صيد الخاطر

ইমাম ইবনুল জাওযি রহ.

হৃদয়ের দিনলিপি

অনুবাদ
শামীম আহমাদ

সম্পাদনা
আলী হাসান উসামা

অ ॥ র্প ॥ ণ

উম্মে সালমান,

যার ত্যাগ ধৈর্য, যত্ন ও উৎসাহ—জীবনকে স্বস্তি দেয়।

সকল প্রতিদান আল্লাহ তাআলার নিকট।

—শামীম আহমাদ

জেনে রেখো, বিভ্রান্তির এই সকল উচ্ছল আনন্দ কোথায় ছুটে টুটে যাবে—অবশিষ্ট থাকবে শুধু তোমার আফসোসের তিক্ত তীক্ষ্ম শাস্তি। বিবশ অলসতার গ্লাসভরা বিলাস কোথায় পড়বে উল্টে—পড়ে থাকবে শুধুই অনুশোচনা আর অনুতাপ!

অভিজ্ঞতার আলোয় চিন্তার জানালা এবার একবার খুলেই দেখো না! তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে—অথচ কোথায় তোমার উচিত ছিল দাঁড়ানো!
আসল কথা তো তাই—যারা যার মধ্যে স্বাদ পেয়েছে, তারা তাতেই নিমগ্ন হয়েছে...।

—আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ.

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

লেখকের ভূমিকা

الحمد لله حمدًا يبلغ رضاه ، وصلى الله على أشرف من اجتباه ، وعلى من صاحبه ووالاه ، وسلم تسليمًا لا يدرك منتهاه.

অনেক সময় কিছু কিছু বিষয় সামনে আসে এবং সে ব্যাপারে আমার হৃদয়ে অনেক রকম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ভেসে ওঠে। কিন্তু সেগুলো যখন আর সামনে থাকে না—মনের মধ্যে উদ্ভাসিত সেই কথাগুলোও তখন হারিয়ে যায়। পরে সেভাবে আর মনে আসে না। এ কারণে মানুষের জন্য উত্তম কাজ হলো, তার মনে কখনো কোনো ভালো বিষয়ের উদয় হলে সেটা লিখে রাখা—যাতে পরে সেগুলো ভুলে না যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, قيدوا العلم بالكتابة -অর্থাৎ তোমরা লেখার মাধ্যমে ইলমকে সংরক্ষণ করো।[১]

এভাবে কত বিষয় হৃদয়ের কোণে উদিত হয়—কিন্তু নিজের অলসতা ও উদাসীনতার কারণে সেগুলো তখন লিখে রাখা হয় না। পরে ভুলে যাই। তখন ভীষণ আফসোস হয়।

এছাড়া আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়—আমি যখন চিন্তার দৃষ্টিতে কোনো বিষয় নিয়ে ভাবি, মাথার মধ্যে অগণিত আশ্চর্য সব ভাবনা ও

---

১ ১. হাকিম ইবনে মুসতাদরাক তাঁর গ্রন্থ 'مستدرك' এ এই হাদিসটি আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এর শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। ইমাম বোখারি রহ. বলেন, এটি 'মুনকিরুল হাদিস'। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাঁর 'تقريب التهذيب' গ্রন্থে বলেন, এটি দুর্বল হাদিস। হজরত আবু হাফয বলেন, হাদিসটি মূলত হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব এবং হজরত আনাস ইবনে মালেক রা. এর ওপর মাওকুফ। [মুসতাদরাকে হাকিম: ১/১০৬, দারিমি: ১/১২৭, তবারনি:১/৫২]

বিশ্লেষণ এসে ভিড় করে। বোধ, বিশ্বাস ও চেতনার এক বিশাল ভান্ডার যেন আমার সমুখে খুলে যায়।

অবশেষে ভেবে দেখলাম—এ বিষয়ে আর অলসতা বা উদাসীনতা দেখানো ঠিক হবে না। হৃদয়ের কথাগুলো লিখতে শুরু করলাম। এবং কিতাবটির নাম রাখলাম 'সইদুল খাতির'—হৃদয়ের রক্ষিত কথামালা। হৃদয়ের দিনলিপি। অন্তরের কথকতা। আল্লাহ্ তাআলাই সকল কল্যাণদাতা। তিনি মানুষের অতি নিকটবর্তী এবং আহ্বানে সাড়াদানকারী।

— ইবনুল জাওযি

অনুবাদকের 'কিছু কথা'

ইসলামি জগতে বিস্ময়কর এক ব্যতিক্রম গ্রন্থের নাম– صيد الخاطر বা *হৃদয়ের দিনলিপি*। হৃদয় ফানা করা এক গ্রন্থ। ইলম, ইবাদত, মুআমালা, মুআশারা, তালিম, তাযকিয়া ও তাসাওউফ—সব মিলেমিশে যেন একাকার হয়েছে এই গ্রন্থে। কী বিস্ময়কর মহিমা নিয়েই না আমাদের হৃদয়জগতের খোরাক জুগিয়ে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী—এবং আজও কত জীবন্ত, সতেজ, দরদি এবং আমাদের জীবনের জন্য প্রাসঙ্গিক!

বিশ্বের বহু মানুষ এই গ্রন্থটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর বিস্ময়কর প্রভাব ও উপযোগিতার কথা বলেছেন। এটি একটি নিদারুণ নিরুত্তাপ উদাসীন হৃদয়কেও করে তোলে জাগ্রত উন্নত ও প্রত্যয়দীপ্ত। উদ্বেল উচ্ছল ঢেউ ওঠে জীবনের মৃত সাগরেও। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের আগে ও পরে মানুষ কখনো এক থাকতে পারে না—সম্ভব নয়। ভেতরে একটি জাগরণ আসবেই—আসবে। এর অনেক জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে।

গ্রন্থটির একটি বড় সাফল্য এই যে, পাঠক নিজেকে এর প্রতিটি শিরোনামের সঙ্গে একাত্ম করে নিতে সক্ষম হবে। নিজের কাছে মনে হবে—নিরিবিলি কোনো এক মসজিদে বসে লেখক যেন সরাসরি আমাকেই সম্বোধন করে কথাগুলো বলছেন। আর মসজিদ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে একটি সবুজ গালিচা। তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে গোলাপের সৌরভ। বাইরের সবুজ জগতে তখন নরম সোনালি সকালটি উঠি উঠি করছে... আর তিনি তাকিয়ে আছেন আমার হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটিতে। তিনি আমার সকল পাপ-পঙ্কিলতা—এবং হৃদয়ের গোপন কুঠুরিতে গোপন যা কিছু ইচ্ছে

জাগে, মনের বন্দরে উথলে ওঠে যেসব ন্যায়-অন্যায়, সবুজ-কালোর ঢেউ—তিনি তার সব জানেন। জানেন আমার মতো আরও বহু মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও মনের অলি-গলির খবর। তিনি সেভাবেই যেন উপদেশ দিতে থাকেন। নিষেধ করেন। সতর্ক করেন। তিরস্কার করেন। অন্যদের উদাহরণ দেন। নিজের কথা বলেন। বলেন অন্যদের কথাও। বলেন নবী, সাহাবি তাবেয়ি, তাবে-তাবেইনদের কথা। কথা বলেন আমাদের সালাফে সালেহিনদের। এক ভারসাম্যপূর্ণ ইলম ও আমলের পথ দেখান। হৃদয় যেন উজাড় করে দেন পাঠক ও শ্রোতার কল্যাণ কামনায়—ব্যথিত হন আমাদের অসতর্কতায়। তিরস্কার করেন আমাদের উদাসীনতায়... দীর্ঘক্ষণ এবং বিভিন্নভাবে। কত রকম উদাহরণ দিয়ে। কত সময় যায়—সকালের সূর্য হয়তো উঠে আসে আরও অনেক উপরে। ধীরে ধীরে মসজিদের বাইরে সূর্যের তীব্রতা বাড়ে। কিন্তু আশ্চর্য! কোনো বিরক্তি আসে না। হৃদয় যেন বিগলিত। তার প্রতিটি উপদেশের সাথে ঝরে পড়ে স্নেহের ফল্গুধারা। প্রতিটি নিষেধের পেছনে চুপটি করে বসে থাকে তার অকৃপণ মনের স্নিগ্ধ মমতা আর উষ্ণ ভালোবাসা। তার আগে এভাবে আর কোনো গ্রন্থে কেউ লেখেনি—কেউ বলেনি।

বলে রাখা ভালো– এ গ্রন্থের মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে শুধু অসম্ভবই নয়; তা হবে এক চরম রকমের বেয়াদবি। আমি শুধু আমার মনের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করতে পারি। আর কোনো 'অর্বাচীন'র অনুভূতি 'অর্বাচীন' ভেবে এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কঠিন কিছু নয়।

এরপর এ গ্রন্থের অনুবাদ করতে চাওয়াও ছিল এক দুঃসাহসিকতার ব্যাপার—অন্তত আমার জন্যে। তবুও 'সাহস' দেখানোর মূল কারণ ছিল হৃদয়ের এক অদৃশ্য টান। তার লেখাগুলোর সাথে আমার সাহিত্যমানসিকতার কেন যেন একটি অদৃশ্য বন্ধুতা অনুভব করি। কেন যেন মনে হয়—তিনি যদি আমাদের যুগে জন্মাতেন, বিশ্বের সাহিত্যাকাশে এক অনন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে দেখা দিতেন। যদিও

লেখার বৈচিত্র্যে সময়ের তুলনায় তখনো তিনি ছিলেন অনন্য এবং অসাধারণ।

বহু আগে থেকেই আমি তার প্রতি অন্যরকম এক দুর্বলতা ধারণ করি। তার 'কিতাবুল আযকিয়া' দিয়েই সাজিয়েছিলাম আমার 'বুদ্ধির গল্প' ও 'বুদ্ধির জয়'-এর অধিকাংশ গল্প। কেমন যেন তার থেকে একটি প্রীতিকর সৌরভের ঘ্রাণ পাই—এতদিন পর, এতদূর থেকে—কোনোদিন না দেখেও...। যেমনটি তিনি নিজেই তার গ্রন্থের মধ্যে লিখেছেন—অতীত মানুষের বিষয়ে শোনা ও পড়া—দেখারই বিকল্প। তাই এ গ্রন্থের অনুবাদের মূল উৎসাহদাতা হলো হৃদয়ের আকর্ষণ। নতুবা কিছুতেই এটা নিয়ে এভাবে আমার দীর্ঘদিন ব্যস্ত থাকা ও শ্রম দেওয়া সম্ভব হতো না।

অনুবাদের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং যুগের দীর্ঘ অতিবাহনের প্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো আজকে আর তেমন প্রয়োজন নেই এবং আমাদের পরিবেশে যার প্রাসঙ্গিকতা নেই—অনুবাদে সেগুলোকেও বাদ রাখা হয়েছে।

আমার জানামতে, কিতাবটির অনেকগুলো অনুলিপি বা সংস্করণ (আরবিতে বলা হয় 'নুসখা') রয়েছে। আমি যেটা থেকে অনুবাদ করেছি সেটি মিসরের 'দারুল হাদিস' থেকে প্রকাশিত। এর তাহকিক ও তাখরিজ করেছেন ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ সাইয়েদ এবং উস্তাদ সাইয়েদ ইবরাহিম সাহেব। উৎস বর্ণনার ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে তাদেরকেই অনুসরণ করা হয়েছে—কিন্তু সহজতার জন্য অনেক জায়গায় 'আল-মাকতাবাতুশ শামেলা'-এর উদ্ধৃতিও প্রদান করা হয়েছে।

গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে লেখকের মনের মাঝে তাৎক্ষণিক উদ্ভাবিত উদ্ভাসিত কিছু চিন্তা ও ভাবনার মিশ্রণে। নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের বিশদ বিবরণ, তাহকিক ও বিশ্লেষণ না করে—তবুও বিষয়গুলো কত গভীর! সূক্ষ্ম। কালোত্তীর্ণ এবং শিক্ষণীয়! এই পদ্ধতিটি আমাদের অনেকের চিন্তার জগতে নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করে দিতে সক্ষম। গ্রন্থের এই বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের আরেক রাহবার

আবু তাহের মিছবাহ দা. বা. তাঁর এক লেখায় উল্লেখ করেছেন। এবং এভাবে কিছু লেখা তিনি নিজেও লিখেছেন। হয়তো আরও কেউ লিখেছেন এবং লিখছেন। তবে আমাদের সাম্প্রতিকতম ঝলকিত দৃষ্টান্ত হলেন মাওলানা সফিউল্লাহ ফুয়াদ সাহেব। তাঁর '*একজন শিক্ষক : দর্পণ ও দর্শন*' এ ধরনের এক আলোকবর্তিকা। তবে এটা ঠিক—ব্যক্তি ও যুগের ভিন্নতায় উপস্থাপন, দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয় ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভিন্নতা আসাই স্বাভাবিক।

এবার বইটির প্রকাশনাবিষয়ে কিছু বলে শেষ করি—বইটির কলেবর ছোট নয়। এমন সাইজের একটি বই সর্বাঙ্গীন সুন্দর করে প্রকাশনার কাজটিও সহজ নয়। তবুও সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় 'মাকতাবাতুল হাসান'-এর স্বত্বাধিকারী রাকিবুল হাসান খান এটি প্রকাশের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা খুবই প্রশংসার যোগ্য এবং সাহসের পরিচায়ক। ধারণা করি, বাংলা প্রকাশনার জগতে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং মূল্যবান সংযোজন বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহর নিকট তার সার্বিক সফলতা কামনা করি।

সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠকসহ বইটির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

শামীম আহমাদ
মিরপুর ঢাকা

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনপরিচিতি

আমাদের সালাফদের মধ্যে যে সকল মনীষী তাদের ইলম, মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে দ্বীনি ময়দানে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশেষকরে—একই সাথে তার নসিহত ও লেখা, সমান গতিতে যেভাবে উম্মতের রাহবারি করেছে, এমন সমন্বয় খুব কম মনীষীর মধ্যেই দেখা গেছে। অনেক পরে আবার যেমনটি দেখা দিয়েছিল হজরত আশরাফ আলি থানবি রহ.-এর ক্ষেত্রে। আল্লামা ইবনুল জাওযি রহ. ছিলেন যেন ইলমের সাগর।

এই মহান মনীষী ৫১০ হিজরি সালে [১১২৬ খ্রিষ্টাব্দে] বসরার জাওযা নামক মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন।

তবে এই সাল নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। তিনি নিজে যেহেতু স্পষ্টভাবে কিছু বলে যেতে পারেননি, এ কারণে অন্যরা কয়েকটি সালের কথা বলে থাকেন। সকলেই অবশ্য ৫০৮-৫১৭ এর মধ্যে রয়েছেন। তবে ৫১০ সালটি অধিক প্রসিদ্ধ এবং সঠিক হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি।

তাঁর সম্বন্ধবাচক নাম আল-জাওযি। বসরার একটি মহল্লার নাম জাওযা। তাঁর দিকে সম্পর্ক করে তাকে 'জাওযি' বলা হয়। কেউ বলেন, তাঁর একজন পূর্বপুরুষ জাফর সেই জাওযা নামক মহল্লার অধিবাসী ছিলেন। সেই দিকে সম্বন্ধ করে তাকে 'জাওযি' বলা হয়। তাঁর বাবার নাম আলি। তাঁর পুরো পরিচয়টা এভাবে বলা যায়—জামালুদ্দিন আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনে আলি ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-কুরাশি আত-তামিমি আল-বাগদাদি, হাম্বলি।

তাঁর বয়স যখন তিন বছর, তখন তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তার মা ও ফুফু তখন তার লেখাপড়া ও প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথমে হিফজ সম্পন্ন করেন। এরপর বহু দূর-দূরান্তের উস্তাদদের নিকট ইলম শিক্ষার জন্য সফর করেন। লেখাপড়ার জন্য তিনি অনেক কষ্ট ও মুজাহাদা করতেন। সামান্য শুকনো রুটি দিয়ে আহার সমাধা করতেন। সমসাময়িক প্রায় ৭৮ জন আলেমের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম হলেন, আবু বকর আদ-দীনওয়ারি (মৃত্যু : ৫৩২ হি./১১৩৭-৩৮ খ্রি.), আবু মানসুর আল-জাওয়ালিকি (মৃত্যু : ৫৩৯ হি./১১৪৪-৪৫), আবুল ফজল ইবনুন নাদির (মৃত্যু : ৫৫০ হি./১১৫৫ খ্রি.), আবু হাকিম আন-নাহরাওয়ানি (মৃত্যু : ৫৫৬ হি. /১১৬১ খ্রি.) আবু ইয়ালা রহ. (মৃত্যু : ৫৫৮ হি. /১১৬৩ খ্রি.), ইবনে রজব হাম্বলি রহ.।

ইবনুল জাওযি রহ. প্রখর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর উস্তাদ ইবনুয যাগুনী রহ. লোকদের ওয়াজ-নসিহত করতেন। সেখানে অনেক লোকের সমাগম হতো। সে সময় এটি একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয় ছিল। উস্তাদের মৃত্যুর পর নিজের যোগ্যতার কারণে ইবনুল জাওযি রহ. তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারতেন; কিন্তু তখন তাঁর বয়স অল্প হওয়ায় তা সম্ভব হয় না। অবশ্য কিছুদিন পরই তিনি সেই স্থান অধিকার করেন এবং তিনি এ ময়দানে আরও বেশি প্রসিদ্ধি ও দক্ষতা অর্জন করেন। তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও আলংকারিক বাক্যবিন্যাস চতুর্দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি জামিউল মানসুরে ওয়াজ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। খলিফা আল মুকতাফির ওজির ইবনে হুবায়রার গৃহে অনুষ্ঠিত ওয়াজ-মাহফিলেও তিনি ওয়াজ করেছেন। এরপর খলিফা আল মুসতানজিদের শাসনামলে (৫৫৫-৬৬ হি./১১৬০-৭০ খ্রি.) তিনি শাহি মসজিদে ওয়াজ করা শুরু করেন। সমকালীন খলিফাগণও তাঁর ওয়াজের মজলিসে উপস্থিত হতেন। তার ওয়াজে দশ হাজার থেকে এক লক্ষ লোকের সমাগম হতো। জনগণ তার নসিহত ও উপদেশ শুনে খুব প্রভাবিত হতো। প্রায় লক্ষাধিক মানুষ তার হাতে সরাসরি তাওবা করেছেন। প্রায় বিশ হাজার ইহুদি ও খ্রিষ্টান তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

হজরত ইবনে কাসির রহ. তাঁর ওয়াজের ব্যাপারে বলেন, 'নসিহত প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য। তার আগে কেউ আর এমনটি ছিল না—তার পদ্ধতি, ধরন, ভাষার বিশুদ্ধতা, বিন্যাস, মিষ্টতা, হৃদয়গ্রাহিতা, বিস্ময়কর সকল চিন্তা ও ভাবনা। গভীরতম কথা। তিনি এগুলো এমনভাবে বলতেন, যেন মানুষজন সেগুলো চাক্ষুষ দেখতে পেত। প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারত। অতি দ্রুত তারা সেগুলো বুঝেও যেত। সহজ কথা ও বাক্যে তিনি গভীরতম অর্থ ধারণ করতে পারতেন।'

এরপর খলিফা আল মুসতাদিও তাঁর ওপর বিশেষ নজর রাখতেন। ইবনুল জাওযি রহ. খলিফার নামে—আল মিসবাহুল মুদি ফি দাওলাতিল মুসতাদি' নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেন।

৫৭০ সালের দিকে তিনি দারব দীনার-এ একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে পাঠদান শুরু করেন। এ বছরই তিনি তার ওয়াজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ কোরআনের তাফসির সমাপ্ত করেন। মুসলিম বিশ্বে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ওয়াজ-অনুষ্ঠানে ধারাবাহিকভাবে কোরআনের তাফসির সমাপ্ত করেন।

তিনি একজন বড় কবিও ছিলেন। কবিদের অনেক কবিতাও তাঁর ছিল মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ।

তিনি নফল ইবাদতের চেয়ে ইলমচর্চাকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। জুহদ বা কৃচ্ছসাধনার প্রতি তার কোনো অনুরাগ ছিল না। তিনি বরং পানাহার ও স্মরণশক্তি বর্ধক খাদ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন এবং পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতেন।

অনেক খলিফাই তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখেছেন। কিন্তু তিনি কোনোদিন সম্পদ বা ক্ষমতা লাভের জন্য কোনো খলিফার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেননি। তিনি তাদের মাধ্যমে কখনো দুনিয়ার বিষয়-আশয়ও কামনা করেননি। সত্য প্রকাশে তিনি কখনো পিছপা হননি। 'লিফতাতুল কাবিদ ফি নাসিহাতিল ওয়ালাদ' গ্রন্থে তিনি বলেন, জীবিকা অর্জনের জন্য আমি কখনো কোনো আমিরের তোষামোদ করিনি।

তিনি বিদআতের এত কঠোর সমালোচনা করতেন যে, কখনো কখনো এটা তার নিজের অনুসারীদের জন্যও কঠিন হয়ে পড়ত। এমনকি ইমাম গাজালি রহ. রচিত 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন' গ্রন্থের কিছু দুর্বল হাদিসের সমালোচনা করে এর উপকারকে নিষ্কলুষ করার জন্য এটিকে তিনি নতুনভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

ওয়াজের মতো রচনা-সংকলনেও তার সমান আগ্রহ ছিল। যে গতিতে তিনি ওয়াজ করতেন, একই গতিতে রচনার কাজেও নিয়োজিত থাকতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি প্রায় তিনশত গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি আবার কয়েক খণ্ড-সংবলিত। তার সময় পর্যন্ত কোনো মুসলিম লেখক এত বেশি গ্রন্থ রচনা করেননি।

তার বাক্যবিন্যাস ছিল খুব সহজ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। বক্তব্যের মধ্যে অনেক উদাহরণ এবং ছোট ছোট ঘটনা উল্লেখ করতেন। পাঠক এবং শ্রোতা এতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। ওয়াজের ক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো দুর্বল হাদিসও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'উলুমুল হাদিস' হাদিস-সংক্রান্ত ইলমি গ্রন্থে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর এবং মুহাক্কিক নজরের ব্যক্তি।

তাঁর রচনাগুলোর অধিকাংশই ছিল সংকলন ধরনের। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, তিনি এই সকল বিষয়ের অনেক বিষয়ের রচয়িতা নন; সংকলকমাত্র।

তবুও অধিকাংশ আলেমের মত হলো—তাঁর সকল রচনাই প্রশংসার যোগ্য।

জীবনের শেষ দিকে এসে তাকে জেল খাটতে হয়েছে। প্রায় পাঁচ বছর জেলখানায় বন্দি ছিলেন। এটা হয়েছিল কিছু ভ্রান্ত মানুষ ও হিংসুকের প্ররোচনার কারণে। তারা খলিফার নিকট বিভিন্ন অভিযোগ করতে থাকে। পরিণামে তাকে বাগদাদ থেকে দূরে 'ওয়াসেত' শহরে বন্দি করে রাখা হয়। তার আত্মীয়স্বজনের ওপর অত্যাচার করা হয়। বাড়ি ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এই পুরো বিষয়টার পেছনে মনে করা হয় ইবনুল কাসসাব আশ-শাঈর হাত ছিল। সে-ই ষড়যন্ত্র করে এটা করেছিল। আর ষড়যন্ত্রের সুযোগ পেয়েছিল একারণে যে, ইবনুল জাওযি রহ. আমির-উমারা, রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের অনিয়ম-দুর্নীতি ও জুলুমের কঠিন সমালোচনা করতেন। তিনি তাদেরকে কখনো ভয় করে চলতেন না। ভয় করে কথা বলতেন না।

তবে অনেকে এটাও বলেন—হজরত আবদুল কাদের জিলানি রহ. এর পুত্র এবং তাঁর মাঝে কিছু বিষয় নিয়ে মতবিরোধ ছিল। কারণ, ইবনুল জাওযি আবদুল কাদের জিলানির অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর সববিষয়ে সহমত পোষণ করতেন না। তার বন্দি হওয়ার ক্ষেত্রে এটাও একটা উপলক্ষ্য হতে পারে।

অবশেষে পাঁচ বছর জেলে বন্দি থাকার পর খলিফার মায়ের হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

এরপর তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন। এর দু-বছর পর তিনি সাধারণ রোগে ৫৯৭ হি./১২০০খ্রি. সালে রমজানে জুমার দিন ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর দিন বাগদাদের সকল দোকান-পাট বন্ধ ছিল। পুরো শহর শোকে যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাকে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন। আমিন।

তার কিছু উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম :

১. আল-মুনতাজাম, ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম। (ইতিহাস সম্পর্কিত অসাধারণ একটি গ্রন্থ।)

২. সিফাতুস সাফওয়া। গ্রন্থটি মূলত আবু নুয়ায়ম ইসফাহানির 'হিলইয়াতুল আওলিয়া' গ্রন্থের সমালোচনাসহ সারসংক্ষেপ।

৩. তালবিসু ইবলিস। শয়তানের বিভিন্ন চক্রান্ত ও কৌশল নিয়ে আলোচনা—শয়তান যা দিয়ে সে জনসাধারণকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করে।

৪. কিতাবুল আযকিয়া। মেধা ও বুদ্ধির বিবরণ। এরপর বুদ্ধিদীপ্ত ছোট-বড় অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. কিতাবুল হাছছি আলা হিফজিল ইলম। জ্ঞান সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা এবং ধরন-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা।

৬. কিতাবুল হুমাকা ওয়াল মুগাফফালিন। গ্রন্থটিতে নির্বোধ-বোকা ও অলসদের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. আল মাওদুআতুল কুবরা মিনাল আহাদিছিল মারফুআ। প্রচলিত বিভিন্ন জাল হাদিস নিয়ে আলোচনা। চার খণ্ডে সমাপ্ত।

৭. যাম্মুল হাওয়া। এ গ্রন্থে প্রবৃত্তি, প্রেম ও অনুরাগের ক্ষতিসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এবং এর থেকে মুক্তির উপায়ও বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. কিতাবুল কুসসাস ওয়াল মুযাককিরিন। এতে খ্যাতিমান ধর্মীয় কাহিনিকারদের কথা বলা হয়েছে। তাদের কিছু হাস্যকর বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. কিতাবু আআজিবিল খুতাব। তেইশটি বক্তৃতার সংকলন।

১০. আল মুগনি ফিল কিরাআত।

১১. নাফইয়ুত তাশবিহ।

১২. তাকওয়িমুল লিসান।

১৩. মানাকিবু আহমাদ।

১৪. আন নাসিখু ওয়াল মানসুখ।

১৫. মানহাযুল উসুল ইলা ইলমিল উসুল।

১৬. মানহাযুল ইসাবাহ ফি মাহাব্বাতিস সাহাবা।

তার এক বিখ্যাত দুআ ছিল এমন–

إلهي لا تعذب لسانًا يخبر عنك، ولا عينًا تنظر إلى علوم تدل عليك ولا قدماً تمشي إلى خدمتك ولا يداً تكتب حديث رسولك. فبعزتك لا تدخلني النار فقد علم أهلها أني كنت أذبّ عن دينك.

হে আমার প্রভু, আপনি এমন জিহ্বাকে শাস্তি দিয়েন না, যা আপনার বিষয়ে মানুষদের খবর দিয়ে বেড়ায়। এমন চোখকেও শাস্তি দিয়েন না, যা এমনসব ইলমের দিকে তাকায়, যা আপনার অস্তিত্বের প্রমাণ। এমন দুটি পা-কেও শাস্তি দিয়েন না, যা আপনার ইবাদতের জন্য হাঁটে। এমন হাতকে শাস্তি দিয়েন না, যা আপনার রাসুলের হাদিস লেখে। এবং হে রহমশীল, আপনার মর্যাদার ওয়াস্তে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। কারণ, লোকেরা তো জানে– আমি আপনার দ্বীনের সংরক্ষণেরই কাজ করতাম!

হৃদয়ের দিনলিপি...

উপদেশ গ্রহণে মানুষের বৈচিত্র্য

মানুষ যখন ওয়াজ বা বক্তৃতা শোনে, তখন তার মধ্যে এক ধরনের আবেগ ও জাগরণের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন সে আলোচনার মজলিস থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার মধ্যে সেই আবেগ ও জাগ্রতভাব আর থাকে না। তার হৃদয়ে আবার ফিরে আসে আগের সেই কঠিন অলসতা ও উদাসীনতা।

আমি এর কারণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম– কেন এমনটি হয়? লক্ষ করে দেখলাম, এক্ষেত্রে মানুষের অবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। একেক জনের অবস্থা একেক রকম। তবে তাদের সাধারণ অবস্থা হলো, উপদেশ শোনার সময়ে আর পরে অন্তর এক অবস্থায় থাকে না। দু-সময়ের চেতনা ও আবেগে তাই স্বভাবতই ভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণভাবে এটি হয় দুই কারণে–

১. ওয়াজ-উপদেশ হলো চাবুকের মতো। চাবুক যখন শরীরে আঘাত করে তখন যেভাবে আঘাত ও ব্যথা লাগে, পরে আর সেই আঘাত ও ব্যথা থাকে না।

২. মানুষ ওয়াজ-উপদেশ শোনার সময়ে এক ধরনের তৃপ্তি ও উপভোগ্যতার মধ্যে অবস্থান করে। তার শরীর ও মন দুনিয়ার সকল কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। হৃদয় থাকে শ্রবণের প্রতি নিমগ্ন। অন্তর থাকে বিগলিত। কিন্তু যখন সে মজলিস থেকে বেরিয়ে আসে এবং জীবনের নানান ব্যস্ততা ও কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যায় তখন তার পারিপার্শ্বিকতা তাকে আবার সেগুলোর দিকেই আকৃষ্ট করে ফেলে। তাকে আবার নগদ সুখ, দুঃখ ও পার্থিবতার দিকে টেনে নেয়।

এবার বলুন, তখন কীভাবে অন্তরের সেই অবস্থা বাকি থাকবে, উপদেশ শোনার সময় তার যে অবস্থা ছিল?

তো এটিই হলো মানুষের সাধারণ অবস্থা। তবে হ্যাঁ, প্রভাব অবশিষ্ট থাকার ক্ষেত্রে জাগ্রত মননের অধিকারী ব্যক্তিদের অবস্থা ভিন্নতর হয়ে থাকে। যেমন,

১. এমন কিছু প্রত্যয়ী ব্যক্তি আছে, যারা কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়া দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে নেয়। এরপর সময়ের অতিক্রম সত্ত্বেও যাদের চেতনা ও প্রত্যয়ের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে না। তারা সব সময় লক্ষ্য ও সংকল্পের

ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন থাকে। মনের কোনো দুর্বল মুহূর্তেও যদি নিজের ভেতর কোনো পরিবর্তন দেখতে পায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার সচেতন প্রাণ বিচলিত হয়ে ওঠে। এই তারতম্য সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। যেমন হজরত হানজালা রা.-এর ঘটনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পর হৃদয়ের পরিবর্তন দেখে তিনি নিজের ব্যাপারে বলে উঠেছিলেন, نافق حنظلة –হানজালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে![২]

আহা, কে বুঝবে ঈমানের এই দৃঢ়তা!

২. দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তিরা হলো এমন, যাদের আগের সেই উদাসীন মন কখনো তাদেরকে উদাসীনতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে। আবার কখনো শ্রুত উপদেশগুলি আমলের দিকে উৎসাহিত করে। তাদের দৃষ্টান্ত সেই গমের শীষের মতো, বাতাস যাকে একবার এক দিকে দোলায়, তো আরেকবার অন্য দিকে।

৩. তৃতীয় প্রকার ব্যক্তিরা হলো তারা, উপদেশের প্রভাব যাদের ভেতর ঠিক ততক্ষণ কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তারা শোনে। এরপর সব ভুলে বসে থাকে। তাদের দৃষ্টান্ত শুকনো পাথরের ওপর প্রবাহিত পানির মতো।

---

[২]. এর দ্বারা সেই হাদিসের দিকে ইশারা করা হয়েছে– যা ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর 'সহিহ মুসলিম' এ উল্লেখ করেছেন। সেখানে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ قَالَ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِيَنِي
أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ قَالَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَقُولُ قَالَ قُلْتُ نَكُونُ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ فَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَلْقَى مِثْلَ
هَذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى
كَأَنَّا رَأْيُ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ
عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

[সহিহ মুসলিম : 8/১২-১৩/ ২১০৬-২১০৭, মুসনাদে আহমদ : 8/8৬]

দুনিয়ার সাথে হৃদয়ের বন্ধন

দুনিয়ার প্রতি মানুষের রয়েছে বর্ণনাতীত আকর্ষণ। দুনিয়ার প্রতি মানুষের এই যে বন্ধন ও আকর্ষণ, এর প্রেরণা ভেতর থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু আখেরাতের প্রতি তার ঝোঁক বা আকর্ষণ সে তুলনায় অনেক ক্ষীণ। আখেরাতের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ, তা মানবপ্রকৃতির বাইরের কোনো পারিপার্শ্বিকতা থেকে সৃষ্ট। বাইরে থেকে আমদানিকৃত।

কিন্তু বাস্তবতা সম্পর্কে যাদের জ্ঞান ও ধারণা নেই, তারা ভাবে—মানুষের বুঝি আখেরাতের প্রতিই আকর্ষণ বেশি। কোরআন ও হাদিসের সতর্কবাণীর প্রেক্ষিতে কোনো মুমিনের নিকট বাহ্যত এমনটা মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা এর থেকে ভিন্ন। কেননা, দুনিয়ার প্রতি মানুষের আকর্ষণের উদাহরণ হলো নিম্নভূমির দিকে পানির প্রবহমানতার মতো। পানি সহজেই নিচের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু আখেরাতের প্রতি মানুষের আকর্ষণের দৃষ্টান্ত হলো পাহাড়-চূড়ায় পানির উত্থিত হওয়ার মতো। পানি সে দিকে গড়াতে চায় না। অনেক কষ্ট ক্লেশ, পরিশ্রম ও কৌশলের মাধ্যমেই সেখানে ওঠা সম্ভব হয়। এ কারণে শরিয়তপ্রণেতা আল্লাহ তাআলা ভয় ও ভীতির মাধ্যমে এবং আশা ও প্রত্যাশার মাধ্যমে সচেতন বান্দাদের অন্তরে আখেরাতের আকর্ষণ জাগিয়ে তোলেন। তাকে বহু রকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাগ্রত রাখেন। এটা এমনিতেই হওয়া সম্ভব ছিল না।

অন্যদিকে দুনিয়ার স্বাদ ও আস্বাদনের দিকে মানুষের প্রবৃত্তির ঝোঁক হলো স্বভাবগত। নিম্নদেশে ধাবিত হওয়ার মতো সহজ। কিন্তু এগুলোকে দমিয়ে রেখে আখেরাতের দিকে ধাবিত হওয়াই হলো দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ। এর জন্যই রয়েছে পুরস্কার।

পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখা

যে ব্যক্তি পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি ফেলে কোনো বিষয়ের সূচনাতেই তার পরিণতি লক্ষ করে নিতে পারে, সে সেই বিষয়ের কল্যাণ লাভ করে এবং অকল্যাণ থেকে মুক্তি পায়। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ের পরিণামের কথা চিন্তা করে না, তার ওপর প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যায়। ফলে সে যা থেকে পেতে চেয়েছিল নিরাপত্তা ও নির্ভরতা, তা থেকেই সে প্রাপ্ত হয় কষ্ট ও অনিষ্টতা। আর যে ব্যাপারে সে কামনা করেছিল শান্তি ও স্বস্তি, তা থেকে প্রাপ্ত হয় ক্লান্তি ও অস্বস্তি।

যদিও কথাটি পরীক্ষাযোগ্য এবং ঘটিতব্য একটি বিষয়ের দর্শন; কিন্তু এটাকে একটি পরীক্ষিত অতীতের দ্বারাও প্রমাণ করা যায়। যেমন ধরো—তুমি তোমার জীবনের কিছু ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করেছ, আবার কিছু ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ্যতাও করেছ। এখন বলো, এখনো কি তোমার মধ্যে রয়ে গেছে সেই গোনাহের স্বাদ ও অনুভব? কিংবা সেই আনুগত্যের ক্লান্তি ও ক্লেশ? দুটোর কোনোটিই কিন্তু তোমার মধ্যে এখন অবশিষ্ট নেই। তোমার বর্তমান থেকে দুটো জিনিসই মুছে গেছে। কিন্তু অবশিষ্ট থেকে গেছে সেই গোনাহের পরিণাম ও প্রতিফল। এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।

হায়, গোনাহের সেই অবস্থা যদি মনের খেয়ালে এসে আবার মনের খেয়ালেই হারিয়ে যেত! গোনাহটি যদি কার্যে পরিণত না করা হতো, তাহলে কতই না ভালো হতো!

এভাবে তুমি অনেক মানুষকে মৃত্যুর সময় কৃত গোনাহের কারণে বারবার আফসোস করতে দেখেছ। স্মরণ রেখো, গোনাহের স্বাদ ও আস্বাদন এক সময় রূপান্তরিত হয় গলার কাঁটায়। মজা তো ফুরিয়ে যায় অল্পতেই; কিন্তু বাকি থাকে তার দুঃখ ও দুর্দশা এবং অনুতাপ ও অনুশোচনার ক্লেশ।

আমাকে বলো, তোমার অর্জিত জ্ঞান তোমাকে কি কোনো জিনিসের পরিণাম সম্পর্কে ভাবতে শেখায় না?

জনৈক কবি বলেন,

فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم.

সুতরাং হে বন্ধু, পরিণাম সম্পর্কে ভেবে অগ্রসর হও, নিরাপদ থাকবে।
প্রবৃত্তির চাহিদার দিকে ঝুঁকে পড়ো না কিছুতেই, অন্যথায় লজ্জিত হবে।

প্রতারণার সঙ্গে বসবাস

যে ব্যক্তি দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, সে অবশ্যই সতর্ক ও সচেতন হয়। সফরের দীর্ঘ পথ সম্পর্কে যার রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাস, সে অবশ্যই পাথেয় সঞ্চয় করে, প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অথচ হে বন্ধু,

ما أعجب أمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه،

ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.

তোমার বিষয়টি কত আশ্চর্যজনক—একটি বিষয়কে নিশ্চিত জেনেও আবার সেটাকে ভুলে যাও।

ব্যাপক ক্ষতি ও বিপদের বাস্তবতা জেনেও অন্যদিকে লিপ্ত হও।

ভয় করছ মানুষকে; অথচ আল্লাহকেই তোমার অধিক ভয় করা উচিত।

এ কী বিস্ময়কর ব্যাপার!

দুনিয়ার অনিশ্চিত কোনো বিপদের সামান্য আশঙ্কাও তোমাকে কাবু করে ফেলে; অথচ আখেরাতের মতো একটি নিশ্চিত অনিবার্য বিষয় তোমার মাঝে কোনো প্রভাব ফেলছে না!

আরও অধিক আশ্চর্যের ব্যাপার তো হলো, তুমি ধোঁকা ও প্রতারণার উপকরণ নিয়ে তৃপ্ত ও আনন্দিত হয়ে আছ। কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের অন্বেষণ ছেড়ে অনর্থক বিষয় নিয়েই মত্ত রয়েছ। অদেখা জগৎকে ভুলে প্রকাশ্য জগতেই পুরো বুঁদ হয়ে আছ। রোগের যাতনা ভুলে সাময়িক সুস্থতা নিয়ে রয়েছ প্রতারিত। আসন্ন কষ্ট ও দুর্ভোগের কথা ভুলে বর্তমানের অবকাশ নিয়ে রয়েছ উল্লসিত। অথচ অন্যের মৃত্যু কি তোমার মৃত্যুর পয়গাম নিয়ে আসেনি? অন্যের কবর-শয্যা কি তোমার কবর-শয্যার খবর দেয় না? হায়, সামান্য এই ভোগ-বিলাস তোমাকে মহা ধ্বংসের চেতনা থেকে কীভাবেই না বিমুখ করে রেখেছে!

كأنك لم تسمع بأخبار من مضى .. ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر!

فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم ... محاها مجال الرّيح بعدك والقبر!

আহা, তুমি যেন বিগত মানুষের কোনো সংবাদই শোনোনি! বিরাজিত মানুষদের নিয়ে কালের চক্র যে নির্মম খেলাটা খেলেছে—তা-ও যেন দেখোনি তুমি।

এতদিনেও যদি না জানো, আজ অন্তত তাকিয়ে দেখো তাদের বাড়ি-ঘরের দিকে—যুগের ঘূর্ণিবায়ু সেসব ধ্বসিয়ে দিয়েছে কবে। এবং জেনে রেখো, তোমার মৃত্যুর পরও এমনই অবস্থা হবে তোমার কবরের।

তুমি নিজেই কত প্রাসাদ-অট্টালিকাবাসীকে দেখেছ, কিছুতেই তারা প্রাসাদ ছেড়ে কবরে নামতে চায়নি। তবুও তাদের নামতে হয়েছে; বরং নামানো হয়েছে। আরও কত অট্টালিকাবাসীকে দেখেছ, তাদেরকে নিজেদের অট্টালিকা থেকে সরানো হয়েছে... এরপর তাদের শত্রুরাই চেপে বসেছে সেই অট্টালিকায়।

তাই হে প্রতিমুহূর্তে কবরের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাত্রী, তোমার কাজ দেখে মনে হয়, তুমি যেন কবরের ভয়াবহ দুর্ভোগ সম্পর্কে কিছুই জানো না। এ তোমার কেমন আচরণ!

وكيف تنام العين وهي قريرةٌ ... ولم تدر من أي المحلين تنزلُ؟

এখনো নিশ্চিন্তে ঘুমায় তোমার দু-চোখ, অথচ সে এখনো জানে না, কবরে কী ধরনের শয্যায় সে শায়িত হবে!

সতর্কতাই নিরাপত্তার উত্তম পথ

যে ব্যক্তি ফিতনার কাছাকাছি থাকে, তার সকল নিরাপত্তা উবে যায়। আর নিজের ধৈর্য ও নিয়ন্ত্রণের কথা বলে যারা ফিতনার দিকে এগিয়ে আসে, তাদেরকে নিজেদের শক্তির ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। ফলে তারা হয় বিচ্যুত বিভ্রান্ত ও পদস্খলিত কিংবা তাদেরকে সইতে হয় সীমাহীন দুর্যোগ ও দুর্ভোগ...।

এভাবে কত আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিদার মানুষ অবেলায় হারিয়ে গেছে; লাঞ্ছিত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে তাদের আগামী। সবচেয়ে বেশি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত হলো জিহ্বা ও চোখ। তাই হে বন্ধু, ফিতনার সীমানায় থেকেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখার মিথ্যা প্রতারণা থেকে বেঁচে থেকো। এ বড় সঙ্গিন কাজ। প্রবৃত্তির চক্র-চাল বড় মারাত্মক। বিশ্বজয়ী কত বীরযোদ্ধাও লড়াই-প্রান্তে এভাবে গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছে। হায়, আঘাতটা এসেছে সেখান থেকেই, তুচ্ছতা ও অবহেলায় যার দিকে দৃষ্টিই দেওয়া হয়নি। একবার স্মরণ করো সেই ওহুদ প্রান্তরের করুণ চিত্র—হামজার অমিত বাহুর শাণিত তরবারি ছিন্ন করে চলেছে কত বীর, লুটিয়ে দিচ্ছে কোরাইশদের কত গর্দান। অথচ তিনি নিজেই শহিদ হলেন লুকিয়ে থাকা ওয়াহশির গুপ্ত বল্লমে![৩]

কবি বলেন,

فتبصّر ولا تشم كلّ برقٍ ... ربّ برقٍ فيه صواعق حين

فبلاء الفتى موافقة النف ... س وبدء الهوى طموح العين

বিচক্ষণতার সাথে পথ চলো। প্রতিটি বিদ্যুৎ চমকের আনন্দ উপভোগ করতে চেয়ো না। কিছু বিজলীতে রয়েছে মৃত্যুর পরোয়ানা।

প্রবৃত্তির অনুসরণই অনভিজ্ঞ যুবকের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ; যার সূচনা করে চোখের অন্যায় অতৃপ্ত দৃষ্টির কামনা।

---

৩. এর দ্বারা ওহুদ প্রান্তরের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে– যেখানে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার গোলাম ওয়াহশির বল্লমের আঘাতে হজরত হামজা রা. শহিদ হন। ওয়াহশি লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। ঘটনাটি ইমাম বোখারি রহ. 'কিতাবুল মাগাযি' এর মধ্যে 'قتل حمزة ابن عبد المطلب' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। ফাতহুল বারি : ৭/৪০৭২। একইভাবে ইবনে হিশাম রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'السيرة النبوية' তে দালিলিকভাবে এটার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইবাদতের সাথে অন্তরের সংযোগ

أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة –শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তার (গোপন) শাস্তির বিষয়টি অনুধাবন করতে না পারে, তবে এটাই হলো তার জন্য সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি।

এরচেয়েও মারাত্মক ব্যাপার হলো, সতর্ক না হয়ে বরং শাস্তির বিষয় নিয়ে আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকা। যেমন, হারাম সম্পদ নিয়ে গর্ব করা। গোনাহের বিষয়ে ভাবনাহীন থাকা। এমন ব্যক্তি কখনো ইবাদতে সফলতা লাভ করতে পারে না। আনন্দ ও তৃপ্তি পায় না।

আমি অনেক আলেম ও জাহেদের ক্ষেত্রেও লক্ষ করে দেখেছি, তারা তাদের শাস্তি ও বঞ্চনা সম্পর্কে সচেতন নয়। এগুলোর অধিকাংশ তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগের কামনার কারণেই হয়েছে। অন্তর তাদের দুনিয়ার সাথে লেগে গেছে।

এ ধরনের আলেমরা ভুল ধরলে রেগে যায়। এ ধরনের বক্তারা ভণিতার আশ্রয় গ্রহণ করে। আর এ ধরনের জাহেদ ব্যক্তি হয় মুনাফিক বা লোক দেখানো আমলকারী।

তাদের প্রকাশ্য শাস্তি হলো, দুনিয়ার প্রতি লোভ থাকার কারণে তারা সত্য ও সঠিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর তাদের অভ্যন্তরীণ শাস্তি হলো, তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপের মিষ্টতা এবং নির্জন ইবাদতের আস্বাদন।

হ্যাঁ, তবে কিছু মুমিন পুরুষ ও নারী রয়েছে তাদের ব্যতিক্রম। আল্লাহ তাদের কারণে পৃথিবী এখনো স্থিত রেখেছেন। তাদের একাকী আমলগুলো সম্মিলিত আমলের মতোই; বরং এরচেয়েও আরও উজ্জ্বল। তাদের নির্জন আমলগুলো প্রকাশ্য আমলের মতোই; বরং তারচেয়েও আরও মুগ্ধকর ও স্বাদযুক্ত। তাদের হিম্মত ও ঈমানের দৃঢ়তা সুদূর নক্ষত্রপুঞ্জের উচ্চতায় স্থিত; বরং তারচেয়েও আরও উর্ধ্বে তার অবস্থান।

তারা গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো বলে বেড়ান না। তাদের সমুখে সম্মান ও মর্যাদার ডালি সাজিয়ে ধরলেও তারা সেগুলো স্বীকার করতে চান না।

অবুঝ মানুষরা তাদের তেমন মূল্যায়ন করে না; কিন্তু তারাও তো ভ্রুক্ষেপ করেন না মানুষের এই উন্নাসিকতা। তাদেরকে ভালোবাসে পৃথিবীর সকল তৃণলতা। তাদের নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে আসমানের সকল ফেরেশতা। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাদের অনুসারী হওয়ার তাওফিক দান করেন। আমিন।

মৃত্যুর জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি

বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত তার অন্তিম সফরের জন্য সদা প্রস্তুত থাকা। কারণ, সে জানে না, কখন তার নিকট আকস্মিক তার প্রতিপালকের আদেশ এসে পড়বে। তার জানা নেই, কখন সে প্রস্তুতি নেবে। এ কারণে সে সর্বদাই প্রস্তুতি নিয়ে থাকবে।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষকে দেখি, তাদের যৌবন তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখেছে। কালচক্রের ধাবমানতা যেন তারা ভুলেই গেছে। দুনিয়ার যাবতীয় দীর্ঘ আশা ও প্রত্যাশা তাদেরকে প্রতারণার মধ্যে ফেলে রেখেছে। তাদের চোখের তারায় খেলা করে শুধু দুনিয়ায় রঙিন স্বপ্ন।

কোনো কোনো আলেম মনে করে, আজ ইলমটাই শুধু শিখি, পরে মন স্থির করে এর ওপর আমল করব। এভাবে সে অলসতা ও আয়েশের আশ্রয় নিয়ে নিজের পদস্খলন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে। তাওবার প্রস্তুতিকে বিলম্বিত করে। কারও গিবতে লিপ্ত হয় অথবা শুনতে থাকে। সে এমন সন্দেহপূর্ণ কাজ করতে থাকে, যা তার সকল ধর্ম-কর্ম ও পরহেজগারিকে নস্যাৎ করে দেয়। সে কবরকে ভুলে থাকে, অথচ হঠাৎ যেকোনো সময় বেজে উঠতে পারে তার মৃত্যুর ঘণ্টা।

সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি সে-ই, যে প্রতিমুহূর্তে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যস্ত থাকে। কখনো যদি আকস্মিক মৃত্যু এসেও পড়ে– তবে তো সে প্রস্তুত। আর যদি না আসে তাহলে তো সে প্রতিনিয়ত কত কত সৎ আমলের সুরভিত পুষ্প-ফুলে উপচে নিল জীবনের দীর্ঘ আঁচল!

গোনাহের পরিণতি

বর্তমানের অনেক আলেমই সীমাহীন দুর্যোগ, দুর্ভোগ ও মুসিবতের মধ্যে কাল যাপন করছেন। অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে কাটছে তাদের জীবন ও জীবিকা। বিষয়টি ভাবনায় আসতেই আমার মুখে এসে গেল– إن الله أكرم الأكرمين –আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে মর্যাদাশীল। আর তাঁর মর্যাদার দাবিই হলো, বান্দার ওপর ব্যাপক রহম করা। তাহলে মানুষদের আজ এই অবস্থা কেন? আলেমদের এই দুর্দশা কেন?

অনুসন্ধান নিয়ে দেখতে পেলাম, মুসলমান হিসেবে অধিকাংশের অস্তিত্ব না থাকার মতোই। তারা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না। আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। চতুষ্পদ জন্তুর মতো তারা তাদের অভ্যাস ও প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ করে চলে। শরিয়ত যদি তাদের চাহিদামতো হয় তবে সেটা পালন করে; নতুবা তারা তাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষামতোই চলে। যেভাবেই হোক, সম্পদ অর্জিত হলেই হলো; হালাল-হারামের কোনো ধার তারা ধারে না। পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে নামাজ পড়া সহজ হলে পড়ে; অন্যথায় পড়ে না। নিষেধ ও হারাম জানা সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহের মধ্যে সর্বদা লিপ্ত থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের কারও হয়তো ইলম বা জ্ঞানের প্রাচুর্য রয়েছে; কিন্তু তার সাথে পাল্লা দিয়ে রয়েছে গোনাহের ব্যাপকতা।

এই যখন অবস্থা, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি যত বেশিই হোক না কেন, তবুও সেটা তাদের গোনাহের তুলনায় অনেক কম।

আর যদি আল্লাহ তাআলা তাদের গোনাহ মাফ করার জন্য তাদেরকে কোনো বালা-মুসিবতে আপতিত করেন, তখন কোনো কোনো ফরিয়াদি অনুযোগ করে বলে ওঠে, আচ্ছা বলো তো, আমার কোন গোনাহের কারণে এমন হলো? [আহা, ভাবখানা এমন—তাদের জীবনে যেন শাস্তিযোগ্য কোনো গোনাহই সংঘটিত হয়নি!]

অথচ গোনাহের পাহাড় জমে আছে পৃথিবী জুড়ে। এর একাংশ সহ্য করতেও পৃথিবী আজ বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে। সে কি জানে না, এটি তার যৌবনে আল্লাহ তাআলার হক নষ্ট করার শাস্তি?

হায়, যখনই কোনো মুসিবতে আপতিত হও, তখন স্মরণ রেখো, এটা তোমার কৃত গোনাহের কারণেই হয়েছে।

দুনিয়ামুখী আলেম ও আখেরাতমুখী আলেম

আলেমদের মাঝে এত যে রেষারেষি হিংসা বিদ্বেষ ও পারস্পরিক দোষচর্চা—আমি এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখলাম, এগুলোর প্রধান উৎস হলো দুনিয়ার প্রতি তাদের লোভ ও আসক্তি। কারণ, আখেরাতমুখী আলেমগণ দ্বীনের প্রতি নিঃশর্ত অনুগত হন। তারা এভাবে রেষারেষি করে বেড়ান না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا﴾

যা কিছু তাদেরকে দেওয়া হয়, তার প্রতি তারা তাদের অন্তরে কোনো চাহিদা বোধ করে না। [সুরা হাশর : ৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿يَقُولُونَ: رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾

(মুমিনগণ) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, ক্ষমা করো আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। [সুরা হাশর : ১০]

হজরত আবু দারদা রা. প্রতিরাতে তার সকল সাথির জন্য দুআ করতেন।

হজরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. একবার ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর ছেলেকে বললেন, আমি প্রতিদিন প্রভাতে যে ছয় জন ব্যক্তির জন্য একান্তভাবে দুআ করি, তোমার বাবা হলেন তাদের অন্যতম।[৪]

---

[৪]. কথাটি ইমাম যাহাবি রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'سير أعلام النبلاء' তে উল্লেখ করেছেন– ১১/২২৭।

দুনিয়ামুখী ও আখেরাতমুখী আলেমদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

এক. দুনিয়ামুখী আলেম যারা, তারা নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রতি অত্যধিক আগ্রহী হন। তারা নিজেদের নিকট মানুষদের আধিক্য কামনা করেন। লোকদের প্রশংসা শুনতে ভালোবাসেন।

দুই. আখেরাতমুখী আলেম যারা, তারা কখনোই উল্লিখিত তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দেন না। তারা এগুলোকে ভয় করেন। এগুলো থেকে দূরে থাকতে চান। তবে কখনো নিজের ওপর দায়িত্ব এসে গেলে সবার ওপর দয়া ও মহানুভবতার পরিচয় দেন।

যেমন, আল্লামা নাখঈ রহ.[৫] কখনো কোনো খুঁটি বা তাকিয়াতে হেলান দিতেন না।

হজরত আলকামা রহ.[৬] তাঁর পেছনে কারও চলাকে পছন্দ করতেন না।

এমনকি আলেমদের মধ্যে এমন কিছু বুজুর্গ ব্যক্তিও অতিবাহিত হয়েছেন, যারা তাদের নিকট চারজনের বেশি উপবেশন করলে সেখান থেকে উঠে যেতেন। নিজেদের অহংকার প্রকাশ পাওয়ার সকল ব্যবস্থা ও মাধ্যম তারা এভাবেই পরিহার করে চলতেন।

---

৫. তাঁর পুরো নাম আবু ইমরান ইবরাহিম ইয়াযিদ ইবনে কায়েস আন-নাখঈ। ইয়ামানি এরপর কুফি। তিনি ছিলে ইমাম হাফেজে হাদিস এবং ফকিহ। ইসলামি জ্ঞানের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। বংশগতভাবে তিনি ছিলেন আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদের বোন মালিকার পুত্র। কুফাবাসীর একজন মুফতি। তিনি ছিলেন খুবই সচ্চরিত্রবান। লৌকিকতা-বর্জিত অমায়িক মানুষ। তাঁর স্ত্রী হুনাইদা বলেন, তিনি একদিন পরপর রোজা রাখতেন। হাজ্জাজের ভয়ে তাকে লুকিয়ে থাকতে হতো। অবশেষে যখন তাঁর নিকট একদিন হাজ্জাজের মৃত্যুর সংবাদ পৌছাল, তখন তিনি খুশিতে আল্লাহর দরবারে সেজদায় পড়ে গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। তিনি ৯৬ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। সূত্র– سير أعلام النبلاء :৪/৫২০। এবং– طبقات ابن سعد : ৬/২৭০।

৬. তিনি ছিলেন কুফা নগরীর একজন বিখ্যাত আলেম, ফকিহ ও কারি। আরও ছিলেন হাফেজে হাদিস, ইমাম, সংস্কারক ও মুজতাহিদ। তাঁর পুরো নাম আবু শিবিল আলকামা ইবনে কায়েস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে আলকামা বিন সালামান বিন কুহুল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইলম ও জিহাদের প্রয়োজনে বহু স্থানে সফর করেছেন। এরপর কুফায় অবস্থান করে বিরতিহীনভাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সান্নিধ্য অর্জন করেন। তাঁর থেকে ইলম অর্জন করেন। তিনি ৭২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। [سير أعلام النبلاء :৪/৩৫-৬১]।

তারা ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যদের প্রাধান্য দিতেন। প্রশ্নকারীকে অন্যের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তারা খ্যাতির চেয়ে অখ্যাতিকেই পছন্দ করতেন বেশি। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরের মাঝে তারা ছিলেন টলটলায়মান নৌকার অভিযাত্রীর মতো। নিজেদের এবং অন্যদের মুক্তির চিন্তা তাদেরকে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। এত কিছুর পর অন্যদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ করার সময় ও সুযোগ কোথায়!

তাই তারা সর্বক্ষণ একে অন্যের জন্যে দুআ করতেন। একে অন্যের থেকে উপকৃত হতেন। তারা ছিলেন দ্বীনের সফরে এমন এক সমমনা অভিযাত্রী দল, যারা ছিলেন পরস্পরের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। পারস্পরিক সম্প্রীতি ছিল যাদের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। কারণ, তাদের দিন-রাতের অবিরাম যাত্রা ও অভিযাত্রা এগিয়ে চলেছে জান্নাতের অভিমুখে। তাই তারা ভেবেছেন, পথের মাঝেই পড়ে থাকুক ঠুনকো স্বার্থ নিয়ে সব রেষারেষির জঞ্জাল!

আনুগত্যের প্রতিফল

যে ব্যক্তি নিজের জীবনের অবস্থার উন্নতি করতে চায়, তাকে অবশ্যই কর্ম-কৌশলের পরিবর্তনে প্রচেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾

তারা যদি সঠিক পথের ওপর অটল থাকে, তাহলে অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রচুর বৃষ্টি প্রদান করব। [সুরা জিন : ১৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم أسمعهم صوت الرعد.

যদি আমার বান্দারা আমার আনুগত্য করে চলত, তবে আমি রাতে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করতাম আর দিনে সূর্য উদিত করতাম। তাদেরকে কোনো বজ্রের আওয়াজও শোনাতাম না।[৭]

---

৭. মুসনাদে আহমদ : ২/৩৬৯। মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/২৫৬। হাকিম তার মুসতাদরাকে বলেন, হাদিসটি সকালের উজ্জ্বলতার মতোই পরিষ্কার বা বিশুদ্ধ। তবে ইবনে মাইন, ইমাম নাসাঈ এবং কিছু মুহাদ্দিস বলেন, এটি যয়িফ বা দুর্বল।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، وكما تدين تدان.

পুণ্য নিঃশেষ করে দেওয়া হবে না। গোনাহও বিস্মৃত হবে না। দ্বীনদার ব্যক্তি ঘুমায় না। আর তুমি যেমন কর্ম করবে, তেমনই ফল পাবে।[৮]

হজরত আবু সুলাইমান দারানি রহ.[৯] বলেন,

من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفىء في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفىء في ليله.

যে ব্যক্তি নির্মল আচরণ করবে, তার প্রতিও নির্মল আচরণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি মানুষের কাজকে কঠিন ও জটিল করবে, তার ওপরও কঠোরতা আরোপ করা হবে। যে ব্যক্তি রাতে কারও প্রতি অনুগ্রহ করবে, এটি দিবসে তার অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি দিবসে কারও প্রতি অনুগ্রহ করবে, এটি রাতে তার অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট হবে।[১০]

একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির কথা আমি জানি, যিনি দ্বীনের বিভিন্ন মজলিসে বিচরণ করতেন। খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি বলতেন, সার্বক্ষণিক অনুগ্রহ প্রাপ্তি নিয়ে যে ব্যক্তি আনন্দিত হতে চায়, সে যেন আল্লাহ তাআলাকে সর্বক্ষণ ভয় করে চলে।

---

[৮]. হজরত ইবনে আদি তার ইতিহাসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কামিল' এর মধ্যে হজরত উমর রা. থেকে এটি উল্লেখ করেছেন। তবে এই সনদের মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মালেক রয়েছে। ইবনে আদি বলেন, সে দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ এটি তাঁর 'জুহদ' গ্রন্থে হজরত আবু দারদা রা.-এর ওপর মাওকুফ করে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম সাখাবি রহ. বলেন, এটি শুধু মাওকুফই নয়; মুনকাতে।

[৯]. তিনি ছিলেন একজন বড় ইমাম। যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাহেদ। পুরো নাম– আবু সুলাইমান আবদুর রহমান ইবনে আহমদ আদ-দারানি রহ.। তিনি ১৪০ হিজরি সনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ২১৫ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অনেক বিখ্যাত কথার মধ্যে একটি কথা এই যে– أفضل الأعمال خلاف هوى النفس– সর্বোত্তম আমল হলো নফসের কুপ্রবৃত্তির বিরোধিতা করা। [سير أعلام النبلاء :১০/১৮২]।

[১০]. হাদিসটি ঠিক এই শব্দে কোথায় আছে, আমরা এখনো খুঁজে পাইনি। তবে আশা করছি কোথাও আছে। কেউ সন্ধান দিলে বাধিত হব।– অনুবাদক।

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ.[১১] বলতেন, আমি আল্লাহর কোনো অবাধ্যতা করলে সেটা আমি আমার গৃহপালিত পশু ও প্রতিবেশীর আচরণ-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারি। তখন তাদের আচরণ বিগড়ে যায়।

আর জেনে রেখো—আল্লাহ তাআলা বোঝার তাওফিক দিন—এগুলোর প্রতিফল ও প্রতিক্রিয়া নিছক এ ধরনের গুটিকয়েক উদাহরণের মাধ্যমে অনুধাবন করা যাবে না; বরং নিজের থেকে নফসের হিসাব-নিকাশ যখন কমতে থাকবে, তখনই বুঝতে হবে খোদার অবাধ্যতা বেড়ে গেছে।

নিজের বর্তমান অবস্থার কোনো স্খলন বা বিচ্যুতি দেখতে পেলে স্মরণ করো এমন কোনো নিয়ামতের কথা, যা প্রাপ্ত হয়ে তুমি তার শুকরিয়া আদায় করোনি অথবা স্মরণ করো তোমার লাঞ্ছনাকর গোনাহের কথা। এটি তারই প্রতিফল। এ কারণে নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে সতর্ক থেকো। সতর্ক থেকো আকস্মিক দুর্ভোগ ও শাস্তির ব্যাপারেও। মহান প্রতিপালকের মহা উদারতা ও সুযোগের প্রাচুর্যে ধোঁকায় আপতিত হয়ো না। কারণ, কখনো কখনো তার পাকড়াও আকস্মিক ও নগদও হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ، حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা এর পরিবর্তন সাধন করে।

[সুরা রাদ : ১১]

হজরত আবু আলি রুজাবারি[১২] বলতেন,

---

১১. তাঁর পুরো নাম– ফুজাইল ইবনে ইয়াজ ইবনে মাসউদ ইবনে বাশার আত-তামিমি খুরাসানি রহ.। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ইমাম। শাইখুল ইসলাম। সমরকন্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে অনেক কষ্টস্বীকার করে ইলম অর্জন করেছেন এবং তাঁর ইলম ও প্রজ্ঞা থেকে অন্যরাও প্রচুর উপকৃত হয়েছে। খুবই মুত্তাকি ও পরহেজগার মানুষ ছিলেন। ১৮৭ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। [سير أعلام النبلاء :৮/৪২১-৪৪৪, حلية الاولياء : ৮/৮৪]

১২. তাঁর পুরো নাম : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কাসেম ইবনে মানসুর। আবু নাইম রহ. বলেন, তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত বিশুদ্ধভাষী। তাঁর বয়ানে প্রচুর প্রভাব ছিল। তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তবে মিসরে বসবাস করেন। এবং সেখানেই ৩২২ হিজরি সানে ইন্তেকাল করেন। [سير أعلام النبلاء : ১৪/৫৩৫]

من الاغترار أن تسيء، فيحسن إليك، فتترك التوبة، توهماً أنك تسامح في العقوبات ...

এটাও একপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা যে, তুমি গোনাহের মধ্যে লিপ্ত রয়েছ, অথচ তোমার প্রতি এখনো অনুগ্রহ করা হচ্ছে। আর তুমি তোমাকে শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে মনে করে তাওবা করা থেকে বিরত রয়েছ। আহা, শাস্তির এই বিলম্ব তো তোমাকে তাওবা করার সুযোগ প্রদানের জন্যই দেওয়া হয়েছে!

ভ্রষ্টদের ভ্রষ্ট হওয়ার কারণ

আমি একদিন দীর্ঘক্ষণ মানুষের ওপর অর্পিত কাজ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। লক্ষ করলাম, মানুষের করিতব্য কাজগুলোর মধ্যে কিছু কাজ তুলনামূলক সহজ আর কিছু কাজ কঠিন।

সহজ কাজের মধ্যে ধরা যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়। তবে এর মধ্যেও কিছু কর্ম অন্যটার থেকে তুলনামূলক সহজ। যেমন, সারাদিন রোজা রাখার চেয়ে নামাজ পড়া সহজ। আবার কখনো কোনো সম্প্রদায়ের নিকট জাকাতের চেয়ে রোজা সহজ।

আবার কঠিন কাজগুলো কয়েক ধরনের। একটি অন্যটির থেকে তুলনামূলক কঠিন। যেমন, স্রষ্টার সঠিক পরিচয় ও মারেফাত অর্জন করার জন্য চিন্তা ও দর্শনকে কাজে লাগানো। এ কারণে সঠিক বিশ্বাস অর্জন করাটাও এত কঠিন। তবে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, এটি বেশি কঠিন তাদের জন্য, যাদের নিকট সকল বিষয়ের অনুধাবন অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ এবং বিভ্রান্তমূলক। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান, তাদের নিকট এটি সহজ।

এরপর কঠিন কাজ হলো প্রবৃত্তির ওপর বিজয়ী হওয়া। নফসের ওপর কঠোর হওয়া। নিজের স্বভাবকে তার আকর্ষিত বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখা। তবে কথা হলো, যদিও এগুলো তাৎক্ষণিকভাবে কঠিন; কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যখন এর পরিণাম ও প্রতিদান সম্পর্কে অবগত হন, তখন তাদের জন্য এগুলো সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়।

তবে সবচেয়ে কঠিন হলো জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে স্রষ্টার হিকমত ও রহস্য বোঝা। যদিও যুক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর হিকমত আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত। তবুও আমরা দেখতে পাই, ইলম ও আমলে নিমগ্ন একজন ব্যক্তিকে তিনি করে রেখেছেন পার্থিব সম্পদে দরিদ্র। দরিদ্রতা তার সকল নির্দয়তাসহ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। পার্থিব কিছু খাদ্য ও ভরণ-পোষণের জন্য তাকে নত হতে হয় কোনো মূর্খ ধনীর নিকট।

অন্যদিকে হয়তো কোনো জ্ঞানহীন আকাট মূর্খ ফাসেক ব্যক্তিকে তিনি দিয়ে রেখেছেন অঢেল ধন-সম্পদ। দুনিয়ার সকল বস্তুগত প্রাচুর্য ঢেলে দিয়েছেন তার ওপর।

এরপর আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের শরীরের পূর্ণতা দান করেন এবং সীমাহীন সুন্দর ও সুগঠিত করেন। এরপর হয়তো অদম্য যৌবনের শুরুতেই কারও শরীর ভেঙে দেন, মৃত্যু প্রদান করেন। কেউ আবার যৌবন না পেতেই বৃদ্ধতে রূপান্তরিত হয়।

রয়েছে আরও কত অসহ্য যন্ত্রণাকাতর মানুষ ও শিশুর অবর্ণনীয় কাতর যন্ত্রণার বিশদ বিবরণ, সাধারণ মানবিক মানব-স্বভাবও যার প্রতি করুণাময় হয়ে ওঠে! এমন ক্ষেত্রেও প্রভুর পক্ষ থেকে মানুষকে বলা হয়, তুমি এ ব্যাপারে কিছুতেই সন্দেহ করো না যে, আল্লাহ হলেন সকল করুণাকারীর শ্রেষ্ঠ করুণাকারী। তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠ দয়াবান।

এক আয়াতে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাআলা ফেরাউনকে পথভ্রষ্ট করেছেন। অথচ অন্য আয়াতে এসে দেখতে পাই, তিনিই আবার ফেরাউনের কাছে মুসা আ.-কে পাঠাচ্ছেন হিদায়াতের দাওয়াত দিয়ে।

মানুষ জেনেছে, আল্লাহ তাআলার মহা পরিকল্পনার ছকে হজরত আদম আলাইহিস সালাম-এর গাছ থেকে 'গন্দম' খাওয়া ছিল অপরিহার্য। অথচ আল্লাহ তাআলা তার এই আচরণে তাকে তিরস্কার করে বলছেন,

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ –আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হয়েছে।...

এ ধরনের আরও কত বিষয় মানুষকে বিভ্রান্ত করে। এমনকি এ কারণে তাদের অনেকে স্রষ্টাকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দিকেও ধাবিত হয়। নাউজুবিল্লাহ।

আহা, তারা যদি এসকল বিষয়ের রহস্য ও হিকমত সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখত, তাহলে তারা বুঝতে পারত, এগুলোকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়াই হলো জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। সেটাই ছিল জ্ঞানের অনুসরণ।

وهذا أصل، إذا فهم، حصل السلامة والتسليم.

আহা, এটি এমন এক মূলনীতি, তুমি যদি এটি বুঝতে পারো, তবে
তুমি মুক্তি পাবে এবং পাবে নিজেকে সঁপে দেওয়ার যুক্তি।

আল্লাহ যেন আমাদের তরে সে সকল রহস্যময় বিষয় ও অস্পষ্টতা প্রকাশ করে দেন, যেগুলো ভ্রষ্টদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। নিশ্চয় তিনি আমাদের নিকটবর্তী এবং আহ্বানে সাড়াদানকারী।

সময়ের মূল্যায়ন

মানুষের জন্য উচিত তার জীবন ও সময়ের মূল্যায়ন করা। সময়ের মর্যাদা ও মূল্য বোঝার চেষ্টা করা। কেউ যদি সময়ের মূল্য বুঝতে পারে, তাহলে সে তার জীবনের একটি মুহূর্তও অনর্থক নষ্ট করবে না।

আর যদি বুঝতে পারে জীবনের মর্যাদা, তাহলে যথাসম্ভব সবচেয়ে ভালো কাজের দিকেই সে ধাবিত হবে। তার কথা হবে শ্রেষ্ঠ। তার কাজ হবে শ্রেষ্ঠতর। এবং কর্মের কিছু ক্ষেত্রে তার শারীরিক বা অবস্থানগত সামর্থ্য যদি না-ও থাকে, তবুও কাজগুলির জন্য সর্বদা তার নিয়ত বহাল থাকবে। যেভাবে হাদিস শরিফে এসেছে, نية المؤمن خير من عمله -মুমিনের আন্তরিক নিয়ত তার কাজ থেকেও উত্তম।[১৩]

---

[১৩]. হাদিসটি ইমাম বাইহাকি রহ. তাঁর গ্রন্থ 'শুয়াবুল ঈমান'-এ হজরত আনাস রা. থেকে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন–৫/৩৪৩/৬৮৫৯। আল্লামা হাইছামি রহ. তাঁর গ্রন্থ 'আল-মাজমা'-তে এটা উল্লেখ করেছেন–১/১০৯। হজরত আবু নাঈম রহ. তাঁর حلية الاولياء- গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেন, এটি একটি গারিব হাদিস। একটি সূত্র দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম সুয়ূতি রহ. বলেন, এটি সকল দিক দিয়েই দুর্বল।

আমাদের সালাফে সালেহিনদের একটি বিরাট অংশ সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ করতেন। আমের ইবনে আবদে কায়েস রহ.[১৪] থেকে বর্ণিত রয়েছে, একবার এক লোক তাকে বলল, 'আসুন একটু আলাপ করি।' আমের ইবনে আবদে কায়েস তাকে বললেন, তবে তুমি সূর্যকে আটকে রাখো। [অর্থাৎ সময়কে আটকে রাখতে পারলে আমি তোমার সাথে কথা বলতে রাজি আছি; নতুবা নয়।]

ইবনে সাবেত আল-বুনানি[১৫] বলেন, আমি আমার বাবাকে মৃত্যুমুহূর্তে কালেমার তালকিন দিতে এগিয়ে গেলাম। তখন বাবা বললেন, বেটা, আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমি তো এখন আমার সপ্তম ওজিফা আদায়ে মগ্ন আছি।

একবার এক পূর্বসূরি বুজুর্গের নিকট লোকেরা উপস্থিত হলো। তার মৃত্যু সন্নিকটে। অথচ লোকেরা গিয়ে দেখল, তিনি নামাজে দণ্ডায়মান। নামাজ শেষে তাকে লোকদের উপস্থিতির কথা বলা হলো। তিনি বললেন, এখন তো আমি কোরআন তেলাওয়াত করব। তাদের সাথে অনর্থক কথাবার্তার সময় কোথায়?

এভাবে মানুষ যখন অন্তর দিয়ে অনুধাবন করে– মৃত্যু তার সকল আমলের দরজা বন্ধ করে দেবে, তখন সে তার জীবনে এমন আমল ও কর্মের মাঝে নিমগ্ন হবে, যেটা তার মৃত্যুর পরও তার সওয়াবের বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। যেমন, দুনিয়ার কোনো সম্পদ অতিরিক্ত থাকলে সেটা ওয়াকফ করবে। গাছ লাগাবে। মানুষের কল্যাণের জন্য নদীনালা খনন করবে। এবং এমন একটি পরিবার তৈরির জন্য প্রচেষ্টা করবে, যারা তার মৃত্যুর পরও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে। তার জন্য দুআ করবে। এটি তার সওয়াবের মাধ্যম

---

[১৪]. তাঁর পুরো নাম : আবু আবদুল্লাহ আমের ইবনে কায়েস আত-তামিমি আল-বসরি। তিনি ছিলেন প্রথমসারির একজন আদর্শ জাহেদ। কাব আহবার তাকে দেখে বলেছিলেন, ইনি হলেন এই উম্মতের রাহেব। তিনি হজরত মুআবিয়া রা.-এর যুগে ইন্তেকাল করেন। [سير أعلام النبلاء : ৪/১৫-১৯]

[১৫]. তাঁর পুরো নাম : আবু মুহাম্মদ ছাবেত ইবনে আসলাম আল-বুনানি আল-বসরি। তিনি হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে খুবই শক্তিশালী ও আস্থাবান ব্যক্তি ছিলেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক রহ. বলেন, কল্যাণের অনেকগুলো চাবি থাকে, ছাবেত হলো সেই চাবিগুলোর একটি চাবি। তিনি ১২৭ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। [سير أعلام النبلاء : ৫/২২০, طبقات ابن سعد : ৭/২৩২]

হবে। অথবা ইলমি কোনো কিতাব রচনা করবে। কেননা, একজন আলেমের লিখিত রচনা তার মৃত্যুহীন সন্তানের মতো।

একজন আলেম যেকোনো কাজ করবে, জেনে-শুনেই করবে। সে এমন কাজই করবে, যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হতে পারে।

আহা, এ সকল কথা তার জন্য বলা হচ্ছে, যার এখনো মৃত্যু হয়নি। যার এখনো জীবনী শক্তি রয়েছে অটুট। কবি বলেন,

قد مات قوم وهم في الناس أحياء.

কত লোক এমন রয়েছে, যারা মারা গিয়েছে বহু আগে। তবু তারা মানুষের মাঝে এখনো রয়েছে জীবিত—(তাদের কাজে ও কর্মে)।

সচ্ছলতার মর্যাদা এবং দারিদ্র্যের ঝুঁকি

অনেক ভেবে, আমি শয়তানের দুটি বড় ধরনের ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছি। যেমন,

১. শয়তান সম্পদশালীদের সম্পদের আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখে। তাদেরকে এমন সব পার্থিব ন্যায়-অন্যায় আস্বাদন ও বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখে, যার কারণে তারা আখেরাত ও তার জন্য আমলের সকল চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাদেরকে সম্পদের মায়ায় আবদ্ধ করে তাদের আরও অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে। সম্পদের প্রতি লোভ আরও বাড়াতে থাকে। এবং সম্পদের আকর্ষণ ও লোভের মাধ্যমে তাদেরকে কৃপণতার দিকেও ধাবিত করে। ফলে অনেক ধনবান মানুষ দান-সদকা তো দূরের কথা; জাকাত-ফিতরাও অনেক সময় সঠিকভাবে আদায় করে না। তখন সে ন্যায়-অন্যায় ও হালাল-হারামের কথা একেবারে ভুলে যায়। এটি শয়তানের একটি বড় ধরনের চক্রান্ত এবং শক্তিশালী কৌশল।

২. এই বিষয়ে শয়তান আরেকটি অতি সূক্ষ্ম চক্রান্ত সাজিয়ে রেখেছে। শয়তান অন্য মুমিনদেরকে ধনী ব্যক্তিদের দ্বীনি অবস্থার ভয় দেখিয়ে বলে, দেখো তো, সম্পদ আজ তাদের কোথায় নিয়ে ফেলেছে। দ্বীন থেকে কত দূরে

সরে গেছে তারা!...তখন শয়তানের এই চক্রান্তে পা দিয়ে পরহেজগার মুমিন ব্যক্তিরা সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং হাতে যা রয়েছে সেগুলোও তড়িঘড়ি নিঃশেষ করে ফেলে বা দান করে দেয়। এরপর শয়তান অব্যাহতভাবে তাদেরকে আরও জুহুদ ও কৃচ্ছতা সাধনে উদ্বুদ্ধ করে। দুনিয়ার সংশ্রব বর্জনের প্রতি বিভিন্ন আদেশ-উপদেশ দিতে থাকে। আয়-উপার্জনের সকল পদ্ধতি সম্পর্কেই তাকে ভয় দেখাতে থাকে।

এগুলো সব করতে থাকে দ্বীনের প্রতি কল্যাণকামিতা ও দ্বীন সংরক্ষণের নাম দিয়ে। অথচ এর আড়ালে লুকিয়ে থাকে শয়তানের এক ভয়াল ও গোপন চক্রান্ত। সর্বনাশের দুষ্ট পরিকল্পনা।

শয়তান কখনো যুগের কিছু শাইখ-মাশায়েখের সুরতেও কথা বলে। অনুগ্রহপ্রার্থী তার কাছে উপদেশ নিতে এলে, উক্ত শাইখ তাকে বলে, তুমি তোমার সকল ধন-সম্পদ থেকে বের হয়ে এসো। সকল কিছু ছেড়ে-ছুড়ে জাহেদ-দুনিয়াত্যাগীদের কাতারে এসে দাঁড়াও। তোমার ঘরে যখন আগামী দিনের সকল খাদ্য গচ্ছিত ও পরিমাপিত রয়েছে, তবে আর তোমার কিসের জুহুদ আর তাকওয়া! তাহলে তুমি কিছুতেই রিজিকদাতা আল্লাহর ওপর দৃঢ়ভাবে নির্ভরকারী নও।

এসকল কথার পেছনে কখনো কখনো কিছু অশুদ্ধ হাদিস ও ঘটনা পেশ করা হয়। অথবা এমন কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়, যেগুলো কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ অবস্থা, হিকমত ও শিক্ষার জন্য উল্লেখিত হয়েছিল। সাধারণ মানুষ সেগুলো সহ্য করতে অক্ষম।

কিন্তু অন্য অনেক মানুষ শয়তানের এই চক্রান্তে পড়ে নিজের সম্পদ বিলিয়ে দেয়। উপার্জনবিমুখ হয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে। পরিণামে, কিছুদিনের মধ্যেই জীবনের তাগিদে তাকে তার আশপাশের লোকজন ও বন্ধু-বান্ধবদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। অথবা রাজা-বাদশাহর দরবারে তোষামোদি বা চাটুকারিতা শুরু করতে হয়। কেননা, এভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে বেশিদিন জুহদ ও মুজাহাদার রাস্তায় সে অটল থাকতে পারে না। কিছুদিন পরেই সে আবার তার স্বভাব ও অভ্যাসের প্রতি কাতর হয়ে পড়ে। তার আগের সকল চাহিদা তার মধ্যে চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে। অথচ এখন তার হাত শূন্য। তাই নিজের ও পরিবারের চাহিদাগুলো পূরণ করতে গিয়ে আগের অবস্থা থেকে তাকে আরও হারাম ও নিকৃষ্টতম বিষয়ের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়তে হয়। এভাবেই সে

ধীরে ধীরে তার দ্বীন, ধর্ম ও চরিত্রের দৃঢ়তা ও সততা বিকিয়ে দেয়। দিনে দিনে সে নেমে আসে ভিক্ষুকদের কাতারে।

কিন্তু সে যদি অতীতের মহৎ ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের জীবনী এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ হাদিসগুলোর প্রতি মনোযোগ দিত, তবে সে জানতে পারত, আল্লাহর খলিল ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন অনেক সম্পদের মালিক। এমনকি তার এলাকা তার প্রাণীগুলোর ধারণ-ক্ষমতার বাইরে ছিল। এমনিভাবে হজরত লুত আলাইহিস সালামও ছিলেন সম্পদশালী। এছাড়া আরও অনেক নবীই ছিলেন সম্পদ-প্রাচুর্যের অধিকারী। আর সুলাইমান আলাইহিস সালামের সম্পদ ও রাজত্বের কথা কেই-বা না জানে!

এভাবে অনেক সাহাবিও ছিলেন প্রচুর সম্পদের অধিকারী। হজরত উসমান গনি রা.-এর কথা কতই না প্রসিদ্ধ।

তাদের জীবনধারণের বৈশিষ্ট্য ছিল এমন—কিছু না থাকলে তারা ধৈর্যধারণ করতেন। কিন্তু প্রয়োজনমাফিক উপার্জন করতে কখনো পিছপা হতেন না। আবার সম্পদ-প্রাচুর্য এলে সেগুলো প্রকাশ করা থেকেও বিরত থাকতেন না। এটাই হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা।

হজরত আবু বকর রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ও ব্যবসার জন্য দূর-দূরান্তে সফর করতেন। অধিকাংশ সাহাবি বাইতুল মাল থেকে প্রদত্ত সম্পদ অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এভাবেই তারা অন্যদের দ্বারস্থ হওয়ার লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থেকে মুক্ত থাকতেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. কখনো কোনো হাদিয়া ফিরিয়ে দিতেন না। আবার তিনি কখনো কারও কাছে কিছু চাইতেনও না।

আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও চিন্তা-ভাবনা করলাম। সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তি এবং আলেমদের অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করলাম। আলেমদের ক্ষেত্রে যেটা হয় তা হলো, জীবনের প্রাথমিক সময়গুলো ইলম অন্বেষণে ব্যস্ত থাকায় তারা সাধারণত পার্থিব সম্পদ উপার্জন করতে সক্ষম হন না। কিন্তু একটি সময়ে যখন তাদের জীবনধারণের পার্থিব উপায়-উপকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। অপমানিত হতে হয়। অপদস্থ হতে হয়। অথচ তারাই হলেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানের উপযুক্ত।

অতীতে অবশ্য এসকল ক্ষেত্রে বাইতুল মাল থেকে বরাদ্দ সম্পদ তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু সে অবস্থা এখন আর নেই। এখন আহলে ইলম বা দ্বীনদারদের অন্যদের থেকে কিছু নিতে গেলে নিজের দ্বীনদারির কিছু অংশ খোয়াতে হয়। তবুও যদি উদ্দেশ্য অর্জিত হতো! কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থা হলো, দ্বীনদাররা দুনিয়াদারদের কাছে ধরনা দিয়ে দিয়ে দ্বীনের তো ক্ষতি করছেই; অধিকন্তু তাদের কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যও অর্জিত হচ্ছে না।

সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কর্তব্য হলো, নিজের কাছে যে সম্পদ রয়েছে তার যত্ন নেওয়া। প্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জনের জন্য চেষ্টা ও শ্রম দেওয়া। যাতে কোনো আলেম বা ধার্মিক ব্যক্তিকে কোনো জালেমের তোষামোদ করতে না হয়। কোনো সম্পদশালী মূর্খ জাহেলের চাটুকারিতা করতে না হয়।

এক্ষেত্রে অজ্ঞ সুফিদের কথায় একদমই কান দেবে না, যারা শুধু দারিদ্র্য অবলম্বনের দিকেই আহ্বান করে এবং এটাকেই বড় কল্যাণ ও দ্বীনদারি বলে দাবি করে।

দারিদ্র্য হলো অক্ষম ব্যক্তির অসুস্থতা। অসুস্থতার ওপর ধৈর্যধারণের যে সওয়াব, দারিদ্র্যের ওপর ধৈর্যধারণের সেই একই সওয়াব। এটা স্বেচ্ছায় যেচে আনার জিনিস নয়।

তবে হ্যাঁ, খরচ কমিয়ে কৃচ্ছতা অবলম্বন করা এবং নিজের সামান্য কিছু নিয়েই নিজের মতো তৃপ্ত থাকা—এটি হারাম বা ভ্রান্তিমূলক কিছু নয়। তবে এটি হলো ভীরু দুর্বল অক্ষম জাহেদ ব্যক্তিদের কাজ।

কিন্তু যে ব্যক্তি হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করেছে এই নিয়তে যে, তাকে যেন অন্যদের থেকে চাইতে না হয়। সে গ্রহণকারী না হয়ে যেন প্রদানকারী হয়। নিজেই বরং অন্যদেরকে দান-সদকা করবে; তাকে যেন অন্যের সদকা গ্রহণ করতে না হয়। তাহলে তার এ কাজটি হবে শ্রেষ্ঠতম কাজ—আমাদের বীর সাহসী মহান ব্যক্তিদের মতো কাজ। উচ্চ হিম্মতওয়ালা ব্যক্তির কাজ।

এতক্ষণ যা বলা হলো, সেগুলো নিয়ে যে ব্যক্তি চিন্তা করবে, সে একই সাথে একজন দ্বীনদার ব্যক্তির সম্পদ-প্রাচুর্যে মর্যাদার কথা বুঝবে—এবং বুঝতে পারবে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ও ক্ষতির কথাও।

অপ্রাপ্ত জিনিসের প্রতি আফসোস

আমি মহান ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখেছি, তাদের অধিকাংশই পার্থিব সম্পদ থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে দুনিয়ার তাবৎ সম্পদ ও প্রাচুর্য গচ্ছিত হয়ে আছে খারাপ স্বভাববিশিষ্ট আকাট মূর্খ ব্যক্তিদের হাতে।

আমি কিছু জ্ঞানবান ব্যক্তিকে নিজেদের এই সম্পদহীনতা এবং মূর্খদের সম্পদ-প্রাচুর্য নিয়ে এভাবে আফসোস করতেও দেখেছি যে, এগুলো কেন তাদের প্রাপ্ত হলো না? কাউকে কাউকে তো এই আফসোসে জীবনের ওপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতেও দেখেছি। দেখেছি দুঃখে-হতাশায় ভেঙে পড়তে...।

আমি এরূপ আফসোসকারীদের সম্বোধন করে বলতে চাই– এ তোমার কেমন কাণ্ড! তুমি কি তোমার আচরণ সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? এখন এই আফসোস করাটা তোমার জন্য সকল দিক দিয়েই অনর্থক, অযৌক্তিক এবং ভ্রান্ত। কারণ–

১. তোমার যদি দুনিয়া অন্বেষণের যোগ্যতা, শক্তি, হিম্মত ও আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে তুমিও তা অর্জনে নেমে পড়ো। পরিশ্রম করো। অর্জন করো...। তাহলে আর তোমাকে এই আফসোস করতে হবে না। কিন্তু সেটা না করে শুধু বসে বসে অন্যরা যা পরিশ্রম করে অর্জন করছে, সেটা নিয়ে আফসোস করা প্রচণ্ড রকমের বোকামি ও মূর্খতা। এটা তোমার অক্ষমতা ও পরিশ্রমহীনতার চূড়ান্ত প্রকাশ।

২. তুমি জানো, দুনিয়া হলো অতিক্রম করার জায়গা; এটা স্থায়ী জীবনযাপনের কোনো জায়গা নয়। তোমার এতদিনের অর্জিত ইলম, প্রাজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা এটাই তো বলে। ইলমহীন যে সকল লোক এসব পার্থিব সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলো তাদের অধিকাংশের শরীর, চরিত্র ও দ্বীন-ধর্ম নষ্ট করে দিয়েছে। এগুলো জেনেও যদি তুমি দুনিয়ার অপ্রাপ্তি নিয়ে আফসোস করো, তাহলে তো তোমার আফসোস করাটা হবে এমন এক অপ্রাপ্তি নিয়ে, যা না-পাওয়াই তোমার জন্য কল্যাণকর। যার মধ্যে কল্যাণ নেই—তার অপ্রাপ্তি নিয়ে আফসোস করার শাস্তিস্বরূপ আজকের এই আফসোসের কষ্ট তোমাকে সইতে হচ্ছে।

সুতরাং হে বন্ধু, আসন্ন অনন্ত আজাব থেকে নিরাপদ থাকার যদি কোনো পথ করতে পারো, তবে ক্ষণিকের পার্থিব এই কষ্টটুকু সহ্য করে নাও না কেন!

৩. তুমি এটাও জানো, একজন মানুষ সারাজীবন যত খাদ্য-খাবার খায়, সেই তুলনায় একটি চতুষ্পদ প্রাণী বহুগুণ বেশি আহার করে। তাদের এই আহারে কোনো ধরনের ভয়-ভীতি নেই। অথচ সম্পদ ও আহার নিয়ে তোমার কত ভয়; কিন্তু পরিমাণ কত কম!

এ অবস্থায় তুমিও যদি তাদের মতো বহুধা সম্পদের অধিকারী হতে চাও, তাহলে তো তুমিও সেই মূর্খ সম্পদশালী ও চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের কাতারে পড়ে যাবে। কেননা, এই অতিরিক্ত খাদ্য-খাবার ও সম্পদ অর্জনের ধান্দাই তো তাদেরকে ইলম অর্জন করা থেকে বিরত রেখেছে। তুমি জন্তু-জানোয়ারের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ এই ইলমের দ্বারাই; নতুবা খাবার গ্রহণের পরিমাণে তারা তোমার চেয়ে অনেক এগিয়ে।

মনে রেখো, অল্প আহার, অল্প চাহিদা এবং অল্প বিলাসই মানুষকে সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণে সাহায্য করে।

এসব জানার পরও তুমি যদি দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী সামান্য [যত বেশিই হোক, তবু সেটা সামান্যই] ভোগ্যসামগ্রিকেই প্রাধান্য দাও, তবে তো তোমার আজরদের কাহিনি জানাই আছে। [আজর মূর্তির ক্ষমতাহীনতার কথা জেনেও তা পূজা করার ওপর অটল ছিল] এই আফসোসের মাধ্যমে তুমি তোমার ইলম ও প্রজ্ঞাকে অপমান ও অপদস্থ করে তুলছ। তুমি তোমার সঠিক মত ও বিশ্বাসের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করছ।

মানুষের ভুল করার কারণ

নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার পেছনে মানুষের কয়েকটি কারণ রয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু কুফরির দিকে ঠেলে দেয়। তাই এগুলোর অর্থ ও কারণ স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারণ, নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনে মানুষের কয়েকটি প্রকার রয়েছে। যেমন,

১. এক প্রকার মানুষ হলো তারা, যারা আসলে জানেই না যে, বিষয়টা নিষিদ্ধ বা গোনাহের কাজ। বৈধ মনে করে করে ফেলে। এটা এক ধরনের ওজর বা প্রাথমিকভাবে ক্ষমার যোগ্য।

২. আরেক প্রকার মানুষ হলো তারা, যারা নিষিদ্ধ বিষয়কে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় ভেবে করে ফেলে। তারা জানে না যে, এটা হারাম। সে বরং এটাকে মাকরুহ বা অপছন্দনীয় মনে করেছিল। এটাও প্রায় প্রথম প্রকারের মতো। হজরত আদম আলাইহিস সালামের 'গন্দম' খাওয়া ছিল এ ধরনের।

৩. তৃতীয় প্রকার মানুষ হলো তারা, যারা একটা নিষিদ্ধ জিনিসকে বিভিন্ন আলামত বা কারণ দেখিয়ে ব্যাখ্যা করে জায়েয মনে করে নিয়েছে। কিন্তু আসলে তার ব্যাখ্যা ছিল ভুল। যেমন হজরত আদম আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে বলা হয়, তাকে শাব্দিকভাবে গাছ খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। তিনি তাই গাছের একটি অংশ বা ফল খেয়েছেন। মূল গাছ খাননি। কিন্তু এতে তার ব্যাখ্যা সঠিক হয়নি।

৪. চতুর্থ প্রকার মানুষ হলো তারা, যারা হারাম ও গোনাহের কথা জানে। স্পষ্টভাবেই জানে। কিন্তু প্রবৃত্তির শক্তি ও প্রভাব তাদেরকে এটা ভুলিয়ে দেয়। সুতরাং তাদের কাজটাও তারা যা জানে তার বিপরীত হয়। এ কারণেই চোরের চুরি করার সময় হাত কাটার দণ্ডের কথা মনে থাকে না। সাময়িক প্রাপ্তি তাকে এর পরিণাম ও নিষেধের কথা ভুলিয়ে দেয়। এভাবে জিনায় লিপ্ত ব্যক্তির এর লাঞ্ছনা ও দণ্ডের কথা স্মরণ থাকে না। সুতরাং তার কাজও এমন হয়, যেন সে জানে না; অথচ সে জানে। কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়না তাকে বিভ্রান্ত করে ফেলে। নিজেকে সে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এটা স্পষ্ট পাপ।

৫. পঞ্চম প্রকার ব্যক্তিরা নিষেধ ও পরিণামের কথা জানে, স্মরণ রাখে এবং সে অনুযায়ীই তারা তাদের জীবন পরিচালিত করে। ভালো কাজগুলো করে আর মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

এটিই একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির হৃদয়ের দৃঢ়তা ও সংকল্পের প্রতি অটলতার প্রকাশ। এগুলো সে কেন করে? কারণ, সে জানে, ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক সামান্য চার দিনার চুরির কারণে তার হাত কেটে দেবে। ক্ষণিকের আস্বাদন ভোগ ও আনন্দের কারণে (জিনার কারণে) তার সুগঠিত সুকান্ত শরীর পাথর নিক্ষেপে ধ্বংস করে দেবে। তাই দৃঢ় চিত্তের কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ ধরনের অপরাধের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। হয় না। কারণ, সে জানে, ক্ষণিকের এই ভোগ ও সম্ভোগের কারণে তাকে সইতে হবে চিরদিনের যন্ত্রণা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনো এমন বিষয়ে রাজি হবে না। এতে লিপ্তও হবে না।

প্রতিফলের প্রয়োজনীয়তা

যে-কেউ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাজ ও পরিচালনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে-ই সেগুলোকে একটি ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাবে। বিলম্বে হলেও সব জিনিসের সে একটি প্রতিফল লক্ষ করবে। সুতরাং কোনো গোনাহের তাৎক্ষণিক কোনো শাস্তি বা প্রতিফল না দেখে কারও ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

সবচেয়ে নিকৃষ্টতম গোনাহের কাজ হলো, অব্যাহত গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকা এবং তাওবা না করা। এর কারণে শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। অথচ এই ব্যক্তিও যদি কখনো ইস্তেগফার করে, নামাজ, রোজা ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তার এই ক্ষমা চাওয়া বিফলে যাবে না। আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী।

কিন্তু মানুষজাতি একটি প্রবল ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে আছে। এটি তার একটি নিকৃষ্টতম স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি হলো, প্রতিনিয়ত সে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ করে, অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে সে নিজের পছন্দের জিনিস প্রত্যাশা করে বসে থাকে। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.

দুর্ভাগা সে ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে; অথচ আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে মহান প্রতিদানের প্রত্যাশা করে।[১৬]

সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হলো, প্রতিদান প্রাপ্তির আশা করা এবং সেভাবেই আমল করা। তার কাজের ফলাফল সে একদিন না-একদিন পাবেই পাবে।

স্বপ্নের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকারক আল্লামা ইবনে সিরিন রহ.[১৭] বলেন, আমি একবার এক লোককে ঠাট্টা করে বললাম, 'হে মুফলিস (হতদরিদ্র)।' ঠিক এর ৪০ বছর পর আমি নিজেই হতদরিদ্র হয়ে পড়লাম।

হজরত ইবনুল জালা রহ.[১৮] বলেন, একবার আমার নিকট আমার এক মুরুব্বি এলেন। আমি তার চুলহীন টেকো মাথার দিকে একটু অন্যভাবে তাকিয়ে ছিলাম।

তিনি আমার দিকে ক্ষুণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'এভাবে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ কেন? তুমি অবশ্যই এর পরিণাম ভোগ করবে।' ঠিকই এ ঘটনার ৪০ বছর পর আমি আমার মুখস্থ কোরআন ভুলে গেলাম।

এমনিভাবে এর বিপরীত জিনিসগুলোও সংঘটিত হয়। যে-কেউ কোনো ভালো কাজ করলে বা আন্তরিকতাপূর্ণ কোনো ভালো কাজের নিয়ত করলে, অবশ্যই সে এর সুন্দর প্রতিদানের প্রতীক্ষা করতে পারে; যদিও কখনো কখনো সেটা বিলম্বে আসে।

---

[১৬]. ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি 'আল কিয়ামাহ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন–৪/৪২৬০। এবং তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান সহিহ। এছাড়া মুসনাদে আহমদ–৪/১২৪, ইবনে মাজা–২/৪২৬০ গ্রন্থেও তা উল্লেখিত হয়েছে। এখানে হাদিসটির দ্বিতীয় অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। পুরো হাদিসটি এমন–

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

[১৭]. নাম : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে সিরিন আল-আনাসি আল-বসরি রহ.। তিনি একজন ইমাম। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর আজাদকৃত গোলাম। তিনি অনেক সাহাবি থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। খুবই উত্তম চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন। প্রকাশ্যে অনেক হাসি-মজাক করতেন। ১০৮ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। [سير أعلام النبلاء : ৪/৬০৬, طبقات ابن سعد : ৭/১৯২]

[১৮]. পুরো নাম : আবু আবদুল্লাহ ইবনুল জালা আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া অথবা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া রহ.। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ আরেফ। উত্তম মানুষ। বিশর ইবনুল হারেস রহ.-এর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। তিনি ৩০৬ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। [سير أعلام النبلاء : ১৪/২৫১, صفة الصفوة : ২/২৬৬]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّه مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

নিশ্চয় যে ব্যক্তি খোদাভীতি অর্জন করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে [তার জানা উচিত,] আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের প্রতিফল নষ্ট করেন না। [সুরা ইউসুফ : ৯০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من غض بصره عن محاسن امرأة أثابه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه.

যে ব্যক্তি তার চোখকে কোনো নারীর সৌন্দর্য থেকে সরিয়ে অবনত করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এমন ঈমান দান করবেন; সে তার অন্তরে যার স্বাদ ও মিষ্টতা অনুভব করতে পারবে।[১৯]

সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির জানা থাকা উচিত, কিয়ামতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা কোনো পক্ষপাতিত্ব করবে না। কারও বেশ-কম করা হবে না। বরং ভালো-খারাপ সকল কিছুর পরিপূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যাবে। কোনোকিছুই বাদ পড়বে না।

---

[১৯]. হাদিসটি 'মুসনাদে আহমদ'-এ বর্ণিত হয়েছে- ৫/৬৪। এবং আল্লামা হাইছামি রহ. তাঁর مجمع الزوائد -এ উল্লেখ করেছেন- ২/৬৩। এবং ইমাম তবারনি একটু ভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন। তবে সনদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

দুনিয়ায় নিজের অংশ ভুলে যেয়ো না

আমি সুফি এবং তথাকথিত দুনিয়াত্যাগীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি। এদের অধিকাংশই শরিয়ত থেকে অনেক দূরে ভ্রষ্টতার মধ্যে বসবাস করছে। হয়তো এটা তাদের অজ্ঞতার কারণে হয়েছে; নতুবা জেনেশুনে সজ্ঞানে তারা তাদের বানানো বিদআতের মধ্যে অবস্থান করছে।

তারা তাদের এ ধরনের জীবনযাপনের পক্ষে অনেক সময় এমন কিছু আয়াত দ্বারা দলিল দেয়; যেগুলোর অর্থ তারা নিজেরাই জানে না। এবং এমন কিছু হাদিস দ্বারাও তারা দলিল দেয়; যেগুলোর রয়েছে স্বতন্ত্র কারণ। তথাপি সেগুলোর অধিকাংশই প্রমাণিত নয়।

তাদের এ ধরনের ব্যাখ্যা ও অর্থের কারণ, তারা কোরআনের আয়াতে পেয়েছে—

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

এই পার্থিব জীবন সামান্য ধোঁকার ভোগ্যসামগ্রী ছাড়া কিছু নয়।
[সুরা আলে ইমরান : ১৮৫]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—

﴿اعلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ﴾

তোমরা জেনে রেখো, নিশ্চয় এই পার্থিব জীবন শুধু ক্ষণিকের খেল-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও শোভা-সৌন্দর্য। [সুরা হাদিদ : ২০]

এছাড়া হাদিসে তারা শুনেছে—

للدنيا أهون على الله من شاة ميتة، على أهلها.

একটি মৃত বকরি তার মালিকের নিকট যতটা গুরুত্বহীন, পুরো দুনিয়া আল্লাহ তাআলার নিকট তার চেয়ে আরও বেশি তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন।[২০]

---

[২০]. হাদিসটি ইবনে মাজা রহ. তার 'আয-যুহদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– ২/৪১১১। মুসনাদে আহমদ: ১/৩২৯/৩০৪৮। হাদিসটি সহিহ। ইমাম মুসলিম রহ. তার 'আয-যুহদ' গ্রন্থে হজরত জাবের রা. থেকে এটি উল্লেখ করেছেন–৪/২/২২৭২।

তারা এ ধরনের আয়াত ও হাদিস দেখে প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা না বুঝে দুনিয়া বর্জনের ব্যাপারে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। ঢালাওভাবে দুনিয়ার গাল-মন্দ শুরু করেছে। অথচ কেই-বা না জানে, কোনো জিনিসের হাকিকত ও বাস্তবতা না জেনে তার প্রশংসা বা বদনাম করা জায়েয নেই।

আমরা যখন দুনিয়ার ব্যাপারে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি ফেলি এবং বোঝার চেষ্টা করি, দুনিয়া আসলে কী, তখন তো আমরা এটাই দেখতে পাই– এই বিপুল বিস্তৃত বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে সকল প্রাণীর বাসস্থান ও অবস্থানস্থল হিসেবে। এই দুনিয়া থেকেই তাদের খাদ্য-সামগ্রীর সরবরাহ হয় এবং তাদের মৃতদেরকে এর মাঝে দাফন করা হয়। এখানে বসে আখেরাতের আমল করা যায়...। এগুলো তো ভালো জিনিস। সুতরাং এই ধরনের ভালোত্ব ও কল্যাণ যার মধ্যে রয়েছে, ঢালাওভাবে তার নিন্দা করা যায় না।

এছাড়া পৃথিবীর মাঝে যত পানি শস্য সবুজ শাক-সবজি, বাগান ও প্রাণী রয়েছে—সবই রয়েছে মানুষজাতির উপকারের জন্য। এসকল খাদ্য-খাবার ও দ্রব্য-সামগ্রীর মাধ্যমে সে জীবনধারণ করে পৃথিবীতে টিকে থাকে। পৃথিবীতে মানুষের টিকে থাকা বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ, আল্লাহর পরিচয় লাভ করা এবং তার আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য মানুষজাতিকে পৃথিবীতে অবস্থান করা জরুরি। তাহলে, যে সকল বস্তু-সামগ্রী আল্লাহর পরিচয় লাভকারী ও তাঁর ইবাদতকারীর অবস্থান ও টিকে থাকার মাধ্যম, সেগুলোর তো প্রশংসা করা প্রয়োজন; নিন্দা নয়।

তাহলে বোঝা গেল, দুনিয়ার নিন্দার কারণ হলো অজ্ঞ অথবা অপরাধী ব্যক্তিদের কাজকর্ম। কারণ, কেউ যদি বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে এবং এর জাকাত প্রদান করে, তাহলে এ সম্পদের নিন্দা করার কিছু নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের মধ্যে অনেক জায়গায় ধন-সম্পদকে فضل الله বা 'আল্লাহর অনুগ্রহ' বলে উল্লেখ করেছেন।

জুবায়ের ইবনে আবদুল্লাহ এবং ইবনে আউফ রা. তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য কত ব্যাপক সম্পদ রেখে গিয়েছেন—সেটা তো জানা বিষয়। একবার হজরত আলি রা.-এর জাকাতের পরিমাণ হয়েছিল ৪০ হাজার দিনার। হজরত ইবনে মাসউদ রা.-এর পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৯০ হাজার

দিনার। হজরত লাইস ইবনে সাদ রহ.[২১] প্রতি বছর বিশ হাজার দিনারের বেশি উপার্জন করতেন। হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ.[২২] নিজের সম্পদ দিয়ে বাণিজ্য করতেন। আর হজরত ইবনু মাহদি রহ. প্রতিবছর দুই হাজার দিনার বিনিয়োগ করতেন।

দুনিয়াতে বিয়ে-শাদির কথা যদি ধরা হয়, তবে এটিও প্রশংসনীয় একটি বিষয়। কিছুতেই নিন্দা বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতো বিষয় নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক স্ত্রী ছিল। দাসীও ছিল। এছাড়া অধিকাংশ সাহাবির ছিল একাধিক স্ত্রী। হজরত আলি রা.-এর চারজন স্ত্রী ছিল।

কেননা, বিয়ে যদি সন্তান-সন্ততির উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলেও এটি ইবাদত হিসেবেই গণ্য হবে। আর যদি নিজের চাহিদা পূরণের জন্য হয়, তাহলেও এটা হালাল এবং বৈধ। বিয়ে ইবাদত হওয়ার কারণ, এর মাধ্যমে নিজেকে ও অন্য নারীকে জিনা ও রজম থেকে বিরত রাখা সম্ভব হয়। হাদিসে এর অনেক ফজিলতও বর্ণিত হয়েছে।

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর জীবনের মূল্যবান দশ-দশটি বছর হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের কন্যাকে বিয়ের মহর আদায়ে ব্যয় করে দিয়েছেন।[২৩] প্রায় সকল নবীই বিয়ে করেছেন। বিয়ে যদি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হতো, তবে তো তারা এদিকে পা বাড়াতেন না। হজরত মুসা

---

[২১]. পুরো নাম: লাইছ ইবনে সাদ ইবনে আবদুর রহমান রহ.। তিনি ছিলেন ইমাম এবং হাফেজে হাদিস। খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন মিসরের ফহিক ও মুহাদ্দিস এবং ধর্মীয় নেতা। মিসরের গভর্নর, কাজি, প্রশাসক– সকলেই তার নির্দেশের অধীন ছিলেন। সকলেই তার মত ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন। তিনি বছরে বিশ হাজার দিনারের বেশি উপার্জন করতেন। কিন্তু সব দান করে দিতেন। তাই তার ওপর জাকাত ফরজ হতো না। তিনি ১৫৭ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। [سير أعلام النبلاء : ৮/১৩৬-১৬৩, তবাকাতে ইবনে সাদ: ৭/৫১৭]

[২২]. তার পুরো নাম: সুফিয়ান ইবনে সাইদ ইবনে মাসরুক ইবনে হাবিব... ইবেন ছাওর আল কুফি। তিনি ছিলেন শাইখুল ইসলাম। ইমাম এবং হাফেজে হাদিস। তার সময়ের আলেমদের নেতা। ফকিহ। আস্থাবান মুহাদ্দিস। আবেদ। তার ইলমে উম্মাহ বহুভাবে উপকৃত হয়েছে। তার এক বিখ্যাত বাণী ছিল এমন– إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الأخرة، فاتركوا لهم الدنيا – এই সকল রাজা-বাদশা তোমাদের জন্য আখেরাতকে ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদের জন্য দুনিয়া ছেড়ে দাও। তিনি ১৭১ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। [سير أعلام النبلاء : ৭/২২৯-২৭৯ এবং طبقات ابن سعد : ৭/৫১৭]

[২৩]. এই কথা বলে কোরআনের এই আয়াতের দিকে ইশারা করা হয়েছে–
﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾

আলাইহিস সালামের মতো একজন নবী জীবনের মূল্যবান দশটি বছর মহর আদায়ে ব্যয় করতেন না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

خيار هذه الأمة أكثرها نساء.

এই উম্মতের মধ্যে উত্তম সে, যার স্ত্রী অনেক।[২৪]

এবার খাদ্য-খাবারের কথায় আসি। ভালো খাদ্য গ্রহণের দ্বারা উদ্দেশ্য হবে, নিজের শরীরকে মজবুত ও শক্ত-সামর্থ্যবান রাখা; যাতে ঠিকভাবে আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করা যায়। এছাড়া নিজের অধীন পশু-প্রাণীকেও ভালোভাবে খাবার দেওয়া উচিত; যাতে সেগুলো তাকে বহন করতে পারে।

হজরত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল যা পেতেন, আল্লাহর শুকরিয়া করে খেয়ে নিতেন। গোশত হলে গোশত খেতেন। মুরগির গোশতও খেতেন। তবে খাদ্যের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল মিষ্টান্ন এবং মধু। তাঁর ব্যাপারে এমন কোনো বর্ণনা নেই যে, তিনি হালাল ও বৈধ খাবার গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছেন।

একবার হজরত আলি রা.-এর সামনে ফালুদা পরিবেশন করা হলো। তিনি বললেন, এটা কী? লোকেরা বলল, এটি ফালুদা। ইরানিরা তাদের নওরোজের দিন এটা খায়। হজরত আলি রা. সেটা খেলেন এবং বললেন, نوروزنا كل يوم -আমাদের প্রতিটা দিনই নওরোজ। অর্থাৎ যেকোনো দিন এটা আমরা খেতে পারি। কোনো বাধা নেই।

তবে এটা ঠিক যে, পরিতৃপ্তির পরও পেটুকের মতো ভক্ষণ করা উচিত নয়। এবং অহংকার প্রকাশের জন্য ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরাও ঠিক নয়। হ্যাঁ, তারপরও কিছু মানুষ এরচেয়ে অনেক অল্পতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। কারণ, নিখাদ হালালের মধ্য থেকেও তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবপর হচ্ছিল না। অন্যথায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সময় পরিধানের জন্য এমন একটি পোশাক ছিল, যা ২৭টি উটের বিনিময়ে খরিদ করা হয়েছিল।

---

[২৪]. ইমাম বোখারি রহ. 'আন-নিকাহ' অধ্যায়ে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন– ৯/৫০৬৯।

হজরত তামিম দারি রা.-এর এমন একটি পোশাক ছিল, যা এক হাজার দিরহাম দিয়ে খরিদ করা হয়েছিল। এটি পরিধান করে তিনি রাতে নামাজ আদায় করতেন।

কিন্তু এসকল সাহাবি ও তাবেয়ির পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হলো, যারা বাইরে খুব দুনিয়াবিমুখতা প্রকাশ করতে শুরু করল এবং নিজেরা নিজেদের মতো করে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিল, যেটা আদতে তাদের প্রবৃত্তিতাড়িত পথ। এরপর তারা এই পথ-পদ্ধতির পক্ষে দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধানে লেগে পড়ল। অথচ এটা তো ইসলামের পথ নয়। মানুষের উচিত হলো দলিলের অনুসরণ করা; প্রথমে কোনো পথের অনুসরণ করে এরপর তার জন্য দলিল-প্রমাণ অনুসন্ধান করা নয়।

সুফিদের আরও কয়েকটি শ্রেণি রয়েছে। যেমন–

এক. প্রকাশ্যে মানুষের সামনে সুফি ও দুনিয়াবিমুখতার ভান করে। অথচ গোপনে এবং বাস্তবে সবচেয়ে বেশি সে-ই দুনিয়ার প্রতি লোভী হয়ে থাকে। গোপনে ও নির্জনে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়। তার বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেশ-ভূষায় লোকদের দেখাতে চায় যে, সে একজন সুফি দুনিয়াত্যাগী অনুগত সাধু পুরুষ। কিন্তু তার এই সাধুতা শুধু বেশ-ভূষা ও বাহ্যিকতার মাঝেই সীমাবদ্ধ। নতুবা তার বাস্তব সকল কর্মকাণ্ডের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, তার মধ্যে বিরাজ করছে ফেরাউনের অহংকার ও আমিত্ব।

দুই. দ্বিতীয় প্রকার সুফি, বাস্তবে যাদের অন্তর কলুষমুক্ত। দ্বীনের জন্য হৃদয় পরিষ্কার। কিন্তু শরিয়তের ইলম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ও মূর্খ। সে কারণে হৃদয়ের স্বচ্ছতা সত্ত্বেও অজ্ঞতার কারণে ডুবে আছে ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার মধ্যে।

তিন. তৃতীয় প্রকার ব্যক্তিরাও অজ্ঞ। কিন্তু তারা যেকোনোভাবে সমাজে শীর্ষ অবস্থান লাভ করেছে। তারা বইপত্রও রচনা করেছে। এই পথে মূর্খ অনুসারীরা তাদেরকে ভুলভাবে অনুসরণ করে বসেছে। তাদের অনুসারীদের অবস্থা হলো ওই অন্ধ ব্যক্তির মতো, যে অপর কোনো অন্ধের অনুসরণ করেছে। অথচ তারা যদি এসব ত্যাগ করে শুধু সেই পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ করত, যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ, তবে তারা এভাবে পথভ্রষ্ট হতো না এবং লাঞ্ছিতও হতো না।

কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তি শরিয়ত থেকে বিচ্যুত হলে বিজ্ঞ আলেমদের অনেকেই তাদের বিচ্যুতি তুলে ধরতে কোনো কিছুর পরোয়া করতেন না; বরং তারা আরও বিস্তৃতভাবে তাদের সমালোচনা করতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, মারওয়াজি রহ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিয়ের ব্যাপারে আপনার কী অভিমত? তিনি বললেন, এটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত।

মারওয়াজি রহ. তখন বললেন, ইবরাহিম বিন আদহাম রহ. বলেছেন...। সঙ্গে সঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. চিৎকার করে বলে উঠলেন, তুমি আমার কাছে পথশিশুদের প্রমাণ নিয়ে এসেছ!

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.কে জিজ্ঞেস করা হলো, সারি সাকাতি রহ. বলেছেন, আল্লাহ যখন হরফসমূহ সৃষ্টি করলেন তখন আলিফ দাঁড়িয়ে ছিল এবং বা সিজদা করল। ইমাম আহমদ রহ. বললেন, তোমরা তার থেকে মানুষজনকে সরিয়ে দাও।

জেনে রেখো, মুহাক্কিক ব্যক্তিকে কোনো মর্যাদাবান নাম ভীত করে না। যেমন, একবার এক ব্যক্তি হজরত আলি রা.-এর নিকট এসে বলল, আপনি কি মনে করেন, আমরা তালহা এবং জুবায়রের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করি যে, তারা ভ্রান্তির ওপর ছিল?

হজরত আলি রা. উত্তরে বললেন,

إن الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله.

> সত্য কখনো মানুষের পরিচয়ে জানা যায় না। তুমি আগে সত্যকে জানো, এরপর তা দিয়েই তুমি সত্যপন্থীকে চিনতে পারবে।

কিন্তু যেই বাস্তবতা আমাদের ব্যথিত করে তা হলো, লোকদের অন্তরে কিছু মানুষের প্রতি প্রচণ্ড রকমের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রোথিত হয়ে আছে। এরপর যখন এসব মানুষদের থেকে কোনো বিষয় প্রচারিত হয়, দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের অন্তরে তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে এগুলোকেই সত্য ও সঠিক ভেবে গ্রহণ করে নেয়।

যেমন আবু ইয়াযিদ রহ. থেকে বর্ণনা করা হয়। তিনি বলেন, 'একবার আমার নফস আমার ওপর কর্তৃত্ব করতে শুরু করে। তাই আমি নফসকে শাস্তি প্রদানের জন্য শপথ করে বলি– আমি এক বছর পানি পান করব না।'

সত্যই যদি তিনি এ কথা বলে থাকেন তবে এটা তার জন্য স্পষ্ট একটি ভুল কাজ এবং ভ্রষ্ট পদ্ধতি। কারণ, পানি শরীরের সকল খাদ্যকে সুসমন্বিত করে। পরিপাকতন্ত্রে সাহায্য করে। অন্য কোনো খাদ্য তার বিকল্প হতে পারে না। তাই যখন সে পানি পান করবে না, তার শরীর কষ্ট পাবে। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মিষ্ট পানি পান করতেন। তাই কেউ যদি নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পানি পান না করার মতো শপথ করে তাহলে এটা তার জন্য জায়েয হবে না। কারণ, এই শরীরের মালিক সে নিজে নয়। শরীরের মালিকের অনুমতি ব্যতীত তাকে অবৈধভাবে কষ্ট প্রদান করা তার জায়েয নেই।

অথচ কিছু সুফি ব্যক্তির থেকে এধরনের বিভিন্ন কথা প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে একজনের বক্তব্য এমন– আমি আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে মক্কা পর্যন্ত খালি পায়ে হেঁটে গিয়েছি। পথে যখন পায়ে কাঁটা ফুটেছে, সেগুলো ছাড়িয়ে নিইনি। বরং জমিনের সাথে ঘষে দিয়ে নিয়েছি। তখন সেখান থেকে রক্ত ছুটেছে ফিনকি দিয়ে... ।

কেউ বলেছে, একবার আমার দেহে একটি ফোঁড়া হয়েছিল। বড় যন্ত্রণা দিচ্ছিল ফোঁড়াটা। যখন আমার চোখ আমাকে কষ্ট দিত তখন সেই ফোঁড়া দিয়ে তা ঘষে দিতাম। এভাবে আমার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহর সম্পদ আল্লাহ নিয়েছেন; এতেই বা দুঃখের কী আছে!

এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা ও কথা পাওয়া যায়। বক্তারা অনেক সময় এগুলোকে তাদের কারামাত হিসেবেও চালিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের কাছে এগুলোকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদাপূর্ণরূপে উপস্থাপন করে। ফলে তারা ভাবতে শুরু করে, এসকল সুফিরা বুঝি ইমাম শাফেয়ি রহ. ও আহমদ রহ.-এর চাইতেও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

আচ্ছা তুমিই বলো, নিজের শরীরের ওপর এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় কষ্টারোপ কি তার জন্য জায়েয হয়েছে? এই শরীরের মালিক কি সে নিজে?

আহা, আমি কসম করে বলতে পারি, এ ধরনের কর্মকাণ্ড বড় রকমের গোনাহের কাজ। বড়ই কুৎসিত বীভৎসতা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। [সুরা নিসা : ২৯]

এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن لنفسك عليك حقاً.

নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার শরীরের হক বা অধিকার রয়েছে।[২৫]

হিজরতের সময় হজরত আবু বকর রা. অনুসন্ধানী মনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্রামের জন্য একটু মনোরম ছায়া খুঁজছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে যখন এক জায়গায় একটা বড় প্রস্তরখণ্ড পেলেন, তখন তার ছায়ায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসার ব্যবস্থা করলেন।

অথচ আমাদের নিকট পূর্ববর্তী কিছু ব্যক্তিদের থেকে 'তাসাওউফ'-এর নামে নিজের শরীরের ওপর বিভিন্ন ধরনের বাড়াবাড়ির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের এগুলো করার পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে–

১. ইলম ও শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা।

২. খ্রিষ্টানদের সন্ন্যাসবাদ যুগের কাছাকাছি অবস্থান করা। অর্থাৎ তাদের দুনিয়াত্যাগের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

এভাবে কত গল্পকার যে মজলিস মাতিয়েছে এ-জাতীয় গল্প বলে—অমুক অমুক বিশাল মরু প্রান্তরে বের হয়েছেন কোনো পাথেয় পানি ও খাদ্য ছাড়া। কিন্তু কথক হয়তো জানে না, এরূপ করাটা নিকৃষ্ট কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম।

---

[২৫]. সুনানে আবু দাউদ : ৩/১৩৬৯। মুসনাদে আহমদ : ৬/২৬৮। বিশুদ্ধ হাদিস। এটি হাদিসের একটি অংশ। পুরো হাদিসটি এমন–

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ قَالَ فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ.

আল্লাহ তাআলা এ ধরনের কিছু করতে বান্দাকে বাধ্য করেন না। নির্দেশও দেন না।

কেউ কেউ বর্ণনা করেন, অমুক অমুক পানির ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন। একবার এ ধরনের এক গল্প শুনে হজরত ইবরাহিম হারবি বললেন, কারও পানির ওপর হেঁটে যাওয়ার কথা সত্য নয়। অন্যরা রই রই করে উঠল, তবে কি আপনি সৎ ওলিদের কারামাতকে অস্বীকার করছেন?

এসকল ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, আমরা এগুলোকে অস্বীকার করি না। কিন্তু যেটা প্রমাণিত সত্য, সেটাকেই আমরা অনুসরণ করি। সৎ ও সঠিক ব্যক্তিরা অবশ্যই শরিয়তের অনুসরণ করে চলেন। তারা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের নিজস্ব মত ও পথের অনুসরণ করেন না।

হাদিসে এমন অনেক বিবরণ এসেছে যে, বনি ইসরাইল নিজেদের কর্মকে তারা নিজেরাই কঠিন করে নিয়েছে। সে কারণে আল্লাহও তাদের ওপর কঠিনতা আরোপ করেছেন।[২৬] তাহলে আমরাই বা কোন সাহসে এগুলো করে বেড়াই!

সুফিরা মানুষকে আর কত দরিদ্রতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে? এরা মানুষের হাত শূন্য করে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে যখন তাদের নিজেদের এবং পরিবারের পার্থিব প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন হয়তো তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে অথবা ধনীদের দুয়ারে হাত পাতছে।

তারা মানুষকে আর কত স্বল্পাহারের দ্বারা কষ্টে আপতিত করবে?

অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বল্পতার পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেন,

ثلث للطعام و ثلث للشراب وثلث للنفس.

---

[২৬]. হাদিসের বিবরণটি এমন– إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم। ইবনে আবি হাতেম রহ. হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে মারফু হিসেবে এটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইবনে কাসির রহ. তার তাফসিরে এটি বর্ণনা করেছেন– ১/১০৮। তিনি বলেন, এটির সনদ সহিহ। আরও বর্ণিত হয়েছে 'কাশফুল খাফা' গ্রন্থে–২/৯। এছাড়া আরও অনেকেই এটা বর্ণনা করেছেন।

পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, আরেক তৃতীয়াংশ পানির জন্য
এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ শূন্য থাকবে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য।[২৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের কমতির সর্বোচ্চ সীমা এখানে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

হজরত আবু তালেব আল-মাক্কি রহ. তার 'কুতুল কুলুব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'তাদের মাঝে একজন বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একটি পাত্র দিয়ে নিজের খাদ্যের পরিমাণ মেপে রেখেছিলেন। সেই পরিমাণ অনুসারে তিনি খাদ্য গ্রহণ করতেন। কিন্তু প্রতিদিন তিনি আগের পরিমাণ থেকে কিছুটা করে কমাতে থাকেন। প্রতিফলে খাদ্যের পরিমাণ ক্রমে কমতেই থাকে। আমি শৈশব থেকে ছিলাম তার গুণগ্রাহী ও অনুসারী। কিন্তু তার এ কাজ আমার নিকট সঠিক মনে হয় না। প্রতিদিন তার খাদ্যের পরিমাণ কমতে কমতে একপর্যায়ে পরিমাণ একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে। এভাবে স্বল্প খাদ্য গ্রহণের কারণে কিছুদিনের মধ্যেই তার শরীর ভেঙে পড়ে। এরপর তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর অসুস্থ থাকার পর একদিন ইন্তেকাল করলেন।

আচ্ছা বলো, এটা কি শরিয়ত অনুমোদন করে?

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, 'আমি অতি অল্প খাদ্য গ্রহণ করাকে অপছন্দ করি। যে সকল লোক এ ধরনের কাজ করে, একসময় তারা ফরজ আমল করা থেকেও অক্ষম হয়ে পড়ে।'

এটিই বিশুদ্ধ কথা। কারণ, অল্প আহার গ্রহণকারী ব্যক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। একসময় সে নফল পড়তে অক্ষম হয়। এরপর ফরজ আদায়েও অক্ষম হয়ে পড়ে। এরপর সে তার স্ত্রী ও পরিবারের হক আদায়ে অক্ষম হয়ে পড়ে। তাদের জন্য উপার্জন করতে সক্ষম থাকে না। আরও এমন অনেক ভালো কাজ সে আর করতে পারে না, আগে যেগুলো সে করত।

---

[২৭]. পূর্ণ হাদিসটা এমন–

الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ.

ইবনে মাজা : ১০/৩৩৪০, পৃষ্ঠা : ১০৫– মাকতাবা শামেলা।

যে সকল হাদিসে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের ওপর উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, সেগুলো শুনে তোমার শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো রোজার ওপর উদ্বুদ্ধ করা কিংবা ভক্ষণ বা অধিক খাদ্যের প্রতি নিরুৎসাহিত করা।

অর্থাৎ প্রয়োজন সত্ত্বেও ধারাবাহিক স্বল্প আহার শারীরিক শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। এটা একজন মুমিনের জন্য জায়েয নয়।

এসকল কথা শুনে আবার আমার নিকট ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. বা এ ধরনের কারও কথা দিয়ে দলিল দিতে এসো না। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবির মাধ্যমে যে দলিল প্রদান করা হচ্ছে, তা নিশ্চয়ই এসকল বুজুর্গ ব্যক্তির কথার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। হ্যাঁ, আমরা তাদের ব্যাপারেও ভালো ধারণা রাখি। ব্যতিক্রম বিষয় দিয়ে কখনো দলিল প্রদান করা যায় না। তাছাড়া সকল মানুষের সক্ষমতা ও সহ্যক্ষমতাও এক নয়।

আমার কাছে একদিন এমন এক ব্যক্তির সংবাদ এলো, যাকে আমরা সম্মান করি এবং যার জিয়ারতকে আমরা গনিমত মনে করি। তিনি একবার দজলা নদীর তীরে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করলেন। তাকে বলা হলো, পানি তো পাশেই রয়েছে। তবুও যে তায়াম্মুম করলেন!
উত্তরে তিনি বললেন, আমি ভয় করছিলাম, আমি হয়তো অতদূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব না। তার আগেই হয়তো মৃত্যু এসে যাবে।'
আহা, মৃত্যুকে এত নিকট জ্ঞান করা তো ভালো কথা! কিন্তু তাই বলে শরিয়তকে এভাবে ফেলনা বানিয়ে ফেলা কি ঠিক? তাঁর এই ঘটনা শুনে ফিকাহবিদগণ তাকে ছেড়ে কথা বলেননি! এটা তার অনুচিত হয়েছে; তিনি যত বড় পির ও জাহেদই হন না কেন।

এ ধরনের সকল ঘটনার দিকে যদি কোনো ব্যক্তি দৃষ্টি দেয়, তাহলে সে বুঝবে একজন ফকিহ—তার অনুসারী মুরিদ যতই কম হোক, তার মৃত্যু যতই নীরবে সংঘটিত হোক—এমন হাজার পির বা সুফি থেকে অনেক উত্তম, সাধারণ লোকেরা যাদের স্পর্শ করাকেও বরকত মনে করে। যাদের জানাযায় মানুষের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যায় না।

আল্লাহ আমাদের অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দান করুন। কোনো দলিল ছাড়া শুধু সম্মান ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সালাফদের অনুসরণ করা থেকে হেফাজত করুন।

এ পর্যন্ত আমি অনেক সাধারণ মানুষ দেখেছি, তারা এ ধরনের অনেক উদ্ভট শাইখ বা পিরদের প্রশংসা করে বেড়ায়। গর্বের সাথে তারা তাদের পিরদের ব্যাপারে বলে বেড়ায়, তিনি তো বলতে গেলে রাতভর ঘুমানই না। দিনভর রোজা রাখেন। স্ত্রীকে যেন চেনেনই না। দুনিয়ার কোনো স্বাদ-আস্বাদন তিনি চেখেও দেখেন না। তার শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে। হাড় বাঁকা হয়ে গেছে। এখন তাকে বসেই নামাজ পড়তে হয়। নিশ্চয়ই তিনি সে সকল আলেমের চেয়ে অনেক উত্তম এবং বেশি বুজুর্গ, যারা সাধারণভাবে পানাহার করেন এবং বৈধভাবে দুনিয়া উপভোগ করেন!

আহা, এই হলো তাদের ধারণা! এটার কারণ তাদের মূর্খতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। অজ্ঞতা তাই সকল ক্ষেত্রেই অন্ধকার এবং পরিত্যাজ্য।

অথচ তাদের যদি দ্বীনের জ্ঞান ও বুঝ-বুদ্ধি থাকত, তাহলে তারা বুঝত, দুনিয়ার সকল খাদ্য-খাবার যদি একটিমাত্র লোকমাতে রূপান্তরিত করা হতো এবং তা একজন প্রাজ্ঞ আলেম ভক্ষণ করতেন, তবুও তা তার একটিমাত্র ফতোয়ার সমপরিমাণ মূল্য হতো না। কারণ, তিনি আল্লাহর দ্বীনের বুঝ রাখেন, মানুষকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন, আল্লাহর পথে পথ প্রদর্শন করেন। তার একটিমাত্র সঠিক ফতোয়া একজন মূর্খ আবেদ ব্যক্তির সারাজীবনের সকল আমল ও ইবাদতের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। ইলম যদি না থাকে আর সারা দুনিয়া যদি আবেদ দিয়ে ভরে যায়, তারা সবাই হবে ভ্রষ্ট ও বিপথগামী।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

فقيه واحد، أشد على إبليس من ألف عابد.

> একজন ফকিহ ইবলিসের ওপর হাজার আবেদের চেয়েও বেশি ভারি।[২৮]

---

[২৮]. ইবনে মাজা : ১/২১৮, পৃ:২৫৮– মা.শামেলা। অবশ্য এই বর্ণনায় হাদিসটি রয়েছে এমন–

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ.

আমার এসকল কথা পড়ে পাঠক আবার ধারণা করে বসবেন না যে, আমি আমলহীন কোনো আলেমের প্রশংসা করছি। আমি সে সকল আলেমের প্রশংসাই করি, যারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করেন এবং নিজেদের নফস ও অবস্থার জন্য কল্যাণকর বিষয়ে খবর রাখেন।

কারণ, আলেমদের মধ্যেও অনেকে নিজের কঠোর ও দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপনের মধ্যে নিজের কল্যাণ দেখেছেন। যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.।

আবার কেউ নিজের আভিজাত্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপনকে ভালো মনে করেছেন। এগুলো তাদের তাকওয়া দ্বীনদারি ইলম ও ফিকহি প্রাজ্ঞতার মধ্যে সামান্যতম বিঘ্নতা সৃষ্টি করেনি। যেমন হজরত সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং আরও অনেকে।

মূলকথা, কোনো মানুষের জন্য উচিত নয় যে, সে এমন পথ অবলম্বন করবে, যার কারণে অন্যজন তার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে যায় এবং সে তার চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। আমার জানামতে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের কল্যাণের দিকটি বুঝতে পারেন। সকলের মেজাজ ও শারীরিরিক অবস্থাও একরকম নয়। সুতরাং কারও জীবনযাপন অভিজাত ও সচ্ছল হয়েও শরিয়তের বাইরে না গেলে নিন্দার কিছু নেই।

হজরত রাবেয়া বসরি রহ.[২৯] বলেন, কেউ যদি মনে করে ফালুদা খাওয়ার মধ্যে তার অন্তরের তৃপ্তি ও কল্যাণ নিহিত, তাহলে তার ফালুদা খাওয়াই উচিত।

কিন্তু হে পাঠক, তুমি কিছুতেই লোক দেখানো সুফি হতে যেয়ো না। বৈধ পন্থায় জীবনকে উপভোগ করাতে কোনো অবুজুর্গি নেই। তাতে তাকওয়ার কোনো ঘাটতি নেই। আমি কত অভিজাতকে দেখেছি, সে মূলত বিলাস-

---

ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি 'কিতাবুল ইলম'-এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম গাজালি রহ.ও তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন'-এ হজরত আবু হুরাইরা রা.-এর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। তবে হজরত ইরাকি রহ. বলেন, এই সনদটি বিশুদ্ধ নয়। অন্য সনদে ঠিক আছে।

২৯. পুরো নাম : উম্মু আমর রাবিয়া বিনতে ইসমাইল আল-বসরিয়া। তিনি হলেন বিখ্যাত আবেদা জাহেদা মুত্তাকিয়া। ইবাদত ও আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে তার বহু খবর প্রসিদ্ধ। তিনি ১৩৫ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

ব্যসনের ভুক্তভোগী নয়, তবে এটা তার পরিবেশ, শরীর ও মানসিক চাহিদা। এটিই তার স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য শান্তিদায়ক।

সকল শরীরই কৃচ্ছতা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। সকল পাকস্থলিই দীর্ঘ অনাহার সইতে পারে না। কিছু নফসকে তার বৈধ উপভোগ্যতা না দিলেই বরং বিপত্তি দেখা দেয়। ভীষণ কষ্ট হয়তো তাকে কুফরি ও অবাধ্যতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। এ সময় সে যদি তার নিজের ওপর সহজ ও সদয় না হয়, তবে সে অবশ্যই সহজতাকে বর্জন করল, দ্বীনের ক্ষেত্রে যার সুযোগ রয়েছে। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ চান; কঠিন চান না।

প্রিয় পাঠক, এই বিষয়ে আলোচনা এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, আমি যদি এর পক্ষে সকল প্রমাণ ও হাদিস বর্ণনা করতে যাই, তবে বিষয়টি অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। কিন্তু সকল প্রমাণের কথা চিন্তা না করে তাৎক্ষণিকভাবে হৃদয়ের মধ্যে যা উদয় হয়েছে, তা-ই এখানে লিখে রাখলাম। আল্লাহই আমাদের সকল কল্যাণের মালিক।

মৃত্যুর পর আত্মার প্রত্যাবর্তন

সকলেই প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। অথচ এর প্রকৃতি ও অবস্থান নিয়ে এক রহস্যময় সংকটের মধ্যে রয়েছে সকলেই। যদিও এর প্রকৃতি সম্পর্কে না জানলেও তার অবস্থান নিয়ে কোনো অসুবিধায় পড়তে হয় না। কারণ, এটা নিশ্চিত যে, সেটা আছে। শরীরের যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক, আছে।

কিন্তু ঝামেলা বাঁধে মানুষের মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থান নিয়ে। আহলে হকের মাজহাব হলো, মৃত্যুর পরও এটি বিদ্যমান থাকে এবং তখন তা হয়তো আরামে থাকে কিংবা আজাবে আক্রান্ত হয়। শহিদদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, তাদের আত্মা জান্নাতের সবুজ পাখিদের দেহে অবস্থান করে এবং জান্নাতের গাছে গাছে আনন্দের সাথে উড়ে বেড়ায়।

আত্মাদের আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে হাদিসের এই বাহ্যিকতা ধরে কোনো কোনো মূর্খ ব্যক্তি বলে বসেন, মৃত ব্যক্তিরা তাহলে কবরে খায় এবং সম্ভোগও করে।

কিন্তু সঠিক কথা হলো, মানুষের মৃত্যুর পর আত্মা তার শরীর থেকে বের হয়ে বেহেশতের উচ্চতম স্থান বা অনন্ত কয়েদ-খানা জাহান্নামে অবস্থান করতে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত সেখানেই তারা অবস্থান করবে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, আত্মা তখন আবার এক নতুন শরীরের সাথে এসে মিশবে; যাতে আত্মা তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ নিয়ামত বা আজাব ভোগ করতে সক্ষম হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা– في حواصل طير خضر [সবুজ পাখির আকৃতির মধ্যে থাকবে[৩০]] প্রমাণ করে, আত্মা কোনো শরীর বা মাধ্যম ব্যতীত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না।

তবে এই স্বাদ আস্বাদন হলো খাবার ও পানীয়ের। নতুবা ইলম বা স্মরণ কোনো মাধ্যম বা উপায় ছাড়া শরীরহীন আত্মা নিজেই ধারণ করতে সক্ষম।

---

৩০. সহিহ মুসলিম : ৩/১২১/১৫০২, ১৫১৩। সুনানে আবু দাউদ : ৩/৫২০। সুনানে তিরমিজি : ৫/৩০১১। মুসনাদে আহমদ : ১/২৬৬/২৩৮৮। আবু ইসা বলেন, এটি হাসান সহিহ হাদিস। তবে বিভিন্ন বর্ণনায় শব্দের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পূর্ণ হাদিসটি এমন–

عَنْ ابنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ
تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ أَوْ شَجَرِ الْجَنَّةِ.

আমার এ নিয়ে আলোচনা করার কারণ হলো, আমি কিছু মানুষকে মৃত্যুর ভয়ে অধিক ভীত হয়ে পড়তে দেখি। আবার কিছু মানুষকে দেখি মৃত্যুর সময় আত্মার একেবারে ধ্বংস বা নিঃশেষ হওয়ার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে। তাদের মাঝে একটি হাহাকার কাজ করে যে, হায়, মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যাবে!

আমি তাদেরকে অভয় দিয়ে বলি, তুমি যদি ইসলামি শরিয়তে বিশ্বাসী হও, তবে তো তুমি তোমার অবস্থা জানোই। মৃত্যুপরবর্তী আত্মার জীবন অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু তুমি যদি শরিয়তের খবর সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো, তবে তো তোমার সামনে আগে শরিয়তের সত্যতা নিয়ে কথা বলতে হবে। সেটা ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যারা বিশ্বাসী, তাদের কোনো ব্যক্তিকে আমি যখন সম্বোধন করে বলি, বলো, মৃত্যুপরবর্তী জীবন নিয়ে তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে?

উত্তর আসে, না, আমার নিকট সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি বলি, তাহলে মৃত্যুতে তোমার চিন্তা কী! তুমি বরং দুনিয়াতে তোমার ঈমানকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করো। তাকওয়া অবলম্বন করো। এটা যদি করতে পারো, তবে তুমি মৃত্যুর সময় থেকে প্রশান্তির সুসংবাদ গ্রহণ করো। মৃত্যুতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। বেশির থেকে বেশি—আরও অধিক আমলের সুযোগ হারাবে, এই যা!

হে নফস! জেনে রেখো, মৃত্যুর পর তুমি তোমার দুনিয়ার আমল ও মর্যাদার অনুপাতে আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ পাবে। তাই আর দেরি কেন! আমলের ডানায় ভর করে তুমি তোমার মর্যাদার শিখরে আরোহণে ব্যস্ত হও। নিজের খেয়াল-খুশি থেকে সতর্ক হও। আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহই সকল কিছুর তাওফিকদাতা।

আলেমের হতভম্বতা

একদিন মজলিসে আলোচনার এক পর্যায়ে আমি বলে বসলাম,

لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت.

আমি যা বহন করছি পাহাড়কে যদি তা বহন করতে হতো, তবে সে পেরে উঠত না।

মজলিস থেকে ফিরে গৃহে যখন নিরিবিলি হলাম, হঠাৎ আমার নফস আমাকে ডেকে বলল, এ কথা তুমি কীভাবে বললে? মানুষ হয়তো মাঝেমধ্যে সন্দেহ করে যে, তোমার চিন্তা-ভাবনা ভিন্ন রকম। কিন্তু তুমি তো তোমার নিজেকে ও পরিবার নিয়ে বহাল তবিয়তেই আছ। জীবনযাপনের যে দায়িত্ব ও কষ্ট তুমি কখনো পাও—এটা তো সকল মানুষই বহন করে। তবে আর তোমার এই অভিযোগের কারণ বা যৌক্তিকতা কোথায়? এ কথা তুমি কেন বললে?

আমি তাকে উত্তরে বললাম, যেই মানসিক চাপ ও কষ্ট আমি বহন করে চলেছি, মাঝেমধ্যে সেটা বইতে অক্ষম হয়ে পড়ি বলেই কথাটি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এটি আমি কোনো অভিযোগ বা অনুযোগের ভিত্তিতে বলিনি। নিজের একটু আরামের জন্য দীর্ঘশ্বাস হিসেবে বলেছি। আমার পূর্বেও তো অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি কখনো কখনো বলে উঠেছেন,

ليتنا لم نخلق.

হায়, আমাদের যদি সৃষ্টিই না করা হতো!

তাদের এ কথা বলার কারণ কী? তারা এটা বলেছেন জীবনের ভার বইতে অক্ষম হয়েই।

অনেকেই জানে না, মানুষকে পাগল করে ফেলানোর মতো চাপ কী? তার জন্য সবচেয়ে কঠিনতম কাজ কী? কেউ যদি ধারণা করে যে, মানুষের বিশ্বাসগত চাপ ও আনুগত্য খুবই সহজ তবে সে এর কিছুই জানে না।

তোমার কী মত? কেউ যদি ধারণা করে, মানুষের জন্য কঠিন কাজ হলো ভীষণ ঠান্ডায় পানি দিয়ে অজু করা, মসজিদে গিয়ে নামাজে দাঁড়ানো, রোজা

পালন করা, জাকাত আদায় করা! আহা, তুমি যদি জানতে, এ সবই হলো সবচেয়ে সহজতম কাজ!

কষ্টের কাজ তো সেটা, যা পাহাড়ও বহন করতে অক্ষম। আহা, যখন এমন অনেক 'ভাগ্যের' বিষয় সংঘটিত হতে দেখি, বোধ-বুদ্ধি যেগুলোকে বুঝতে পারে না, তখন জ্ঞান-বুদ্ধিকে আনুগত্যের খাতিরে সেই 'ভাগ্য-নির্ধারিত' বিষয়গুলো মানতে বাধ্য করি। বিবেকের ওপর এই চাপ প্রয়োগই সবচেয়ে কঠিনতম কাজ।

অহরহ এমন কত বিষয় ঘটে চলেছে, জ্ঞান-বুদ্ধি যার অর্থ বা রহস্য উদঘাটনে অক্ষম। যেমন, নিষ্পাপ শিশুদের অসহ্য কষ্ট-কাতর আর্তনাদ, বিকলাঙ্গ ও দুরারোগ্য যন্ত্রণা-কাতর অসহায় মানুষের করুণ চাহনি এবং অবলা পশুদের জবাই– তবুও বিশ্বাস করা যে, এগুলোই এদের ভাগ্যলিপি এবং এসবের আদেশদাতা হলেন أرحم الراحمين বা শ্রেষ্ঠ করুণাকারী।

এগুলোর সামান্য চিন্তাও বুদ্ধিকে হতভম্ব করে তোলে। অদেখা ঝড়ে এলোমেলো হয়ে পড়ে মস্তিষ্কের প্রতিটি অণু। আহা! বন্ধু, এটাই তো যুক্তি বা বুদ্ধির আত্মসমর্পণের পরীক্ষা—কোনো অভিযোগহীন মেনে নেওয়ার সময়।

তবে প্রশ্ন হলো, শারীরিক ও চিন্তাগত আনুগত্যের এই কষ্টের মাঝে কতটা পার্থক্য?

এটি যদি বিস্তারিত আলোচনা করতে যাই, তবে কথা অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে। এখানে সেদিকে যাওয়া প্রয়োজন মনে করি না। অন্যের কথা উল্লেখ না করে আমারই কিছু বিষয় উল্লেখ করছি। আশা করি, এর দ্বারা বিষয়টা কিঞ্চিৎ হলেও অনুধাবন করা যাবে।

আমি এমন এক বান্দা, শৈশব থেকেই যার নিকট ইলমকে প্রিয় করে তোলা হয়েছে। তাই আমি আমার শৈশব থেকেই ইলমের সাধনায় নিমগ্ন থেকেছি। অধিকন্তু আমার আকর্ষণের বিষয় শুধু একটি শাস্ত্র নয়; ইলমের প্রতিটি শাখায় আমার আগ্রহ ও আকর্ষণ রয়েছে। এবং এগুলোর কোনো শাখাতেই ভাসাভাসা ইলম অর্জনের ওপর আমি সন্তুষ্ট নই। আমি বরং ইলমের প্রতিটি শাখার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করতে চেয়েছি। কিন্তু সময় বড় সংকীর্ণ। জীবন বড় সংক্ষিপ্ত। আমার ইলমের সাধনা তো উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে;

কিন্তু সময়ের কারণে অক্ষমতা এসেছে। তাই এখনো কিছু কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের গভীরতম অনবগতি নিয়ে আমার আফসোস রয়ে গেছে।

এরপর ইলম আমাকে আমার মাবুদের পরিচয় জানিয়েছে। তার দাসত্বের প্রতি ধাবিত ও উৎসাহিত করেছে। তাঁর অস্তিত্বের হাজারো দলিল-প্রমাণ আমাকে তাঁর দিকেই টেনেছে। আমি তাঁর কুদরতের সামনে নতজানু হয়েছি। তাঁর অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে আমি তাকেই খুঁজে পেয়েছি। তাঁর গুণাবলির কার্যকারিতা আমি চিনেছি। আমার দূরদর্শী অভিজ্ঞতা যতই তার দয়া ও অভিভাবকত্বের পরিচয় পেয়েছে, ততই তার মুহাব্বত ও ভালোবাসার দিকে টেনে নিয়েছে। নির্জন-নীরব একান্ত ইবাদতের প্রতি আমাকে আকর্ষণ করেছে। এভাবে তার জিকির হয়ে উঠেছে আমার কাছে প্রাপ্তির চেয়ে অনেক বেশি। প্রতিটি অবকাশ ও নির্জনতার ইবাদত ও জিকির দুনিয়ার সকল মিষ্টতা থেকেও আমার নিকট বেশি আস্বাদনের হয়ে উঠেছে।

কিন্তু যখনই আমি ইলমের মগ্নতা ছেড়ে অন্য কিছুতে মনোনিবেশের ইচ্ছা করেছি, ইলম আমার আঁচল ধরে চিৎকার করে বলেছে, যাচ্ছ কোথায়? তুমি কি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও? অথচ তুমি আমার মাধ্যমেই পেয়েছ তোমার রবের পরিচয়!

আমি তাকে বললাম, তুমি ছিলে সামান্য দলিল মাত্র। স্রষ্টাকে চেনার সামান্য মাধ্যম। এখন যখন উদ্দেশিত মাবুদকে পেয়ে গিয়েছি, দলিলের আর কী প্রয়োজন?

ইলম আমাকে কটাক্ষ করে বলেছে, আহা, এসব বলে না! এখনো যখন তুমি আরও কিছু ইলম অর্জন করো, তুমি তোমার মাহবুবের পরিচয় আরও বেশি করেই জানতে পারো। এবং জানতে পারো কীভাবে তার আরও নিকটবর্তী হওয়া যায়। প্রতিদিনের এই অবস্থাটা প্রমাণ করে, ইলম থেকে দূরে থাকার অর্থ, তোমার প্রভুর পরিচয় লাভের দরজা বন্ধ করে দেওয়া। ইলমহীন কিছুদিন অবস্থান করলেই তুমি জানতে পারবে, কী ক্ষতির মধ্যে তুমি রয়েছ। তুমি কি তোমার রবকে তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোনোনি?–

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

আপনি বলুন, হে আমার রব, আপনি আমার ইলম আরও বৃদ্ধি করে দিন।

[সুরা তোয়াহা : ১১৪]

এরপর ইলম আমাকে বলে, তুমি কি তাঁর নৈকট্য প্রত্যাশী নও? তুমি কি তোমার রবের নৈকট্য প্রত্যাশা করো না? তাহলে এবার তুমি তাঁর গাফেল বান্দাদের তাঁর দিকে আহ্বানে মশগুল হও। সকল নবী আলাইহিমুস সালাম এগুলোই করেছেন। তুমি কি জানো না, নিজেদের নির্জন ইবাদত-বন্দেগির চেয়ে তাঁরা সব সময় মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান ও শিক্ষা-দীক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন? তাদের মাঝেই থেকেছেন। তাদের সাথেই চলাফেরা করেছেন। যেহেতু তাঁরা জানতেন, এগুলোই তাদের প্রতিপালকের নিকট অধিক পছন্দনীয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি হজরত আলি রা.-কে বলেননি?—

لأن يهدي الله بك رجلاً، خير لك من حمر النعم.

> (হে আলি,) তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যদি একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন, তবে এটা তোমার জন্য মূল্যবান শত লাল উট প্রাপ্তি থেকেও লাভজনক।[৩১]

ইলমের এসকল প্রমাণ ও বক্তব্যে আমার মাথা ঘুরে গেল। তার কথাগুলোর সত্যতা স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। কিন্তু যখন বাস্তবে আমি মানুষদের সাথে মেলামেশা ও ওঠাবসার জীবনযাপনের দিকে ধাবিত হলাম, কিছুদিনের মধ্যেই আমার লক্ষ্য ইচ্ছা ও মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। কারণ, আমি আমার সকল ইচ্ছাকে তাদের কল্যাণের দিকে নিয়োগ করেছিলাম। আমার সকল সময় তাদের জন্যই ব্যয় হচ্ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আমি দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলাম। কিছু কিছু সময় আমি এমন হতবুদ্ধি ও

---

[৩১]. ইমাম বোখারি রহ. এটি 'কিতাবুল জিহাদ'-এ উল্লেখ করেছেন—৬/২৯৪২, ফাতহুল বারি। ইমাম মুসলিম রহ. উল্লেখ করেছেন 'ফাজাইলুস সাহাবা' অধ্যায়ে— ৪/৩৪/১৮৭১। এটি হাদিসের শেষ অংশ। পূর্ণ হাদিসটি এমন—

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

সহিহ বোখারি : ১০/২৭২৪, পৃষ্ঠা : ৯৪— মা. শামেলা।

দ্বিধান্বিত অবস্থার মুখোমুখি হতাম যে, বুঝতে পারতাম না, আমি আমার কোন পায়ের ওপর ভর দেবো।

এরই মাঝে হঠাৎ একদিন আমার ইলম আমাকে চিৎকার করে ডেকে বলল, বয়স তো হলো, আল্লাহর নাম নিয়ে এবার বিয়ে করো। পরিবারের ভরণপোষণ, সন্তান অন্বেষণ ও প্রতিপালনের জন্য অর্থ উপার্জনে নেমে পড়ো।

কথা তো সত্য। বিয়ে হলো। স্ত্রী-সন্তান হলো। উপার্জন তো দরকার। কিন্তু অবস্থার দাবি অনুযায়ী যখন উপার্জনের দিকে মনোযোগ দিলাম, আমি যেন দিশেহারা হয়ে উঠলাম। দুনিয়া যেন আমার দুধ দোহনের সময়ই তার সকল ওলান শুকিয়ে নিল। আমার মুখের সমুখে উপার্জনের সকল দরজা সরব শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আমি তো কিছুই পারি না। ইলম অর্জনের নিমগ্নতা আমাকে অর্থকড়ি বৈষয়িক জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। ইলম ছাড়া তো আমার কোনো পুঁজি নেই।

আমি আমার চারপাশের সকল দুনিয়াদার খলিফা শাসক ও ধনবান ব্যক্তিদের দিকে দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম, তারা তো গ্রহীতার দ্বীনের বিনিময় ছাড়া কিছুই প্রদান করে না। নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে আপস করা ছাড়া গ্রহণকারীগণ তাদের থেকে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। তাদের থেকে কিছু পেতে হলে দ্বীনের ক্ষতি করা ছাড়া কিছুই অর্জন করা সম্ভব হয় না।

হায়, আরও ভয়াবহ কথা হলো, কিছু কিছু আলেম তাদের দরবারে নিজেদের দ্বীন-দুনিয়া ও মর্যাদাবোধ সকল কিছু বিকিয়ে দিয়েও কাঙ্ক্ষিত দুনিয়াটুকুও প্রাপ্ত হয় না।

আমার ক্রোধ ও ক্ষুব্ধতা বলে উঠল, এসব ছিন্ন করে নিজের পথে অটল থাকো।

শরিয়ত বলে বসল, সক্ষম কোনো ব্যক্তি যদি তার ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে অপব্যয় করে, তবে এটি তার গোনাহের জন্যে যথেষ্ট।

সংকল্প এসে বলল, নিজের কাজে একাকী এগিয়ে যাও। ইলমে নিমগ্ন হও। নিজেকে বিকিয়ে দিয়ো না।

এবার নফস বলে উঠল, তাহলে তোমার পরিবার ও অধীনস্থদের কী হবে?

অনেক চিন্তা-ভাবনা করলাম। কিন্তু বাড়তি উপার্জনের জন্য কিছুই করলাম না। অথচ এদিকে পরিবার রয়েছে। মানুষদের সাথে মেলামেশাও রয়েছে। কারণ, একাকী নির্জনবাস তো গ্রহণ করিনি। পরিণামে জীবনযাপনের অনেক খরচ কমিয়ে দিতে হলো। অথচ এতদিন আমি স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপন করে আসছিলাম। দুনিয়ার আস্বাদন করেছি। মেজাজ ও মানসিকতায় একটি সাধারণ পরিপাট্য আভিজাত্য ও সূক্ষ্ম ভব্যতা এসে ভর করেছে। কিন্তু এখন আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য-খাবারের ধরন নিম্নমানে রূপান্তরিত হলো। কারণ, এর চেয়ে প্রশস্তভাবে চলার আর্থিক সামর্থ্য আমার ছিল না।

পছন্দনীয় অভ্যাস ও জীবনযাপনের রুচিশীল পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আমার মেজাজে রুক্ষতা এসে গেল। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে অনেক আবশ্যক কাজ করতেও অক্ষম হয়ে পড়লাম। জীবন আমাকে এক বিভিষীকাময় অবস্থায় ফেলে দিলো। আর এটা তো জানা কথা, অতীতে কোনো ধরনের কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই যার সুখময় খাদ্য-খাবারের সংস্থান হয়েছে, সে যদি হঠাৎ এই রুক্ষ ও স্বল্প খাবারের কবলে পতিত হয়, তবে তার জীবন বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, তবে আমি এ অবস্থায় কী করতে পারি? এখন কী করা উচিত আমার?

প্রায় আমি নির্জনে নিমগ্ন হয়ে ভাবতে থাকি। আমার দুরাবস্থা দেখে আপনাআপনিই যেন আমার চোখে জল এসে যায়।

সাধক আলেমদের জীবনযাপন করতে চাই; অথচ আমার শরীর আর ইলমি সাধনায় মগ্ন হওয়ার মতো অবস্থায় নেই। সুফিদের জীবন ধারণ করব কি? কিন্তু আমার শরীর যে জুহুদ বা কৃচ্ছতা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না!

এদিকে বন্ধু বা সাধারণ মানুষদের সাথে মেলামেশা আমার মনোযোগ ও স্থিতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। প্রিয়তমের কান্তিমান অবয়ব আমার হৃদয় থেকে উধাও হতে থাকে। জং ও ক্লেশে ঝাপসা হয়ে আসে হৃদয়ের আয়না। অথচ সম্প্রীতি টিকে থাকার জন্য ভালোবাসার চারাকে উদার মাটির সবুজ বুকে কোমলতার সাথে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। হৃদয়ের আলমারিতে সুরভিত কথামালায় তাকে সিঞ্চিত ও সজিব রাখতে হয়। কিন্তু আমার মন ধীরে ধীরে শুধু রুক্ষই হতে থাকে।

এই অবস্থায় আমি যদি উপার্জনকেই প্রাধান্য দিই তবে সেটা আমার সাধ্যের বাইরে। আর যদি ইলমের পুঁজি নিয়ে দুনিয়াদার বিত্তবানদের নিকট উপস্থিত হই—যদিও আমার মর্যাদাবোধ, সচেতন স্বভাব এবং নিজের দ্বীনের প্রতি সতর্কতা এটাকে কিছুতেই সমর্থন করে না—আমার এই স্বভাব ও সতর্কতার কারণে তাদের সাথে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিন অটুট থাকবে না। মানুষদের সাথে অবস্থানে কষ্টই শুধু বাড়তে থাকবে।

অথচ এদিকে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো সক্ষমতাও আর অবশিষ্ট নেই। ইলম, আমল ও মুহাব্বতের কোনো মর্যাদাও হলো না অর্জিত। আমি যখন আমার অবস্থার দিকে তাকাই, নিচের কবিতাটিতে কবি যে অবস্থার কথা বলেছেন, আমার অবস্থাও ঠিক তেমনই দেখতে পাই। কবি বলেন,

ألقاه في اليمّ مكتوفاً وقال له ... إيّاك إيّاك أن تبتلّ بالماء.

হাত-পা বেঁধে তাকে ফেলে দিলো সাগরের মাঝে। এরপর বলল, দেখো, তুমি কিন্তু সতর্ক থেকো, পানিতে যেন আবার না ভিজে যাও!

আমি আমার বিষয় নিয়ে প্রায় চিন্তিত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। জীবনের কর্ম নিয়ে হিসাব-নিকাশ করি। কষ্টে-দুঃখে কখনো কখনো দিশেহারা অবস্থা হয়ে যায়। আমার নিদারুণ নির্জনতায় প্রায় আমি এক সাধারণ ব্যক্তি থেকে শোনা কবিতার পঙ্‌ক্তি দুটি আবৃত্তি করি। তিনি যেন আমারই অবস্থা কত যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন!

واحسرتي كم أداري فيك تعثيري . . مثل الأسير بلا حبل ولا سيري

ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري . . لما شكلت جناحي قلت لي طيري

আফসোস, আমি আর কত তোমার ব্যাপারে প্রতারিত হব। রশি-রশদ ও অসহায় এক বন্দির মতো অপদস্থতার সাথে রয়েছি পড়ে। আমার সকল কৌশল উধাও হয়েছে। প্রচেষ্টা হয়েছে ব্যর্থ। তুমি আমার উড়ে চলার সকল ডানা কেটে দিয়ে বলছ, এবার যাও উড়ে।

শরীর ও অর্থের এমন অসহ্য কষ্টে নিপতিত হয়েও আমি অনুভব করেছি, এগুলোর চেয়েও এই চিন্তাগত চাপ এবং নিঃশর্তভাবে তাকদিরকে মেনে নেওয়ার আনুগত্যই সবচেয়ে কঠিন ও দুঃসাধ্য। এর কাছে শারীরিক হাজার

কষ্টও অতি তুচ্ছ। এটার আঘাত সইতে না পেরেই তো কত চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ পণ্ডিত নাস্তিকতার পথে পা বাড়িয়েছে, আত্মহত্যা করেছে। সন্দেহের গরল-বিষে জীবন তুলেছে বিষিয়ে।

তবুও জেনে রাখো বন্ধু, জান্নাতের বিনিময়ে দুনিয়ার হাজার কষ্টও কিছু নয়। একবার ভাবো তো জান্নাতের সেই বিশাল বিস্তৃতি এবং সতত নিয়ামতের বাহার! বিশ্বাসগত এই কষ্টটাও তাই এত বেশি।

সফলতার রাজপথ

আমি দুনিয়া ও আখেরাত নিয়ে চিন্তা করলাম। দেখলাম, দুনিয়ার বিষয়াবলি মানুষের অধিকতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং স্বভাবগত। আর আখেরাতের বিষয়গুলো ঈমান ও বিশ্বাসগত। আকর্ষণ ও প্রভাবের দিক দিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলোই প্রাধান্য লাভ করে; যদি না সে মানুষের ইলম ও ইয়াকিন অতি দৃঢ় হয়।

দুনিয়ার সকল বিষয়ের প্রভাবই নির্ভর করে তার উপকরণের আধিক্যের ওপর। চারদিকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ইন্দ্রিয়-আকর্ষণের উপকরণ। এ কারণে সাধারণ মানুষদের সাথে মেলামেশা, নয়নাভিরাম জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং সুখ-উপভোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে লিপ্ত থাকা ইন্দ্রিয়ানুভবকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

অন্য দিকে নির্জনতা, আল্লাহর নিয়ামত নিয়ে চিন্তা-ফিকির এবং ইলম ও জ্ঞানের চর্চা আখেরাতের প্রভাবকে শক্তিশালী করে তোলে।

এটি বোঝা যাবে এভাবে যে, মানুষ যখন বাজারে হেঁটে বেড়ায়, দুনিয়ার বিভিন্ন মানুষের প্রাচুর্য ও শোভা-সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এরপর সে যখন কবরস্থানে যায় এবং নিজের অন্তরের শ্বেতপত্রের দিকে তাকায়, তখন সে তার আগের বাজারে অবস্থানকালে অন্তরের অবস্থা এবং এই সময়ে অন্তরের অবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখতে পাবে।

এটির একমাত্র কারণ হলো, এ সময় দুনিয়ার প্রভাব ও আকর্ষণ থেকে তার দূরে অবস্থান।

সুতরাং হে বন্ধু, তোমার নফসের সংশোধনের জন্য এবং তাকে আখেরাতমুখী করার জন্য নির্জনতা অবলম্বন করা, আল্লাহর জিকির করা এবং বেশি বেশি ইলম চর্চা করা কর্তব্য। কেননা নির্জনতা হলো নিয়ামক পথ্য। জিকির ও ইলম হলো ওষুধ। সাধারণ মানুষদের সাথে মেলামেশা করে জ্বরাক্রান্ত হয়ে ওষুধ ব্যবহারে কোনো উপকার আসবে না। তাই মেলামেশাহীন নির্জনতার সাথে যখন জিকির ও ইলম সংযুক্ত হবে, রোগ সেরে ওঠার মতোই তোমার অন্তরও পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। আখেরাতের দিকে ধাবিত হবে।

নিষিদ্ধের প্রতি আকর্ষণের কারণ

নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণের কারণ নিয়ে চিন্তা করলাম। এটাতে আমি একটি ভয়ানক ব্যাপার লক্ষ করলাম। দেখলাম, যেটাকে যতটা শক্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়, মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ সেটার প্রতি ততটাই বেশি সৃষ্টি হয়। প্রথম উদাহরণ দেখা যাক। হজরত আদম আলাইহিস সালামকে যখন একটি নির্দিষ্ট গাছ থেকে নিষেধ করা হলো, জান্নাতে আরও অসংখ্য গাছগাছালি থাকা সত্ত্বেও এই অপ্রয়োজনীয় গাছের প্রতিই তাদের আগ্রহ বাড়তে লাগল।

প্রবাদ রয়েছে–

المرء حريص على ما منع، وتواق إلى ما لم ينل.

> যে জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করা হয়, মানুষ সে জিনিসের প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করে। আর যে জিনিস তার হস্তগত হয়নি, সেটির প্রতিই ঝুঁকে থাকে তার যত আগ্রহ।

তাছাড়া এভাবেও বলা হয়, মানুষের স্বভাবটাই এমন যে, তাকে যদি ক্ষুধার্ত থাকার আদেশ দেওয়া হয়, তবু সেটা সে মেনে নেবে। কিন্তু তাকে যদি গোবর-লাদিকেও ছড়িয়ে দিতে নিষেধ করা হয় তবে সে এটি করাতেই প্রচণ্ড আগ্রহ বোধ করবে।

আরবরা বলে, এ কারণে আমরা কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করানোর জন্য তাকে সে কাজ থেকে নিষেধ করি।

কারণ, প্রবাদে আছে–

أحب شيء إلى الإنسان ما منعا.

মানুষের নিকট সবচেয়ে আগ্রহের বস্তু হলো, নিষিদ্ধ বস্তু।

মানুষ-স্বভাবের এ এক অতি রহস্যময় দিক। আমি এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে এর দুটি কারণ পেয়েছি। যেমন,

এক.

মানুষের অন্তর বাধ্য হয়ে শরীর নামক এক গণ্ডি বা খাঁচাকে মেনে নিয়েছে। সে কারণে কোনো কল্পনা ও কর্মের ক্ষেত্রে আর কোনো সীমাবদ্ধতা সে মানতে চায় না। যখনই কোনো নিষেধের মাধ্যমে তার সীমানা নির্ধারণ করা হয় তখনই সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে। ছটফট করতে থাকে। লাভ-ক্ষতির চিন্তা পরে; এটাকে তার আগে ডিঙানো চাই-ই চাই।

এ কারণে কোনো মানুষ এমনিতেই তার ঘরে যদি এক মাসও অবস্থান করে, সেটা তার কাছে কঠিন মনে হয় না। কিন্তু তাকে যদি কখনো বলা হয়, তুমি তিনদিন ঘর থেকে বের হবে না। এটা তার কাছে অতি দীর্ঘ ও কষ্টকর মনে হয়ে উঠবে।

দুই.

মানুষের মন বা অন্তরের জন্য যেকোনো হুকুমের অধীনে প্রবেশ করাটাই কষ্টকর। এ কারণে সে হারাম জিনিসে মজা পায়। আর বৈধ জিনিসে কোনো উৎফুল্লতা অনুভব করে না। যেমন, কোনো মানুষের নিকট হয়তো দুধপান খুবই প্রিয় একটা জিনিস। কিন্তু তাকে যদি নির্দেশ দেওয়া হয়, তোমাকে প্রতিদিন দুধ খেতে হবে। কিছুদিনের মধ্যেই সে দুধপানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। বিরক্ত হয়ে উঠবে।

এ কারণে মানুষের নফস যেটাকে পছন্দ করে, সেভাবে ইবাদত করতে তার সহজ হয়। অথচ যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত, সেটাকে সে প্রাধান্য দিতে চায় না। এতে তো আল্লাহর হুকুম মানা হয় না। এতে বরং নিজের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করা হয়। এটা থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

কল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে শয়তানের ধোঁকা

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ওয়াজের মজলিস, তাওবাকারীদের তাওবা এবং দুনিয়াত্যাগীদের দর্শন আমাকে প্রচণ্ডভাবে জুহদ ও দুনিয়াত্যাগের প্রতি আকর্ষিত করে তুলছে। আমাকে ধাবিত করছে নানা রকম মানুষের সংশ্রব থেকে মুক্ত থাকার দিকে এবং নির্জনে-নিরালায় আখেরাতের আমলে মগ্ন হওয়ার দিকে।

আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। অবশেষে বুঝতে পারলাম, এর অধিকাংশই হলো শয়তানের ধোঁকা। কারণ, শয়তান দেখে, আমার প্রতিটি মজলিসেই বহু বহু মানুষ তাদের অতীত গোনাহের জন্য ক্রন্দন করে, অনুতাপ-অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দৃঢ়ভাবে তাওবা করে এবং সকল ধরনের অবৈধ কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

কখনো কখনো পঞ্চাশ-একশজনও তাওবা করে। আর কিছুদিন তো একশোরও অধিক ব্যক্তি তাওবা করে। এদের অধিকাংশই তরুণ-যুবক, যারা এতদিন ইচ্ছাধীন খেলতামাশায় মগ্ন থেকেছে। বিভিন্ন পাপকর্মে নিমজ্জিত থেকেছে। এগুলো দেখে শয়তানও সম্ভবত গভীর দুঃখে নিমজ্জিত হয়। সে দেখতে পায়, এতদিন যারা তার দিকে ঝুঁকে ছিল, আজ তারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তাওবা ও আমলের দিকে ঝুঁকছে। সুতরাং সে বাহ্যিকভাবে মনোরম সুসজ্জিত কথা দিয়ে এগুলো থেকে আমাকে বিরত রাখতে চায়; যাতে তার থেকে যারা ছুটে যাচ্ছে, তাদেরকে যেন সে এককভাবে আবার তার দিকে প্রলুব্ধ করতে পারে।

সে আমাকে মজলিস থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে মন্ত্রণা দিয়ে বলে, যে ব্যক্তি এভাবে মানুষদের সংশ্রবে বিভিন্ন লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার মাঝে মজে থাকে, সে তো আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হওয়ার নির্জনতা লাভ করতে পারে না!

আমি বলি কী, মানুষদের মাঝে যদি সুন্দর ও মনকাড়া কথা বলি এবং সেগুলো যদি ভালো কথা হয়, তাহলে ভালোই তো; খারাপ কিছু তো নয়। এই সৌন্দর্যমণ্ডিত কথা দিয়ে আমি যদি মানুষদের শরিয়তের নাজায়েয

কোনো কাজের দিকে আহ্বান ও আকর্ষণ করতাম, তবে সেটা খারাপই হতো; কিন্তু এর মধ্যে খারাপের কী আছে!

এরপর শয়তান আমাকে দুনিয়াত্যাগের পথ দেখায়। মানুষের স্বাভাবিক বৈধ জীবনোপকরণ, হালাল উপার্জন থেকে বিরত থাকার প্রলোভন দেখায়। সে বলে, এগুলো তো পার্থিব বিষয়ে মত্ত থাকা!

আমি তাকে বলি, আমি যদি দুনিয়াত্যাগের মানসিকতা গ্রহণ করি এবং সকল উপার্জন থেকে নিজেকে বিমুখ করে রাখি, তবে তো কিছুদিনের মধ্যেই আমার হাতে যা রয়েছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে অথবা আমার জীবনধারণের জন্য আমার পরিবার-পরিজনের কাছে হাত পাততে হবে। তাহলে কি আমি অধঃপতিত হয়ে পড়ব না?

বরং আমার উচিত হবে এমন কিছু সম্পদ জমা করে রাখা, যা আমাকে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সহায়তা করবে। মানুষদের নিকট হাত পাতা থেকে বিরত রাখবে। আমার পুরো জীবনযাপনে সেটা কাজে লাগবে। কিংবা মৃত্যুর পর সেটা আমার পরিবার-পরিজনের জন্য রয়ে যাবে। আমি অবশ্যই এমন মুসাফির হতে চাই না, দূর থেকে মরীচিকা দেখেই যে তার সকল পানি নিঃশেষ করে ফেলে। কিন্তু নিকটে গিয়ে মরীচিকা দেখে হায় হায় বলে আফসোস করে। তখন তার এই আফসোস কোনো কাজে লাগবে না।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ হবে, ঘুমুতে যাওয়ার আগেই বিছানার মসৃণতা প্রস্তুত করে নেওয়া। বার্ধক্যের আগেই উপযুক্ত পরিমাণ সম্পদ জমা করে নেওয়া।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لأن تترك ورثتك أغنياء، خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.

তুমি তোমার সন্তানদেরকে এমন নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাবে যে, তাদেরকে মানুষের কাছে হাত পাততে হবে—এরচেয়ে তাদেরকে তোমার স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াই উত্তম।[৩২]

---

৩২. কিতাবুল জানাইয: ১২৯৫/৩, ফাতহুল বারি।

তিনি আরও বলেছেন,

نعم المال الصالح للرجل الصالح.

সৎ ব্যক্তির জন্য সৎ মাল কত উত্তম![৩৩]

আর বিচ্ছিন্ন থাকার ক্ষেত্রে আদেশ হলো, বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে অন্যায় ও অকল্যাণ থেকে। কল্যাণ থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন থাকা যাবে না। আর প্রত্যেক অবস্থাতেই অকল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা অপরিহার্য। তাছাড়া শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা প্রদান করা, মুরিদদের পথনির্দেশনা দেওয়া—এটা তো একজন আলেমের ইবাদত।

আর কিছু আলেমের জন্য তো নফল নামাজ ও রোজার চেয়ে কোনো কিতাব রচনা করা অথবা দ্বীনের উপকারী ইলম প্রদান করাই শ্রেষ্ঠতর কাজ। কারণ, এটি স্বল্প দেখা গেলেও এর প্রতিফল অনেক দূরগামী। কালের অতিবাহনে এটা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। এবং এর উপকারের সময়-সীমাও অনেক প্রলম্বিত।

এখন কথা হলো, শয়তান যে সজ্জিত ধোঁকার দিকে আহ্বান করে, মানুষের সেদিকে ধাবিত হওয়ার দুটি কারণ রয়েছে–

১. অলসতাকে ভালোবাসা। কারণ, দ্বীনি এসকল কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত থেকে একাকী অলসতার মাঝে ডুবে যাওয়া সহজ।

২. প্রশংসার লোভ। কারণ, সে জানে, দুনিয়াত্যাগের ব্যাপারে যখন সে মানুষদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করবে, তখন আগের তুলনায় বহু সংখ্যক সাধারণ মানুষ তার দিকে ঝুঁকতে থাকবে। তারা তার প্রশংসা করে বেড়াবে।

এ কারণে তোমার কর্তব্য হবে, সর্বপ্রথম সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। কাজ-কর্মে অগ্রগামীদের সাথে থাকা। এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ রা. যেগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া। তাদের কারও থেকে কি এমন কোনো বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা আজকের কথিত দুনিয়াত্যাগী ও সুফি-দরবেশরা আবিষ্কার করেছে? ইলম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা—এগুলো তো দ্বীনের কর্মীদের কাজ নয়। নবীদের সকল ব্যস্ততা ছিল মানুষদের

---

[৩৩]. ইমাম বোখারি রহ. হাদিসটি তার 'আল আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর মুসনাদে আহমদ: ৪/১৯৭,২০২।

সাথে মেশা এবং তাদের কল্যাণ সাধন করা, সৎ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করা।

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আলেম নয়, সে মন্দ থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে মূর্খ লোকদের সংশ্রব ত্যাগ করতে পারে। অর্থাৎ মন্দ সংশ্রবের কারণে যার মধ্যে খারাপ প্রভাব পড়ার ভয় রয়েছে, সে থাকবে আত্মরক্ষার পর্যায়ে। একজন জাহেল কিংবা দুর্বল মনের মানুষ যেহেতু নিজের ইলম ও দৃঢ়তা দিয়ে মন্দদের প্রভাবিত করতে সক্ষম নয়, তাই নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাদের সংশ্রব বর্জন করাই তার জন্য উত্তম। কিন্তু যিনি দক্ষ অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ডাক্তার, তিনি যাকে নাগালে পাবেন কিংবা যারা তার নাগাল পাবে, সবাই উপকৃত হবে। তাকে তো দূরে সরে থাকলে চলবে না।

ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব তার আমলে

কিছুদিন একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করলাম, বান্দার থেকে স্রষ্টার চাহিদা কী কিংবা স্রষ্টার জন্য বান্দার কর্তব্য কী?

ভেবে পেলাম, বান্দার কর্তব্য হলো, বিনয় প্রকাশ করা, নিজের কমতি ও অক্ষমতার কথা স্বীকার করা। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে আলেম ও জাহেদ-আবেদদের দুটি ভাগ করতে পারি। আলেমদের কাতারে ধরছি ইমাম মালেক রহ., সুফিয়ান সাওরি রহ., ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফেয়ি রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.কে। আর আবেদ-জাহেদদের কাতারে রাখছি মালিক ইবনে দিনার রহ.[৩৪], রাবিয়া বসরি রহ., মারুফ আল কারখি রহ.[৩৫], বিশর ইবনে হারিস রহ.কে[৩৬]।

এই জাহেদ-আবেদগণ যখন তাদের গভীর ইবাদতে মশগুল হতে শুরু করলেন, যুগের আওয়াজ তাদেরকে চিৎকার করে বলতে লাগল, তোমাদের এই ইবাদত কোনো কাজে আসবে না, এগুলো একেবারেই বৃথা। ইবাদত তো কাজে আসবে আলেমদের, যারা ইলমের সাথে আমল করে। তারাই হলেন নবীদের উত্তরাধিকারী। তারাই হলেন জমিনে আল্লাহর প্রতিনিধি। শরিয়তের ব্যাপারে তারাই হলেন নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত। তারাই হলেন মান্য ও অনুসরণীয়। তাদের জন্যই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল শ্রেষ্ঠত্ব।

এ কথায় আবেদগণ অবনত হলেন। নমিত হলেন। এবং এই কথার সত্যতাও স্বীকার করে নিলেন। প্রতিফলে মালিক ইবনে দিনার রহ. ইলম শেখার জন্য

---

[৩৪]. মালেক ইবনে দিনার রহ.। তিনি ছিলেন সৎকর্মশীল আলেমদের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আস্থাবান তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত। আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন। তিনি ১২৭ কিংবা ১৩০ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। سير أعلام النبلاء : ৫/৩৬২ এবং طبقات إبن سعد : ৭/২৪৩।

[৩৫]. তাঁর পুরো নাম: আবু মাহফুজ মারুফ আল কারখি আল বাগদাদি। তিনি ছিলেন জাহেদদের মধ্যে অন্যতম নক্ষত্র। যুগের বরকত। বলা হয়– তিনি ছিলেন 'মুস্তাজাবুত দাওয়াত'। তার থেকে অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে। سير أعلام النبلاء : ৯/৩৩৯ এবং طبقات الحنابلة : ১/৩৮১।

[৩৬]. পুরো নাম: বিশর ইবনে হারেছ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আতা। তিনি ছিলেন যোগ্য ইমাম প্রাজ্ঞ আলেম মুহাদ্দিস এবং বিশিষ্ট জাহেদে রব্বানি। তিনি 'বিশর আলহাফি' নামে অধিক প্রসিদ্ধ। ইবনুল জাওযি তাকে নিয়ে স্বতন্ত্র একটি কিতাব লিখেছেন। ২২৭ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। سير أعلام النبلاء : ১০/৪৬৯-৪৭৭।

ছুটে এলেন হাসান বসরি রহ.-এর নিকট। এবং বললেন, হ্যাঁ, হাসান আমাদের উস্তাদ।

আবার অন্যদিকে আলেমগণ যখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে শির উঁচু করে আছেন। সবার উর্ধ্বে তাদের স্থান। তখন আবার যুগের ভাষ্য চিৎকার করে উঠল আলেমদের ব্যাপারেও। বলা হলো, ইলমের একমাত্র উদ্দেশ্য আমল। আমল ছাড়া ইলমের কোনো মূল্য নেই। স্বয়ং আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف ؟

> মারুফ কারখি যেখানে পৌঁছেছে, ইলম দ্বারা তো সেখানে পৌঁছানোই উদ্দেশ্য!

হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. থেকে বর্ণনা এসেছে। তিনি বলেন,

وددت أن يدي قطعت ولم أكتب الحديث.

> আমি কখনো কখনো কামনা করি, আমার এই হাত কর্তিত হোক এবং আমি আর কোনো হাদিস না লিখি। [কারণ, যা লিখেছি সেগুলোর ওপরই আমল করে সেরে উঠতে পারি না।]

হজরত উম্মে দারদা একবার এক লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যতটুকু জেনেছ, তার সবগুলোর ওপর আমল করেছ?

লোকটি বলল, না।

উম্মে দারদা বললেন, তবে তুমি কেন ইলমচর্চার দ্বারা অযথা নিজের ওপর আল্লাহর দলিল বাড়িয়ে চলেছ?'

হজরত আবু দারদা রহ. বলেন,

ويل لمن يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل سبعين مرة.

> যে জানেনি এবং আমল করেনি, তার জন্য একবার আফসোস। আর যে ব্যক্তি জেনেছে কিন্তু আমল করেনি, তার জন্য সত্তরবার আফসোস।

হজরত আবুল ফুজাইল বলেন,

يغفر للجاهل سبعون ذنباً. قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد.

আলেমের একটি গোনাহ ক্ষমা করার আগে জাহেলের সত্তরটি অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

এসবের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত কথা হলো কোরআনের কথা। কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُون والَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সবাই সমান?

[সুরা যুমার : ৯]

এসকল কথায় আলেমগণও নত হলেন। প্রতিফলে তাই আমরা দেখি, বিখ্যাত আলেম মুহাদ্দিস মুজতাহিদ হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. ছুটে এসেছেন হজরত রাবেয়া বসরি রহ.-এর নিকট। তার কথা ও তারবিয়ত দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

অর্থাৎ ইলমই আলেমদেরকে বুঝিয়েছে, ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমল। ইলম শুধুমাত্র একটি উপকরণ বা মাধ্যম। এটি কিছুতেই মূল লক্ষ্যবস্তু নয়। আলেমরাও এভাবেই নত ও অবনত হয়েছেন। নিজেদের কমতি ও অপূর্ণতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

অতএব, দেখা যাচ্ছে সকল কিছুই অর্জিত হচ্ছে নিজের কমতির স্বীকারোক্তির মাধ্যমে, বিনয়ের মাধ্যমে। এর দ্বারাই বুঝে আসে, ইবাদতের মূল লক্ষ্যই হলো নিজেদের কমতি ও অক্ষমতাকে স্বীকার করে নেওয়া। আর এটিই হলো স্রষ্টার পক্ষ থেকে বান্দাকে তাকলিফ বা ইবাদতের হুকুম প্রদানের মূল উদ্দেশ্য।

স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা জরুরি

আমি আল্লাহ তাআলার একটি আয়াতাংশ নিয়ে ভাবছিলাম। আয়াতটি এই–

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন, তারাও তাকে ভালোবাসে।

[সুরা মায়িদা : ৫৪]

অন্তর বা নফস যখন স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসার অস্বীকৃতি জানায়, তখন তার মাঝে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সে ভাবে, স্রষ্টার আনুগত্যই বুঝি তার প্রতি মুহাব্বত।

এটা সে কেন বলে? ভেবে দেখলাম, সে আসলে এই ভালোবাসা সম্পর্কে অজ্ঞ রয়েছে ইন্দ্রিয়জাত প্রভাবের কারণে। এটিকে সহজ করে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, ইন্দ্রিয়জাত ভালোবাসা দৃশ্যত কোনো বস্তু বা আকৃতির বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু ইলম ও আমলের ভালোবাসা ধাবিত হয় কোনো সত্তার গভীরতম অর্থময়তার দিকে এবং সকল বাহ্যিকতা দূরে সরিয়ে তাকেই সে ভালোবাসে।

আমরা দেখি, মানুষেরা হজরত আবু বকর রা.-কে ভালোবাসে, ভালোবাসে হজরত আলি রা.-কে। এভাবে উম্মতের বড় সংখ্যক একটি দল হজরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর সমর্থন করে। আরেকটি দল হজরত আশআরি রহ.-এর এবং এই নিয়ে কখনো কখনো নিজেদের মাঝে মারামারি ও ঝগড়া-বিবাদ হয়। এমনকি কেউ কেউ জীবনও দিয়ে দেয়।

এই যে তাদের মধ্যে একটি দলবদ্ধতা কাজ করে; কিন্তু তাদের কেউ কোনোদিন এই দল বা জাতির কোনো চিত্র স্বচোখে দেখেনি। তাছাড়া জাতির চিত্র কখনো ভালোবাসা জাগাতে পারে না। কিন্তু এসকল ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে যখন তাদের মাঝে কিছু বিশ্বাস, কথা, কর্ম ও উপকারিতা এসেছে, সেগুলোই তাদের মস্তিষ্কে সমমনাদের নিয়ে একটি দলবদ্ধতা তৈরি করেছে। এর জন্যই তাদের ভালোবাসা উথলে উঠেছে।

তাহলে এই অসাধারণ ব্যক্তিদের যিনি তৈরি করেছেন, জ্ঞান বুদ্ধি মেধা ও কর্মের ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই স্রষ্টার প্রতি কেমন ভালোবাসা হওয়া প্রয়োজন?

তাকে আমি ভালোবাসবই তো!

যিনি অমাকে সুখ আস্বাদনের ইন্দ্রিয়-উপকরণ দিয়েছেন! যিনি আমাকে চিনিয়েছেন ইলমের সুখ! আহা, ইলম ও প্রজ্ঞার স্বাদ ও আস্বাদন সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সুখের চেয়েও অতি সুখকর। তিনিই তো হলেন সেই সত্তা, যিনি আমাকে শিখিয়েছেন এগুলো। তিনি আমাকে অনুভব ও অনুভূতির শক্তি দিয়েছেন। আর কীভাবে অনুভব করব—সে শিক্ষাও দিয়েছেন তিনিই।

এছাড়া প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি নতুন সৃষ্টিতে তিনি আমার কাছে আরও উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হন। আমি সেই সৃষ্টির সুষম সংগতি ও মন অবশকরা সৌন্দর্যের মাঝে তাকে যেন অবলোকন করি।

আমার সকল প্রিয় জিনিসই এসেছে তার থেকে। আমার ইন্দ্রিয় অনুভূতি, আমার গভীর থেকে গভীরতম অনুভব এসেছে তার থেকে। অনুভব-অনুভূতির সহজতম পথ ও পন্থা এসেছে তার থেকে। এবং আমার সবচেয়ে সুমিষ্ট আস্বাদন ও গহীনতম আনন্দের বিষয় হলো, তাকে চিনতে পারা। তিনি যদি আমাকে না চেনাতেন, আমি কিছুতেই তাকে চিনতে পারতাম না।

আমি কীভাবে তাকে ভালো না বেসে পারি!

আমার পুরো অস্তিত্ব এসেছে তার থেকে। আমার অবস্থিতি, আমার বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠা—এ সবই হয়েছে তার হাত থেকে। আমি আবার তাঁর কাছেই ফিরে যাব। আমার যত সৌন্দর্য ও প্রিয়তা—সব তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এগুলোকে সৌন্দর্য দিয়েছেন। সজ্জিত করেছেন। এসবের মাঝে প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

আমি কীভাবে স্রষ্টাকে ভালো না বেসে পারি!

সৃষ্টির সকল শক্তিই তো এসেছে স্রষ্টার পক্ষ থেকে। বান্দার শিল্প ও সৌন্দর্যবোধও তার পক্ষ থেকে। বান্দার যে অনুভব ও অনুভূতির ক্ষমতা—তা তো তিনিই দিয়েছেন। আমরা যদি কখনো কোনো অতি মুগ্ধকর বিস্ময়কর চিত্র বা ছবি দেখি, তখন আমরা সেই চিত্রের চেয়ে চিত্রকরের প্রতিই বেশি মুগ্ধ হই, তার প্রতি সম্মানবোধ করি, তার এই অসাধারণ কাজের জন্য তারই প্রশংসা করি। চিত্রটির সাথে সাথে, এমনকি চিত্রের চেয়েও তখন আমাদের কাছে চিত্রকর বা চিত্রের স্রষ্টাই বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে।

এভাবে আমাদের নিজেদের এবং চারপাশের বিষয়াবলির দিকে আন্তরিক দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে স্রষ্টা সম্পর্কে আমাদের ভালোবাসাময় এক পবিত্র চিন্তার উন্নতি ঘটে। যখন এ চিন্তাগুলো তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ানুভবের পর্দা সরিয়ে দিয়ে উদ্ভাসিত করবে তার পেছনের অসাধারণ এক সত্তার অসীম দয়া ও মায়াময় উপস্থিতি, তখন অবশ্যই অন্তরের মধ্যে জেগে উঠবে স্রষ্টার প্রতি দুকূল ছাপানো এক অপার্থিব বান ডাকা ভালোবাসা। এই দোলায়িত হৃদয়ের ভালোবাসার সাথে দুনিয়ার কোনো ভালোবাসারই তুলনা চলে না, তুলনা হয় না।

তবুও এই ভালোবাসার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কিছুটা তারতম্য হয়। কারণ, স্রষ্টার রয়েছে অনেকগুলো মহান গুণাবলি। কারও কারও অন্তরে কোনো গুণ হয়তো একটু বেশি প্রভাব ফেলে। সে কারণে তার ভালোবাসার সাথে সেই গুণের বৈশিষ্ট্যও লেগে থাকে। যেমন,

কেউ হয়তো স্রষ্টার এই বিশাল জগতের নিখুঁত পরিচালনায় প্রতি লক্ষ করে তাকে সমীহের সাথে ভালোবাসে। কেউ হয়তো তার কঠোরতা ও শাস্তির বিষয় লক্ষ করে ভয়ের সাথে ভালোবাসে। কেউ তাঁর দয়া ও করুণার প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রবল আশা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে ভালোবাসে।

আহা, এ যেন স্রষ্টার বর্ণিত সেই ব্যবস্থাপনা, যার কথা তিনি নিজেই বলেছেন এভাবে—

﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ﴾

প্রত্যেক মানুষই তার নিজ পানি পানের স্থান জেনে নিয়েছে।

[সুরা বাকারা : ৬০]

আল্লাহর হিকমতের কাছে জ্ঞানের আত্মসমর্পণ

এবার এক আশ্চর্য বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। বিষয়টি হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কত বিস্ময়করভাবেই না মানুষের এই শরীর সৃষ্টি করেছেন। কত সুন্দর ও সুগঠিত করেছেন! এখানেও তিনি তার অসীম ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন।

অথচ এই শরীরই তিনি আবার নষ্ট ও ধ্বংস করেছেন। কত মানুষের মৃত্যু দিয়েছেন। আরও কত মানুষের মৃত্যু দেবেন এবং এই সুন্দর সুগঠিত কান্তিমান লাস্যময় শরীর বিনষ্ট করে দেবেন।

মানুষের আকল স্রষ্টার এসকল সৃষ্টি দেখে যেমন বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়, তেমনি আবার তার রহস্যময়তার মধ্যে হাবুডুবু খায়—কেনই বা এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যের সৃষ্টি আবার কেনই বা অচিরেই তার ধ্বংস!

মাথার মধ্যে প্রশ্ন জাগে। প্রশ্ন নড়ে। নড়তেই থাকে।

কিন্তু আকল বা যুক্তি যখন জানল, শরীরের এই কাঠামো একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার জীবিত করা হবে। দুনিয়ার এই সুন্দর কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছে শুধু কিছু দিনের চেনা-জানার জন্য, আমলের জন্য এবং ফসলের বীজ বপনের জন্য।

হ্যাঁ, এই যুক্তিতে আকল কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিশ্চুপ হলো। কিন্তু... কিন্তু এরপর এজাতীয় আরও অনেক জিনিস তার সামনে এসে পড়তে থাকে। প্রশ্ন বাড়তে থাকে। যেমন, হয়তো তারুণ্যের আলোয় ঝলমল করা কোনো তরুণের মৃত্যু কিংবা পিতা-মাতার পায়ে পায়ে খেলে বেড়ানো মায়াময় কোনো শিশুর আকস্মিক পরলোকগমন। মায়ের কোল থেকে এই নিষ্পাপ শিশুটি ছিনিয়ে নেওয়ার রহস্য তার বুঝে আসে না। কারণ, আল্লাহ তাআলার তো এর মধ্যে কোনো লাভ নেই। প্রয়োজনও নেই।

এই তরুণ-তরুণী কিংবা এই শিশু প্রাণ দুটি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার, বেড়ে ওঠার হয়তো সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল। সবুজ পৃথিবীতে মাত্র তাদের জীবনের শুরু হয়েছিল—কিন্তু শুরু হতে না হতেই যেন জীবন সাঙ্গ করে দেওয়া হলো। অথচ অন্যদিকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে জরাজীর্ণ অথর্ব এমন

কত মানুষকে; কষ্টের অনুভূতি ছাড়া যাদের আর কোনো অনুভূতি নেই। বেঁচে থাকার অর্থই যারা আর বোঝে না—কেনই বা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হয়!

আরও প্রশ্ন জাগে–

একজন জ্ঞানী বুদ্ধিমান মুমিন ব্যক্তিকে ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে আপতিত হতে হয়, অন্যদিকে কত অবাধ্য ফাসেক-কাফেরকে অঢেল সম্পত্তি প্রদান করা হয়। কী এর রহস্য!

এমন আরও অনেক বিষয় আছে, যেগুলোর রহস্য উদ্ঘাটনে আকল বা বুদ্ধিবিবেক কোনো কিনারা খুঁজে পায় না। হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।

তবুও আমি আপাত যুক্তিহীন এই বিষয়গুলোর মাঝেও যুক্তি খুঁজতে থাকি। কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তিও যখন এগুলোর কারণ উদ্ভাবনে অক্ষম হয়ে পড়ে—অথচ যুক্তি সকল কিছুরই কারণ খুঁজে পায়—তখন আমি যুক্তির অক্ষমতা বুঝতে পারি। আমি বুঝতে পারি, যুক্তিই সবকিছুর সমাধান নয়। আমি তখন নিঃশর্তে আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে যাই। আর এটিই আমাকে স্রষ্টার সকল হুকুম মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। উৎসাহ জোগায়।

এবার একটি উল্টো প্রশ্ন—

কখনো যদি যুক্তি-বুদ্ধিকে প্রশ্ন করা হতো, এবার তুমিই বলো দেখি, স্রষ্টার সকল সৃষ্টি ও কর্মের রহস্য যেহেতু তোমার জানা, স্রষ্টা যে এভাবে সুন্দর করে সৃষ্টি করে আবার ধ্বংস করে ফেলেন, এর জন্য তার ওপর কোনো মন্দ আসে কি না?

যুক্তি-বুদ্ধি নিশ্চয় উত্তর দিত, বহু বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে আমি যেহেতু আগেই জেনে গিয়েছি, তিনি বড় জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান এবং আমি তার জ্ঞান বা প্রজ্ঞার রহস্য অনুধাবনে অক্ষম। সুতরাং আমার অক্ষমতা স্বীকার করে আমি তার সবকিছু নতশিরে মেনে নিয়েছি।

বিয়ে নিয়ে কিছু কথা

আমি একবার বিয়ের উপকারিতা, অর্থময়তা ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করলাম। দেখতে পেলাম, এর আসল ও সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো বংশ রক্ষা করা, জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। কারণ, প্রতিনিয়ত পৃথিবী থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী বিলীন হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-খাবার বিলুপ্ত হচ্ছে। আরও এমন অনেক মৌলিক জিনিস বা বস্তু বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যেগুলো পৃথিবীতে তাদের প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছে না কিংবা রেখে যেতে পারছে না। যেহেতু সবকিছুই পৃথিবীতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এদিকে পৃথিবীর বয়সও দীর্ঘায়িত করা উদ্দেশ্য, সুতরাং প্রতিনিয়ত এখানে আসল থেকে তার প্রতিনিধি রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মানুষ জন্মের বিষয়টি যেহেতু কিছুটা লজ্জাকেন্দ্রিক উন্মোচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেখানে নিজের একান্ত অঙ্গের উন্মোচন করতে হয়, অন্যের সাথে মিলিত হতে হয়। সুরুচিবোধসম্পন্ন মানুষ লজ্জাবোধ করার কারণে বিবাহোত্তর এই প্রক্রিয়াটা হয়তো পছন্দ করত না। এ কারণে স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের মাঝে কামভাব বা যৌনচেতনা ও উত্তেজনা প্রদান করা হয়েছে। এর আকর্ষণে এখন মানুষ সকল লজ্জা-নিরাগকে জয় করে নিজেই উন্মোচন ও মিলনের প্রতি আবেগি হয়ে ওঠে। এবং পৃথিবীতে এভাবেই বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়াটি বহাল থাকে।

এটিই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য।

তবে এই মৌলিক উদ্দেশ্য ছাড়াও আরও কিছু উপকারী বিষয় এতে অর্জিত হয়। তার মধ্যে প্রধান একটি বিষয় হলো, মানুষের শরীর থেকে সেই পিচ্ছিল পানীয় নির্গত হয়ে যায়, যার আবদ্ধতা মানুষকে কষ্ট দেয়। পদার্থটিকে মনি বা বীর্য বলে। মানবশরীরের পরিপাকযন্ত্রের প্রক্রিয়ার চতুর্থ ধাপে এসে এটি মনিতে রূপান্তরিত হয়। প্রথমে খাদ্য, এরপর নির্যাস। এরপর রক্ত, তারপর মনি।

মানবশরীরে যখন মনির উপস্থিতি বেড়ে যায়, তখন তার মাঝে প্রস্রাব আবদ্ধতার মতো এক ধরনের কষ্ট ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। বরং বলা যায়, এটি প্রস্রাব আবদ্ধতার চেয়েও অনেক কষ্টের। কারণ, এর অধিক উপস্থিতি

এবং দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা অনেক কঠিন রোগের সৃষ্টি করে। কারণ, এটির তপ্ততীব্রতা মস্তিষ্কে গিয়ে আঘাত করে। ভীষণ কষ্ট দেয়। কখনো এটি শরীরে ভীষণ বিষক্রিয়ারও সৃষ্টি করতে পারে।

কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানবশরীরের চাহিদাই হলো, মনির উপস্থিতি বৃদ্ধি পেলে সেটি বের হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠা। তবে কারও যদি শরীর অসুস্থ থাকে কিংবা মানসিক বিকৃতি থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে এই চাহিদা নাও হতে পারে। কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক শরীরে এমনটি হবেই। বলা হয়ে থাকে, একটি স্বাভাবিক সুস্থ শরীরে যদি দীর্ঘদিন মনি আটকে রাখা হয়, এটি বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। অনেক রকম কুচিন্তা বা কল্পনার সৃষ্টি করে। প্রেম, ভালোবাসা বা শারীরিক আসক্তি ছাড়াও এটি আরও অনেক ভয়াবহ বিপদ ও লাঞ্ছনার মধ্যে ঠেলে দেয়।

একটি স্বাভাবিক সুস্থ মেজাজের মানবশরীর থেকে একটি উত্তেজনা ও অস্থিরতার পর এটি পর্যায়ক্রমে শরীর থেকে বের হতেই থাকে। এর থেকে নিবৃত্তি নেই। এটা যেন সেই ভক্ষণকারীর মতো, যার তৃপ্তি যেন মেটেই না।

সুতরাং এর সুস্থ ও সুন্দর সমাধান হলো বিয়ে করা। কেউ যদি তার চেহারার অসৌন্দর্যের কারণে, দারিদ্র্যের কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিয়ে করতে না পারে, তবুও তার শরীর থেকে যেকোনো প্রক্রিয়ায় এগুলোর কিছুটা নির্গত হয়; কিন্তু বেশিরভাগই শরীরে অবশিষ্ট থেকে যায়। কারণ, বিয়ে বা সহবাসহীন কোনো পদ্ধতিই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়। থেকে যাওয়ার পরিমাণ যদি তুমি জানতে চাও তাহলে তুমি নিজেই কাঙ্ক্ষিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে মনি নির্গত হওয়ার পরিমাণের ওপর তুলনা করে নিতে পারো। স্থান ও আনন্দের ভিন্নতার কারণে মনি নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা আসে। যেমন, দুই রানের মাঝখান আর যোনিপথে মনি নির্গমনে ভিন্নতা আসে। অকুমারী ও কুমারীর সাথে সহবাসেও ভিন্নতা হয়।

তাহলে জানা গেল, রুচিময় কাঙ্ক্ষিতা বিবাহিতার সাথে মনি নির্গত হওয়ার পরিমাণ হয় বেশি। এবং অনিবার্যভাবেই পূর্ণ নির্গমনের সাথে সাথে আনন্দ ও স্বাদও আসে পরিপূর্ণ। কখনো কখনো এটি সন্তানের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। যেমন, কোনো তরুণ-তরুণী যদি নিজেদের দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণে রাখার পর প্রবল আসক্তির সাথে মিলিত হয় তবে অন্যদের তুলনায় তাদের সন্তান

সাধারণত স্বাস্থ্যবান হয়। আর যাদের মিলন এতটা উত্তেজক, আনন্দদায়ক ও কাঙ্ক্ষিত হয় না, তাদের সন্তানের ক্ষেত্রেও অনেক সময় অবনমন দেখা যায়।

এ কারণে বৈধ নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে করাকে অপছন্দ করা হয়েছে। কারণ, অন্তর এখানে ভীষণ উত্তেজনা ও উৎফুল্লতায় ভাসে না। নতুনত্বের স্বাদ তেমন একটা প্রাপ্ত হয় না। ব্যক্তির মধ্যে কিছুটা এমন একটা কল্পনা এসে যায়, সে যেন তার নিজেরই কোনো অংশের সাথে মিলিত হচ্ছে। নিতান্তই পরিচিত। নিতান্তই জানাশোনা এবং নতুনত্বহীন।

এ কারণেই অজানা অপরিচিতাকে বিয়ে করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তখন সন্তান উৎপাদনের এই মহান লক্ষ্য—কষ্টদায়ক পদার্থটিকে শরীর বের করে দেওয়া ছাড়াও নব পরিচিতা বধূর মাধ্যমে অনেক উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সুন্দরী হলে ভালো হয়। কারণ, কুৎসিত চেহারা হলে সাধারণত প্রবৃত্তির সকল কিছু অর্জিত হয় না। উদ্যম-উৎফুল্লতাও আসে কম।

ধরা যাক একজন ভক্ষণকারী—গোশত ও রুটিতে যে তার পেট ভর্তি করে ফেলেছে—আরেকটি লোকমাও মুখে দেওয়ার সাধ্য তার নেই। ঠিক এই অবস্থাতেও যদি তার সামনে হালুয়া বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে আবার নতুন করে হাত বাড়াবে। এরপর যদি এরচেয়েও অতি আশ্চর্যরকম ভিন্ন কিছু তার দিকে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে সে আবারও হাত বাড়াবে। কারণ, নতুনত্বের আকর্ষণই আলাদা। তার মোহকে অগ্রাহ্য করা সহজ কথা নয়। এ কারণে মানুষের প্রবৃত্তি খুব পরিচিত বিষয়ের দিকে তেমন একটা কৌতূহলী ও আকর্ষিত হয় না। সে চায় নতুন কিছু। অপরিচিত কিছু। সে যেন নতুনত্ব ও অজানা রহস্যের মধ্যেই নিজের বাসনা পূরণের স্বপ্ন দেখে।

কিন্তু যখন সে নিজের প্রাপ্তির মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূরণ হতে দেখে না তখন সে আরেক নতুনত্বের দিকে ধাবিত হয়। সে যেন ধরেই নিয়েছে, কোনো ধরনের ত্রুটি ও খুঁত ছাড়াই পূর্ণভাবে তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। সে এখনো যা পেয়ে ওঠেনি, তারই স্বপ্ন সে এখনো দেখে ফেরে।

ঠিক মানুষের এই মনোপ্রবৃত্তিটিই তার পুনর্জীবনের ওপর একটি গোপন দলিল। কারণ, মানুষ তার কল্পনার রাজ্যে কোনো ধরনের খুঁত বা অপূর্ণতা রাখতে চায় না। যখনই মানুষ দুনিয়ার যাপিত জিনিসের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পায় তখনই সে অন্য কোনো নতুনত্বে খুঁজে ফেরে খুঁতহীন বাসনা পূরণের স্বপ্ন।

এ কারণে পণ্ডিতরা বলেন, ভালোবাসার অপর নাম হলো প্রিয়জনের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অন্ধ হয়ে যাওয়া। দোষ-ত্রুটির পেছনে পড়লেই মুশকিল; ভালোবাসা উধাও হয়ে যাবে। তাছাড়া অন্যের দোষ-ত্রুটি সামনে এলে নিজের দোষগুলো নিয়েও চিন্তা করা উচিত। এটাই শান্তিতে থাকার একমাত্র পথ।

স্ত্রীদেরও উচিত, স্বামীদের থেকে এমন বেশি দূরে দূরে থাকবে না যে, স্বামী তাকে ভুলে যাওয়ার অবসর পায়। আবার সর্বক্ষণ তার এত বেশি কাছে কাছেও থাকবে না যে, তার সঙ্গ স্বামীর জন্য বিরক্তিকর ওঠে। স্বামীর জন্যও একই কর্তব্য। সে যেন তার সার্বক্ষণিক সঙ্গ দ্বারা স্ত্রীকে বিরক্ত করে না ফেলে কিংবা সার্বক্ষণিক অবস্থানের কারণে স্ত্রীর সকল রহস্য ও মানবিক ত্রুটিগুলো তার কাছে যেন প্রকাশিত না হয়ে পড়ে। কিছুটা রহস্য রেখে দেওয়া উচিত।

এভাবে পুরুষের জন্য উচিত নয়, স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। এবং সে চেষ্টা করবে, স্ত্রীর থেকে সব সময় যেন সুঘ্রাণ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীও চেষ্টা করবে নিজের কোনো অপ্রীতিকর অরুচিকর কোনো কিছু স্বামীর দৃষ্টিতে যেন না আসে। স্বামী যেন তার থেকে কোনো দুর্গন্ধ না পায়।

এ ধরনের আরও বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, যেগুলো বুঝমান নারীগণ কারও শেখানো ছাড়াই তার সহজাত বুদ্ধির মাধ্যমে জেনে যায় এবং সেগুলো মেনে চলে। কিন্তু মূর্খ বোকা মেয়েরা এগুলোর দিকে তেমন দৃষ্টি দেয় না কিংবা খেয়ালই করে না। পরিণামে স্বামীরা তাদের থেকে খুব দ্রুতই আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।

যে ব্যক্তি ভালো সন্তান চায় এবং বৈবাহিক জীবনে নিজের বাসনা পূরণ করতে চায়, সে যেন নিজেই স্ত্রী নির্বাচন করে নেয়। মেয়ে দেখতে গিয়ে পূর্ণভাবে তাকিয়ে দেখে নেবে। প্রথম দৃষ্টিতেই যদি তার অন্তরে একটি প্রীতির জায়গা তৈরি হয় তাহলে তাকেই বিয়ে করে নেবে। এবং এই দেখার সময় সে তার অন্তরের দিকে দৃষ্টি রাখবে। দেখবে, অন্তরের কী অবস্থা। সেখানে ভালোবাসার সৃষ্টি হচ্ছে কি না—বোঝার চেষ্টা করবে। হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার আলামত হলো, মেয়েটি থেকে তার চোখ যেন সরতেই চাইবে না। আরও দেখতে মন চায়। হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। আর

দৃষ্টি সরাতেই অন্তরের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন বুঝতে হবে, এই হলো তার কাঙ্ক্ষিতা সঙ্গিনী।

এছাড়াও অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ব্যাপার থাকে, যেগুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয়।

যদি দেখার মজলিসে দেখা ও কথা বলার সুযোগ হয় তাহলে কিছুটা কথা বলা উচিত। নারীর সৌন্দর্য আসলে তার মুখে ও চোখে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, পুরুষ যে মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক, তার জন্য নারীর সতর দেখা জায়েয রয়েছে। সতর বলতে চেহারা, হাত-পা ইত্যাদি।

মেয়ে তো দেখা হলো, কিন্তু বিবাহ কখন করা উচিত? এ ক্ষেত্রে আমার মত হলো, পুরুষের জন্য যথাসম্ভব বিয়েকে একটু বিলম্ব করা ভালো; যাতে ইলমের পথে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রয়োজন বেশি দেখা দিলে অগ্রসর হতে পারে। এবং মেয়ে দেখার সময় সে তার অন্তরের ঝোঁক বোঝার চেষ্টা করবে। বুঝমান যে-কেউ একটি নতুন বিষয়ের প্রতি হৃদয়ের এই ঝোঁকটা খুব সহজেই অনুভব করতে পারে। একজন মেয়েও সম্ভাব্য হবু স্বামীর প্রতি ভালোবাসার ঝোঁক টের পায়। যখন অন্তরে ভালোবাসার নড়াচড়া অনুভব করবে তখন সে সামনে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করবে।

হজরত আতা আল-খুরাসানি রহ.[৩৭] বর্ণনা করেছেন,

> مكتوب في التوراة كل تزويج على غير هوى حسرة وندامة إلى يوم القيامة.
>
> তাওরাতের মধ্যে লিখিত ছিল, ভালোবাসার আকর্ষণ ব্যতীত যত বিবাহ হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত সেগুলো আফসোস ও অনুশোচনার কারণ হবে।

---

৩৭. পুরো নাম: আতা ইবনে আবি মুসলিম। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ওয়ায়েজ। দামেস্ক এবং ফিলিস্তিনে বসবাস করতেন। তিনি আবু দারদা, ইবনে আব্বাস, মুগিরা... থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবং ইবনে মুসাইয়েব, উরওয়া ও আতা ইবনে রবাহ...প্রমুখ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৩৫ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। سير أعلام النبلاء : ৬/১৪০।

শোভা-সৌন্দর্য দেখা শেষ—

এবার মেয়েটির আখলাক-চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দেবে। আর এটিই হলো বিয়ের ক্ষেত্রে আসল ধর্তব্য। এটিই স্থায়ী ও কল্যাণকর। নতুবা শুধু সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করা হলে নারীটি যখন তার শোভা-সৌন্দর্য ও লাবণ্য হারাবে তখন তা যেন স্খলিত আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সন্তানের ক্ষেত্রে বংশের আভিজাত্যও একটি প্রধান উদ্দেশ্য। তাই অন্তরের আকর্ষণ ও ঝোঁক বোঝার পর আসল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ মেয়ের আখলাক-চরিত্রের দিকে দৃষ্টি প্রদান করা উচিত। খোঁজ-খবর নেওয়া প্রয়োজন।

হাদিসে এসেছে–

لا يقضى القاضى بين إثنين وهو غضبان.

কাজি (বিচারক) রাগান্বিত অবস্থায় দুজনের মাঝে ফয়সালা করবে না।[৩৮]

অর্থাৎ কম গুরুত্বপূর্ণ রাগ আগে প্রশমিত করা হবে, এরপর প্রধান কাজ বিচারের দিকে ধাবিত হতে হবে।

অন্য হাদিসে এসেছে–

وإذا وضع العشاء و حضرت العشاء فابدأوا بالعشاء.

যখন ইশার সময় হয়ে গেল, আবার এদিকে রাতের খাবারও হাজির হয়ে গেল তাহলে তোমরা রাতের খাবারই আগে খেয়ে নাও।[৩৯]

অর্থাৎ কম গুরুত্বের ঝামেলা মিটিয়ে তারপর আসল কাজে অগ্রসর হও।

কোনো পুরুষ যদি এমন মেয়ে পায়, যে দেখতেও সুন্দর, যার স্বভাব-চরিত্রও ভালো তাহলে আর কোনো দোষ-ত্রুটি বা অসুবিধার দিকে না তাকানোই উচিত। মানবিক কিছু দোষ-ত্রুটি সকলেরই থাকে। এটা থেকে কেউ-ই মুক্ত নয়। তবে নিজেরটা নিজের চোখে ততটা ধরা পড়ে না, অন্যেরটা যেমন

---

[৩৮]. ইমাম বোখারি রহ. হাদিসটি 'কিতাবুল আহকাম' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন– ফাতহুল বারি: ১৩/৭১৫৮। এবং ইমাম মুসলিম রহ. 'কিতাবুল আকযিয়া' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন– ৩/১৬/১৩৪২, ১৩৪৩।

[৩৯]. হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. 'কিতাবুল আতইমা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন– ফাতহুল বারি: ৯/৫৪৬৩। এবং ইমাম মুসলিম রহ. 'কিতাবুল মাসাজিদ' অধ্যায়ে হজরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর শব্দে এটি উল্লেখ করেছেন– ১/৬৪/৩৯২।

পড়ে। এ সত্ত্বেও বিয়ের পর স্ত্রীও চেষ্টা করবে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে। বেশি বেশি সান্নিধ্যে বিরক্তও করে তুলবে না, আবার বেশি দূরত্ব সৃষ্টি করে নিজেকে ভুলিয়েও দেবে না। সে স্বামীর সাথে এমন আচরণ করবে; যাতে স্বামীর চাহিদা পূরণ হয়ে যায়। যেমন, সন্তান এবং জৈবিক বাসনা। তবে খুবই সতর্কতার সাথে, কৌশল ও চাতুর্যের সাথে এমনভাবে সঙ্গ দেবে, যেমনটা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি; যাতে স্বামী তাকে নিয়ে তৃপ্ত থাকে, অন্য কোনো দিকে মন না যায়।

তবে কোনো পুরুষ যদি বোঝে, একাধিক বিয়ের মাধ্যমেই শুধু তার কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূরণ হবে, তাকে বিভিন্ন অস্থিরতা থেকে মুক্ত রাখবে এবং একাধিক বিয়ের সকল শর্ত পূরণেও সে সক্ষম তাহলে তার একাধিক বিয়ে করাটাই উত্তম।

আর যদি সে আত্মসম্মানবোধের ভয় করে কিংবা অধিক সুন্দরীর ক্ষেত্রে যদি তার ভয় হয়, নারীটি তার অন্তরকে আখেরাতের স্মরণ থেকে বিমুখ করবে অথবা তার থেকে এমন বিষয় চাহিদা করবে, যা তাকে তাকওয়ার পথ থেকে সরিয়ে দেবে তাহলে সে নিজের জন্য বর্তমান স্ত্রীকেই যথেষ্ট মনে করবে।

আমি এতক্ষণ যে নসিহতগুলো করলাম, তার মধ্যে এটিও একটি—পুরুষ অন্যান্য সুন্দরী নারীদের থেকে নিজেকে সব সময় দূরে রাখবে।

তবে স্বামী যদি স্ত্রী থেকে কাঙ্ক্ষিত সন্তুষ্টির কিছু প্রাপ্ত না হয়, তবে দ্রুতই স্ত্রী পরিবর্তন করে নেবে। কারণ, এটাই হবে শান্তিদায়ক। আর সে যদি একজন স্ত্রীর ওপর সীমিত থাকতে সক্ষম হয় তবে সেটাই ভালো। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সাধিত হলে একজন স্ত্রীতেই পরিতৃপ্ত থাকবে।

তবে ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক পুরুষ ছিলেন, যারা একসাথে একাধিক স্ত্রী রেখেছেন। মেয়েরাও ধৈর্যধারণ করেছেন এবং মেনে নিয়েছেন। হজরত দাউদ আলাইহিস সালামের এক শ স্ত্রী ছিল। হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের ছিল একহাজার স্ত্রী। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একাধিক স্ত্রী ছিল। এবং তাঁর সাহাবাদের কথাও আমরা জানি, তাঁদের অনেকেরই ছিল একাধিক স্ত্রী। তবে উম্মতের জন্য অবশ্যই একসঙ্গে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা জায়েয নয়। পরবর্তী যুগেও একাধিক স্ত্রীর উদাহরণ ছিল এবং এখনো আছে। প্রয়োজন আছে বলেই আছে।

এসকল ব্যাপারে এখানে আরও দীর্ঘ আলোচনা হতে পারত। কিন্তু আমি অল্প কথার মধ্যেই এখানে কিছু ইঙ্গিত করে গেলাম। এগুলো বুঝলে এবং সে মতে কাজ করলে একটি সফল জীবনযাপন করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

শাস্তি ও পুরস্কার

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পার্থিব জগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, এর প্রত্যেকটির প্রতিরূপ রয়েছে আখেরাতে। এবং আখেরাতে যা ঘটবে, দুনিয়ার ঘটনাবলি তারই কিছু নমুনা। অবশ্য ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء.

শুধু নাম ব্যতীত জান্নাতের কোনো কিছুই দুনিয়ার মতো হবে না।[৪০]

তবে সাদৃশ্য থাকবেই। এবং এই সাদৃশ্যের কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা মানুষদের দুনিয়ার নিয়ামত দেখিয়ে আখেরাতের নিয়ামতের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন। একইভাবে দুনিয়ার শাস্তি দেখিয়ে আখেরাতের শাস্তি থেকেও সতর্ক করেন।

তাহলে এখন দেখি দুনিয়াতে কী ঘটে?

প্রত্যেক জালেমকেই আখেরাতের শাস্তির আগে দুনিয়াতেও নগদ কিছু শাস্তি প্রদান করা হয়। প্রত্যেক পাপীরও তাৎক্ষণিক কিছু শাস্তি প্রদত্ত হয়। আর এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার এই কথাটির বাস্তবায়ন–

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾

যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করবে, তাকে অবশ্যই তার প্রতিদান দেওয়া হবে। [সুরা নিসা : ১২৩]

কিন্তু মানুষ অনেক সময় তার এই শাস্তির কথা বুঝতে পারে না। পাপী দেখছে তার দেহ সুস্থ, তার রয়েছে অঢেল সম্পদ। সে ভাবছে, তার তো

---

[৪০]. কথাটি হজরত ইবনে কাসির রহ. তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেছেন– ১/৯১। এবং তিনি বলেন, এটা ইবনে জারির রহ. বর্ণনা করেছেন। তাফসিরে ইবনে জারির– ১/৩৬৯/৫৩৪, ৫৩৫।

কোনো শাস্তি হয়নি বা হচ্ছে না। আসলে তার শান্তিটাই তাকে তার শাস্তি সম্পর্কে উদাসীন করে রেখেছে। এটাই তার শাস্তি।

এ কারণে জনৈক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেন,

المعصية عقاب المعصية، والحسنة بعد الحسنة ثواب الحسنة.

> গোনাহের শাস্তিই হলো আরেকটি গোনাহ করা... এবং সওয়াবের প্রতিদানই হলো আরেকটি সওয়াব অর্জন করতে পারা।

অবশ্য কখনো কখনো দুনিয়ার এই শাস্তিটা হয়ে থাকে অভ্যন্তরীণ; বাহ্যদৃষ্টির আড়াল। যেমন, বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করা হয়—একবার বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলল,

يا رب، كم أعصيك ولا تعاقبني.

> হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার কত অবাধ্যতা করি, কিন্তু তুমি তো আমাকে কোনো শাস্তি দাও না।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে বলা হলো,

كم أعاقبك وأنت لا تدرى، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟

> আমি তোমাকে কত শাস্তি প্রদান করি, কিন্তু তুমি তো তা বুঝতে পারো না। আমি কি আমার জন্য তোমার সেই নির্জন ইবাদতের মিষ্টতা ও আস্বাদন তোমার থেকে উঠিয়ে নিইনি?

যে ব্যক্তি আল্লাহর এ ধরনের শাস্তির কথা চিন্তা করে সতর্ক থাকে, সে-ই কেবল সফলকাম হতে পারে। কারণ, এ ধরনের শাস্তি তো খুবই ভয়াবহ একটি ব্যাপার। কিন্তু অনেকেই সেটা বুঝতে পারে না।

গোনাহের ওপর গোপন এই শাস্তি খুবই মারাত্মক। এমনকি ওহাব ইবনে ওরদ রহ.[৪১], বলেন, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি গোনাহে লিপ্ত থাকে, সে কি ইবাদতের স্বাদ অনুভব করতে পারে?

---

[৪১]. পুরো নাম: আবু উসমান বা আবু উমাইয়া ওহিব ইবনে উরদ আলমাক্কী। কেউ বলেন, তার নাম আসলে আবদুল ওয়াহহাব। তিনি ছিলেন একজন 'ছিকা' বা হাদিসের ক্ষেত্রে একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি।

তিনি বলেন, কিছুতেই না। এমনকি যে গোনাহের প্রতি শুধু আগ্রহ রাখে, বাস্তবে করে না, সে ব্যক্তিও ইবাদতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে।

যেমন, কোনো ব্যক্তি হয়তো চোখের হেফাজত করে না, আল্লাহ তাআলা তাকে দৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করেন। কেউ হয়তো জবানের হেফাজত করে না, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের নির্মলতা দূর করে দেন। হয়তো কেউ হারাম বা সন্দেহপূর্ণ খানা ভক্ষণ করে, আল্লাহ তাআলা তার অভ্যন্তরকে অন্ধকার করে দেন। তাকে বঞ্চিত করেন রাতের নির্জন নামাজ থেকে, একান্ত মোনাজাত থেকে, ইবাদতের স্বাদ থেকে, এমনিভাবে আরও অনেক বিষয় থেকে।

এটা হলো এমন এক অন্তরগত বিষয়, যারা প্রতিদিন নফসের হিসাব-নিকাশ করে, তারা নিজেদের মাঝে এই তারতম্য বুঝতে পারে। আর অন্যরা থাকে এর থেকে গাফেল।

আর ঠিক এর বিপরীত অবস্থা হলো, যারা তাকওয়া অর্জন করে, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ তাদেরকেও তার তাকওয়ার কারণে তাৎক্ষণিক পুরস্কার প্রদান করেন। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, হজরত আবু উমামা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

> النظرة إلى المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من تركه ابتغاء مرضاتي آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه
>
> কোনো বেগানা নারীর দিকে দৃষ্টিপাত শয়তানের তিরগুলোর মধ্যে একটি বিষাক্ত তির। যে ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টির জন্য এটাকে বর্জন করবে, আমি তাকে এমন ঈমান প্রদান করব, যার মিষ্টতা সে তার অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারবে।[৪২]

খুব ইবাদতগুজার। তিনি ১৫৩ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। سير أعلام النبلاء : ৭/১৯৮ এবং طبقات ابن سعد : ৫/৪৪৮।

[৪২]. মুসতাদরাকে হাকেম: ৪/৩১৪। হাদিসটি হজরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম গাজালি রহ. এটি তাঁর গ্রন্থ 'ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন'এ উল্লেখ করেছেন– ১/৩৬৫। সনদ সহিহ। তবে কিছু কিছু সূত্রে এর রাবীর মধ্যে দুর্বলতা আছে।

উদাসীন ব্যক্তিদের সতর্কতার উদ্দেশ্যে এ ব্যাপারে এখানে অল্প কিছু আলোচনা উপস্থাপিত হলো। তাছাড়া গোনাহের স্পষ্ট শাস্তির কথাও হাদিসে এত বেশি বর্ণনা এসেছে যে, তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না।

যেমন হাদিসে এসেছে—

وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه.

বান্দার কৃত পাপ, তার রিজিককে কমিয়ে দেয়।[৪৩]

বুঝমান ব্যক্তিরা যখন এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন তখন তারা এর প্রতিদান ও প্রতিফল বুঝতে পারেন। যেমন, ফুজাইল রহ. বলেন, 'আমি কখনো আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হলে তা আমি আমার বাহন ও দাসীর আচরণ দ্বারা টের পাই। তাদের আচরণও বিগড়ে যায়।'

আবু উসমান নিশাপুরী রহ.[৪৪] থেকে বর্ণিত আছে, মসজিদে যাবার পথে একবার তার পায়ের জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেল। এটা ঠিক করতে তাকে কিছুক্ষণ বিলম্ব করতে হলো। এরপর তিনি বললেন, 'আসলে আজকে আমি জুমার দিনের গোসল করিনি। এ কারণেই আমার জুতার ফিতা ছিঁড়েছে।'

দুনিয়াতে তাৎক্ষণিক প্রতিদানের এক উজ্জ্বল ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত হলো হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা। তারা তাদের যে হাত ইউসুফের প্রতি জুলুমের জন্য প্রসারিত করেছিল, একদিন তাদের সেই হাতই ইউসুফের দিকে প্রার্থনার জন্য বাড়িয়ে বলতে হয়েছিল– وتصدق علينا –আমাদের কিছু দান করুন।

---

[৪৩]. হাদিসটি 'মুসনাদে আহমদ' এ বর্ণিত হয়েছে– ১/৭৩/৫৩০। 'সুনানে ইবনে মাজা'তেও বর্ণিত হয়েছে–২/৪০২২। আহমদ শাকের বলেন, হাদিসটি দুর্বল। পুরো হাদিসটি এমন–

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ.

মুসনাদে আহমদ: ৪৫/২১৪০২, পৃষ্ঠা: ৪১৭– মা. শামেলা।

[৪৪]. তার পুরো নাম: আবু উসমান সাইদ ইবনে ইসমাইল ইবনে নিসাপুরী। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ইমাম মুহাদ্দিস ও বক্তা। তিনি ছিলেন 'মুত্তাজাবুত দাওয়াত'। আবেদ ও জাহেদদের তিনি ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু। তিনি ২৯৮ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। سير أعلام النبلاء : ১৪/৬২-৬৬।

যে জুলাইখা মিথ্যাভাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল, আল্লাহ আবার তার মুখ দিয়েই বলিয়েছেন– أنا راودته – আমিই আসলে ইউসুফকে ফুসলিয়েছিলাম।

একইভাবে সুন্দর কাজের প্রতিদানও তাৎক্ষণিক দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। যেমন, হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন জুলায়খার সেই পরীক্ষার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলেন, পরিণামে আল্লাহ তাআলা একসময় হালালভাবেই তাকে তার আয়ত্তে এনে দিলেন।

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার জন্য কেউ যদি কোনো পাপকর্ম বর্জন করে, অবশ্যই সে তার সুন্দর প্রতিফল দেখতে পাবে। আবার কেউ যদি কোনো সওয়াব বা ভালো কাজ করে, তার প্রতিফলও সে প্রাপ্ত হবে।

এ কারণে আমাদের সকল কাজেই সতর্ক থাকা চাই। কারণ, আমরা এমন অনেক মানুষকেই দেখি, সাময়িক আনন্দ-উল্লাসের জন্য হয়তো কোনো শরিয়তবিরোধী কোনো কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে গিয়েছে; কিন্তু আচমকাই তার সকল ব্যবস্থা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। তখন তার অবস্থাই গেছে পাল্টে। মরে গেছে কিংবা চিরদিনের জন্য অথর্ব অসম্মানী কিংবা নিঃস্ব হয়ে গেছে।

এক শাইখের ঘটনা। তিনি বলেন, একবার আমি আমার যৌবনকালে একটি দাসী ক্রয় করেছিলাম। তার প্রতি খুবই আসক্ত হয়ে পড়ছিলাম। ক্রয়ের পর আমি ফিকাহবিদকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি এখন তার সাথে মিলিত হতে পারব?

তারা বললেন, না, একবার ঋতুস্রাব না হওয়ার আগে আপনি তার সাথে মিলিত হতে পারবেন না। এমনকি তার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকাতেও পারবেন না, স্পর্শও করতে পারবেন না।

এরপর কিছুদিন যাওয়ার পর দাসীটি জানাল, তাকে যখন আমি ক্রয় করি তখনই সে ঋতুমতী অবস্থায় ছিল। আমি ভাবলাম, তাহলে বুঝি এখন সময় হয়ে গেছে। আমি আবার এটার কথা ফিকাহবিদদের জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বললেন, সময় তো আরও দূরবর্তী হয়ে গেল। পুনরায় আপনার মালিকানায়

ঋতুস্রাব হয়ে তা থেকে পবিত্র হতে হবে। এখনো আপনি আগের মতোই সবকিছু থেকে বিরত থাকবেন।'

তাদের কথায় কষ্টে আমার অন্তর চৌচির হয়ে যেতে লাগল। জৈবিক চাহিদা যেন আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল। হাতের কাছেই এমন সুন্দরী মেয়েটি; অথচ...। আমি একদিন দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ অবস্থায় কী করা যায়?

দাসীটি বলল, কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করাই হলো ঈমান। এখন আপনি মেনেও চলতে পারেন কিংবা অস্বীকারও করতে পারেন। আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন?

দাসীটির কথায় আমার চক্ষু খুলে গেল। অন্তর প্রসারিত হলো। আমি আল্লাহর জন্য জান-প্রাণ বেঁধে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করলাম। এবং এভাবে কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণের কারণে পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা আমাকে জীবনে এত এত প্রতিদান দিলেন! আহা, আমি বলে শেষ করতে পারব না! আমার জীবনটাই গেল বদলে। জীবন হয়ে উঠল আরও উচ্চ উন্নত ও সম্মানজনক।

অন্তরের একনিষ্ঠতা

আল্লাহ তাআলাই যেহেতু আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই তার অবস্থিতি কিংবা সত্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ বা সংশয় থাকতে পারে না। তবুও কিছু মানুষ অস্বীকার করে। আল্লাহ নিজেই তাই তার সত্যতার ব্যাপারে কোরআনে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আমিও একবার আল্লাহর সত্যতার প্রমাণ নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করলাম। দেখলাম, এ ক্ষেত্রে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিস্ময়কর ও সহজ প্রমাণ হলো, কখনো কখনো মানুষ এমন কাজ-কর্ম গোপন করে, যার প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট নন। অনেকদিন পরে হলেও আল্লাহ তাআলা সেটাকে প্রকাশ করে দেন। মানুষ এটা নিয়ে কথা বলতে থাকে, অথচ তারা এটা দেখেনি।

কখনো গোপন গোনাহকারী ব্যক্তি এমন বিপদের মধ্যে পড়ে যে, মানুষের সামনে তার সকল পাপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সে এতদিন ধরে যে গোনাহগুলো করে আসছিল, এই হলো তার দুনিয়ার প্রতিদান। আল্লাহ কেন

এমনটি করেন? তিনি এমনটি করেন, যেন মানুষ বুঝতে পারে, অবশ্যই এমন একজন সত্তা রয়েছেন, যিনি মানুষের পদস্খলনের প্রতিদান দেন। তিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন। তার ক্ষমতা ও নির্বাচনের কাছে কোনো গোপনীয়তা ও পর্দা নেই। মানুষের কোনো কর্মই তার নিকট অবিদিত নয়।

এমনিভাবে মানুষ কখনো কখনো তার ইবাদত-আনুগত্যকেও মানুষের থেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষকে জানতে দিতে চায় না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষের সামনে একদিন এগুলোও প্রকাশ করে দেন। মানুষ তার আমলগুলোর কথা আলোচনা করতে থাকে। তার প্রচারে রত হয়। এমনকি আমল যতটা নয়; তার চেয়েও বেশি বলতে থাকে। মানুষ যেন তার কোনো খারাবির কথাই জানে না। তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া কিছুই বলে না। আল্লাহ এটা কেন করেন? যেন মানুষ জানে, নিশ্চয় একজন প্রতিপালক রয়েছেন, যার নিকট কোনো আমলকারীর আমলই বিফলে যায় না।

এভাবে মানুষ যখন কারও প্রকৃত অবস্থা জেনে যায় তখন হয়তো কাউকে ভালোবাসে এবং প্রশংসা করে এবং কাউকে ঘৃণা করে ও বদনাম করে। সবই হয়ে থাকে আল্লাহ ও তার মাঝের সম্পর্ক অনুযায়ী। এরপর আল্লাহ তাআলা তার জন্য যথেষ্ট হন, সকল কষ্ট দূর করেন। সকল খারাবি থেকে মুক্ত রাখেন।

আর যে ব্যক্তি সত্যের দিকে লক্ষ না করে মানুষের সাথে নিজের সম্পর্ক ভালো করতে চায়, পরিণামে তার উদ্দেশ্য উল্টে যায়। তার প্রশংসাকারীও একসময় তার নিন্দায় অংশ নেয়। সে স্রষ্টাকে অসন্তুষ্ট করে সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল; কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয় না। একসময় সৃষ্টিও তার বিপক্ষে চলে যায়। তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে।

ভালো এবং মন্দ

পৃথিবী এবং তার ওপর যারা রয়েছে, তাদের ব্যাপারে একবার চিন্তার দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম। মনে হলো, পৃথিবীর বয়সের চেয়েও তার অবস্থা বড় ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তারপর এখানকার বসবাসকারীদের দিকে দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম, জগতের প্রায় সকল জায়গা কাফেররা দখল করে আছে। এরপর দৃষ্টি দিলাম মুসলমানদের দিকে। দেখলাম, কাফেরদের তুলনায় পৃথিবীতে তাদের সংখ্যা অনেক কম।

এরপর শুধু মুসলমানদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করলাম। দেখলাম, বিভিন্ন পেশা ও কাজ-কর্ম তাদের অধিকাংশকে রিজিকদাতা আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তার সম্পর্কে ইলম অর্জন করা থেকেও তাদেরকে বিরত রেখেছে। আর রাজ-বাদশাহরা রয়েছে কর্মচারীদের আদেশ-নিষেধ ও নিজেদের আরাম-আয়েশ নিয়ে। তাদের মাঝে অঢেল টাকা-সম্পদের প্রবাহধারা জারি রয়েছে; কিন্তু এগুলোর কোনো শুকরিয়া নেই। কেউ তাদেরকে আজ আর উপদেশ দিতে আসে না। বরং সকলেই নির্বিচারে তাদের প্রশংসা আর চাটুকারিতা চালিয়ে যাচ্ছে, যা তাদের বন্ধনহীন নফসকে আরও লাগামছাড়া করে তুলছে। অথচ নফসের এসকল রোগ খুব শক্তহাতে প্রতিহত করার দরকার ছিল। যেমন, আমর ইবনে মুহাজির রহ. বলেন, আমাকে একবার উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. বললেন,

إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ بثيابي و هزني، وقل ما لك يا عمر؟

> আপনি যদি দেখেন আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি তাহলে তখন আমার জামার প্রান্ত চেপে ধরবেন এবং ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে বলবেন, হে উমর, এ তোমার কী হলো? ভুল করলে কেন?

এছাড়া উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেছেন,

رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا.

> আল্লাহ তার প্রতি দয়া বর্ষণ করুন, যে আমাদেরকে আমাদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জানিয়ে দেয়।

সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপদেশ ও নসিহত দরকার হলো রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের জন্য। কিন্তু অহংকারের ঘোড়ায় সাওয়ার হয়ে তারাই আজকে সবচেয়ে কম উপদেশ গ্রহণ করে।

আর এদিকে মুসলিম রাজা-বাদশাহর সেনাবাহিনীর অবস্থা কেমন? তাদের অধিকাংশই প্রবৃত্তির নেশায় মত্ত। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যে নিমগ্ন। সাথে রয়েছে তাদের সীমাহীন অজ্ঞতা ও মূর্খতা। কোনো পাপই যেন তাদেরকে উদ্বিগ্ন করে না। কোনো পাপই যেন তাদের হাতছাড়া হয় না। রেশমি কাপড় পরিধান করে। মদ্যপানেও যেন তারা অস্বস্তি বোধ করে না। আরও আছে লোকজন থেকে অন্যায়ভাবে জিনিস-পত্র ছিনিয়ে নেওয়া। জুলুম যেন তাদের সত্তার সাথে মিশে গেছে।

আর এদিকে বেদুইন জাতি ডুবে রয়েছে পুরো অজ্ঞতার মধ্যে। গ্রামবাসীদেরও একই অবস্থা। তাদের অধিকাংশের চলাফেরা অপবিত্রতার মধ্যে। নামাজকে নষ্ট করে। শিক্ষাহীনতার মধ্যে জীবনযাপন করে।

এরপর আমি ব্যবসায়ীদের দিকে দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম, লোভ তাদেরকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করেছে। ব্যবসায় লাভ হলেই হলো, কিন্তু সেটা কীভাবে হলো, তা যেন তাদের দেখার অবসর নেই। তাদের মাঝে সুদের ছড়াছড়ি। যেভাবেই হোক দুনিয়া উপার্জন হোক—এছাড়া আর কোনো দিকে তারা ভ্রুক্ষেপ করে না। জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রেও তারা সীমাহীন গাফেল। জাকাত না দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। তবে আল্লাহ যাদেরকে এসকল খারাবি থেকে রক্ষা করেছেন, তাদের কথা ভিন্ন।

এরপর আমি সরকারি ও বিভিন্ন চাকুরিজীবীদের দিকে লক্ষ করলাম। দেখলাম, তাদের লেনদেনের মধ্যে ঘুষের ছড়াছড়ি। ঘুষ তাদের নিকট ব্যাপক এবং সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কম দেওয়া। কৃপণতা করা। আত্মসাৎ করা। অন্যকে বঞ্চিত করা। এছাড়াও তারাও আসলে মূর্খতার মধ্যে ডুবে আছে। দ্বীনি কোনো শিক্ষা নেই।

আর যাদের সন্তান-সন্ততি আছে, তারা তো রাতদিন তাদের সন্তানদের জন্য উপার্জনের পাগলামিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অথচ খেয়াল করছে না, সন্তানের জন্য তার কর্তব্য কী? কীভাবে তাকে সুন্দর ও সততার সাথে লালন-পালন করবে।

এরপর নারীদের বিষয়ে চিন্তা করে দেখলাম। দ্বীন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই অল্প। সীমাহীন মূর্খতা বিরাজ করছে তাদের মধ্যে। আর আখেরাত সম্পর্কে তাদের যেন কোনো খবরই নেই। হ্যাঁ, আল্লাহ যাদেরকে রক্ষা করেছেন, তাদের কথা ভিন্ন।

আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, হায়, এই যদি হয় অবস্থা তবে আর কারা অবশিষ্ট রইল আল্লাহ তাআলার দ্বীনের খেদমত ও তার পরিচয় জানার জন্য!

এরপর আমার দৃষ্টি নিপতিত হলো আলেম, তালিবুল ইলম, ইবাদতগুজার ও দুনিয়াত্যাগী সাধকদের দিকে।

প্রথমে ইবাদতগুজার ও সাধকদের কথা চিন্তা করলাম। দেখলাম, তাদের অধিকাংশই ইবাদত করে কোনো ইলম ছাড়া। নিজেকে অনেক বড় বুজুর্গ মনে করে। নিজেদেরকে আল্লাহর অনেক বড় ওলি মনে করে। অনেক মানুষের অনুসরণ কামনা করে। অন্যরা তার হাতে চুমো খায়। এমনকি তাদের কেউ যদি কখনো কোনো প্রয়োজনে বাজার থেকে কিছু কিনতে বাধ্য হয়, সে নিজে তা করে না। এতে যেন তার সম্মানের মিনার ভেঙে পড়ে। তারা মানুষের মাঝে বিভিন্ন মনগড়া রীতিনীতি বাড়াতে থাকে। খুব উচ্চ মর্যাদার কেউ না হলে সাধারণ কারও জানাযায় উপস্থিত হয় না। খরচের ভয়ে একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করে না। তাদের এই রীতিনীতিগুলো এক সময় অনুসারীদের উপাস্যে পরিণত হয়; যেন এগুলোরই তারা পূজা করে। এর বাইরে তারা যেতে চায় না। কিছু মানতে চায় না। ইলম অর্জন করে না। বরং তাদের কেউ কেউ অগ্রগামী হয়ে তাদের এই মনগড়া রীতিনীতির পক্ষে অজ্ঞতাপূর্ণ ফতোয়া প্রদান করে। সর্বক্ষণ আলেমদের বদনাম ও দোষ-ত্রুটি ধরে বেড়ায়। বলে বেড়ায় দুনিয়ার প্রতি আলেমদের লোভের কথা। অথচ তারা জানে না, প্রয়োজনমাফিক দুনিয়া অর্জনের জন্য কেউ-ই নিন্দিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ, তারা তো জায়েয কাজের মধ্যেই রয়েছে।

এরপর আলেম ও তালিবুল ইলমদের ব্যাপারে চিন্তা করলাম। দেখলাম খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রই রয়েছে, যাদের ওপর সঠিকভাবে 'তালিবুল ইলম' শব্দ ব্যবহার করা যায়। কারণ, শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার তারাই, যারা ইলম তলব করে তদনুযায়ী আমল করার জন্য। অথচ এদের অধিকাংশই ইলম অর্জন করছে এ জন্য যে, এর দ্বারা উপার্জনের কোনো মাধ্যম হবে। কিংবা তাকে দিয়ে কোনো

বাড়ি-ঘর বানানো হবে। কিংবা তাকে কোনো শহরের কাজি বানানো হবে। অথবা সে এই ইলম দ্বারা তার সমবয়সীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অর্জন করবে। এতটুকুই। এই হলো সার্বিকভাবে তাদের উদ্দেশ্য।

এরপর আলেমদের ওপর দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম, তাদের অধিকাংশই নিজের প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত এবং তার কথামতোই চালিত। ইলম তাকে যা থেকে বাধা প্রদান করে, সে বরং সেটাকেই প্রাধান্য দেয়। ইলম তাকে যেটা থেকে নিষেধ করে, সে সেইদিকেই ধাবিত হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে তার কোনো আত্মিক সম্পর্ক নেই এবং তাঁর নির্জন ইবাদতের আস্বাদনও সে প্রাপ্ত নয়। তার একমাত্র লক্ষ্য মুহাদ্দিস হওয়া, ফকিহ হওয়া, দুনিয়াতে মানুষের মাঝে সম্মান অর্জন করা। এতটুকুই। আর কিছু না।

কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তো কখনো পৃথিবী এমন ব্যক্তি থেকে খালি রাখেন না, যারা তাঁর দ্বীনের জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় করবে। যথার্থভাবে আল্লাহ তাআলার হকগুলো জানবে। তাকে ভয় করবে। তারাই হলেন 'কুতুবুদ দুনয়া' বা দুনিয়ার কুতুব। যখন তাদের কেউ ইন্তেকাল করেন, আল্লাহ তাআলা তার স্থানে অন্যজনকে প্রতিষ্ঠা করেন। কখনো কখনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ইনতেকালের আগেই তারা এমন কিছু ব্যক্তিকে দেখে যান, যারা সর্বদিক দিয়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম। এভাবেই পৃথিবী কখনো তাদের বরকত ও প্রতিনিধিত্ব থেকে মুক্ত থাকে না। এই উম্মতের মধ্যে তাদের স্থান আগের যুগের নবীদের মতো।

তাদের পরিচয় কী?

আমি তাদের পরিচয়ের ক্ষেত্রে বলে থাকি– তারা হলেন সেই সকল ব্যক্তি, যারা দ্বীনের উসুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা দ্বীনের সীমারেখাগুলো সংরক্ষণ করেন। হয়তো কখনো তাদের ইলম কম হতে পারে। কম হতে পারে মানুষের সাথে তাদের মেলামেশা।

অর্থাৎ তাদের মর্যাদা ও অবস্থানের মধ্যেও কিছুটা তারতম্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে যারা সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও যোগ্যতার অধিকারী, এমন সংখ্যা খুবই কম। অতীতে মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি শুধু একজনই থাকতেন।

আমি গভীরভাবে আমাদের সালাফে সালেহিনের মাঝে এই সংখ্যাটা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। আমি বের করতে চেষ্টা করলাম, এমন সংখ্যা কত হবে? যারা এমনভাবে ইলম অর্জন করেছেন যে, মুজতাহিদদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আবার এমনভাবে আমল করেছেন যে, আবেদদের নেতা হয়ে উঠেছেন। আমার পর্যবেক্ষণ শেষে আমি এ ক্ষেত্রে তিনজনের অধিক পাইনি। ১. হজরত হাসান বসরি রহ.। ২. হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ.। ৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.।

আমি তাদের এই বিন্যাস নিয়ে বহুজনের কাছে চিঠি দিয়েছি। সবাই আমার কথা মেনে নিয়েছেন। তবে তাদের কেউ কেউ চতুর্থ জন হিসেবে হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. এর কথা বলেছেন।

আমাদের সালাফে সালেহিনের মধ্যে যদিও আরও অনেক নেতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশের ওপর হয়তো কোনো বিশেষ শাস্ত্র বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই অন্য বিষয়টি তার থেকে কমতি হয়ে গেছে। কারও ওপর প্রভাব ফেলেছে ইলম। কারও ওপর আমল। তবে সকলেরই নিজের ইলমের ক্ষেত্রেই একটি মজবুত ভিত ও দক্ষতা ছিল। ছিল আচার-আচরণ ও জানাশোনার একটি ভারসাম্যপূর্ণ অনুসরণীয় অংশ।

এখন তাদের পথে কেউ যদি চলতে চায়, তার তো কোনো বাধা নেই। যদিও সময়ের প্রেক্ষাপটে তারা অগ্রগণ্য হয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হজরত খাজির আলাইহিস সালামকে এমন বিষয় জানিয়েছিলেন, যা হজরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট ছিল অনুপস্থিত। আল্লাহর ভান্ডার পূর্ণ ও অবারিত। এটা শুধু কিছু ব্যক্তিতেই নিঃশেষিত নয়। সকলেরই অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

আমার কাছে ইবনে আকিল সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'নৌকা তৈরির কাজে আমিই সেরা ছিলাম। তারপর এ ধারা নষ্ট হয়ে গেছে।'

আমি বলি, এটা তার ভুল কথা। তিনি কীভাবে এটা মনে করতে পারেন যে ভবিষ্যতে অন্য কেউ তার মতো বা তারচেয়েও ভালো নৌকা বানাতে পারবে না?

কত আত্মগর্বী সম্ভাবনাময়ী মানুষ যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেটাই হয়তো সম্পাদিত হয়েছে এমন ব্যক্তির হাত দিয়ে, যার ক্ষেত্রে ধারণাই করা হতো না। কত পরবর্তীগণ কাজে ও কর্মে ছাড়িয়ে গেছেন পূর্ববর্তীদের!

বলা হয়—

إن الليالي والأيام حاملة　　وليس يعلم غير الله ما تلد

রাত ও দিনগুলো প্রসবের ভারে হয়ে আছে নত

খোদাই শুধু জানে, কী যে করবে তারা প্রসবিত।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই

আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, নফস কখনো কখনো প্রচণ্ডভাবে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দিকে ধাবিত হয়। এমনকি যখন সে ধাবিত হয়, অন্তর জ্ঞান বোধ বুদ্ধি বিবেক সকলকে মাড়িয়েই ধাবিত হয়। কারও বাধাই তখন আর মানে না। এ সময় মানুষ কোনো নসিহত দ্বারা উপকৃত হওয়ার অবস্থায় থাকে না।

আমার নফসও একদিন হঠাৎ এভাবে প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হলো। আমি সচেতন সতর্ক হয়ে তাকে বলে উঠলাম, তোমার ধ্বংস হোক, কয়েক মুহূর্ত থামো। আগে আমার কিছু কথা শোনো, এরপর তোমার যা ইচ্ছা করো।

সে থেমে বলল, তুমি বলো, আমি শুনছি।

আমি বললাম, প্রবৃত্তির হাতছানি উপেক্ষা করে জায়েয জিনিসের দিকে তুমি খুবই কম যাও। তোমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ও আকর্ষণ হলো হারাম বিষয়ের দিকে। এখন আমি তোমার স্বভাবের দুটি বিষয় এখানে উপস্থাপন করছি। মনোযোগ দিয়ে শোনো।

এক.

তুমি সাধারণত দুটি তিক্ত জিনিসকে মিষ্ট ভাবো। যেমন, জায়েয জিনিসের চেয়ে নাজায়েয প্রবৃত্তির আনুসরণকে মিষ্ট ভাবো। অথচ প্রবৃত্তির সেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দিকে পৌঁছার পথ তো অনেক কঠিন। কারণ, সম্পদের স্বল্পতার কারণে কখনো কখনো সেটি সম্ভব হয়ে ওঠে না। স্বল্প

উপার্জনের কারণে তার অধিকাংশটাই তোমার প্রাপ্তিতে আসবে না। এটি অর্জনে জীবনের কত মূল্যবান সময় তোমার খরচ হয়ে যাবে। অর্জনের পুরোটা সময় তোমার অন্তর তাতেই ব্যস্ত হয়ে থাকবে। আবার অর্জনের পরও হারানোর ভয়ে অস্থির হয়ে থাকবে। এরপর হয়তো প্রাপ্ত জিনিসের বাস্তব কোনো অপূর্ণতা তোমার এই প্রবৃত্তির আগ্রহকে নষ্ট করে দেবে। সেটা যদি খাবার-জাতীয় হয় তাহলে হতে পারে, তোমার এই পরিতৃপ্ত ভক্ষণই তোমার সমস্যার সৃষ্টি করবে। আর যদি তোমার প্রবৃত্তির বাসনা থাকে কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে– তাহলে হয়তো একসময় তুমি তার মাধ্যমে বিরক্ত হয়ে উঠবে। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কিংবা তার কোনো নিকৃষ্ট স্বভাব ও আচরণে তুমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এরপর বিয়ে ও সহবাসের আস্বাদনের ক্ষেত্রেও রয়েছে অনেক ক্ষতি ও অসুবিধা, শরীর ভেঙে পড়ে। ব্যক্তিকে নিয়ে আরও কত সমস্যা, যার বর্ণনা অতি দীর্ঘ।

দুই.

নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে ধাবিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সাথে রয়েছে দুনিয়ার শাস্তি। মানুষের মাঝে সেগুলো ছড়িয়ে পড়ার ভয়। এরপর আখেরাতের কঠিন শাস্তির কথা রয়েই গেল। তাছাড়া যখনই এই গোনাহের কথা স্মরণ হবে, আপনাআপনিই তোমার অন্তর হয়ে পড়বে অস্থির ও বেচাইন।

অন্যদিকে প্রবৃত্তির ওপর বিজয়ের স্বাদ এমনই এক স্বাদ, যা অন্য সকল স্বাদের চেয়ে উন্নত। তুমি কি প্রবৃত্তির কাছে পরাজিত মানুষকে দেখোনি, তারা কেমন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছে? এর কারণ কী? কারণ, তারা প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে পরাজিত হয়েছে। অন্যদিকে যারা প্রবৃত্তির ওপর বিজয় অর্জন করে, প্রবৃত্তির অন্যায় চাহিদাকে দমিয়ে রাখে, তারাই হলো শক্তিশালী অন্তরের অধিকারী। তারাই হলো সম্মানিত ও অনুসরণীয়। কারণ, তারা প্রবৃত্তির ওপর হয়েছে বিজয়ী।

সুতরাং নিজের আকর্ষিত বিষয়কে শুধু সৌন্দর্যের চোখ দিয়ে দেখা থেকে সতর্ক থাকো। যেমন, একজন চোর সম্পদ চুরির সময় শুধু তার আস্বাদনের কথাই মনে রাখে, এর ক্ষতির দিকে দৃষ্টি দেয় না। হাত কর্তিত হওয়ার কথা স্মরণ করে না।

এ কারণে নিজের কর্মগুলোকে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার দৃষ্টি দিয়ে দেখো, পরিণামের কথা চিন্তা করো। কারণ, স্বাদ আস্বাদনের কর্মটি বদলে গিয়ে সেটাই হয়ে উঠতে পারে ধ্বংসের কারণ। কিংবা এটি তার আস্বাদনের পরিবর্তে হয়ে উঠতে পারে কষ্টের কারণ।

মানুষের প্রথম গোনাহ এমন একটি লোকমার মতো, যা কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ভক্ষণ করে। এটি তার ক্ষুধাকে নিবারণ করে না। বরং এটি খাবারের মতো তাকে আরও বেশি কাতর করে তোলে।

এ কারণে প্রবৃত্তির চাহিদার কাছে পরাজিত মানুষের পরিণাম এবং ধৈর্যধারণের উপকারিতা নিয়ে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। যে ব্যক্তি এটি করতে সক্ষম, সফলতা তার থেকে দূরে নয়। সফলতা যেন তার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

জীবনের ব্যস্ততা

হঠাৎ আমার মনে একটি চিন্তা এলো–

আমাদের তো সুন্দর মজলিস। মনোযোগী সকল অন্তর। চক্ষুগুলো অশ্রু প্রবাহিত করছে। মাথাগুলো দুলছে। নফস তার অন্যায় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হচ্ছে। সংকল্পগুলো সুদৃঢ় হচ্ছে তার অবস্থার সংশোধনের জন্য। এদিকে যদিও শয়তানের চক্রান্ত মনের অভ্যন্তরে প্রতিজ্ঞাগুলো নষ্ট করতে এবং গোনাহ সম্পর্কে সতর্ক না হতে কাজ করে যায়। কিন্তু মন তবু তাওবার দিকেই ধাবিত হয়।

এ সময় আমি নফসকে ডেকে বললাম, 'এই যে মনের জাগরণ, এটা স্থায়ী হয় না কেন? মজলিসে আমি নফস ও জাগরণকে পরস্পরের সাথে সখ্যতা ও হৃদ্যতার সাথে সহঅবস্থানে দেখতে পাই। কিন্তু যখনই আমরা এই মাটির মজলিস থেকে উঠে যাই, আমাদের অন্তরগুলো পরিবর্তন হয়ে যায়।

আমি চিন্তা করলাম, এমনটা কেন হয়? ভেবে দেখলাম, নফস জাগ্রতই থাকে, অন্তর আল্লাহর স্মরণেই থাকে। কিন্তু এগুলোর সচেতন থাকার অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যতটুকু সময় আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও স্মরণে চিন্তাকে ব্যবহার করা হয়, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি ব্যবহার করা হয় দুনিয়ার উপার্জনে, নফসের চাহিদাগুলোর উপকরণ জোগাড়ে। অন্তর সব সময় এর

মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে। আর আমাদের শরীর যেন এমনই এক সোহাগি বন্দি, যার পরিচর্যার কোনো বিরাম নেই।

এভাবে আমরা দেখি, মানুষের চিন্তা ব্যস্ত রয়েছে তার খাদ্য-খাবার, পোশাক, বাসস্থান ও শারীরিক পরিচর্যা নিয়ে। এগুলো নিয়েই সে চিন্তা করে এবং তার আগামীকাল বা আগামী বছরের জন্য খাদ্য ও অর্থ জমাতে থাকে। শরীর থেকে নাপাকি বের হলে যেমন পবিত্রতা অর্জন করতে হয়, তেমনি শরীরের জৈবিক চাহিদার জন্য বিয়েও করতে হয়। পরিবার হয়। দায়িত্ব আসে। তাই স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়ার উপার্জন ছাড়া তার আর উপায় থাকে না। এরপর যখন সন্তান-সন্ততি আসে তখন তো তার চিন্তা পুরোদমে দুনিয়ার উপার্জনে ঘুরতে থাকে।

কিন্তু মানুষ যখন মজলিসে আসে তখন সে ক্ষুধার্ত হয়ে আসে না। বড় ধরনের কোনো পেরেশানির চিন্তা নিয়েও আসে না। বরং এখানে সে তার সমস্ত মনোযোগ একত্র করে। দুনিয়ার যত চিন্তা ও ভাবনা, সেগুলোকে ভুলে থাকে। তখন সে অন্তর দিয়ে ওয়াজ শুনতে পারে। যা বলা হয়, তা-ই স্মরণ করে। যা শোনে, তা-ই গ্রহণ করে। যা জানে, তার ওপরই আমল করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এভাবেই মানুষ তাদের নফসকে উদাসীনতা থেকে জাগ্রত করে তোলে। অতীতে যে ভুল-ক্রুটি ও গোনাহ হয়ে গেছে, সেগুলোর ওপর অনুতপ্ত হয়। চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এবং ভবিষ্যতে মেনে চলার ব্যাপারে অন্তরগুলো প্রবলভাবে প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

এতক্ষণ আমি দুনিয়ার যে কর্তব্য-কাজের কথা বললাম, অন্তরগুলো যদি সকল সময় সেই ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হতো তবে তারা সর্বক্ষণই তার প্রতিপালকের ইবাদতে নিমগ্ন থাকত। মানুষ যদি এভাবে তার প্রতিপালকের প্রেমে পড়ে যেত তবে সকল কিছু বর্জন করে তার নৈকট্য প্রাপ্তির জন্য জীবনপাত করত। এ কারণেই দুনিয়াবিমুখ সাধকগণ নির্জনতাকে অবলম্বন করে নিরালায় বসবাস করেন। সকল অন্তরায় ও পিছুটান থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন। তারা তাদের এই পরিশ্রম ও ত্যাগের পরিমাণ অনুপাতেই ইবাদতের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করেন। যেমনভাবে কৃষকরা তাদের বপিত বীজের পরিমাণ অনুপাতে ফসল পায়।

কিন্তু চিন্তার ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে একটি জিনিস ঝলক দিয়ে উঠল। তা হলো, নফসের যদি সর্বক্ষণ এই জাগ্রত অবস্থা বিরাজ করে, দু-হাতে আঙুলের মুঠো দিয়ে যেমন বালির কণাগুলো বেরিয়ে যায়, তেমনি অসংখ্য ক্ষতির সৃষ্টি হবে এতে। যেমন, মানুষ তার নিজের অবস্থার ওপর অহংকারী হয়ে উঠবে। অন্যদের তুচ্ছ ও হেয়জ্ঞান করতে শুরু করবে। জোশ ও অবস্থার ক্রমউন্নতির একপর্যায়ে সে দাবি করে বসবে, আমার সাথে দুনিয়ার কার কী কর্তব্য আর লেনদেন? আমার কারও সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তখন দুনিয়ার কোনো দায়-দায়িত্বই আর পালন করবে না। আর যারা পালন করছে, তাদেরকে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ ভাবতে থাকবে। এভাবে নফসকে সে গোনাহের বিভিন্ন আক্রমণের মাঝে হাবুডুবু খেতে দেবে। এরপর যখন তীরে উঠে এসে অন্যদের দিকে দৃষ্টি দেবে তখন অন্যদের ইবাদতের তুচ্ছতা নিয়ে নাক ছিটকাবে।

একেবারে সংশ্রবহীন নির্জন সাধকদের অধিকাংশের অবস্থা এমনটাই হয়ে থাকে। এ কারণে আলেমগণ এই অবস্থা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছেন। যে ব্যক্তি বীজ বপন করে, সে তার পরিচর্যা করে। পোকা-মাকড় ধ্বংস করে ও আগাছা উঠিয়ে ফেলে। এই পরিশ্রম তার ক্ষেতকে পরিশুদ্ধতা এনে দেয়। সুতরাং বান্দার জন্যও অবশ্যই এমন কিছু ভুল থাকা আবশ্যক, যে দিকে সে ভয়মিশ্রিত কম্পিত বুক নিয়ে তাকিয়ে থাকবে, আল্লাহ মাফ করবেন কি না! এতেই তার দাসত্ব প্রকাশিত হবে। তার ইবাদত গ্রহণ করা হবে। আর এদিকে ইশারা করেই হাদিসে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ.

হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যদি গোনাহ না করতে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের অপসারিত করে এমন এক সম্প্রদায় নিয়ে আসতেন, যারা গোনাহ করবে এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন।[৪৫]

[৪৫]. সহিহ মুসলিম: ১৩/৪৯৩৬ পৃষ্ঠা: ৩০১– মা. শামেলা।

সুফিতন্ত্রের যাচাই-বাছাই

চিন্তা করে দেখলাম, মানুষের সম্পদ সংরক্ষণ করাও একটি আবশ্যক কর্তব্য। অথচ এদিকে মূর্খ সুফিরা বলে বেড়ায়, হাতে যা আছে তা দান করে আল্লাহর ওপর ভরসা করো।

এটি আমাদের শরিয়তে বৈধ নয়। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাব ইবনে মালিক রা.-কে বলেছিলেন,

أمسك عليك بعض مالك.

> তুমি নিজের কাছে তোমার কিছু সম্পদ রেখে দাও (সম্পূর্ণ দান করো না)।[৪৬]

এবং সাদ রা.-কে বলেছিলেন,

لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.

> তুমি তোমার পরিবারকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাবে আর তারা মানুষের দুয়ারে চেয়ে বেড়াবে—এর চেয়ে তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াই ভালো।[৪৭]

এখন কোনো মূর্খ যদি এসে প্রশ্ন উঠায়– তবে যে হজরত আবু বকর রা. তার সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিয়েছিলেন! এর কী উত্তর হবে?

উত্তরে আমরা বলব, হজরত আবু বকর রা. ছিলেন এক মহৎ হৃদয়ের মানুষ এবং ছিলেন একজন দক্ষ ব্যবসায়ী। তিনি তার সকল সম্পদ দিয়ে দিলেও তার জন্য সম্ভব ছিল কারও থেকে ঋণ করে ব্যবসার মাধ্যমে জীবনযাপন

---

[৪৬]. হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. 'কিতাবুল মাগাযি' তে উল্লেখ করেছেন। ফাতহুল বারি: ৭/৪৪১৮। এবং ইমাম মুসলিম রহ. 'কিতাবুত তাওবা' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। এখানে হাদিসের কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। এবং বিভিন্ন বর্ণনায় শব্দেরও ভিন্নতা রয়েছে। সহিহ বোখারিতে পুরো হাদিসটি এমন–

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.

সহিহ বোখারি: ৯/২৫৫২ পৃষ্ঠা: ৩৩৩– মা. শামেলা।

[৪৭]. সূত্র– পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

করতে পারা। যার এ ধরনের ধৈর্য, হৃদয়, সক্ষমতা ও দক্ষতা রয়েছে, তার জন্য আমি সকল সম্পদ দান করে দেওয়াও কিছু মনে করি না। কিন্তু এটা তার জন্য অবশ্যই নিন্দনীয় হবে, যার জীবনযাপনের আর কোনো মাধ্যম ও পুঁজি নেই। কারণ, তখন সে নিজের সম্পদ হারিয়ে অন্যের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। মানুষের দয়া অনুগ্রহ ও সহানুভূতির ওপর চলতে বাধ্য হবে। তার অন্তর তখন সর্বক্ষণ মাখলুকের দিকে ঝুঁকে থাকবে। তাদের মাঝেই তার আশা-নিরাশা ঘুরপাক খেতে থাকবে। যখনই কেউ তার দরজায় কড়া নাড়বে, তার অন্তর প্রত্যাশার চাপে তিরতির করতে থাকবে, এই বুঝি রিজিক এসে গেল। কেউ বুঝি কিছু নিয়ে এলো। নাউজুবিল্লাহ। সক্ষম কোনো ব্যক্তির জন্য এটি খুবই কুৎসিত একটি বিষয়।

আর যে ব্যক্তি উপার্জনে সক্ষম নয়, তার সকল সম্পদ দান করা তো আরও খারাপ, অবৈধ। কারণ, এরপর তাকে সব সময় মানুষের হাতের দিকে চেয়ে থাকতে হবে। তাদের দয়া-অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হবে।

এটি একটি অপদস্থতার পথ। কখনো কখনো এটিকে দুনিয়াবিমুখতা বলে সুশোভন করার চেষ্টা করা হয়। অথচ আসলেই এটি একটি অপদস্থতার পথ। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম লাঞ্ছনার অবস্থা হলো, তারা ফকির মিসকিন ও নিঃস্বদের সাথে জাকাতের সম্পদে ভিড় বাড়িয়ে দেবে। তুমি প্রথম যুগের অবস্থার দিকে তাকাও। সেখানে এমন কাউকে পাবে না, যেমনটি আজকের যুগের মূর্খ সুফিগুলো করে বেড়ায়। আগেই উল্লেখ করেছি, তারা নিজেরা উপার্জন করেছেন এবং পরবর্তীদের জন্য সম্পদ রেখে গেছেন।

তাছাড়া প্রথম যুগের দিকে তাকিয়ে দেখো, সেখানে কেউ তাদের নিজেদের জন্য 'সুফি' পরিভাষা ব্যবহার করেননি। তাই শরিয়তে যে ধরনের আচরণ ও পরিভাষা বিদ্যমান ছিল না, সে ধরনের বিষয় থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। নিশ্চয় আমাদের এই দ্বীন অসম্পূর্ণ নয় যে, নতুন কোনো বিষয় এসে তাকে পূর্ণতা দান করবে।

জেনে রেখো, মানুষের শরীর হলো একটি জীবন্ত বাহনের মতো। তাকে খাইয়ে-পরিয়ে রাখতে হয়। তার পরিচর্যা করতে হয়। কিন্তু তুমি যদি এ ব্যাপারে অবহেলা করো তাহলে বুঝতে হবে, তুমি নবী ও সাহাবিদের জীবন ও জীবনাচার সম্পর্কে সামান্যতমও অবগত নও।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন খুবই প্রিয় ও বিখ্যাত সাহাবি হজরত সালমান ফারসি রা.। তাকে দেখা যেত যে, তিনি খাবার কাঁধে নিয়ে ঘুরতেন। তাকে একবার প্রশ্ন করা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবি হয়ে আপনি এমন কাজ করেন?

জবাবে তিনি বললেন,

إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت.

নফস যখন তার খাদ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়, তখন সে শান্ত থাকে।

বিখ্যাত তাবেয়ি হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন,

إذا حصلت قوت شهر فتعبد.

> তোমার যদি অন্তত একমাসের খাদ্য জমা থাকে তাহলে তুমি অধিক নফল ইবাদতে সময় দিতে পারো।

আবার কিছু লোক আছে, নিছক কথার দাবি ছাড়া তাদের কোনো দলিল নেই। তারা বলে, এটা তো আল্লাহ তাআলার 'রাজ্জাক' হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করা কিংবা তার ওপর 'তায়াক্কুল'-এর বিরোধী কথা।

এ ধরনের কথা যারা বলে, তুমি তাদের থেকে বেঁচে থাকো। তাদের কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ো না। অবশ্য তারা কিছু 'সালাফ'-এর দুনিয়াবিমুখতা দিয়ে এ ব্যাপারে উদাহরণ দিতে চায়। কিন্তু সেই অবস্থা এখন আর নেই। মানুষের আচরণ, মানুষের ধৈর্য একেবারে পাল্টে গেছে। সুতরাং মূর্খ সুফিদের বিরোধিতা যেন তোমাকে উদ্বিগ্ন না করে। যেমন, আবু বকর আল-মারুজি বর্ণনা করেন, কথাপ্রসঙ্গে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে একবার বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুনলাম। এ কথা শুনে আমি তাকে বললাম, হজরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. বলেছেন...। আমি কথাটি শেষ করার আগেই আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. আমাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, কী বলো, আমি তোমার কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের অবস্থা বর্ণনা করছি আর তুমি নিয়ে আসছ নব আবিষ্কৃত পথ? চুপ করো।

ভালোভাবে জেনে রাখো, কোনো ব্যক্তি যদি জীবনযাপনের আবশ্যক উপকরণগুলো স্বেচ্ছায় ব্যবহার না করে বলে, আমি খাব না, পান করব না,

রোদের তাপ থেকে দূরে সরে যাব না কিংবা ঠান্ডায় উষ্ণতার আশ্রয় নেব না, সর্বসম্মতিক্রমে সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে। এমনিভাবে যার অধীনে পরিবার-পরিজন রয়েছে, সে যদি বলে, আমি উপার্জন করব না। তাদের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার ওপর। এরপর যদি পরিবারের লোকদের ক্ষুধার্ত থাকতে হয় কিংবা আর্থিক কষ্ট করতে হয় তাহলে সেই লোক গোনাহগার হবে। যেমনটি হাদিসে এসেছে–

كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, নিজের সক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।[৪৮]

জেনে রেখো, গুরুত্বের সাথে উপার্জন করা নিজের হিম্মত ও মনোবল বাড়িয়ে দেয়, অন্তরকে মুক্ত ও প্রফুল্ল রাখে, মাখলুকের ওপর কোনো আশা করতে হয় না। তাছাড়া তোমার নিজের মানবিক স্বভাব-তবিয়তের একটা অধিকার আছে। তার বৈধ চাহিদাগুলো পূরণ করা উচিত। শরিয়ত এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছে–

إن لنفسك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا.

তোমার ওপর তোমার নফসের অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে তোমার চোখের।[৪৯]

নতুবা অর্থহীন লোকদেখানো দুনিয়াবিমুখতার উদাহরণ হলো সেই কুকুরের মতো, যে রাতের অন্ধকারে কাউকে চেনে না। যাকে দেখে তার সাথেই হাঁটতে শুরু করে। ঘেউ ঘেউ করে। লোকটি যদি কোনো রুটির টুকরো ছুড়ে মারে তখন চুপ হয়ে যায়।

এই নীতিগুলো ভালোভাবে বুঝে নাও। একটি সুন্দর জীবনযাপনের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ এই বুঝটা খুবই জরুরি।

---

[৪৮]. সুনানে আবু দাউদ: ৫/১৪৪২, পৃষ্ঠা:১২– মা. শামেলা। এছাড়া মুসনাদে আহমদ: ২/১৬০, ১৯৪। এবং মুসতাদরাকে হাকেম: ১/৪১৫। ইবনে হাকেম বলেন, এটি বিশুদ্ধ সনদের হাদিস।

[৪৯]. সহিহ বোখারি: ৭/১৮৩৯, পৃষ্ঠা: ৮৭– মা. শামেলা।

খোদাভীরুতার স্বরূপ

আমার কাছে একদিন আমাদের সময়ের দুনিয়াবিমুখ কিছু ব্যক্তির ঘটনা শোনানো হলো। আমি তাদের বিষয়গুলো শুনে অতি আশ্চর্য বোধ করলাম। মানুষ এমনটা কেন করে?

তাদের ঘটনা ছিল এমন– এক ব্যক্তির নিকট খাবার উপস্থিত করা হলো। কিন্তু তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন, 'আমি খাব না'।

কেন? কেন খাবেন না?

লোকটি বলল, 'দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমি আমার নফস যা চায়, তা থেকে তাকে বিরত রাখি।'

ঘটনা শুনে আমি বললাম, দুটি কারণে এ লোকটি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১. প্রথম কারণ– ইলম না থাকা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কখনো এমন করেননি। তাঁর সাহাবিদের মধ্যেও কেউ এমন করেননি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুরগির গোশত খেতেন। মিষ্টান্ন এবং মধু ভালোবাসতেন। এবং সেগুলো খেতেন।

একবার হজরত হাসান রা. ফালুদা খাচ্ছিলেন। এ সময় ফারকিদ আস-সাবুখি তার নিকট দেখা করতে এলেন। হাসান রা. বললেন, হে ফারকিদ, এ খাদ্য সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?

ফারকিদ বলল, আমি এটি ভালোবাসি না এবং যে ব্যক্তি এটা খায়, তাকেও ভালোবাসি না।

তখন হজরত হাসান রা. বললেন, মধু, গম এবং গরুর ঘি—কোনো মুসলিম কি এগুলোকে দূষণীয় মনে করতে পারে? এগুলো দিয়েই তো ফালুদা বানানো হয়েছে। (ফালুদা আরও বিভিন্নভাবেই বানানো যায়। এটি একটি ফর্মুলা)।

একবার এক ব্যক্তি হজরত হাসান রা.-এর নিকট এসে বলল, আমার এক প্রতিবেশী আছে, সে কখনো ফালুদা খায় না।'

হাসান রা. বললেন, 'সে এটা কেন খায় না?'

লোকটি বলল, 'সে বলে, আমি তো এর শোকর আদায় করতে পারব না।'

হজরত হাসান রা. বললেন, 'তোমার প্রতিবেশী হলো একজন মূর্খ বোকা। সে যে ঠান্ডা পানি পান করে, তারও কি সে শোকর আদায় করতে সক্ষম?'

হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. তাঁর সফরের সময় সাথে ফালুদা ও ভুনা গোশত রাখতেন। এবং বলতেন, আমি যখন আমার বাহনের প্রতি অনুগ্রহ করব তখন সেটাও আমার জন্য ভালোভাবে কাজ করবে।'

আর মুসলমানদের মধ্যে বাড়াবাড়ি ধরনের এই যে 'সুফিতন্ত্র', এটা এসেছে মূলত খ্রিষ্টানদের 'রাহবানিয়াত' বা কৃচ্ছতাসাধন থেকে। আমি এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের ভয় করি–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু হালাল করেছেন, তাকে হারাম সাব্যস্ত করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।

[সুরা মায়িদা : ৮৭]

আর হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে যে কথাটি বর্ণিত আছে– 'তিনি যা ভালোবাসতেন, সেটার ক্ষেত্রে অন্যকে প্রাধান্য দিতেন এবং তার বালিকা দাসীকে আজাদ করে দিতেন। কারণ, এগুলো ছিল তার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।'

এ ধরনের বিষয় তো প্রশংসনীয়। নিজের কাছে যা কিছু প্রিয় ও ভালো, তার ক্ষেত্রে তিনি অন্যকে প্রাধান্য দিতেন। অন্যকে দান করতেন এবং নিজের জন্যও রাখতেন। অর্থাৎ মাঝে মাঝে যখন এ ধরনের কাজ করা হবে, এর দ্বারা অন্তরের সেই লোভ-কাতরতা ভেঙে যাবে– দুনিয়াতে সে যা চায়, তা-ই পায়। ধারণা ভাঙার দরকারও আছে। দুনিয়া তো আসলে এমনই।

কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বক্ষণ তার অন্তরের চাহিদার বিপরীত চলে, সে তার অন্তরকে অন্ধ করে ফেলে। সব ক্ষেত্রেই নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে রাখে এবং তার সকল ইচ্ছা টুকরো টুকরো করে ফেলে। এভাবে তাকে সে যতটা উপকার করে, ক্ষতি করে তারচেয়ে বেশি। হজরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম[৫০] বলেন,

إن القلب إذا أكره عمي.

> অন্তরকে যখন অব্যাহতভাবে বাধ্য করে রাখা হয়, অন্তর তখন অন্ধ হয়ে যায়।

তার কথার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। তা হলো, আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাব-তবিয়তের মধ্যে একটি আশ্চর্য নিয়ম রেখেছেন। নিয়মটি হলো, অন্তর যেটার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, সেটার মধ্যেই তার সুস্থতা রয়েছে।

এ কারণে চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষজ্ঞরা বলেন, মনের মধ্যে যে ধরনের খাবারের আগ্রহ জন্মে, সে ধরনের খাবার খাওয়াই উচিত; বাহ্যিক পর্যবেক্ষণে তার মধ্যে যদি কিছুটা ক্ষতি থেকেও থাকে। কারণ, অন্তর বা প্রবৃত্তি তার জন্য সেটাই পছন্দ করে, যা তার জন্য সংগত। কিন্তু কোনো জাহেদ ব্যক্তি যখন অব্যাহতভাবে নিজের চাহিদা থেকে নিজেকে বিরত রাখে তখন তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ে। এটা অনুচিত।

মনের অভ্যন্তরে যদি খাবারের প্রতি আকর্ষণ না থাকত তাহলে তো মানুষের শরীরই টিকত না। কারণ, আকর্ষণ না থাকলে খাবারের প্রতি আগ্রহ হতো না। মানুষের খাওয়া সম্ভব হতো না। আগ্রহটাই হলো আসল অগ্রদূত। শরীর ঠিক রাখার জন্য এর কোনো জুড়ি নেই।

---

৫০. তার পুরো নাম: ইবরাহিম ইবনে আদহাম বিন মানসুর বিন ইয়াযিদ বিন জাবের। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ ইমাম ও আরেফ। জাহেদদের সরদার। শামে বসবাস করতেন। ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন, তিনি ছিলেন, আস্থাভাজন। জাহেদ। ১৬২ হিজরি সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। سير أعلام النبلاء : ৭/৩৮৭-৩৯৬ এবং حلية الأولياء : ৭/৩৬৭-৮/৫৮।

কিন্তু কেউ যদি খাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলে তবে সেটাও তার জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু মন যা চায়, কোনো ক্ষতির কারণ না থেকেও তুমি যদি সর্বক্ষণ তা থেকে বিরত থাকো তবে এটা পরিণামে তোমার শরীর নষ্ট করে দেবে। এটা তখন একটি বিষের মতো কাজ করবে। যেমন, কোনো প্রচণ্ড পিপাসার্ত ব্যক্তিকে পানি পান করতে বাধা দেওয়া হলো, প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় খাবার থেকে বিরত রাখা হলো কিংবা সঙ্গম থেকে নিষেধ করা হলো প্রচণ্ড যৌন-উত্তেজনার সময়। ঘুমে ঢলে পড়ার সময় ঘুম থেকে বাধা প্রদান করা হলো। এমনকি কোনো ব্যথাক্রান্ত ব্যক্তিকে তার ব্যথার কথা বলতে দেওয়া হলো না। এই সবগুলো বিষয় তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে। হয়তো এভাবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলা হবে কিংবা বেদনার অভ্যন্তরীণ চাপেই তারা মারা যাবে।

এটাই হলো আসল কথা। কোনো জাহেদ যখন এটি বুঝবে তখন জানতে পারবে, সে আসলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের পথের বিপরীত কাজ করছে। এবং এগুলো সাধারণ প্রজ্ঞারও বিপরীত।

২. ভুল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

আমি ভয় করি, তার এই 'নফস যা চায়, তা থেকে বিরত থাকা' তার নিজের খাহেশে পরিণত হয়ে যাবে। লোক দেখানো লৌকিকতা হয়ে পড়বে। কারণ, এসকল ক্ষেত্রে নফসের মধ্যে খুবই সূক্ষ্ম এক ষড়যন্ত্র ও গোপন অহংকার লুকিয়ে থাকে। এই অহংকার সে বাইরের মানুষের কাছে প্রকাশ করে না। নিজের মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে পরিতৃপ্তিসহ ঘুরতে থাকে। এটা খুবই ক্ষতিকর একটি অবস্থা। খুবই ভুল একটি পদ্ধতি। এ কারণে দ্বীনের জন্য যা সাধারণ, সর্বজনের কাছে গ্রাহ্য, তার বাইরে না যাওয়া উচিত। এর মাধ্যমে নফস নিজেকে ব্যতিক্রমী ও অহংকারী করে তোলে।

এসকল আলোচনার প্রেক্ষিতে কিছু মূর্খ আবার বলে বসতে পারে, এর মাধ্যমে তো মানুষকে কল্যাণ ও দুনিয়াবিমুখতা থেকে বাধা প্রদান করা হচ্ছে।

আমি বলি, না, বিষয়টা এমন নয়। কারণ, হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে,

كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.

> দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিটি এমন কাজ, যার ক্ষেত্রে আমার কোনো আদেশ নেই, তা পরিত্যাজ্য।[৫১]

সুতরাং কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়, ভিত্তিহীন কর্তিত কোনো বাহ্যিক ইবাদতের মাধ্যমে ধোঁকায় পতিত হওয়া। 'তাকওয়া'র নামে নিজের ক্ষতিসাধন করা। কারণ, আজকের কিছু মূর্খ সুফি এমন পথের অনুসরণ করছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ যে পথ অনুসরণ করেননি। যেমন, লৌকিকভাবে খুব বেশি বেশি বিনয় প্রকাশ করা, উষ্কখুষ্ক পোশাক পরিধানের মাধ্যমে খোদাভীরুতা দেখানো। এমন নতুন কিছু বিষয় সৃষ্টি করা, যেগুলো মানুষ ভালো মনে করতে থাকে। এমনি কিছু রীতি-নীতি ও নব্যপ্রথা, যার মাধ্যমে কিছু মানুষের অন্যায়ভাবে আয়-উপার্জনের দুয়ার খুলে যায়। হাতে চুমো দেওয়া, অত্যাধিক সম্মান প্রদর্শন করা। কারামতির আকাঙ্ক্ষা করা। নির্জন ও প্রকাশ্য অবস্থার মধ্যে আমল ও আচরণের ভিন্নতা। অবশ্য এটির ভালো দিকও আছে। যেমন হজরত ইবনে সিরিন রহ. মানুষের মাঝে হাসি-তামাশা করে চলতেন। কিন্তু যখন রাত হয়ে যেত, একাকী রবের সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কাঁদতেন, তাকে যেন জনপদবাসীরা হত্যা করতে আসছে।

সুতরাং আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট উপকারী ইলম চাই। এটাই আসল। যখন এই ইলম অর্জিত হয়ে যাবে, সেটাই রব ও মাবুদের পরিচয় জানিয়ে দেবে। এবং সেই সঠিক ইবাদতের দিকে নিয়ে যাবে, যা তিনি আমাদের দিয়েছেন এবং যা তিনি ভালোবাসেন। এবং সেই ইলম অর্জনকারী ইখলাস ও একনিষ্ঠতার পথ অনুসরণ করবে।

আবারও বলি, সকল মূলনীতির প্রধান মূলনীতি হলো ইলম। আর সবচেয়ে উপকারী ইলম হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের জীবনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া।

---

[৫১]. ইমাম মুসলিম রহ. এটাকে হজরত আয়েশা রা. এর শব্দে 'কিতাবুল আকযিয়া' তে উল্লেখ করেছেন– ৩/১৮/১৩৪৩, ১৩৪৪। ইমাম বোখারি রহ. উল্লেখ করেছেন 'কিতাবুস সুলহ'-এর মধ্যে। ফাতহুল বারিঃ ৫/২৬৯৭। তবে বিভিন্ন বর্ণনায় হাদিসটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে এভাবে–

قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

সহিহ মুসলিমঃ ৯/৩২৪৩, পৃষ্ঠাঃ ১১৯– মা. শামেলা।

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾

(ওপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হলো) তারা ছিল এমন লোক, আল্লাহ যাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। সুতরাং তুমিও তাদের পথে চলো। [সুরা আনআম : ৯০]

নফসের সঙ্গে জিহাদ

নফসের জিহাদ সম্পর্কে চিন্তা করলাম। দেখলাম, এটিই সবচেয়ে বড় জিহাদ। কিন্তু দেখি, আলেম এবং জাহেদদের মধ্যে একটি শ্রেণি এর ভুল অর্থ বোঝে। কারণ, তাদের কেউ কেউ নফসকে তার সকল চাহিদার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বিরত রাখে। এটা দুটি কারণে ভুল।

১. প্রথম কারণ

নফসের বিরোধিতাকারী কিছু ব্যক্তি খাহেশাত থেকে বিরত থাকতে গিয়ে আরও বেশি খাহেশাত বা 'নাফসানিয়াত'-এর মধ্যে আপতিত হয়। যেমন, কোনো বৈধ জিনিস থেকে নফসকে বিরত রাখা। এর মাধ্যমে সে লোকদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করতে চায়। তখন নফস এই বিরত রাখার ওপরই অধিক সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। কারণ, সে এর পরিবর্তে অগণিত মানুষের প্রশংসা প্রাপ্ত হচ্ছে। এর চেয়েও আরও গোপন ভয়াবহতা হলো, যারা নফসকে এর থেকে বিরত রাখছে না, তাদের ওপর সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভেবে নেয়। এটা হলো এমন এক গোপন রোগ, ইলম ও বুঝের বাটালি দিয়ে যাকে ছেঁটে পরিশুদ্ধ করা উচিত।

২. দ্বিতীয় কারণ

আমাদের ওপর নফস বা আত্মাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আর তাকে সংরক্ষণের মাধ্যম হলো, তার জন্য এমন জিনিসের ব্যবস্থা করা, যা তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে এবং সংরক্ষণ করবে। আর এর অধিকাংশ কিংবা মোটটাই হলো, সে যা চায় তা সরবরাহ করা। আমরা তাকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উকিল বা দায়িত্বশীলের মতো। এটি আমাদের রবের পক্ষ থেকে

আমাদের কাছে আমানত। তাই সর্বক্ষণ তার সকল আগ্রহের বিষয় থেকে তাকে বিরত রাখা অবশ্যই ক্ষতিকর।

তাছাড়া কিছু কিছু কঠোরতা তাকে খুব বেশি অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। আর কিছু সংকীর্ণতা তাকে একেবারে ধ্বংসই করে দেয়।

বরং তার সাথে জিহাদ হবে বুদ্ধিমান রোগীর শুশ্রুষার মতো। নিশ্চিতভাবেই তার কিছু আগ্রহের বিষয়ে বাধা দেওয়া হবে। কারণ, সে অসুস্থ। এটা তাকে সাময়িক কষ্ট দিলেও স্থায়ী উপকার হবে। আবার এটাও ঠিক, তার এই তিক্ত জিনিসের মধ্যে সামান্য কিছু মিষ্টি বুলিয়ে দেওয়া উচিত। তার সাথে আচরণ হবে খুবই কোমলতার সাথে, তবে নির্দিষ্ট ছক মেনে।

একজন বুদ্ধিমান মুমিনও ঠিক তেমনই। সে নফসের লাগাম একেবারে ছেড়ে দেবে না, আবার পরিচর্যার ক্ষেত্রে কমতিও করবে না। বরং কখনো কখনো সামান্য ঢিল দেবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের লাগাম থাকবে তার হাতেই। যতক্ষণ ঠিকভাবে চলছে, তার ওপর কোনো চোটপাট করবে না। কিন্তু যখন দেখবে খারাপের দিকে ঝুঁকছে, সহানুভূতির সাথে সেদিক থেকে ফিরিয়ে আনবে। এরপরও যদি অলসতা দেখায়, অবাধ্য হয়, তাহলে সে-ও কঠোরতার পথ অবলম্বন করবে– তার স্থায়ী উপকারের জন্যই।

একজন স্ত্রীকে যত্ন ও নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো নফসের সাথেও খুব খোশামদের সাথে আচরণ করবে। স্ত্রী যদি অন্যায় অবাধ্যতা করে, তবে প্রথমে সহানুভূতির সাথে ভালো উপদেশ দেবে। তারপরও যদি ঠিক না হয়, তবে বিছানা আলাদা করবে। এতেও যদি কাজ না হয়, তবে হালকা প্রহার করবে। তবে সদিচ্ছা ও দৃঢ় সংকল্পের চেয়ে শ্রেষ্ঠ চাবুক আর কিছু হতে পারে না। নিজেরও সদিচ্ছা থাকা চাই।

এতক্ষণ যা বর্ণনা করলাম, এগুলো হলো কর্মের মাধ্যমে মোজাহাদা। কিন্তু নফসের জন্য উপদেশ ও তিরস্কারের পদ্ধতিও প্রয়োগ করতে হবে। যেমন, কেউ দেখল তার নফস কোনো মাখলুকের দিকে ঝুঁকছে, চারিত্রিক নীচতার প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ছে, তাহলে নফসকে তার প্রতিপালকের বড়ত্ব মহত্ব ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। নফসকে বলবে, তুমিই তো সেই প্রাণ, যাকে তোমার প্রতিপালক নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতা দিয়ে তোমাকে সেজদা করিয়েছেন। তার পৃথিবীতে তোমাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। এবং জমিনে পাঠিয়েছেন। তোমার সবকিছুই তিনি করজ নিয়ে

নিয়েছেন এবং জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। এখন তার অনুগত হওয়া ছাড়া তোমার উপায় কী!

আর যদি দেখো, নফস অহংকারী হয়ে উঠছে তাহলে তাকে বলো, 'তুমি তো সামান্য নিকৃষ্ট একফোঁটা পানি থেকে সৃষ্ট। রোদ-শীত তোমার সহ্যের বাইরে। সামান্য কীটও তোমাকে কষ্ট দেয়। সামান্য অনিয়মও তোমার শরীর ও শক্তি বিনষ্ট করে দেয়। তাহলে তোমার কী এমন বাহাদুরি?

এরপর কোনো কাজে যদি কমতি দেখো, নফস যদি ইবাদত করতে না চায় তাহলে তাকে বান্দার ওপর তার প্রতিপালকের অধিকার ও হকগুলোর কথা বলো।

আর যদি আমলের ক্ষেত্রে অলসতা করে তাহলে তাকে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অজস্র অগণিত পুরস্কারগুলোর কথা বলো।

আর যদি খারাপ প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয় তবে তুমি তাকে বড় বড় শাস্তির কথাগুলো বলো। এরপর তাকে তাৎক্ষণিক শারীরিক শাস্তি ও কষ্টের কথাগুলোও বলো। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ﴾

(হে নবী, তাদেরকে) বলো, তোমরা বলো তো, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন!
[সুরা আনআম : ৪৬]

এবং এভাবে তাকে অভ্যন্তরীণ শাস্তির কথাও বলো। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনাবলি হতে বিমুখ করে রাখব। [সুরা আরাফ : ১৪৬]

এগুলো হলো কথার মাধ্যমে জিহাদ ও নিয়ন্ত্রণ। পূর্বে যেগুলো বলা হলো, সেগুলো ছিল কর্মের মাধ্যমে জিহাদ ও নিয়ন্ত্রণ।

নফসের সাথে এই দু-ভাবেই জিহাদ করতে হবে।

দুআ কবুলের বিলম্বতা

আমি দেখেছি, একজন মুমিন ব্যক্তি তার কোনো বিপদের জন্য দুআ করে, কিন্তু অনেক সময় বাহ্যিকভাবে তাতে সাড়া দেওয়া হয় না। লোকটি দুআ করতেই থাকে। সময় দীর্ঘায়িত হতে থাকে। কিন্তু দুআ কবুলের কোনো আলামত পাওয়া যায় না। এ ধরনের ব্যক্তির তখন বোঝা উচিত, তাকে তো আসলে এই বিপদের মাধ্যমে ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। এখন ধৈর্যধারণ করাটাই তার উচিত।

এমন দুআ কবুলের বিলম্বে অনেকের মনেই যে ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা আসে, সেটা এমন এক রোগ, অনতিবিলম্বে যা দূর করা দরকার। আমার নিজের ক্ষেত্রেও একবার এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। আমি একটি বিপদে আক্রান্ত হই। আল্লাহর কাছে দুআ করলাম। কিন্তু দুআ কবুলের কোনো আলামত দেখতে পেলাম না। তখন ইবলিস শয়তান তার কুমন্ত্রণার সকল দড়িরশি দিয়ে আমাকে টানতে লাগল। সে বলল, দুআ তো অনেক করা হলো। প্রতিপালকও তো কৃপণ নয়। তাহলে এই সাড়াদানে বিলম্বে তার কী উপকার?

আমি বললাম, হে বিতাড়িত অভিশপ্ত, তোকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তোকে আমি আমার উকিল বানাইনি। তোর কোনো যুক্তিই আমি শুনতে চাই না।

এরপর আমি আমার নফসের দিকে ফিরে বললাম, তুমি কিছুতেই ইবলিসের ওয়াসওয়াসায় কান দেবে না। নিশ্চয় এই দুআ কবুলের বিলম্বে প্রভু তোমাকে শয়তানের ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করছেন নতুবা অবশ্যই এতে তাঁর অন্য কোনো হিকমত রয়েছে।

নফস বলল, 'তাহলে বিলম্বিত সাড়াদানের এই বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করবে কে? আমাকে বাঁচাও।'

আমি তখন নফসকে কয়েকটি কথা বললাম। কথাগুলো এমন–

১. বিভিন্ন রকম অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা হলেন আমাদের মালিক ও প্রভু। আর প্রভুর জন্য অধিকার রয়েছে, তিনি দিতেও পারেন, না-ও দিতে পারেন। এর জন্য বান্দার পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ-অনুযোগ করার সুযোগ নেই।

২. প্রতিপালকের হিকমতের কথাও বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। হয়তো কোনো বিষয় আমি কল্যাণকর মনে করছি। কিন্তু প্রভুর হিকমতে সেটা কল্যাণকর নয়। যেমন, ডাক্তারের অনেক কাজের মধ্যে তার হিকমত বোঝা যায় না। বাহ্যিকভাবে তার কিছু কাজে প্রথমে কষ্ট হয়, ব্যথা হয়; কিন্তু তিনি এর দ্বারা কল্যাণ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ হয়তো এটার ক্ষেত্রে তেমনই চেয়েছেন। তাই অভিযোগের কিছু নেই।

৩. কখনো কখনো বিলম্বিত সাড়া প্রদানই বান্দার জন্য কল্যাণকর হয়, আর ত্বরান্বিতটা হয় ক্ষতিকারক। হাদিসে এসেছে–

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يَسْتَعْجِلُ قَالَ يَقُولُ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي.

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করবে। সাহাবিরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে কীভাবে তাড়াহুড়া করবে? উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে বলবে, আমি আমার প্রতিপালককে ডেকেছি, কিন্তু তিনি আমার ডাকে সাড়া দেননি।'[৫২]

৪. কখনো কখনো দুআ কবুল না হওয়াটা তোমার কারণে হতে পারে। তোমার কৃতকর্মের কারণে। তোমার খাবারে হারামের সন্দেহ রয়েছে। কিংবা দুআ করার সময় তোমার অন্তর ছিল উদাসীন। কিংবা যে গোনাহের ক্ষেত্রে তুমি সত্য তাওবা করোনি, তার শাস্তিস্বরূপ তোমার দুআতে সাড়া প্রদান করা হচ্ছে না, প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে না। এমন আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে দেখো, তাহলেই তুমি দুআ কবুল না হওয়ার আসল কারণ সম্পর্কে জানতে পারবে।

---

[৫২]. মুসনাদে আহমদ: ২৬/১২৫৩৮, পৃষ্ঠা:৮৫– মা. শামেলা। এছাড়া একটু ভিন্ন শব্দে সহিহ বোখারি ও মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে।

যেমন, হজরত মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণনা করা হয়, একবার এক বেদুইন তার বাড়িতে আগমন করে। তার আচরণ ছিল সন্দেহপূর্ণ; যেন কোনো ক্ষতি করতে চায়।

হজরত মুআবিয়া রা. তার কথা শুনে বাইরে এলেন। পরিস্থিতি বুঝলেন। এরপর তিনি তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কিছু লোককে নির্দেশ দিলেন, অমুক স্থানের মাটি সরিয়ে স্থানটি নতুন মাটি দিয়ে যেন লেপে দেওয়া হয়।

তার নির্দেশ পালন করা হলো। কিছুক্ষণ পরই বেদুইনটি দাঁড়িয়ে গেল এবং ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল।

পরে হজরত মুআবিয়াকে এর রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আগের মাটিটি ছিল সন্দেহযুক্ত। তাই যখন সন্দেহযুক্ত মাটি দূর করে দেওয়া হলো, তখন সন্দেহযুক্ত মানুষও চলে গেল।

ইবরাহিম আল-খাওয়াস রহ.[৫৩] থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার সমাজের একটি গোনাহের কাজ নির্মূলের জন্য বের হলেন। হঠাৎ তার কুকুরটি ঘেউ-ঘেউ করতে শুরু করে দিলো এবং তাকে চলতে বাধা দিতে থাকল। এ অবস্থা দেখে তিনি ফিরে এলেন। মসজিদে গেলেন। নামাজ পড়ে আবার বের হলেন। কুকুরটি খুশিতে লেজ নাড়তে লাগল। এবার তিনি নির্দিষ্ট স্থানে গেলেন এবং অন্যায়টাকে নির্মূল করলেন।

পরে তাকে এই অবস্থা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমার নিজের মধ্যেই একটি অন্যায় বিদ্যমান ছিল। সে কারণে কুকুরটি আমাকে যেতে বাধা প্রদান করেছে। কিন্তু পরে আমি যখন মসজিদে ফিরে গিয়ে নামাজ পড়ে তাওবা করলাম এবং এরপর বের হলাম তখন আর সে বাধা দেয়নি। ফলে আমি কাজটি করতে সক্ষম হলাম।

৫. তোমার একটু চিন্তা করা দরকার, এই দুআর মাঝে কাঙ্ক্ষিত বিষয় দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? কখনো তো এমন হয় যে, দুআকারীর প্রার্থিত বিষয়টি অর্জিত হলে তার জন্য গোনাহের দরজা আরও বেশি করে খুলে যায়।

---

[৫৩]. পুরো নাম: ইবরাহিম ইবনে আহমদ বিন ইসমাইল আলখাওয়াস। উপনাম: আবু ইসহাক। তিনি ছিলেন ইরাকে জন্মগ্রহণকারী। কিন্তু বসবাস করেছেন রাই শহরে এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি ২৯১ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। صفة الصفوة : ৪/৯৪।

গোনাহ আরও বেশি হতে থাকে। কিংবা তার মর্যাদার হানি হয়। সে ক্ষেত্রে প্রার্থিত বিষয়টি প্রদান না করাই তো উত্তম।

৬. কখনো কখনো এই বিপদ বা বঞ্চনাটাই তোমার প্রতিপালকের দরজায় দাঁড়ানো এবং তার নিকট তোমার আশ্রয় প্রার্থনার উপলক্ষ্য হয়। প্রার্থিত বিষয় অর্জিত হয়ে গেলে তুমি আবার তার স্মরণ এবং তার আশ্রয় ও প্রার্থনা থেকে বিরত হয়ে যাও। তোমার এই অবস্থাই প্রমাণ করে, বিপদটি যদি তোমার সংঘটিত না হতো তাহলে তোমাকে কিছুতেই প্রভুর দরজায় এভাবে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে দেখা যেত না।

এছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খুব ভালো করেই জানেন, কোন জিনিস মানুষদের ভালো কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সুতরাং বিভিন্ন নিয়ামতের সাগরে ডুবে থাকার পর মাঝে মাঝে এমন কিছু বিপদাপদ তিনি প্রদান করেন, যাতে তারা তার কাছে কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করে। বিপদের আকৃতিতে এটিও এক ধরনের নিয়ামত। নতুবা বান্দা যেন আল্লাহর কথা ভুলেই গিয়েছিল!

আর তোমার প্রকৃত বিপদ তো সেটাই, যা তোমাকে প্রভুর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সুতরাং যে বাহ্যিক বিপদ তোমাকে তোমার প্রভুর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তাতে তোমার কল্যাণ ছাড়া আর কিছু নেই।

ইয়াহইয়া ইবনে বাক্কা রহ.[৫৪] থেকে বর্ণিত, তিনি একবার ঘুমের মধ্যে আল্লাহ তাআলাকে দেখলেন। তিনি বললেন, 'হে আমার প্রভু, আমি আপনাকে কতবার ডাকি, কিন্তু আপনি তো আমার ডাকে সাড়া দেন না!'

আল্লাহ বললেন, 'হে ইয়াহইয়া, আমি তোমার এই প্রার্থনার আওয়াজ শুনতে ভালোবাসি।'

তুমি যদি এই কথাগুলো চিন্তা-ভাবনা করে দেখো তাহলে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ মুসিবত এবং প্রার্থনা ও দুআর মূল রহস্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। তখন তুমি সকল অভিযোগ-অনুযোগ বর্জন করে আরও ভালো ও কল্যাণকর কাজের দিকে অগ্রসর হতে উৎসাহ পাবে।

---

[৫৪]. তার পুরো নাম: ইয়াহইয়া ইবনে মুসলিম বা সুলাইমান আলবাক্কা। কেউ বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে খালিদ। তিনি ১৩০ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। হজরত নাসাঈ রহ. বলেন, সে ছিল 'মাতরুকুল হাদিস'। কিন্তু ইয়াহইয়া রহ. বলেন, না, তিনি এমনটি ছিলেন না। তবে হাফেজ যাহাবি বলেন, সে ছিল মুনকিরুল হাদিস। سير أعلام النبلاء : ৫/৩৫০।

বিপদের প্রতিকার

কারও ওপর যখন কোনো বিপদ আসে, সেই বিপদ থেকে মুক্তি ও স্বস্তি পাওয়ার একটি পদ্ধতি হলো, সে যেন বিপদটাকে আরও বড় কোনো বিপদে আপতিত হওয়ার চেয়ে ছোট মনে করে। সে হয়তো এর চেয়ে আরও বড় বিপদে আপতিত হতে পারত। তার আরও বেশি ক্ষতি হতে পারত। তারপর বিপদে ধৈর্যধারণের প্রতিদানের কথা স্মরণ করবে। আর আশা করা যায়, বিপদটি অতি দ্রুত চলেও যাবে। জীবনে বিপদ আসেই। জীবন কখনো নিরবচ্ছিন্ন সুখের দ্বারা ভরে থাকে না। সুখ ও দুখের এই পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা না থাকলে শান্তি ও সুখ অনুভব করাও সম্ভব হতো না।

এ কারণে তার নিকট বিপদের অবস্থানকে সে যেন একজন মেহমানের অবস্থানের মতো মনে করে। এটা তো সাময়িক ও তাৎক্ষণিক। এর আগে সে কত কত সময় আনন্দে ও উল্লাসে কাটিয়েছে। কত কত মজলিস উৎসব ও সুখের জায়গায় গিয়েছে। এখন এই কষ্টের মেহমানকে একটু সয়ে নিতেই হবে।

এভাবে বিপদের সময় মুমিন তার অন্য সময়গুলোর কথাও স্মরণ করা উচিত। খুব ধৈর্যের সাথে আঘাত সয়ে নেবে। সামান্য অসতর্কতায় যেন মুখ থেকে কোনো খারাপ কথা বের না হয়। অন্তরে যেন কোনো ক্ষোভ বা ক্রোধের সৃষ্টি না হয়। এই বিপদ চলে যাবে। এই তো আবার ফজর উদিত হলো বলে, তখন রাতের এই অন্ধকার মিলিয়ে যাবে। অন্ধকার কেটে রাতের এই ভ্রমণকারী বেদনার অবসান হবে। এবং ধৈর্যের প্রতিদানের সূর্য উদিত হতেই সবাই নিরাপত্তার গৃহে আশ্রয় নেবে।

ইলম ও আমল

একদিন আমি লক্ষ করে দেখলাম, আমার নফস ইলমে মশগুল থাকাকে ভালো মনে করে এবং এটাকে সে অন্য সকল জিনিসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এটাকে সে দলিল মনে করে। অন্য কোনো নফল কাজের চেয়ে ইলমে মশগুল থাকার সময়গুলোকে সে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

নফস বলে, নফল ইবাদতের চেয়ে ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে আমার নিকট সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল এই যে, ইলমচর্চা বাদ দিয়ে যারা নামাজ ও রোজার নফল নিয়ে মশগুল রয়েছে, তাদের অধিকাংশের বিশ্বাসের ভিত্তি নড়বড়ে, ভুলক্রটিতে ভরা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি একটি খুবই সোজা পথ এবং সঠিক মতের ওপর রয়েছি।

আমি দেখলাম, নফস যা বলছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আমি দেখি, সে তো শুধু বাহ্যিক ইলম নিয়ে মশগুল রয়েছে। আমি তাকে চিৎকার করে ডেকে বললাম, তোমার এই ইলম তোমার কী উপকার করবে? এখানে খোদাভীতি কোথায়? গোনাহের দুশ্চিন্তা কোথায়? হারাম থেকে বেঁচে থাকার সতর্কতা কোথায়? কিংবা পূর্ববর্তীদের থেকে শুনে আসা সেই আকুলকরা ইবাদত ও মোজাহাদা কোথায়?

অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকলের নেতা, ইলমের ভান্ডার। তিনি এমন দীর্ঘ নামাজ পড়তেন যে দু-পা ফুলে যেত!

হজরত আবু বকর রা. ছিলেন দ্বীনের তরে ব্যথিত হৃদয়, অধিক ক্রন্দনকারী। কান্নার দমকে তার বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ বের হতো।

আর হজরত উসমান রা. রাতের নামাজে কোরআন খতম করতেন!

আর হজরত আলি রা. রাতে তার নামাজের জায়গায় এমনভাবে ক্রন্দন করতেন যে, তার দাড়ি অশ্রুধারায় ভিজে যেত। এবং দুনিয়ার প্রতি আঙুল দেখিয়ে বলতেন,

يا دنيا! غري غيري.

হে দুনিয়া, তুমি অন্য কাউকে ধোঁকায় ফেলার চিন্তা করো। (আমার ক্ষেত্রে কোনো লাভ হবে না)

এদিকে হজরত হাসান বসরি রহ. আখেরাতের ব্যাপারে নিজের সীমাহীন দুশ্চিন্তা নিয়ে মানুষের সামনে লজ্জিত বোধ করতেন।

সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. সর্বক্ষণ যেন মসজিদেই থাকতেন। চল্লিশ বছরে তার একদিনও জামাতের সাথে নামাজ ছোটেনি বা তরক হয়নি।

আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ রহ.[৫৫] এত বেশি রোজা রাখতেন যে, তার চেহারা সবুজ ও হলুদবর্ণ হয়ে গিয়েছিল!

রাবি ইবনে খাইসামের এক মেয়ে একবার তাকে বলল, 'বাবা, কী হলো, আমি সকল মানুষকে ঘুমাতে দেখি, আর তুমি ঘুমাও না?

উত্তরে রাবি ইবনে খাইসাম রহ. বললেন, তোমার বাবা অপ্রয়োজনীয় ঘুমে সময় কাটানোতে আজাবের ভয় পায়!

আবু মুসলিম খাওলানি রহ.[৫৬] মসজিদে একটি চাবুক ঝুলিয়ে রাখতেন। ইবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলে নিজেকে সেই চাবুক দ্বারা আঘাত করতেন। নিজেকে আবার চাঙ্গা করে নিতেন।

ইয়াজিদ আল-কুরাশি রহ.[৫৭] একাধারে চল্লিশ বছর রোজা রেখেছেন (নিষিদ্ধ দিনগুলো বাদে)। তিনি বলতেন, আগের ইবাদতকারীরা তো আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। আমাকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছে।

হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. জাহান্নামের ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানিই যেন নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। শেষে চোখ থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতো।

---

[৫৫]. পুরো নাম: আবু আমর আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে কায়েস আননাখঈ। তিনি জাহেলি এবং ইসলাম- দুটি যুগই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইবনে আউন রহ. বলেন, একবার শাআবীকে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, তিনি ছিলেন অধিক রোজাদার, অধিক নামাজি এবং অধিক হজকারী। তিনি ৭৫ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। سير أعلام النبلاء : ৪/৫০।

[৫৬]. পুরো নাম: আবু মুসলিম আলখাওলানি আদদারানি। তিনি ছিলেন তাবেঈদের সরদার। যুগের শ্রেষ্ঠ জাহেদ। ইয়ামান থেকে আগমন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। আর হজরত আবু বকর রা. এর যুগে মদিনায় আগমন করেন। তিনি ৬২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। سير أعلام النبلاء : (৪/৭)- ১৪।

[৫৭]. পুরো নাম: আবু আমর ইয়াযিদ ইবনে আব্বান আররকাশি আলবসরি। ভালো কথক ছিলেন। জাহেদ ছিলেন। তবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি তাকে দুর্বল রাবী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সূত্র: তাহযিবুত তাহযিব: ১১/২৭০।

এছাড়া তুমি শ্রেষ্ঠ চার ইমাম—আবু হানিফা রহ., মালেক রহ., শাফেয়ি রহ. এবং আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর মোজাহাদা ও ইবাদতের প্রাচুর্য সম্পর্কে কি জানো না?

এবার তাহলে আমলহীন এই বাহ্যিক ইলমের বিষয়ে চিরদিনের জন্য সতর্ক হয়ে যাও। আমলহীন ইলম তো শুধু অলস অথর্ব ও দুনিয়াভোগীদের বিষয়।

ইলম ও ইবাদত

আগের অধ্যায়ে আমলের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমলের জন্য ইলম মূলত লাগবেই।

আমার নিকট ইলমের শ্রেষ্ঠত্বের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যেমন, যারা ইলম ছাড়া ইবাদতে মশগুল হয়, তারা দ্বীনের উসুল ও মৌলিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুর্বল থাকে তাদের জ্ঞান থাকে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। যেমন, আমাদের পূর্ববর্তী এক আবেদ জাহেদ ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার এক ব্যক্তিকে বললেন, 'হে আবুল ওয়ালিদ, তুমি যদি আবুল ওয়ালিদ (অর্থাৎ ওয়ালিদের বাবা) না হয়ে থাকো তবে এই উপনাম রাখা থেকে বিরত থাকো।' এ কথা বলার কারণ হলো, লোকটির আসলে 'ওয়ালিদ' নামে কোনো সন্তানই ছিল না।

আমি বলি, তার কাছে যদি এটি অনুচিত মনে হয় তবে তার জানা থাকা উচিত স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সুহাইব রুমিকে 'আবু ইয়াহইয়া' উপনাম দিয়েছিলেন। অথচ তিনি 'ইয়াহইয়া' নামক কোনো সন্তানের বাবা ছিলেন না।

এমনকি ছোট্ট এক বালককে তিনি উপনাম নিয়ে ডেকে বলেছিলেন,

يا أبا عمير، ما فعل النغير؟

হে আবু উমাইর, তোমার নুগাইরের কী হলো?[৫৮] [বাচ্চাটির একটি পাখি ছিল। তাকেই 'নুগাইর' বলা হচ্ছে।]

---

৫৮. ইমাম বোখারি এটাকে 'কিতাবুল আদাব' এ উল্লেখ করেছেন। ফাতহুল বারি– ১০/৬১২৯।

এক জাহেদ ব্যক্তি বলেন, আমাকে একবার বলা হলো, এই দুধটুকু খাও। আমি বলেছিলাম, 'এটা আমাকে ক্ষতি করবে।'

এরপর অনেক সময় গিয়েছে। একদিন আমি কাবার নিকট দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করে বলছিলাম, হে দয়াময় আল্লাহ, তুমি তো জানো, আমি আমার জীবনে চোখের একটি পলকের জন্যও তোমার সাথে কাউকে শরিক করিনি।... এসময় আমাকে একটি আওয়াজ দিয়ে বলা হলো, সেই দুধের ঘটনার দিনেও নয়! অর্থাৎ সেদিনও কি তুমি শিরক করনি? অর্থাৎ করেছ।

এই ঘটনা যদি সত্যি হয় তবে এটা হয়ে থাকবে তাকে আদব শেখানোর জন্য; যাতে সর্বক্ষেত্রে মূল কর্তাকে ভুলে উপকরণের দিকে মন না যায়। নতুবা নিজের শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে এ ধরনের কথা বলা নাজায়েয নয়। শিরকও নয়। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন,

ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى الآن قطعت أبهري.

> খায়বারের সেই এক লুকমা আমাকে এখনো পর্যন্ত অনবরত কষ্ট দিয়েই যাচ্ছে। তা আমার মহাধমনী ছিঁড়ে ফেলেছে।[৫৯]

জাহেদদের মধ্যে একটি দল মনে করে, জীবনযাপনের সকল উপকরণ নিঃশেষ করে তবেই হবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা। এটা তারা বলে থাকে ইলম না থাকার কারণে। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু থেকে নিরাপদ থাকার জন্য গুহায় আশ্রয় নিয়েছেন, চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েছেন, বর্ম পরিধান করেছেন, খন্দক খনন করেছেন, মুতঈম ইবনে আদির নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন– অথচ মুতঈম তখন কাফের ছিল। তিনি সাদ রা.কে বলেছেন,

لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.

> তুমি তোমার পরিবারকে নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাবে আর তারা মানুষের দুয়ারে চেয়ে বেড়াবে—তার চেয়ে তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের স্বচ্ছল রেখে যাওয়াই ভালো।[৬০]

---

[৫৯]. ইমাম বোখারি হাদিসটিকে 'কিতাবুল মাগাযি'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ফাতহুল বারি–৭/৪৪২৮।
[৬০]. পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হ্যাঁ, মূল কর্তা আল্লাহকে ভুলে শুধু আসবাব বা উপকরণের ওপর নির্ভর করা ভুল, শিরকি কাজ। আর এ ধরনের সকল অন্ধকার ইলমের আলোয় দূরীভূত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি অজ্ঞতার অন্ধকারে হেঁটে যায়, সে-ও ভ্রষ্ট। আর ভ্রষ্ট সে-ও, যে জেনে শুনে প্রবৃত্তির সংকীর্ণ গলি দিয়ে পথ চলে।

মানুষ ও ফেরেশতা

যারা মনে করে, নবী ও ওলিদের চেয়ে ফেরেশতাদের মর্যাদা বেশি, তাদের কথায় আমি আশ্চর্য হই। তারা এটা কীভাবে বলে? কী কারণে তাদের বেশি মর্যাদা হবে?

শারীরিক গঠনের জন্য যদি মর্যাদা হয় তবে ডানাওয়ালা ফেরেশতাদের চেয়ে আদমের আকৃতি ও গঠনই বেশি বিস্ময়কর ও সুন্দর। আর যদি মানুষের শরীরের মধ্যকার ময়লা আবর্জনার জন্য মর্যাদার কমতি ধরা হয় তবে এগুলো বাদ দিলে তখন আর আদমের আকৃতি থাকবে না; সেটা হয়ে যাবে অন্য কিছু। এছাড়া মানুষের অনেক অপছন্দনীয় জিনিসও বিভিন্ন সময়ে ভালো ধরা হয়। যেমন, রোজাদারের মুখের গন্ধ, শহিদের রক্ত, নামাজের মধ্যে ঘুম।

তাছাড়া ফেরেশতাদের কি এই মর্যাদা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন? অথচ মানুষের ক্ষেত্রে তা-ই বলা হয়েছে। মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসে। আল্লাহও মানুষকে ভালোবাসেন।

কিংবা এই মর্যাদা কি ফেরেশতাদের আছে যে, আল্লাহ তাদের নিয়ে অহংকার করেন? অথচ মানুষের জন্য তা-ই বলা হয়েছে। মানুষের ভালো কাজ ও জিকিরের মজলিস দেখিয়ে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাঝে অহংকার প্রকাশ করেন।

তাছাড়া বিষয়টা চিন্তা করে দেখো, আল্লাহ তাদের দিয়ে আমাদের সেজদা করিয়ে নিয়েছেন। এটা তাদের ওপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্পষ্ট প্রমাণ।

আর যদি ইলমের দিক দিয়ে ধরো তবে তুমি নিশ্চয় সেই ঘটনার কথা জানো। হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পরের ঘটনা। যখন ফেরেশতাগণ বলেছিলেন, لا علم لنا – আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। আর

আল্লাহ আদমকে বললেন, يا آدم أنبئهم –হে আদম, তুমি তাদের জানিয়ে দাও।

ফেরেশতাদের অস্তিত্ব হলো 'জাওহার'। এ কারণে যদি তাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলতে হয়, তবে তো আমাদের রুহও 'জাওহার।

কিংবা ফেরেশতাগণ কি ইবাদতের আধিক্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ? না, তাদের কেউ মানুষের মতো ততদূর আরোহণ করতে সক্ষম নয়, মানুষ যতদূর আরোহণ করে পৌঁছেছে। হ্যাঁ, তাদের কিছু ভিন্নতা আছে। তাদের মধ্যে কেউ কখনো মানুষের মতো 'ইলাহ' হওয়ার দাবি করে বসেনি। অথচ তাদের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের অলৌকিক শক্তি রয়েছে। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেন–

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾

> তাদের মধ্যে কেউ যদি এমন কথা বলে (যদিও সেটা অসম্ভব) যে, 'আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন মাবুদ' তবে আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেবো।
> [সুরা আম্বিয়া : ২৯]

আর যেহেতু শাস্তির বাস্তবতা সম্পর্কে তারা সম্যক অবহিত, সে কারণে তারা এ থেকে খুব বেশি সতর্ক থাকে। তাই তারা কখনো নাফরমানি করে না। আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হয় না।

কিন্তু আমরা সেই বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে দূরে রয়েছি এবং শেষ পরিণাম সম্পর্কে আমাদের ঈমানের দুর্বলতা ও উদাসীনতা রয়েছে। সেই সাথে আমাদের ওপর আমাদের প্রবৃত্তি-বাসনার প্রভাব রয়েছে। এসকল কারণে মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই 'ইলাহ' কে অস্বীকার করে বসেছে আর কেউ কেউ নিজেই 'ইলাহ' হওয়ার দাবি করে বসেছে। কিন্তু ফেরেশতাদের মাধ্যমে এ ধরনের কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়নি।

তবুও কথা হলো, তাদের শ্রম ও পরিশ্রমের চেয়ে আমাদের বহুগুণে শ্রম-পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়। আল্লাহর কসম, আমরা যেই পরীক্ষার মধ্যে আপতিত রয়েছি, ফেরেশতাদের মধ্যে কাউকে যদি এই পরীক্ষায় ফেলা হতো তাহলে তাদেরকেও এমন অবিচলিত পাওয়া যেত না।

মনে করো, আমাদের কারও ওপর যখন একটি ভোর উদিত হলো, অমনি শরিয়ত তার সামনে এসে বলল, নামাজ আদায় করো। খুজু-খুশুর সাথে। শীতের সময় হলেও অজু করো। এরপর বলল, তোমার পরিবারের জন্য উপার্জন করো। শুধু তা-ই নয়; উপার্জনের মধ্যে সতর্ক থাকো। হারাম যেন না হয়– আরও কত কী!

তাছাড়া মানুষ তার এই সংক্ষিপ্ত একটি জীবনে একসঙ্গে যত কাজ করে, ফেরেশতাদের দিয়ে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। যেমন, নিজের শরীর ঠিক রাখা। উপার্জন করা। নিজে দ্বীনের পথে চলা এবং অন্যকে দাওয়াত দেওয়া। নিজের পরিবার-আত্মীয়কে ভালোবাসা। মা-বাবার হক আদায় করা। স্ত্রী-সন্তানের হক আদায় করা। নারী হলে স্বামীর হক আদায় করা। সন্তানের বিভিন্ন আবদার অনুযায়ী তার পছন্দনীয় জিনিসগুলো এনে দেওয়া। প্রবৃত্তির কুপ্রস্তাবনা থেকে বেঁচে থাকা। বন্ধুত্ব–শত্রুত্ব দেখে-শুনে চলা ইত্যাদি। অথচ ফেরেশতাদের এর কোনো বালাই নেই।

এভাবে মানুষকে অনেক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। যেমন, আল্লাহর খলিল ইবরাহিম আ.-কে বলা হচ্ছে, 'তুমি নিজ হাতে তোমার সন্তানকে জবাই করো, তোমার কলিজার ধন নিজ হাতে কেটে ফেলো। এদিকে মুসা আলাইহিস সালামকে বলা হচ্ছে, একমাস দিনে-রাতে রোজা রাখো।

কোনো ক্রোধান্বিত ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে, তোমার ক্রোধ দমন করো। চক্ষুষ্মানকে বলা হচ্ছে, তোমার চক্ষু অবনত করো। কথককে বলা হচ্ছে, চুপ থাকো। ঘুমকাতর ব্যক্তিটিকেও বলা হচ্ছে, ওঠো, তাহাজ্জুদ পড়ো। যে ব্যক্তির প্রিয় কেউ মারা গিয়েছে, তাকে বলা হচ্ছে, ধৈর্যধারণ করো। যার শরীরে কোনো আঘাত লেগেছে, তাকেও বলা হচ্ছে, শোকর আদায় করো। জিহাদে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে বলা হচ্ছে, পলায়ন করো না। অবশেষে মৃত্যুর মতো কঠিন ও কষ্টকর বিষয় তাকে সহ্য করতে হবে এবং তার রুহ বের করে আনা হবে, এ সময়ও তাকে বলা হচ্ছে, অবিচল থাকো। যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো, মাখলুকের কাছে প্রার্থনা করো না ইত্যাদি।

এভাবে মানুষকে যত পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়, তার কোনোটাই কি ফেরেশতাদের সহ্য করতে হয়? হয় না। তাদের ইবাদত করাটাও সহজ। সেই ইবাদতের মধ্যে স্বভাবের দৃঢ়তা নেই। প্রবৃত্তির সাথে লড়াইয়ের তীব্রতা

নেই। তাদের ইবাদত তো শুধু আকৃতিগতভাবে রুকু, সেজদা ও তাসবিহ পড়া। তাদের সেই ইবাদতে আমাদের ইবাদতের মতো অভ্যন্তরীণ অর্থময় খুজু ও খুশু কোথায়?

তাছাড়া তাদের অধিকাংশই মানুষের বিভিন্ন খেদমতে ব্যস্ত রয়েছে। আমাদের হিসাব-নিকাশ লিখছে। কেউ আমাদের বিপদ থেকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত। কেউ বাতাস ও বৃষ্টি প্রবাহের কাজে। কেউ খাদ্য উৎপাদনে। আরেকটি বড় অংশ আমাদের গোনাহ মাফ করার জন্য 'ইস্তিগফার'-এ নিয়োজিত। তাই কীভাবে তারা আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠ হতে পারে– কোনো কারণ ছাড়া?

এছাড়া আমাদের আচরণ নিয়ে আল্লাহর নিকট ফেরেশতাদের যে অভিযোগ ছিল। সেই প্রেক্ষিতে দুনিয়াতে হারুত ও মারুত নামে দুজন ফেরেশতা পাঠানোর যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তাতে দেখা যায়, তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয় না। খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে।[৬১]

তবে এমন ধারণা করা যাবে না যে, আমি ফেরেশতাদের ইবাদত বা উবুদিয়্যাতের মধ্যে কোনো কমতির কথা বলছি। কারণ, তারা সর্বোচ্চ পরিমাণে আল্লাহকে ভয় করে ও ইবাদত করে। কারণ, তারা সরাসরি আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত। তবে ফেরেশতাদের ঈমান হলো 'ইতমিনানি' বা আস্থাপূর্ণ ঈমান। নিশ্চিত এবং স্থির। কিন্তু আমাদের ঈমান গতিশীল। ভয় ও ইবাদতের সাথে এটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে সক্ষম।

সুতরাং আমার ভাইগণ, তোমরাই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তবে তোমরা তোমাদের সত্তাকে গোনাহের পঙ্কিলতায় নিকৃষ্ট করা থেকে বিরত থাকো। তাহলে তোমরাই ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকবে। কিন্তু নিজেদেরকে যদি গোনাহ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে পঙ্কিল করে তোলো তাহলে তোমরাই হবে চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের মতো কিংবা তারচেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহই আমাদের সহায়। তিনি আমাদের হেফাজত করুন। আমিন।

---

[৬১] এই প্রচলিত কথার পক্ষে ইসরাইলি বর্ণনা পাওয়া গেলেও কোনো সহিহ ও বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দুই ফেরেশতা সম্পর্কে উপরিউক্ত বিশ্বাস লালন করা সংগত হবে না। -সম্পাদক

বস্তুসমূহের মৌলিকতা

অনেক সাধারণ মানুষকে এবং কিছু আলেমকে বস্তুসমূহের মৌলিকতা নিয়ে সীমাহীন তর্ক-বিতর্ক করতে দেখি। অথচ এগুলো এমন ইলম—যার বাস্তবতা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করা চলে না। যেমন, রুহ। আল্লাহ তাআলা এর বিষয় গোপন রেখে বলেছেন,

﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾

আপনি বলুন, রুহ আমার প্রতিপালকের আদেশমাত্র। [সুরা ইসরা : ৮৫]

কিন্তু আল্লাহ তাআলার এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা রুহের গঠন-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে থাকে। তর্ক-বিতর্ক করে। কিন্তু কোনো সমাধানে আসতে পারে না। যা দাবি করে, তার পক্ষে কোনো প্রমাণ আনতে পারে না।

আরেকটি আলোচনার বিষয় হলো 'আকল' বা বিবেক। রুহ যেমন আছে, নিঃসন্দেহ আকলও আছে। দুটিকেই চেনা যায় তাদের কর্ম ও প্রভাব দেখে; চাক্ষুষ সত্তা দেখে চেনা যায় না। দেখার উপায়ও নেই

এখন কেউ যদি বলে বসে তবে এগুলো গোপন রাখার মধ্যে কী রহস্য লুকিয়ে আছে?

উত্তরে আমি বলি, রুহ বা আত্মা প্রতিমুহূর্তে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয়। তুমি যদি এগুলোর রহস্য জেনে যাও তবে তার স্রষ্টার প্রকৃতিও কিছুটা জানা হয়ে যাবে। সুতরাং অন্যদের নিকট তিনি এটি গোপন রেখেছেন। এটি তার মর্যাদাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কারণ, সৃষ্টির সাধারণ স্বভাব হলো, যখন সে কোনো জিনিসের সম্পূর্ণটা না জানে, সেটাই তার কাছে সবচেয়ে বড় ও মহান মনে হয়। আর কোনো জিনিসের পূর্ণ রহস্য জানা হয়ে গেলে তা তার কাছে আকর্ষণহীন তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয়।

আবার কেউ যদি বলেন, বজ্র, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প– এগুলো কী?

তার উত্তরে আমরা বলব, এগুলো খুবই অশান্ত ও গতিশীল কিছু জিনিস। এর মধ্যে যে রহস্য, আল্লাহ তাআলাই তা ভালো জানেন। তবে কখনো যদি এগুলোর বাস্তবতা প্রকাশিত হয় তবুও তা আল্লাহর বড়ত্ব ও ক্ষমতার পরিচয়

আরও বাড়িয়ে দেবে। এগুলো যেহেতু তারই সৃষ্টি, তাই অনর্থক তর্ক-বিতর্ক না করে এগুলোর আসল রহস্য উদ্ঘাটনের প্রমাণ প্রাপ্তি পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত।

রিসালাত বা নবীদের সত্যতা নিয়েও তর্ক-বিতর্ক করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলদের পাঠানোর সম্ভাব্যতা নিয়ে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়।

এরপর আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলি নিয়ে বিভিন্ন তর্কের আসর জমানো হয়। এসকল সিফাতের কথা আমরা বিভিন্ন আসমানি কিতাব ও রাসুলদের বর্ণনা থেকে জানতে পেরেছি। কিন্তু বিস্তারিত নয়। কিন্তু মানুষ নিজেদের বিচিত্র মত অনুযায়ী তার গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করে। অথচ এগুলো আলোচনার দায়িত্ব তো কাউকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং যারা মূর্খতার সাথে এগুলোর অনুচিত আলোচনা করে, এর ক্ষতি ও ভয়াবহতা তাদের ওপরই বর্তাবে।

যেমন, আমরা যখন বলি, তিনি মাওজুদ বা অবস্থিত এবং আমরা তার কালাম থেকেই জেনেছি যে তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা। জীবন্ত। সক্ষম। তার গুণাবলির পরিচয়ের ক্ষেত্রে এতটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা এর বেশি কিছু নিয়ে আলোচনায় মগ্ন হতে চাই না।

এভাবে আমরা যখন বলি, তিনি মুতাকাল্লিম, কোরআন তার কালাম বা বাণী। এর বেশি কিছু বলা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নয়। আমাদের সালাফে সালেহিন এর বেশি কিছু বলেননি, تلاوة ومتلو এবং قراءة و مقروء —এসব কথা তারা বলেননি। এবং তারা বলেননি, استوى على العرش بذاته —তারা এ কথাও বলেননি, ينزل بذاته । বরং কোরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই তারা বলেছেন। এর থেকে কিছু বৃদ্ধি করে বলেননি।

উদাহরণ হিসেবে সংক্ষেপে এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো। এর সাথে আল্লাহ তাআলার অন্য গুণাবলির কথা কিয়াস করে নাও। তাহলেই তুমি বাড়াবাড়ির বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। সাদৃশ্য প্রদানের খারাবি থেকে দূরে থাকতে পারবে। এই বাড়াবাড়ির যুগে এটাই বা কম কী!

মূর্খেরও কিছু উপকার রয়েছে

আমি দেখি, পৃথিবী-ভরতি অসংখ্য মানুষ। কত দেশ পরিবার ও সন্তানাদি। মুসলিম এবং অমুসলিম। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে মানুষের অধিকাংশের অস্তিত্বই না থাকার মতো। এদের মধ্যে কেউ তো স্রষ্টাকেই চেনে না। কেউ আবার স্রষ্টাকে নিজের ইচ্ছেমতো একটি আকার-আকৃতি ও ক্ষমতা দিয়ে নিজের মতো গড়ে নিয়েছে। কেউ শিরিক করছে। কেউ অস্বীকার করছে। কেউ আবার নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কেও খবর রাখে না। কত যে তাদের ধরন!

আবার মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পাবে– লোক দেখানো কিছু সুফি-পির অব্যাহত কিয়াম-সুজুদ করে যাচ্ছে। প্রবৃত্তির সকল চাহিদা বর্জন করছে। এর মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভের যে প্রবৃত্তির সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে ভুলে থাকছে। হাতে হাতে চুমো খাচ্ছে।

কিন্ত কেউ যখন তাদের এই দোষের কথা বলতে যাচ্ছে, তাকে বলে উঠছে,

أ لمثلي يقال هذا؟—আমার ক্ষেত্রে কি এ কথা খাটে? ومن فلان الفاسق—কোন ফাসেক আমার ক্ষেত্রে এমন কথা বলে?

এরা মূলত দ্বীনের আসল উদ্দেশ্যটিই বোঝে না। এভাবে অনেক আলেমও অন্যদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং নিজেদের ব্যাপারে অহংকারে লিপ্ত হয়।

আমি আশ্চর্য হই, কীভাবে এসকল মানুষ সত্যের অনুসারী হবে এবং জান্নাতের অধিবাসী হবে!

পরে ভেবে দেখলাম, দুনিয়াতে সব ধরনের মানুষেরই প্রয়োজন রয়েছে। এবং আখেরাতের ক্ষেত্রেও তা-ই। দুনিয়াতে প্রয়োজনীয়তার কারণ, যারা আরেফ বিল্লাহ, অভিজ্ঞ আলেম—তারা অন্যদের নিকট আল্লাহ তাআলার নিয়ামতগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। দ্বীনের কথা শোনান। দ্বীনের যে বিষয়গুলো তাদের নিকট অস্পষ্ট ছিল, সেগুলো জানিয়ে দেন। ঈমান ও আমলের কথা বলেন। এভাবে সকল মানুষের অস্তিত্বই পৃথিবীতে অর্থময় হয়ে ওঠে।

সব জায়গাতেই মানুষের অবস্থানের মধ্যে একটি তারতম্য রয়েছে। যারা ইবাদতের শুধু বাহ্যিকতা নিয়ে চলে, আরেফগণ তাদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে সময় নষ্ট করেন না। আর জাহেদগণ থাকেন নিজেদের ইবাদতে ব্যস্ত। আর আলেমগণ হলেন বাচ্চাদের তারবিয়াতকারীদের মতো। সাধারণ মানুষদের হেদায়াতের পথ দেখানোই তাদের কাজ। আর আরেফগণ হলেন হিকমত বিতরণকারীদের মতো। আল্লাহ যদি চান, চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে যে-কেউ 'আরেফ বিল্লাহ' হতে সক্ষম।

মানুষের মাঝে এত তারতম্যের পেছনে হিকমত কী?

আমার মনে হয়– যেমন, কোনো সম্রাট বা বাদশাহর পাশ ঘেঁষে যদি কিছু সভাসদ না থাকে, সৈনিক ও বাহিনী না থাকে, জৌলুস না থাকে তবে তার বিলাসিতা পূর্ণতা পায় না। ঠিক এভাবেই জান্নাতে 'আরেফ' ব্যক্তিদের বিলাস-ব্যসন পূর্ণ করার জন্য অন্য মানুষগুলোকে তাদের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী ব্যবহার করা হবে।

কেউ যখন আরেফের যোগ্যতায় পৌঁছে যায় তখন তার সকল প্রতিবন্ধকতা উঠিয়ে নেওয়া হয়। তখন তার আমল হবে সর্বোচ্চ পরিমাণ পরিশুদ্ধ। আর কেউ যদি সে পর্যন্ত পৌছুতে না পারে, তবে সে দুনিয়াতে অবস্থান করবে আরবি কথাবার্তায় অনেক সময় অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত ﻻ শব্দটির মতো। শব্দটি অতিরিক্ত। তা পূর্বেরটিকে সুদৃঢ় করে।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে বসে, ধরো, এটা না-হয় দুনিয়ার জন্য হলো, কিন্তু জান্নাতে এটার ধরন কেমন হবে?

উত্তর: দুনিয়াতে আমরা কী দেখি? প্রতিবেশীর সঙ্গ সব সময়ই একটি কাম্য জিনিস। কারণ, অপূর্ণ ব্যক্তিদের দর্শন পূর্ণ ব্যক্তিদের সুখ ও তৃপ্তিকে আরও বাড়িয়ে দেয়। জান্নাতেও তা-ই হবে। তবে প্রত্যেকের জন্যই তাদের মর্যাদানুপাতে একটি প্রাপ্য থাকবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা তাদের এই অপূর্ণতার বিষয়ে জানতে পারবে না। তাই তারা কোনো দুঃখ বা কষ্টও পাবে না।

এ কথাগুলো দিয়ে আমি মানুষের বিশেষ কিছু অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছি, কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তবে সে আমার ইশারা বুঝতে সক্ষম হবে। বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখি না।

একক আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া

আমি আমার রিজিকের ক্ষেত্রে স্রষ্টার পরিচালনার বিষয় নিয়ে চিন্তা করলাম। যেমন, মেঘমালাকে ভাসিয়ে আনা। বৃষ্টি বর্ষানো। আর যে বীজ রয়েছে জমিনের মধ্যে বপিত। একেবারে মৃতের মতো। পচে গলে গেছে। অপেক্ষায় রয়েছে জীবনের শিঙায় একটি উষ্ণ ফুঁৎকারের। এবং সেই জীবন-পানি যখন তাতে স্পর্শিত হয়, তখন সেটা সবুজ হয়ে মাথা তোলে। পানিহীন হয়ে পড়লে, প্রার্থনায় দু-পাতার দু-হাত বাড়িয়ে অনুনয়-বিনয় করে। বিনয়ে মাথা নত করে দেয়। বিবর্ণ হয়ে যায়। এখন সে আমার মতো মুহতাজ। তারও সূর্যের উষ্ণতা প্রয়োজন। পানির আদ্রতা প্রয়োজন। মৃদুমন্দ বাতাস প্রয়োজন। আমারও যেমন প্রয়োজন।

মাটির আদরে লালিত-পালিত এই যে বীজটির বেড়ে ওঠা—যা আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখালেন—আমার লালিতপালিত হওয়াটাও তো এমনই। এমনকি আমার অসহায়ত্ব ছিল আরও কত বেশি! আরও কত দীর্ঘ!

সুতরাং হে নফস, আজ কিছু এদিক-সেদিক চোখ ফিরিয়ে জ্ঞান শিখে অন্য মাখলুকের দিকে ধাবিত হও, এটা তোমার জন্য কত বড় নিকৃষ্ট কাজ! এছাড়া তুমি কীভাবে সেই সৃষ্টিজীবের কাছে তোমার প্রার্থনার হাত বাড়াও, যে ঠিক তোমার মতোই অক্ষম ও মুহতাজ। তোমার মতোই তারও প্রয়োজন রয়েছে, প্রার্থনায় নত হওয়ার দরকার রয়েছে!

হে বিহঙ্গ আমার, তুমি অচিরেই তোমার প্রথম ও একমাত্র পালনকর্তার কাছে ফিরে এসো। বিনয় অবনত হয়ে প্রধান দাতার কাছে তোমার প্রার্থনার কথা বলো।

তুমি যদি তাকে যথার্থভাবে চিনতে পারো, এটা তোমার জন্যই হবে কল্যাণকর। জেনে রেখো, তাকে চিনতে পারা মানেই দুনিয়া ও আখেরাতের রাজত্ব পাওয়া। এটাই তোমাকে সফলতার সবকিছু এনে দেবে।

আঁধারাচ্ছাদিত অন্তরের গল্প

আমি আমার তারুণ্যের সূচনাকালে মোজাহাদার পথ অনুসরণের দিকে ধাবিত হয়েছিলাম। দীর্ঘ রোজা ও নামাজে অভ্যস্ত ছিলাম। নির্জনতা ছিল আমার কাছে খুবই প্রিয়। তখন আমার মধ্যে একটি পূত-পবিত্র অন্তরের উপস্থিতি অনুভব করতাম। আমার দূরদর্শিতার চোখ প্রান্ত ছাড়িয়ে দূর-বহুদূরে স্থান করে নিত। আমি যেন আখেরাত দেখতে পেতাম। যে সময়টুকু আনুগত্য ছাড়া অতিবাহিত হতো, তার জন্য আফসোস করতাম। আনুগত্যের গনিমতের আশায় সর্বক্ষণ ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। আল্লাহর সাথে কেমন যেন একপ্রকার প্রীতি অনুভব করতাম এবং তার নিকট নির্জন মোনাজাতে এক অপার্থিব মিষ্টতা অনুভব করতাম।

কিন্তু একদিন এর সবকিছুর অবসান ঘটল। সব হারিয়ে ফেললাম। আর এই মহা সর্বনাশের সূচনা হলো এইভাবে—

প্রশাসনের কিছু লোকের নিকট আমার কথা-বক্তব্য ভালো লাগল। বহু চেষ্টা-তদবির করে আমাকেও প্রশাসনের কিছু কাজে তাদের সাথে যুক্ত করে নিল। ভালো মনে করে আমিও যুক্ত হলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার স্বভাব-মেজাজও সেদিকে ঝুঁকতে থাকল। ব্যস্ত হতে থাকলাম এবং একসময় অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, আমি আমার আগের সেই নির্জনতার মিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছি।

শুধু তা-ই নয়; ঘটনা আরও ভয়াবহতার দিকে এগোতে থাকল। খাবারে হারামের সন্দেহের কারণে প্রথমে তো তাদের সাথে মেলামেশা ও একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া থেকে বেঁচে থাকতাম। কিন্তু আস্তে আমার অবস্থাও তাদের নিকটবর্তী হতে থাকল। হৃদ্যতা বাড়তে থাকল। মেলামেশাও বাড়তে থাকল। অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন পরিস্থিতি সামনে আসতে থাকল।

নিজেকে রক্ষা করার জন্য এ অবস্থায় কী করা যায়, তা-ই চিন্তা করতে লাগলাম। অবশেষে নিজের থেকেই একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেললাম। যেগুলো বৈধ, বেছে বেছে আমি শুধু সেগুলোর দিকে হাত বাড়ালাম। অন্য বিষয় ও সঙ্গ এড়িয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। আমার মনের মধ্যে আগে যেই উজ্জ্বলতা ও প্রশান্তি ছিল, তা সব কোথায় উধাও হয়ে

গেল। অবশেষে এই মেলামেশা আমার অন্তরের মধ্যে অন্ধকারের সৃষ্টি করতে লাগল এবং একসময় আমার অন্তর পুরোপুরি আলোশূন্য অন্ধকারে পরিণত হলো।

আগের সেই শান্তি, স্বস্তি ও মিষ্টতা থেকে বঞ্চিত তো হলামই, সেই সাথে হৃদয়ের আলো হারানোর কারণে ইসলাহি মজলিসগুলোর ক্ষেত্রে আমি বিরক্ত ও অনাগ্রহী হয়ে উঠতে থাকলাম। অন্যদের সাথে যদিও আমি বিভিন্ন মজলিসে যেতাম; কিন্তু অবস্থার উন্নতি হতো না। লোকজন তাওবা করে। ক্রন্দন করে। নিজেদের সংশোধন করে। কিন্তু আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হতো না। যেন আমার সাথে এগুলোর কোনো সংযোগ-সম্পর্কই নেই।

এভাবে আমার রোগের দৌরাত্ম্য বাড়তেই থাকল। আমি আমার অন্তরের চিকিৎসার ব্যাপারে অক্ষম হয়ে পড়লাম। পরিশেষে একদিন বুজুর্গদের কবরস্থানে গমন করলাম। সেখানকার নির্জনতায় দীর্ঘক্ষণ আমার পরিশুদ্ধি নিয়ে দুআ করতে থাকলাম। ক্রন্দন করলাম। অবশেষে আমার পলায়ন সত্ত্বেও প্রতিপালকের অনুগ্রহ আমার জীবনে যুক্ত হলো। আমার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আমার অন্তরকে যেন আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হলো। আমি এতদিন যে বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছি, ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে নিয়েছে– সেগুলোর ত্রুটি আমাকে দেখিয়ে দেওয়া হলো।

এভাবে আমি আমার উদাসীনতার রোগ থেকে রক্ষা পেলাম। আমি আমার সেই নির্জন প্রার্থনার মধ্যেই বলতে থাকলাম, হে আমার প্রভু, আমি তো আপনার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না। কোন ভাষায় আমি আপনার প্রশংসা আদায় করব? কত বড় রহম আপনি আমার প্রতি করেছেন! আমার উদাসীনতার সময় আপনি আমাকে পাকড়াও করেননি। আপনি আমাকে অজ্ঞতার ঘুম থেকে জাগ্রত করেছেন। আমার অবস্থার সংশোধন করেছেন– আমার স্বভাবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সকল শুকরিয়া, সকল প্রশংসা আপনারই।

এতদিনের বঞ্চনার কত উত্তম প্রতিদানই না আপনি আমাকে দিয়েছেন, যার প্রতিফলে আমি আপনার নিকট আজ আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়েছি। আমার অনাকাঙ্ক্ষিত মেলামেশার বদলে কী সুন্দর সঙ্গ দ্বারাই না আপনি আমার শূন্যতা পূরণ করে দিয়েছেন, যার প্রতিফলে আজ আপনার নিকট এই নির্জন

প্রার্থনায় দাঁড়িয়েছি। আমাকে ধনী করেছেন, যেহেতু প্রার্থনার হাত তুলেছি আপনারই কাছে। কত মধুর সান্নিধ্য আজ প্রাপ্ত হয়েছি, যেহেতু আপনি এভাবে লোকদের সঙ্গ থেকে আমাকে মুক্ত করে আপনার দরবারে আশ্রয় দিয়েছেন।

হায়! সেই সময়গুলোর জন্য আফসোস, যেগুলো আপনার ইবাদত ছাড়া নষ্ট হয়েছে। সেই সময়গুলোর জন্য অনুশোচনা, যেগুলো আপনার আনুগত্য ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে।

এভাবেই আমার রোগমুক্তি হয়।

আগে যখন ফজরের সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হতাম, রাতের দীর্ঘ বিনিদ্রা আমাকে কষ্ট দিত না। যখন দিনটা শেষ হয়ে আসত, দিনের এই অনর্থক নষ্ট হয়ে যাওয়াটা আমাকে উদ্বিগ্ন করত না। অন্তরের তীব্র রোগের কারণেই যে এই অনুভূতিহীনতা, তা তখন বুঝতে পারতাম না। কিন্তু আজ আমার ওপর দিয়ে আমার প্রতিপালকের ক্ষমার প্রভাতী বাতাস অতিবাহিত হয়েছে। তাই আজ এই রাত ও দিনের অনর্থক অতিবাহিত হওয়া আমাকে কষ্ট দেয়। আর এটিই আমার রোগমুক্তির প্রধান আলামত।

হে পরম দয়াময় প্রভু, মহান অনুগ্রহদাতা, আমার প্রতি আপনার ক্ষমাকে পূর্ণ করুন; আমি যেন পরিশুদ্ধ হতে পারি।

হায়, আফসোস সেই মত্ত নেশার, যার দৌরাত্ম্যের ভয়াবহতা শুধু জাগ্রত হওয়ার পরেই অনুভব করা যায়। সে এমনভাবে জীবনের নৌকার পাল ছিন্নভিন্ন করে ছাড়ে, পুনরায় যা মেরামত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেই সম্পদের জন্য আফসোস, যা নষ্ট হয়ে গেছে। আফসোস সেই অবিশ্রান্ত শ্রমের উপর, যে মাঝি দীর্ঘক্ষণ উত্তরীয় বায়ুর বিপরীতে জাহাজ টেনে টেনে গন্তব্যে এনেছে, এরপর ঘুমের প্রাবল্যে গিয়েছে ঘুমিয়ে। অবশেষে জাগ্রত হয়ে দেখে, জাহাজ সেই আগের জায়গায় এসে উপনীত হয়েছে।

হায়, আমার এই সতর্কতার কথা যে ব্যক্তি পড়ছ, তুমি তো আমার কথা ও অবস্থা দিয়েই সতর্ক হতে পারছ। তুমি কত সৌভাগ্যবান! কিন্তু আমাকে তো আমার জীবন দিয়ে সতর্কতার শিক্ষা লাভ করতে হয়েছে। সুতরাং হে ভাই, যেখানে ফাসাদের আশঙ্কা রয়েছে, তার থেকে বেঁচে থাকার জন্য কখনো

নম্রতা অবলম্বন করো না। এখানে কঠোরই হও। কোমরে রশি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাও।

শয়তানের পদ্ধতি হলো, প্রথমে বৈধতাকেই সুশোভন করে উপস্থাপন করে। এরপর আস্তে আস্তে পাখা বিস্তার করে। সুতরাং তোমার গন্তব্যস্থলের দিকে দৃষ্টি রাখো। অবস্থা বুঝে চলো। কিছুতেই সন্দেহজনক বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়ো না।

আবার কখনো কখনো শয়তান সমুখে একটি সুন্দর লক্ষ্য দেখাতে থাকে। কিন্তু রাস্তার মধ্যে কোথাও রয়েছে ষড়যন্ত্র– বিশাল ফাঁদ। আমরা আমাদের বাবা হজরত আদম আলাইহিস সালামের সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। শয়তান তাকে বলেছিল,

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ﴾

তারপর শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিলো। সে বলল, হে আদম, তোমাকে কি এমন একটা গাছের সন্ধান দেবো, যার দ্বারা অর্জন করা যায় অনন্ত জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব? [সুরা তোয়াহা : ১২০]

এখানে হজরত আদম আলাইহিস সালাম চিন্তা করলেন শেষ লক্ষ্য বা গন্তব্যের দিকে। আর তা হলো চিরন্তনতা। এটা তো ভালো। কিন্তু সমস্যা হলো লক্ষ্যে পৌঁছানোর রাস্তার মধ্যে। এটাই হলো ইবলিসের ভালো সুরতে খুবই শক্তিশালী এক ষড়যন্ত্র, যার দ্বারা অনেক আলেমকেও সে ঘায়েল করে ছাড়ে।

কারণ, আলেমরাও অনেক সময় শেষ পরিণাম দিয়ে কোনো জিনিসকে ব্যাখ্যা করে এবং শুরুতেই কিংবা মাঝপথে সমস্যায় আক্রান্ত হয়। যেমন ধরো, 'ইবলিস কোনো আলেমকে বলল, যাও এই জালেমকে ধরো এবং মাজলুমের প্রতিকার করো।'

আলেম উত্তেজিত হয়ে ছুটে গেল জালেমের এলাকায় কিংবা জালেমের দরবারে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর চারপাশের বিভিন্ন হালত, আকর্ষণীয় দৃশ্য ও চেহারা দেখে আলেমের নিজের দ্বীনই যায় যায় অবস্থা। এখন সে আর জালেমের প্রতিকার করবে কী, নিজের নফসই এখন তার ওপর কর্তৃত্ব করে।

কিংবা কখনো সেই প্রতিবাদী আলেম এমন লোকদের সাথে মিলে জুলুম প্রতিরোধ করতে যায়, যারা নিজেরাই আরও বেশি জালেম।

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের দ্বীন ও চারিত্রিক দৃঢ়তার ওপর একশভাগ আস্থাশীল নয়, তার এসকল ফাঁদ ও অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত নয়। এই ধরনের দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তিদের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকাই উত্তম। একাকী নিজের আমল ও কর্ম নিয়ে থাকাই উত্তম। বিশেষ করে এ যুগে, যখন সব জায়গায় ভালোর মৃত্যু ঘটেছে আর খারাবি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি হলো,

أنفع نفسي وحدي، خير لي من أن أنفع غيري وأتضرر.

> যাতে অন্যের উপকার, নিজের ক্ষতি, তার চেয়ে সেটাই উত্তম, যাতে শুধু নিজের উপকার, অন্যের কোনো ক্ষতি নেই।

সুতরাং অবশ্যই ভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। অপছন্দনীয় কাজকর্ম থেকে দূরে থাকতে হবে। এভাবে তুমি যদি শুধু তোমার প্রভুর জন্য একাকী হয়ে যাও তবে তিনিই তোমার জন্য তার মারেফাতের দরজা খুলে দেবেন। তখন সকল কঠিনতাই সহজ হয়ে যাবে। সকল তিক্ততা সুন্দর হবে। সকল কষ্টই সুখে রূপান্তরিত হবে। এবং সকল উদ্দেশ্যই সাধিত হবে।

আল্লাহ তাআলাই সকল কিছুর তাওফিকদাতা। তার সাহায্য ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

ভ্রান্ত ব্যাখ্যা

আমি একবার আমার জন্য এমন বৈধ কিছু বিষয়ে নরম ব্যাখ্যার কথা চিন্তা করছিলাম, যার মাধ্যমে পার্থিব কিছু সুবিধা অর্জিত হতে পারত।

কিন্তু গভীরভাবে ভেবে দেখলাম, এগুলো পরহেজগারিতার ক্ষেত্রে বড় ধরনের কলংক। লক্ষ করে দেখেছি, এ ধরনের বিষয়ে প্রথমে দ্বীনের দুগ্ধ বন্ধ হয়। পরিণামে আল্লাহ তাআলার সাথে নির্জন প্রার্থনার মিষ্টতা দূরীভূত হয়। এরপরও যদি কাজটি অব্যাহত থাকে তাহলে তখন দ্বীনের ওলানও কর্তিত হয়ে যায়। তখন আমল-ইবাদত সব বিনষ্ট হয়ে যায় আর ইবাদতের মিষ্টতা তো আগেই হারিয়েছে।

অতএব আমি আমার নফসকে বললাম, এমন কাজের ক্ষেত্রে তোমার দৃষ্টান্ত হবে এমন এক জালেম বাদশাহর মতো, যে অন্যায়ভাবে বহু সম্পদ জমা করেছে। এরপর একদিন তার রাজত্বে আগ্রাসী আক্রমণ হলো। বাদশাহ হলো বন্দি। এতদিন সে যা কিছু জমা করেছিল, সব ছিনিয়ে নেওয়া হলো। এবং যা তার কাছে নেই, সেগুলোর কথা বলে সেগুলোর স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাকে শাস্তি প্রদান করা হতে লাগল।

এ কারণে ভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে সতর্ক থাকো। আল্লাহ তাআলাকে কখনো ধোঁকা দেওয়া বা প্রতারিত করা সম্ভব নয়। জেনে রেখো, তার নিকট যা রয়েছে, তা তো তার অবাধ্য হয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়।

বিচ্ছিন্নতার ক্ষতিগুলো

আমি প্রায়ই আমার নফসের একটি বিষয় খেয়াল করে দেখি– যখন তার চিন্তা পরিশুদ্ধ থাকে কিংবা কোনো বিলুপ্ত জাতি বা এলাকার মাধ্যমে উপদেশ প্রাপ্ত হয় অথবা পূর্ববর্তীদের কবরের নিকট উপনীত হয় তখন তার হিম্মত সকল মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নতার আকর্ষণে ছটফট করতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার সাথে নির্জন প্রার্থনার প্রতি ধাবিত হয়।

একদিন যখন নফসের এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো, আমি সেদিন তাকে ডেকে বললাম, 'তুমি আমাকে বলো, এভাবে বিচ্ছিন্ন বৈরাগ্যের প্রতি ঝোঁকার দ্বারা

তোমার উদ্দেশ্য কী? তোমার চাওয়ার শেষ সীমা কোনটি? তুমি কি চাও আমি নিঃস্ব ফকির হয়ে বসবাস করি, যাতে আমি অভ্যস্ত নই? তুমি কি চাও আমার জামাতের সাথে নামাজ ছুটে যাক? যে ইলম শিখেছি তা বিনষ্ট হয়ে যাক এবং তার ওপর আমল ছুটে যাক? তুমি আসলে কী চাও? আমি কি পানিতে মেশানো নিম্নমানের খাবার খাব, যাতে আমি অভ্যস্ত নই? তাহলে তো আমি দু-দিনেই জীর্ণ ও কাহিল হয়ে পড়ব।

তুমি কি চাও, আমি অমসৃণ খুস্ক কাপড় পরিধান করে বেড়াব, যা আমাকে পীড়া দেয়? এবং শরীরকে এক অদ্ভুত জামার আস্তরণে ডুবিয়ে নিজেকেই হয়তো প্রশ্ন করে বসব, এ আবার কে?

আর সন্তান কামনার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমি কি সন্তান কামনা করব না, যারা আমার পরে ইবাদত করতে পারবে?

তোমার এ কথাগুলো যদি আমি মেনে চলি তাহলে বুঝতে হবে, জীবনভর আমার অর্জিত ইলম আমাকে কোনো উপকার করতে পারেনি। তোমার কথা শোনলে চলবে না। আমার অনেক কাজ রয়েছে। বরং আমি আমার ইলম দ্বারা বুঝতে পারছি, তোমার এই প্ররোচনাগুলো ভুল ও ভ্রান্ত। জেনে রেখো, শরীর হলো এক জীবন্ত বাহন। আর বাহনকে যদি তার যথার্থ খাদ্য প্রদান না করা হয় তবে সে তার আরোহীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে না। আর আমি যথার্থ খাদ্য বলতে প্রবৃত্তির সকল চাহিদা পূরণের কথা বলছি না। আমি বলতে চাই, আমি আমার শরীরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভালো খাদ্য গ্রহণ করব। এতে আমার শরীর ভালো থাকবে। চিন্তা পরিশুদ্ধ হবে, আকল সুস্থ থাকবে এবং মস্তিষ্ক শক্তিশালী হবে।

তুমি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে মস্তিষ্কের পরিশুদ্ধির প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি লক্ষ করোনি?

হাদিসে এসেছে,

لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان.

বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দুজন বিচারপ্রার্থীর মাঝে বিচার করবে না।

আলেমগণ এ হাদিসের ওপর কিয়াস করে বলেছেন, বিচারক ক্ষুধা, প্রস্রাবের বেগ কিংবা মনের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী কোনো অবস্থা নিয়ে বিচারের ফয়সালা দেবে না।

একটি সুস্থ সুন্দর বিশ্বাস, চিন্তা ও মেজাজের জন্য শারীরিক সুস্থতারও প্রয়োজন রয়েছে। তাই ভালো থাকা আর ভালো খাওয়া থেকে দূরে থাকার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই।

হ্যাঁ, মন্দ থেকে দূরে থাকা হবে; কল্যাণ থেকে নয়। আর এভাবে মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মধ্যে যদি কোনো কল্যাণ থাকত তাহলে অবশ্যই এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিদের থেকে কোনো বর্ণনা থাকত।

আমি কিছু লোকের কথা জানি, অব্যাহত কম খাওয়ার কারণে এবং শুধু শুকনো খাবার খাওয়ার কারণে যাদের শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, চিন্তা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে চিন্তার বিভ্রান্তি বেড়ে গেলে মানুষদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জনে বসবাস শুরু করেছে। এদের মধ্যে কারও মধ্যে পাগলামির ভাব এসে পড়েছে। হয়তো একদিন.. দুইদিন... তিনদিন কিছু খায়নি। ভাবতে থাকে, এভাবে থাকতে পারা বুঝি অলৌকিক শক্তির প্রকাশ। কিন্তু এভাবে দিন যেতে যেতে বদহজম সৃষ্টি হয়েছে। পেট খারাপ হয়েছে। শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। চিন্তার বিভ্রান্তি আরও বেড়ে চলেছে। অবশেষে অতি দুর্বলতার কারণে চোখে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রম শুরু হয়েছে। আর এটাকেই মনে করতে শুরু করেছে, এই বুঝি আলোর ফেরেশতাদের আগমন।

মানুষ ইলম দিয়েই আল্লাহকে চেনে। মানুষ আকল দিয়েই আল্লাহকে বোঝে। এ কারণে আকলের আলোকে কিছুতেই নিভিয়ে দেওয়া উচিত নয়। ইলমের ধারকে কমিয়ে ফেলতে পারে—এমন কাজ করাও উচিত নয়। এই ইলম ও আকলকে যখন রক্ষা করা হবে, তখন এ দুটিই যুগের কর্তব্যগুলোকে রক্ষা করবে। কষ্টকে লাঘব করবে। কল্যাণকর জিনিসকে আনয়ন করবে। একই সঙ্গে খাদ্য-খাবার, চলাফেরা ইবাদাত-বন্দেগি ও পরহেজগারিও অক্ষুণ্ন থাকবে।

নফস আমাকে বলল, তাহলে আমার জন্য একটি নির্ধারিত ওজিফা নির্দিষ্ট করে দাও। একজন রোগীর মতো আমাকেও একটি ব্যবস্থাপত্র লিখে দাও।

আমি বললাম, আমি এতক্ষণ যে ইলমের কথা বললাম, সেটাই হলো তোমার সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক ও চিকিৎসক। প্রত্যেক মুহূর্তে সব ধরনের অসুখের চিকিৎসাই সে দিতে সক্ষম। ইলমই হলো তোমার 'ওজিফা'।

মোটকথা, তুমি তোমার সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে চলবে—তোমার কথাবার্তায় চাল-চলনে, দর্শনে, খাদ্য-খাবারে। আর যা কল্যাণকর, সেদিকেই শুধু ধাবিত হবে। যা ক্ষতিকর, তা থেকে বিরত থাকবে। এবং প্রতিটি কাজ করার আগে নিয়তকে শুদ্ধ ও সুদৃঢ় করে নেবে।

আর বেশি চঞ্চলতা ও লঘুকথা বর্জন করবে। এগুলো মূর্খতার প্রকাশ; ইলমের নয়। অনর্থক কথাবার্তা বর্জন করবে—অমুক এটা খায়, তমুক সেটা করে। অমুক রাতে ঘুমায় না। তমুক খুব চালাক। এ ধরনের অনর্থক কথা ও গিবত বর্জন করে চলবে।

যা তুমি বহনে সক্ষম, সে রকম জিনিসই কেবল বহন করবে। শরীরে সাধ্যের বাইরে কিছু চাপাবে না। তুমি নিজেও লক্ষ করেছ—কোনো চতুষ্পদ জন্তু কোনো খাল বা ঝরনা পার হতে গেলে কিংবা পানি পান করতে গেলে, তুমি যদি লাফ দেওয়ার জন্য তাকে প্রহারও করো, তবুও সে লাফ দেবে না—যতক্ষণ না সে নিজের কাছে নিজে পরিমাণটা মেপে নিচ্ছে। সে যদি বোঝে–এখানে তার লাফ দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, তাহলেই শুধু সে লাফ দেবে। আর যদি বোঝে—সেই ক্ষমতা তার নেই, তবে তুমি যদি পিটিয়ে মেরেও ফেলো, তবুও সে লাফ দেবে না।

জেনে রেখো, সকল শরীরই সমান ক্ষমতা রাখে না। কিছু কিছু মানুষ তাদের অজ্ঞতার কারণে যৌবনে এমন কঠিন কঠিন কাজ করে, ভারি ভারি জিনিস বহন করে, যার কারণে তারা দ্রুতই অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে আর কোনো ভালো কাজ করতেও সক্ষম হয় না। এগুলোর কারণে তাদের অন্তরও বিষিয়ে ওঠে।

আবারও বলি, তুমি সব সময় ইলমের সাথে চলবে। এটিই তোমার সকল রোগের ওষুধ। আল্লাহ হলেন একমাত্র তাওফিকদাতা।

সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিস থেকে বেঁচে থাকা

এমন লোকদের বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করি, যারা ইলমের দাবি করে, অথচ হাদিসগুলোকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপর ধরে সাদৃশ্য নিরূপণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু হাদিসে কথাগুলো যেভাবে এসেছে, ঠিক সেভাবেই যদি ধরে নিত, তাহলে তারা নিরাপদ থাকতে পারত। কারণ, যে ব্যক্তি এগুলোকে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই রেখেছে এবং সেভাবেই এর অর্থ করেছে, তার ব্যাপারে আর কোনো অভিযোগ থাকে না। সে তো অন্যকিছু সাব্যস্ত করছে না। যা আছে, তাকে রহিতও করছে না।

এ কারণে যে ব্যক্তি কোরআন ও হাদিস পড়ে এবং সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ে বাড়তি কিছু বলে না, তাকে আমি নিন্দা করি না। এটিই ছিল আমাদের 'সালাফে সালেহিন'-এর পথ ও পদ্ধতি। কিন্তু যে ব্যক্তি এগুলোর ক্ষেত্রে বলে, 'হাদিসটার চাহিদা এমন, এটিকে এই অর্থে ধরতে হবে—যেমন, আল্লাহ তাআলার আরশে 'ইসতিওয়া' নিয়ে কেউ বলল, 'استوى على العرش بذاته -তিনি আরশে নিজ সত্তায় সমাসীন হয়েছেন। কিংবা এমন বলল যে, ينزل إلى السماء الدنيا بذاته -তিনি দুনিয়ার আসমানে নিজ সত্তায় অবতরণ করেন— এভাবে অতিরিক্ত অর্থ লাগিয়ে বলা উচিত হয় কীভাবে? এটা তো নিজের অনুভব উপলব্ধি থেকে বলা হলো। এর পেছনে কোনো বর্ণিত দলিল-প্রমাণ নেই।

সত্যের সন্ধানে যারা আগ্রহী, তাদের জন্য বলি, আমাদের কাছে 'আকল' এবং 'নকল' দুটি মাধ্যমেই দুটি মৌলিক প্রমাণ রয়েছে, হাদিসের সকল বর্ণনা সেই ভিত্তিতে গ্রহণ করলেই আর কোনো সমস্যা থাকে না। নকল বা বর্ণিত প্রমাণ, যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী– তিনি বলেন,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

তার মতো কিছু নেই। [সুরা শুরা : ১১]

আর আকল বা বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা আমরা জেনেছি যে, স্রষ্টা কিছুতেই তার সৃষ্টির মতো নয়। সৃষ্টি ধ্বংসশীল। আর স্রষ্টা চিরঞ্জীব। সৃষ্টির ধ্বংসশীলতার প্রমাণ হলো, তার মাঝে পরিবর্তন আসে।

তাই কীভাবে আমরা চিরঞ্জীব সত্তার সাথে তার সৃষ্টবস্তুর সাদৃশ্য করতে পারি! জগতের কিছুই তার মতো নয়, তিনিও কারও মতো নন। তিনি যেমন, ঠিক তেমনই– যেমনটা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

রজমের[৬২] আয়াত বিলোপের রহস্য

শাব্দিকভাবে রজমের আয়াত রহিত হওয়া এবং সর্বসম্মতিক্রমে বাস্তবে তার হুকুম বাকি থাকার রহস্য নিয়ে চিন্তা করলাম– এমনটি কেন করা হলো? আমার কাছে মনে হলো, এর দুটি কারণ হতে পারে–

১. বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার সূক্ষ্ম এক মমতার কারণে এই সর্বোচ্চ শাস্তিটি তাদের মুখোমুখি রাখেননি। দেখুন, তিনি বেত্রাঘাতের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন; কিন্তু রজমের কথা আড়াল করেছেন। ঠিক এ বিষয়টার দিকে ইঙ্গিত করে কিছু আলেম বলেন, আল্লাহ তাআলা তার অতি উচ্চ রুচি ও সূক্ষ্ম মমতার কারণে অতি কষ্টকর কিংবা অতি অপ্রিয় বিষয়ে সরাসরি কিছু বলেন না। যেমন, ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾

তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো। [সুরা বাকারা : ১৮৩]

এখানে ফরজকারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। অথচ আমরা সবাই জানি, আল্লাহ তাআলাই হলেন এই ফরজকারী।

অথচ যেখানে রহম ও দয়ার কথা এসেছে, সেখানে তিনি নিজের নাম সরাসরি উল্লেখ করেছেন। যেমন, ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾

তোমাদের প্রতিপালক নিজের ওপর রহম করাকে আবশ্যক করে নিয়েছেন।
[সুরা আনআম : ৫৪]

২. আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইশারা করেছেন। এই উম্মতের একটি দলিলের নাম– ইজমা। আলেমদের সর্বসম্মতি। রজমের বিষয়টি এভাবেই নির্ধারিত হয়েছে এবং এই উম্মত প্রাণ-বিয়োগান্তক বিষয়টির ক্ষেত্রে শরিয়তের এই দলিলের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে যখন সকলের সর্বসম্মতি এসে গেছে, তখন এটি দলিলে

[৬২] বিবাহিত ব্যভিচারীর জন্য নির্ধারিত প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড।

পরিণত হয়ে গেছে। অথচ ইজমা আল্লাহ তাআলার নিজের আয়াতের মতো সর্বোচ্চ প্রনিধানযোগ্য অকাট্য দলিল নয়। তবু ইজমা একটি দলিলে পরিণত হয়েছে এবং এই উম্মত সেটা মেনেও নিয়েছে।

ঠিক এ ধরনের বিষয়ই ঘটেছিল আল্লাহর খলিল হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে। ঘুমের মধ্যে পাওয়া নির্দেশকে তিনি প্রকৃত নির্দেশ হিসেবেই নিয়েছিলেন। অনর্থক স্বপ্ন না ভেবে একটি দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের বিষয় এমনই হয়– সাধারণ কথাও নির্দেশ বলে মানতে মন চায়।

উপকরণ ও উপকরণদাতা

একবার আমি একটি জটিলতার মধ্যে আপতিত হলাম। আমি আমার অন্তর নিয়ে একক আল্লাহ তাআলার দিকে ধ্যানমগ্ন হলাম। জানি, তিনি ছাড়া আমার উপকারের কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া আমার বিপদ দূর করারও কেউ নেই।

এরপর আমি আমার উপকরণগুলোর বাহ্যিক কার্যকারিতার কথা ভেবে সেগুলোর সাহায্য গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলাম। কিন্তু আমার 'ইয়াকিন' বা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে বলল, এটি তাওয়াক্কুলের ক্ষেত্রে একটি বড় কলঙ্ক। তাকওয়ার পরিপন্থী।

আমি বললাম, না, বিষয়টা এমন নয়। আল্লাহ তাআলা এগুলোকে একটি হিকমত হিসেবে তৈরি করেছেন। অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করছি, আমি দুনিয়ার যে উপকরণ প্রস্তুত করেছি, এটা কোনো উপকার করতে পারবে না। এর অবস্থান না থাকার মতোই। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হবে না।

তবে শরিয়ত এই উপকরণগুলোর বৈধতা দিয়েছে। এগুলো ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾

এবং হে নবী, তুমি যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকো ও তাদের নামাজ পড়াও, তখন (শত্রুর সাথে মোকাবিলার নিয়ম এই যে,)

মুসলিমদের একটি দল তোমার সাথে দাঁড়াবে এবং নিজেদের অস্ত্র সাথে রাখবে। [সুরা নিসা : ১০২]

এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ﴾

তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে, তা তার শীষসহ রেখে দিয়ো।
[সুরা ইউসুফ : ৪৭]

এছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের ময়দানে বর্ম পরেই বের হতেন, চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করতেন। যখন তিনি তায়েফ থেকে বের হলেন, মক্কায় প্রবেশ করতে পারছিলেন না, তখন মুতঈম ইবনে আদির নিকট বলে পাঠালেন, 'আমি তোমার নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করতে চাই।' পরে এমনটিই হয়েছিল। কিন্তু তিনি তো ইচ্ছা করলে, আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোনো মাধ্যম ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

এভাবে শরিয়তই যখন দুনিয়ার কোনো কাজকে উপকরণের ওপর নির্ভরশীল করে দিয়েছে, তখন উপকরণ ত্যাগ করা হিকমতের বিপরীত কাজ।

এ কারণে আমি ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণকে উত্তম মনে করি। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً.

আবদুল্লাহ রা. থেকে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যে রোগই পাঠিয়েছেন, তিনি আবার তার ওষুধও পাঠিয়েছেন।[৬৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ.

৬৩. ইমাম বোখারি রহ. 'কিতাবুত তিব্ব' এ হজরত আবু হুরাইরা রা.-এর বর্ণনায় এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। ফাতহুল বারি–১০/৫৬৭৮।

হজরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলাই রোগ ও ওষুধ পাঠিয়েছেন এবং প্রত্যেক রোগের ওষুধ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কিন্তু হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা নিয়ো না। [সুনানে আবু দাউদ : ৩৩৭৬]

হজরত আয়েশা রা. বলতেন,

تعلمت الطب من كثرة أمراض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينعت له.

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোগের আধিক্য ও তার বর্ণনা থেকে চিকিৎসা শিখেছি।

[মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/১৯৭]

আর যারা বলেন, ডাক্তারি চিকিৎসা না করানোই উত্তম। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিস দিয়ে দলিল প্রদান করেন। হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ... هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে বলা হবে, এটা আপনার উম্মত। তাদের মধ্য থেকে ৭০ হাজার কোনো হিসাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তারা হলো সেই সকল ব্যক্তি, যারা ঝাড়ফুঁক করায় না, কোনো অশুভ লক্ষণ মনে করে না, সেঁক দেয় না আর তাদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।

[সহিহ বোখারি : ৫২৭০]

এ হাদিস চিকিৎসা গ্রহণের বিপরীত কথা বলে না। কেননা, তখন কিছুলোক সেঁক দিত, যাতে তারা অসুস্থ না হয়। ঝাড়ফুঁক করত, যাতে কোনো বিপদে আপতিত না হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে এই ঝাড়ফুঁকের মধ্যে শিরকি কথা থাকত। এ কারণে এগুলো নিষেধ করা হয়েছে।

নতুবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইবনে যুরারাকে সেঁক দিয়েছেন এবং বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি ঝাড়ফুঁকের অনুমোদন দিয়েছেন। সুতরাং ওপরে বর্ণিত হাদিসের যথার্থ ব্যাখ্যা তা, যা আমরা আগে বর্ণনা করেছি।

সুতরাং সক্ষমতা সত্ত্বেও আমার শরীরের সাথে যা উপযোগী হবে, তা আমি খাব না, আর আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলতে থাকব, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে সুস্থ করে দাও—এটা হিকমতের চাহিদা নয়। হিকমত তো আমাকে বলে, তুমি কি হাদিসের কথা শোনোনি– اعقلها و توكل –'আগে তা [বাহন] বাঁধো, এরপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।' এভাবে উপযুক্ত জিনিস খাও, এরপর বলো, আল্লাহ, আমার অসুখ সারিয়ে দাও। কিন্তু সেই ব্যক্তির মতো হয়ো না, যার শস্যক্ষেত ও পানির নহরের মাঝে হয়তো হাতখানিক দূরত্ব। কিন্তু সে অলসতা করে সেটুকু ছুটিয়ে না দিয়ে পানি প্রার্থনার নামাজে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করল—আল্লাহ, আমার ক্ষেতে পানি দাও... পানি দাও...।

ঠিক এরকম অবস্থা হলো তার, যে ব্যক্তি কোনো পাথেয় ছাড়াই সফরে বের হয়। সে যেন তার প্রতিপালককে পরীক্ষা করছে– তিনি তাকে রিজিক দেবেন, নাকি না? এটা কত বড় মূর্খতা! অথচ আল্লাহ তাআলা বলেই দিয়েছেন, وتزودوا –তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো।

আর সে ব্যক্তি বলল, না, আমি পাথেয় নেব না। এটা এমন এক অবস্থা– তাকে ধ্বংস করার আগেই যেন সে ধ্বংস হয়ে আছে। সুতরাং কিছু মানুষ বেশি বাড়াবাড়ি করে। তারা এভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় বের করে মূলত দ্বীন-ইসলামের বাইরে পা বাড়িয়েছে। তাদের এসকল কর্ম থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তারা ধারণা করে, মানবিক স্বভাবের সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে দ্বীনের ইবাদত এবং সকল উপকরণের বিরোধিতাই হলো তাওয়াক্কুল।

ইলম ও ইলমের গভীরতা দিয়ে এই বিষয়টি বুঝতে হবে। সুতরাং আমি যে বিষয়গুলোর দিকে ইশারা করলাম, সেগুলো ভালোভাবে বুঝে নাও। অনেক ধরনের বিভ্রান্তকর কথা, যেগুলো মূর্খদের থেকে শুনে থাকো, সেগুলোর থেকে এটাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর প্রজ্ঞাবানদের সাথে থাকো; মূর্খদের দলভুক্ত হয়ো না।

ইসলাম ও পরিচ্ছন্নতা

আমি একবার মানুষের পরিচ্ছন্নতার বিষয় নিয়ে চিন্তা করলাম। দেখলাম– অনেক মানুষই তাদের শরীর ও জায়গার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে অবহেলা করে। কেউ হয়তো খাওয়ার পর ঠিকভাবে তার মুখ পরিষ্কার করে না। কেউ তার দু-হাতের তেল-চর্বি পরিষ্কার করে না। কেউ কেউ তেমন একটা মিসওয়াকই করে না। কেউ হয়তো চোখে সুরমা লাগায় না। বগল ও অন্যান্য স্থানের অবাঞ্ছিত পশমগুলো পরিষ্কার করে না, পরিচ্ছন্ন থাকে না। এভাবে এই অবহেলাগুলো তাদের দ্বীন ও দুনিয়া– উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

অথচ শরিয়ত মুমিনকে পরিচ্ছন্ন থাকার আদেশ দিয়েছে। লোকজনের অধিক সমাগম হওয়ার কারণে জুমার দিনে গোসলের আদেশ দিয়েছে। রসুন-পেঁয়াজ বা গন্ধউদ্রেককারী খাদ্য গ্রহণের পর পরিচ্ছন্ন হওয়া ছাড়া মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছে। নখের ময়লা পরিষ্কার করতে আদেশ দিয়েছে। মোচ ছোট করতে বলেছে। মিসওয়াক করতে বলেছে। এবং নির্ধারিত কিছু জায়গার লোম পরিষ্কার করতে নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়াও শরিয়তে আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন এগুলোর ক্ষেত্রে অবহেলা দেখানো মানে দ্বীনের পালনীয় সুন্নত বর্জন করা। এমনকি কখনো কখনো এই অবহেলা ইবাদতও নষ্ট করে দিতে পারে। যেমন, কারও হয়তো নখ বড় হয়ে গেছে। তার নিচে ময়লা জমেছে। অজু করার সময় সেখানে পানি না পৌঁছানোর কারণে তার অজু হলো না। পরিণামে নামাজও হলো না।

অপরিচ্ছন্ন থাকলে পার্থিব সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয়। এরকম অনেক উদাসীন মানুষকে দেখি, কারও সাথে খুব কাছ ঘেঁষে কথা বলছে। কিন্তু তার শারীরিক অপরিচ্ছন্নতার কারণে তার শরীর, মুখ বা পোশাকের দুর্গন্ধ নিকটের মানুষটিকে কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু তার নিজের সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই!

যখন কথা বলে, দুর্গন্ধ ছড়ায়। আর যদি গোপন কথা বলার জন্য একেবারে নিকটে এসে যায়, তখন তার মুখের গন্ধ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়। হয়তো

যখন তার হাই ওঠে, মুখে হাত দেয় না। হাঁচি বা শ্লেষ্মা এলে একটু আড়াল করে না।

এই আচরণগুলো স্ত্রীদের নিকটও ভীষণ অপছন্দ। হয়তো ভদ্রতা করে কখনো এগুলো পুরুষের কাছে উল্লেখ না-ও করতে পারে; কিন্তু এর পরিণামে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ কমে যেতে পারে।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي.

'আমি আমার স্ত্রীর জন্য তেমন পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকা পছন্দ করি, যেমন আমি ভালোবাসি সে আমার জন্য পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকুক।'

মানুষদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, এগুলো নিছক লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা। কিন্তু বিষয়টি কিছুতেই তেমন নয়। এটি একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের অপরিহার্য অংশ। জীবনের সৌন্দর্য। আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজেও আমাদের সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। কারণ, দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে চোখেরও শান্তি-স্বস্তির অধিকার রয়েছে। যে ব্যক্তি মানুষের চোখ, ভ্রু এবং অন্যান্য গাঠনিক সৌন্দর্য নিয়ে চিন্তা করবে, সেই বুঝবে, আল্লাহ আসলে কত সুন্দর করে মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ও সুগন্ধময়। তিনি নিয়মিত মিসওয়াক করতেন। তার থেকে কোনো অপ্রিয় ঘ্রাণ পাওয়া যাবে– এটা তিনি পছন্দ করতেন না।

পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বলেন,

من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله.

যে তার কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখবে, তার দুশ্চিন্তা কম হবে। আর যার ঘ্রাণ সুন্দর হবে, তার বুদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কিছু সাহাবির ব্যাপারে বলেছেন,

ما لكم تدخلون علي قلحا، استاكوا.

তোমাদের কী অবস্থা বলো তো, অপরিচ্ছন্ন দাঁত নিয়ে তোমরা আমার নিকট এসো! তোমরা মিসওয়াক করে আসবে।[৬৪]

মিসওয়াক না করে নামাজ পড়ার চেয়ে মিসওয়াক করে নামাজ পড়ার সওয়াব বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এভাবে পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি নিজেকে সুন্দর রাখে এবং তার অবস্থান থেকে আরও মর্যাদাবান হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞজনরা আরও বলেন,

من طال ظفره قصرت يده، ثم إنه يقرب من قلوب الخلق وتحبه النفوس، لنظافته و طيبه.

যার নখ লম্বা হয়ে যায়, তার হাত খাটো হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মানুষের পরিচ্ছন্নতা ও সুঘ্রাণতার কারণে সবাই তাকে পছন্দ করে এবং নৈকট্য দান করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আতর বা সুঘ্রাণকে ভালোবাসতেন।

এরপর কথা হলো, স্ত্রীগণ এই সুঘ্রাণ অবস্থাতেই স্বস্তি বোধ করে। কারণ, নারীরাও রুচিবোধের ক্ষেত্রে পুরুষদের মতোই। পুরুষ যেমন নারীদের থেকে কোনো কুঘ্রাণকে পছন্দ করে না, তেমনি নারীরাও পুরুষদের থেকে কোনো দুর্গন্ধ পছন্দ করে না। বরং অনেক সময় পুরুষরা একটু ধৈর্যধারণ করে চললেও, নারীরা এক্ষেত্রে তা করতে চায় না।

আমি কিছু লোককে জানি, তারা দাবি করে যে, তারা ইবাদতগুজার জাহেদ– কিন্তু তারা মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নোংরা। এটা আসলে তাদের ইলমহীনতার পরিণাম।

নতুবা যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচার-আচরণ, জীবনপদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে চিন্তা করবে, সে দেখতে পাবে– তিনি ছিলেন কত স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। কত সুন্দর ও পরিপাটি। সুতরাং আমাদের অনুসরণ করতে হবে তাঁকেই। সকল মানুষের জন্য তিনিই আমাদের একমাত্র আদর্শ ও অনুসরণীয়।

---

[৬৪]. মুসনাদে আহমদ: ১/২১৪/১৮৩৫। শাইখ শাকের রহ. বলেন, এর সনদ দুর্বল।

ধৈর্যধারণ

আমার মতে, হঠাৎ আপতিত বিপদের ওপর ধৈর্যধারণ হলো সবচেয়ে কষ্টকর কর্ম। তবে এর মাধ্যমে অর্জিত শ্রেষ্ঠ সন্তুষ্টিও আর কিছুতে নেই। ধৈর্যধারণ হলো ফরজ আর অর্জিত সন্তুষ্টি তার পুরস্কার।

আপতিত বিপদে ধৈর্যধারণ করা কঠিন কেন?

কারণ, ভাগ্যের লিখনে হঠাৎ করে যে বিপদটি ঘটে, নফস সাধারণত তার জন্য প্রস্তুত থাকে না। নফস তার অসুস্থতা কিংবা শারীরিক কোনো কষ্ট সহ্য করতে চায় না। সে চায় সীমাহীন সুস্থতা আর বিলাস-ব্যসন। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত আকস্মিক বিপদে তার মস্তিষ্ক যেন হতভম্ব হয়ে পড়ে, অস্থির হয়ে পড়ে। ভাগ্যের এই হিকমতকে সে মেনে নিতে চায় না।

যেমন, তুমি অনেক দুনিয়াদারকে দেখো, তার জীবনের দু-কূল ছেপে সম্পদের নহর বইছে। এত এত সম্পদ—সে যেন নিজেই বুঝতে পারে না এত সম্পদ দিয়ে সে কী করবে! স্বর্ণ ও রূপার এই অর্থগুলো দিয়ে সে বিভিন্ন পাত্র তৈরি করে ব্যবহার করে। অথচ জানা কথা, কাঞ্চন মণি আকিক ও মুক্তার জিনিসপত্র দেখতে এগুলোর চেয়েও সুন্দর। কিন্তু সে দ্বীনের বিধি-নিষেধের কোনো তোয়াক্কা করে না। স্বর্ণ-রূপার জিনিস ব্যবহার করে। রেশমি কাপড় পরিধান করে। মানুষের ওপর জুলুম করে। বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকে। সম্পদের কোনো অভাব নেই। দুনিয়া যেন তার ওপর উপুড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে দেখা যায়, আলেম-ওলামা, ধার্মিক ব্যক্তি, ইলমের শিক্ষার্থী–আল্লাহর এসকল প্রিয় ব্যক্তিই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ ও বিপদাপদে আপতিত। এমনকি ধনবান জালেমদের অধীনে কষ্ট সহ্য করে চলছে তাদের অনেকের জীবন।

ঠিক এই ক্ষেত্রগুলোতে এসে শয়তান ধোঁকা দেওয়ার সুযোগটা পেয়ে যায়–ভাগ্যের এই হিকমতের মধ্যে সে কদর্যতা আনয়নের চেষ্টা করে। মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম অনুচিত প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করে।

সুতরাং একজন মুমিনের উচিত হবে, দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে দুনিয়াতে যে কষ্টগুলোর মুখোমুখি হতে হয় এবং এই নিয়ে শয়তানের সাথে লড়াই করতে

গিয়ে মানসিক যে কষ্টের স্বীকার হতে হয়– সবগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের ওপর কাফেরদের যেই অত্যাচার ও নিপীড়ন, ধার্মিকদের ওপর অধার্মিক ফাসেকদের যেই অনাচার ও দুর্ব্যবহার– সেগুলোর ওপরও ধৈর্যধারণ করা। তাদের অত্যাচারের সবচেয়ে অমানবিক ও নিকৃষ্টতম উদাহরণ হলো, তারা নির্বিচারে মানুষকে কষ্ট দেয়, শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। নারীদের ওপর অত্যাচার করে। সম্পদ-সম্পত্তি বিনষ্ট করে ইত্যাদি।

ঠিক এই জায়গাটাতে এসে ঈমান টলমল করে ওঠে। বিভিন্ন কুমন্ত্রণা এসে বিশ্বাসের ভিতকে টলিয়ে দিতে চায়। আর ঠিক এখানেই তো প্রকৃত ঈমানের পরীক্ষা।

কেন? এই সময়গুলোতেও আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে কেন? ধৈর্যের সাথে অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে কেন? কারণ, আমাদের এভাবেই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কোরআন ও হাদিসে এভাবেই নির্দেশনা এসেছে।

তবে কোরআনের নির্দেশনা এখানে দুভাবে এসেছে। যেমন–

১. কাফের এবং অবাধ্যদের সম্পদ, শক্তি ও সুযোগ প্রদানের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

> যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা যেন কিছুতেই মনে না করে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছি, তাদের পক্ষে তা ভালো। প্রকৃতপক্ষে আমি তাদেরকে অবকাশ দিই কেবল এ কারণে যে, যাতে তারা পাপাচারে আরও অগ্রগামী হয় এবং পরিশেষে তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। [সুরা আল ইমরান : ১৭৮]

অন্য আয়াতে এসেছে,

﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ○ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا
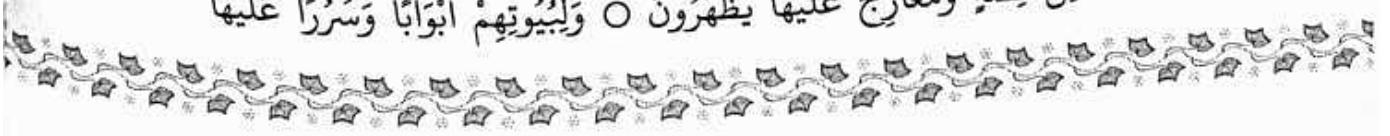
يَتَّكِئُونَ ○ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾

সমস্ত মানুষ একই মতাবলম্বী (অর্থাৎ কাফের) হয়ে যাবে– এই আশঙ্কা না থাকলে, যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, আমি তাদের ঘরের ছাদও করে দিতাম রুপার এবং তারা যে সিঁড়ি দিয়ে চড়ে তাও।

আর তাদের ঘরের দরজাগুলি এবং সেই পালঙ্কগুলিও, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসে।

বরং সোনার তৈরি করে দিতাম। প্রকৃতপক্ষে এসব পার্থিব জীবনের সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট মুত্তাকিদের জন্য আছে আখেরাত। [সুরা যুখরুফ : ৩৩-৩৫]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾

যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তাদের বিত্তবান লোকদেরকে (ঈমান ও আনুগত্যের) হুকুম দিই, ফলে তারা তাতে নাফরমানি করে, যার পরিণামে তাদের ব্যাপারে কথা চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি।

[সুরা ইসরা : ১৬]

কোরআনে এ ধরনের আরও অনেক বর্ণনা এসেছে।

২. দ্বিতীয় কারণ, বিপদের মাধ্যমে মুমিনদের পরীক্ষা করা। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾

নাকি তোমরা মনে করো, তোমরা এমনিতেই জান্নাতে পৌঁছে যাবে, অথচ আল্লাহ এখনো পর্যন্ত তোমাদের মধ্য হতে সেই সকল

লোককে যাচাই করে দেখেননি, যারা জিহাদ করবে এবং তাদেরকেও যাচাই করে দেখেননি, যারা অবিচল থাকবে।

[সুরা আল ইমরান : ১৪২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا﴾

(হে মুসলিমগণ,) তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা জান্নাতে (এমনিতেই) প্রবেশ করবে, অথচ এখনো পর্যন্ত তোমাদের ওপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর? তাদেরকে স্পর্শ করেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকম্পিত...। [সুরা বাকারা : ২১৪]

আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে আরও বলেন,

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾

তোমরা কি মনে করেছ তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে, অথচ আল্লাহ এখনো দেখে নেননি, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করে। [সুরা তাওবা : ১৬]

কোরআনে এ ব্যাপারে আরও অনেক আয়াত এসেছে।

ধৈর্যধারণের এই ব্যাপারটি হাদিসেও এসেছে। অবস্থার বর্ণনা এসেছে। কথার বর্ণনাও এসেছে। যেমন,

عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ.... فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ قَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمْ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى.

হজরত ওমর রা. বলেন, এরপর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কামরায় প্রবেশ করলাম। তখন তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বসলাম। তিনি তার কাপড় গুটিয়ে নিলেন। এটিই ছিল তখন তার একমাত্র পরিধেয়। তাছাড়া চাটাইয়ের রুক্ষতা তার শরীরে দাগ বসিয়ে দিয়েছিল। এবার আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গচ্ছিত জিনিস-পত্রের দিকে দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম, কামরার একপ্রান্তে স্বল্প পরিমাণ কিছু যব। আর অনুরূপ ছাতু। এটা দেখে আচমকাই আমার চোখে পানি চলে এলো।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইবনে খাত্তাব, কাঁদছ কেন?

আমি বললাম, আমি কাঁদব না কেন? এই যে শক্ত চাটাই– যা আপনার শরীরে দাগ ফেলে দেয়! আর এই যে আপনার সামান্য কিছু সঞ্চিত খাদ্য! অথচ কায়সার-কিসরা কত সম্পদ-সম্পত্তি, খাদ্য-খাবার ও আরাম-আয়েশে চলে! আর আপনি হলেন আল্লাহর রাসুল ও তাঁর বন্ধু– অথচ এই হলো আপনার খাদ্য-সামান!

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে ইবনে খাত্তাব, তুমি কি এই বণ্টনে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য শুধু দুনিয়া আমাদের জন্য আখেরাত?

আমি বললাম, জি, অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট।[৬৫]

অন্য হাদিসে এসেছে–

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

[৬৫]. সহিহ মুসলিম: ৭/২৭০৪, পৃষ্ঠা: ৪৪১– মা. শামেলা।

হজরত সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার নিকট এই দুনিয়া যদি একটি মাছির ডানার পরিমাণও মূল্য রাখত, তবে তিনি দুনিয়া থেকে কোনো কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। [সুনানে তিরমিজি : ২২৪২]

এখন আমরা যৌক্তিকভাবে ধৈর্যধারণের বিষয়টা ভেবে দেখতে পারি। এটাকে আমরা কয়েকভাবে বিবেচনা করতে পারি। যেমন–

১. যেহেতু অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে ভাগ্যের হিকমত [তাকদির] আমাদের কাছে সাব্যস্ত হয়ে আছে, সুতরাং এই মূলনীতিটা বর্জন করা সম্ভব নয়। তাকদিরে যেভাবে আছে, ঘটনাবলি সেভাবেই সংঘটিত হবে। কিন্তু অনেক সময় মূর্খরা এটাকে ভুল বুঝে অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকে।

২. বাহ্যিকভাবে অবাধ্যদের যে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, সেটার মাধ্যমে আসলে তাদেরকে পাকড়াও করা হচ্ছে। আর বাহ্যিকভাবে আনুগত্যকারীদের যে কষ্টের বোঝা চেপে ধরছে, প্রকৃত অর্থে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কারণ, অবাধ্যদের এই ছাড়ের পরেই রয়েছে দীর্ঘ শাস্তি ও কষ্ট। আর আনুগত্যকারীদের এই কষ্টের পরেই রয়েছে সীমাহীন প্রতিদান, পুরস্কার ও শান্তি। দুই দলেরই সময় অতি দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। জীবনের সফর সমাপ্ত হচ্ছে। এরপরই তাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়বে আখেরাতের পর্দা। অচিরেই সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে দুনিয়ার সুখ কিংবা দুঃখের। তাহলে এত অভিযোগের কী আছে!

৩. এটাও প্রমাণিত যে, মুমিন বান্দা হলো আল্লাহর তাআলার দাস– তার শ্রমিকের মতো। আর বান্দার শ্রমের সময় হলো দুনিয়ার জীবন নামক এই দিনগুলো। সুতরাং যে শ্রমিক মাটির মধ্যে কাজ করবে, তার জন্য শুভ্র পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা উচিত নয়; বরং সে এই কাজের সময়গুলোতে জান-প্রাণ পরিশ্রম করবে। কষ্ট স্বীকার করবে। ধৈর্যধারণ করবে। এরপর যখন সে কাজ থেকে বিরত হবে, তখন সে পরিচ্ছন্ন হয়ে তার সবচেয়ে ভালো কাপড়টি পরিধান করবে। পারিশ্রমিক নিয়ে বিলাস-ব্যসন করবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি কাজের সময় বিলাসিতা করে, কাজ না করে আরাম-আয়েশ করে, সে তো কাজ শেষে প্রতিদান প্রাপ্তির সময় আফসোস করবে। তখন

তাকে কোনো পুরস্কার প্রদান করা হবে না। বরং কাজের সময় তাকে যে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, সেক্ষেত্রে অবহেলা করার কারণে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে।

নিশ্চয় এই দৃষ্টিভঙ্গিটি আমাদের ধৈর্যের সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করবে।

৪. এটা কি আমরা ভেবে দেখি না, কোরআনে বলা হয়েছে, তোমাদের থেকে কিছু ব্যক্তিকে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করা হবে? তাহলে দুনিয়ায় সব সময় এমন কিছুলোক থাকবেই– যারা মুমিনদের দিকে অত্যাচার ও হত্যার হাত বাড়িয়ে দেবে।

আমরা কেন বুঝতে চাই না, উমর রা.-এর হত্যার জন্য আবু লুলু'র দরকার। হজরত আলি রা.-এর হত্যার জন্য ইবনে মুলজিম। আর হজরত ইয়াহইয়া ইবনে জাকারিয়া আলাইহিমাস সালামকে হত্যার জন্য বড় কাফেরদের দরকার।

এভাবে যখন বুঝ, বোধ ও চিন্তার আলোকবর্তিকা আমাদের রাতের পর্দা সরিয়ে দেবে, তখন বুঝে আসবে এগুলোর পেছনে রয়েছে আসল স্রষ্টার হিকমত। এখানে সৃষ্টির কোনো হাত নেই।

সুতরাং আমরা তার পরীক্ষাগুলোর ওপর সব সময় ধৈর্যধারণ করব। তিনি যা চান– সেটাকেই প্রাধান্য দিয়ে। তাহলেই শুধু তার পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হব– ইনশাআল্লাহ।

এবার একটি ঘটনার কথা বলি। একবার এক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দুআর কথা বলা হলো। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট, আমার সন্তুষ্টি লেগে আছে তার সাথেই।

সন্তুষ্টি

ধৈর্য সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়টি যখন শেষ করলাম, তখন আমার অভ্যন্তর থেকে একটি আওয়াজ এলো। বলা হলো, কদর বা ভাগ্যলিপির ওপর ধৈর্যধারণের কিছু ব্যাখ্যা করার সুযোগ দাও। সেখানে শুধু কিছু উদাহরণ দিয়েই আলোচনার সমাপ্ত করেছ।

আর সন্তুষ্টির অবস্থা নিয়েও কিছু বর্ণনা দাও। কারণ, সন্তুষ্টি যেন এমন এক প্রভাতী মৃদুমন্দ বাতাস, যার কথা শুনলেও আত্মার আরাম হয়।

আমি বললাম, তবে হে আওয়াজকারী, উত্তর শুনে নাও। এর সঠিকতাও বুঝে নাও।

পরিচয় ও নৈকট্যের প্রতিফলে আহৃত এক বোধের নাম হলো সন্তুষ্টি। তুমি যদি আল্লাহকে যথার্থভাবে চিনতে পারো, তবে তার সকল ফয়সালায়ই সন্তুষ্ট হবে। ভাগ্যের ফয়সালায় অনেক সময় কিছু তিক্ততা ও অপ্রিয়তা থাকে, কিন্তু আনুগত্যকারী বান্দা নিজের কষ্ট সত্ত্বেও এগুলোতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যারা আরেফ– আল্লাহর পরিচয়ে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, তাদের কাছে পরিচিতি ও নৈকট্যের মিষ্টতার কারণে আল্লাহ তাআলার কোনো ফয়সালাই আর তিক্ত থাকে না। খোদার সকল ফয়সালাতেই তাদের সন্তুষ্টি। তাদের আনন্দ ও সম্মতি।

এভাবেই পরিচিতির মাধ্যমে তারা মুহাব্বত ও ভালোবাসার দিকে ধাবিত হয়। অবশেষে জীবনের সকল তিক্ততাই মিষ্টিতে পরিণত হয়। যেমন এক কবি বলেন,

عذابه فيك عذب　　وبعده فيك قرب

وأنت عندي كروحي　　بل أنت منها أحب

حسبي من الحب أني　　لما تحب أحب

তার শাস্তিও তোমার কাছে মিষ্ট, তার দূরত্বও তোমার কাছে আনে নৈকট্য।

তুমি আমার কাছে আমার আত্মার মতোই, বরং তোমাকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি।

> আমার ভালোবাসার জন্য এটাই যথেষ্ট– তুমি যা ভালোবাসো, আমিও তা-ই ভালোবাসি।

কিন্তু আমার অভ্যন্তর চিৎকার করে বলে উঠল, তুমি আমাকে বলো, আমি আসলে কিসের ওপর সন্তুষ্ট হব? তুমি আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও– আমি কি তার পক্ষ থেকে অসুস্থতা ও দরিদ্রতার প্রতি সন্তুষ্ট হব? আমি কি তার ইবাদতে অলসতার প্রতি সন্তুষ্ট হব? আমি তার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকার প্রতি সন্তুষ্ট হব? তুমি আসলে আমার জন্য নির্ধারণ করে দাও, কোনগুলোর প্রতি আমার সন্তুষ্টি থাকবে আর কোনগুলোর প্রতি থাকবে না।

আমি বললাম, তুমি যে প্রশ্ন করেছ, তা খুবই সুন্দর প্রশ্ন। তাহলে এবার শোনো–

স্রষ্টার পক্ষ থেকে যা আসে, তার সকল কিছুর প্রতিই সন্তুষ্ট থাকবে। কিন্তু অলসতা উদাসীনতা ও ইবাদতে পশ্চাৎপদতা– এগুলো সবই তোমার পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমার এই অনুচিত কাজের প্রতি তুমি কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকবে না। তোমার ওপর তাঁর যে হকগুলো রয়েছে, সেগুলোর বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকবে। যে কাজগুলো তার নৈকট্য অর্জনে সহজ হয়, সেগুলোর ওপর অটল ও অনড় থাকবে। কিন্তু চেষ্টা-পরিশ্রমের বিষয়ে কোনো ধরনের অবহেলার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট থাকবে না।

যা শুধু স্রষ্টার পক্ষ থেকেই হয়, যেখানে তোমার কোনো অংশ নেই, তেমন সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। যেমন একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়– হজরত রাবেয়া বসরি রহ.-এর নিকট একজন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলো, লোকটি ময়লার স্থান থেকে খাবার খুঁটে খায়। তার সম্পর্কে বলা হলো, 'সে কি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে পারে না যে, আল্লাহ যেন তার জন্য সুন্দরভাবে খাদ্যের সংস্থান করে দেন।'

এ কথা শুনে হজরত রাবেয়া বসরি রহ. বললেন, সন্তুষ্ট ব্যক্তি কখনো বিকল্প খোঁজে না। যে ব্যক্তি মারেফাতের স্বাদ পেয়ে গেছে, সে ব্যক্তি তার মাঝে ভালোবাসার স্বাদ পেয়ে গেছে। তাই সে তাঁর যেকোনো কাজের প্রতিই সন্তুষ্টি ও সম্মতি প্রকাশ করে।

সুতরাং প্রথমে ইলমের দলিলের মাধ্যমে মারেফাত অর্জনে চেষ্টা-পরিশ্রম করতে হবে। এরপর মারেফাতের চাহিদা অনুযায়ী ইবাদতের মধ্যে মোজাহাদা করতে হবে। আশা করা যায়, এটিই তার মধ্যে মুহাব্বত ও ভালোবাসার সৃষ্টি করবে। আর বান্দার জন্য তখন তা কতই না সুন্দর ও মজাদার হবে।

হাদিসে কুদসিতে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ قَالَ ...وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ...

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, বান্দা যে কাজের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো আমি তার ওপর যে ফরজ অর্পণ করেছি, তা আদায় করা। এমনিভাবে সে নফলগুলোর মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে– একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে। আমি তার দৃষ্টি হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে।

[সহিহ বোখারি : ৬০২১]

বান্দার জন্য এর চেয়ে বড় খুশি ও আনন্দের আর কী হতে পারে!

জীবিকা অর্জনের পথ ও পদ্ধতি

অধিকাংশ আলেমের কৈশোর ও যৌবনের শুরুর সময় ইলম অন্বেষণে মগ্ন থাকায় জীবিকা অর্জনের কাজ থেকে তাদের বিরত থাকতে হয়। কিন্তু শিক্ষা সমাপ্তির পর তাদেরও জীবিকার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু এখন আর বায়তুল মাল থেকে তাদের কাছে কিছু আসে না; আবার পরিচিত-আহবাব-বন্ধুদের থেকেও যা আসে, তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয় না। তখন বাধ্য হয়েই তাদেরকে বিভিন্ন লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার মুখোমুখি হতে হয়।

এটার মধ্যে আমি দুটি হিকমত দেখতে পাই।

১. এই অপদস্থতার মাধ্যমে নিজেদের অহংকারকে দমিয়ে রাখার শিক্ষা নেওয়া।

২. সওয়াবের মাধ্যমে নিজেদের উপকৃত করা।

অন্তরকে স্বস্তিতে রাখা

জাহেদদের মধ্যে একটি দল আছে, যারা আলেমদের বৈধ জিনিসের দিকে অগ্রসর হওয়াকে দোষারোপ করে। তারা তাদের মূর্খতার কারণেই এমনটি বলে। তাদের কাছে যদি ইলমের দৌলত থাকত, তাহলে তারা এভাবে আলেমদের দোষারোপ করত না।

আরেকটি কারণ হতে পারে—মানুষের মেজাজ ও স্বভাব এক রকম নয়। কিছু মানুষ কঠিন ও সংগ্রামী জীবনযাপন করতে পারে। কেউ আবার কঠোর জীবন সইতে পারে না। সুতরাং কারও জন্য নিজের সক্ষমতার মানদণ্ড দিয়ে অন্যকে পরিমাপ করা উচিত নয়।

তবে হ্যাঁ, আমাদের একটি মানদণ্ড রয়েছে—আর তা হলো শরিয়ত। শরিয়তের মধ্যে কিছু বিধানে সহজতা রয়েছে, আবার সহজতার সুযোগ গ্রহণ না করে কঠিনতার ওপর আমল করার বৈধতাও রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি কোনো বিধানের ক্ষেত্রে সহজতার ওপর আমল করে, তাহলে তাকে মন্দ বলা বা তিরস্কার করা উচিত নয়। কারণ, কখনো কখনো কঠোরতা বাদ দিয়ে সহজতার ওপর আমল করাই উত্তম—সার্বিক উপকারিতার বিষয় প্রাধান্য দিয়ে।

জাহেদরা যদি জানত, ইলমের দ্বারা আল্লাহর যে মারেফাতের সৃষ্টি হয়, তার কারণে অন্তরসমূহ তার ভয়ে সচেতন থাকে, তাহলে তারাও শরীর সংরক্ষণের দিকে মনোযোগী হতো– যাতে শরীর নামক বাহনটি আরও শক্তিশালী হয়।

ইলম ও আমলের মাধ্যম হলো অন্তর ও চিন্তা-ফিকির। যখন মাধ্যম স্বাচ্ছন্দ্য ও যথার্থ হবে, তখন আমলও শ্রেষ্ঠভাবে আদায় হবে। এটি এমন এক বিষয়– যা ইলম ছাড়া বোঝা যাবে না।

ইলম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ থাকার কারণে, তারা যেগুলো জানে না, সেগুলোকে অস্বীকার করে বসে। অন্যায় মনে করে। এবং ধারণা করে– ইবাদতের মূল লক্ষ্যই বুঝি শরীরকে ক্লান্ত করা এবং খাদ্য-উপকরণ না থাকা। অথচ তারা বোঝে না, সচেতনভাবে ভয় করার জন্য একটি স্থির অন্তর ও সুস্থতারও প্রয়োজন আছে।

যেমন, জনৈক ব্যক্তি বলেন, روحوا القلوب تعي الذكر—অন্তরকে স্বস্তি দাও, সেই জিকিরকে বাঁচিয়ে রাখবে।

সুফিতন্ত্র এবং মূর্খতার প্রসার

জগতে অস্তিত্বশীল জিনিসের মধ্যে ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই। আর এটা হবেই বা না কেন, এটাই হলো সকল কিছুর দলিল? ইলম না থাকা মানে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা।

শয়তানের গোপন চক্রান্তের মধ্যে একটি হলো, মানুষের অন্তরে সাধারণ ইবাদতকে সুশোভিত করে তোলা—যাতে করে সে যেন তাকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত ইলম থেকে বিরত রাখতে পারে।

এমনকি আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একটি দলকে শয়তান এই ধোঁকার মধ্যে ফেলেছিল। এ কারণে তাদের অনেকেই তাদের কিতাব মাটির নিচে দাফন করে দিয়েছিলেন। কেউ সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিলেন তাদের কিতাব।

যারা এমনটি করেছিলেন, আমি তাদের ব্যাপারে সুধারণা রেখে বলি, তাদের সে কিতাবগুলোর মধ্যে হয়তো কোনো অশুদ্ধ মত বা কথা ছিল, সে কারণে তারা এগুলোর প্রচার-প্রসার পছন্দ করেননি। নতুবা তার মধ্যে যদি বিশুদ্ধ

ইলম থাকে, যার পরিণাম ভালো, তবে তো তা পুড়িয়ে ফেলা কিংবা সমুদ্রে নিক্ষেপ করার অর্থ সম্পদের বিনষ্ট করা—যা জায়েয নয়।

ইবলিস এমন চক্রান্তে কিছু সুফিকেও ফেলেছিল। এ কারণে তারা তাদের ছাত্রদের লেখার জন্য দোয়াত-কলম রাখতে নিষেধ করতেন। এ ব্যাপারে জাফর খুলদি একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আমি এক মজলিসে বললাম, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য যদি আমার সুফিত্ব চলে যাওয়ার কথা বলা হয়, তবে আমি আমার সুফিত্বের অক্ষুণ্নতার ক্ষেত্রে অঢেল প্রমাণ তোমাদের নিকট উপস্থিত করতে পারি, যা আমি আবুল আব্বাস আদ-দাওরির মজলিসে বসে লিখেছি।

তখন এক সুফি দাঁড়িয়ে বলল, 'এসব কাগুজে লেখার কথা ছাড়ো, তুমি আমাদের কাছে রুহানি ইলম নিয়ে এসো।

মজলিসের মধ্যে এ সময় আমি এক সুফির হাতেও একটি দোয়াত দেখতে পেলাম। হঠাৎ আরেক সুফি তার দিকে কটাক্ষ দৃষ্টি হেনে বলল, 'তোমার সতর ঢাকো' [দোয়াত-কলম]। এরপর তারা আমার নিকট শিবলীর কবিতা আবৃত্তি করে বলল,

إذا طالبوني بعلم الورق   برزت عليهم بعلم الخرق

তারা যখন আমার নিকট কাগজের ইলম অন্বেষণ করল,
আমি তখন তাদের নিকট রুহানি ইলম নিয়ে আবির্ভূত হলাম।

এটা হলো ইবলিসের এক গোপন চক্রান্ত। তাদের ওপর ইবলিস তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করেছে। ইবলিস এটা করেছে দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। যেমন–

১. ইবলিস চেয়েছে তারা যেন এভাবেই অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যেই হেঁটে চলে।

২. প্রতিদিন পৃথিবীতে যত ইলম বাড়ছে, তারা যেন সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা থেকে বিরত থাকে।

ইবলিস এভাবেই ইলমকে মানুষ থেকে গোপন রাখতে চায়। কারণ, ইলম মানুষের ঈমান ও মারেফাতকে শক্তিশালী করে। তার আমল-আখলাকের ভুলগুলো ধরিয়ে দেবে। বিশেষ করে, ইলম জানা থাকলে তখন সে রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের পথ-পদ্ধতিকে পর্যবেক্ষণ করে 'সিরাতে মুস্তাকিমে' উঠে পড়বে। ইবলিসের হলো এই ভয়।

সুতরাং ইবলিস-শয়তান তার গোপন চক্রান্তের মাধ্যমে চেয়েছে, মুমিনের সামনে ইলমের এই সকল রাস্তা বন্ধ করে দিতে। মানুষের সামনে প্রকাশ করেছে যে, আসল উদ্দেশ্য হলো আমল; নিছক ইলম নয়। আর এই ধোঁকায় আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে এটাও লুকিয়ে রেখেছে—ইলমও যে এক প্রকার আমল এবং ইলম ছাড়া আমল হয় না।

সুতরাং ইবলিসের এই গোপন চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, ইলমই হলো মূল স্তম্ভ। সর্বোচ্চ আলো। কখনো কখনো ইলমের এই পাতাগুলো উল্টানো নফল রোজা ও নামাজ থেকেও উত্তম। হজ ও জিহাদ থেকেও শ্রেষ্ঠ কর্ম।

ইলম থেকে বিমুখ থাকার কারণে বহু মানুষ নিজের ইবাদতের মধ্যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলেছে। অসংখ্য মানুষ নফল আদায় করতে গিয়ে নিজের অকাট্য ফরজকে নষ্ট করে ফেলছে। স্পষ্ট ওয়াজিবকে তরক করে নিজের ধারণাপ্রসূত উত্তম কাজে [অথচ শরিয়তে সেটা উত্তম নয়] নিমগ্ন রয়েছে। আহা! তার কাছে যদি ইলমের একটি আলোকবর্তিকা থাকত, তাহলে সে নিশ্চয় সঠিক পথটি পেত।

এতক্ষণ যা উল্লেখ করলাম, এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো। ইনশাআল্লাহ সঠিক পথটি পেয়ে যাবে।

নফসের প্রতি সহজতা করা

একবার আমার পাশ দিয়ে এমন দুজন ব্যক্তি অতিক্রম করল—যারা একটি মোটা ভারি ডাল বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। আর তারা গানের সুরে বিভিন্ন কবিতা ও রসাত্মক কথা বলছিল। প্রথমজন যে কথাটি বলছিল, দ্বিতীয়জন তার সেই কথাটিকে পূর্ণতা দিচ্ছিল কিংবা একই কথা সুরের মাধ্যমে তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। দ্বিতীয় জনও তা-ই করছিল। এভাবে তারা কোরাস গাইতে গাইতে ভারি ডালটি নিয়ে চলছিল।

আমি বুঝলাম, তারা যদি এভাবে উৎফুল্লতার সাথে কোরাস গাইতে গাইতে না চলত, তবে এই বোঝা বহন করা তাদের জন্য বেশি কষ্টকর হয়ে উঠত। কিন্তু তারা যখন আনন্দের সাথে এটা করছে, তখন তাদের অনুভবে বোঝা বহন করাটা হালকা হয়ে গেছে।

আমি তাদের এই কষ্ট লাঘবের কারণটি নিয়ে চিন্তা করলাম। লক্ষ করলাম—প্রথমজন যা বলছে, অন্যজনের চিন্তাটি তার সাথে সংযুক্ত থাকছে এবং তাকে উৎফুল্ল রাখছে। দ্বিতীয়জনও ঠিক একই উত্তর বা বিষয় তার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে প্রীতি ও নৈকট্যের সাথে তাদের রাস্তাও শেষ হলো—আবার বহনের কষ্টও তারা ভুলে থাকল।

এই ঘটনা থেকে আমি একটি আশ্চর্যজনক শিক্ষা গ্রহণ করলাম। আমি দেখি, মানুষ কখনো কখনো অনেক কঠিন ও ভারি কর্ম সম্পাদন করে। আর এ কঠিন কর্মগুলোর মধ্যে আরও কঠিনতর হলো, নফসকে তোষামোদ করে রাখা এবং সে যা পছন্দ করে কিংবা অপছন্দ করে, সে বিষয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা। কিন্তু এখন আমি অনুধাবন করছি, ধৈর্যধারণের এই কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে হবে নফসকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়ে এবং কোমল আচরণ করে।

যেমন কবি বলেছেন,

فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى

সে যদি আপত্তি করতে চায়, তবে তাকে প্রভাতের আলোর আশা দেখাও। আর তাকে ওয়াদা দাও সকালের সূর্যকিরণের উজ্জ্বলতার।

এ ধরনের একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করা হয় বিখ্যাত সুফি বিশর হাফি রহ.-এর। একবার তিনি এবং তার এক সঙ্গী সফর করছিলেন। পথিমধ্যে তার সঙ্গী পিপাসার্ত হয়ে গেল। লোকটি সামনে একটি কুয়া দেখে বিশর হাফিকে বলল, আমরা এই কুয়া থেকে পানি পান করে নিতে পারি না?

বিশর হাফি বললেন, এটা না, একটু ধৈর্য ধরো। সামনে আরেকটি কুয়া থেকে পান করা যাবে।

চলতে চলতে তারা যখন আরেকটি কুয়ার নিকট এসে গেলেন এবং লোকটি পানি পান করতে চাইল। বিশর হাফি তখন তাকে বললেন, এটা নয়, সামনের আরেকটি থেকে পান করব।

এমনিভাবে একটির পর একটি কুয়া থেকে পানি পানের আশা দিয়ে দিয়ে আরও সামনে চলতে লাগলেন তারা। অবশেষে গন্তব্যে পৌঁছার পর বিশর হাফি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, বুঝলে, এভাবেই আশায় আশায় একদিন দুনিয়ার সফর শেষ হয়ে যাবে– দুনিয়ার আশা তবুও পূরণ হবে না।'

এর থেকে আমরা একটি মূলনীতি বুঝতে পারি– তুমি তোমার নফসকে আশা দিতে থাকো। তার সাথে কোমল আচরণ করো। তাকে সুন্দর প্রতিশ্রুতি প্রদান করো। তুমি তার ওপর যে কষ্টগুলো বহন করাবে, সেগুলো যেন সে সইতে পারে। কিংবা আশায় আশায় তার সয়ে নেওয়াটা যেন সহজ হয়। যেমন আমাদের এক সালাফে সালেহ তার নফসকে বলতেন,

والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك.

> আল্লাহর কসম, তুমি যা পছন্দ করছ, তা থেকে তোমাকে বিরত রাখছি তোমার প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার কারণেই। আমি তোমার শত্রু নই; বন্ধু।

হজরত মুআবিয়া রা. বলতেন,

ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك.

> আমি যখনই নফসকে আল্লাহ তাআলার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছি, তখনই সে কাঁদতে শুরু করেছে। কিন্তু যখন তোষামোদ করে টেনে নিয়েছি, তখন সে হাসি-আনন্দের সাথে পথ চলেছে।

জেনে রেখো, এভাবে নফসকে তোষামদ করা এবং তার কষ্টের প্রতি কোমল আচরণ করা খুবই জরুরি একটি বিষয়। তুমি যদি এটি করতে পারো– আশা করা যায়, আশায় আশায় আমলের মধ্যে জীবনের সফর সে সমাপ্ত করতে পারবে। কষ্ট ও ক্লান্তিকে গায়েই মাখবে না।

মূলত এখানে কিছু ইশারা দেওয়া হলো। এর ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। আপাতত এটুকুর ওপরই আমল করে দেখো না!

কারি এবং বক্তার আপদ

চিন্তা করে দেখলাম, ওয়াজের মজলিসে এমন অনেক কিছুই চলে, যেগুলোকে সাধারণ মানুষ—এমনকি জাহেল আলেমগণও সঠিক ও সওয়াবের কাজ মনে করে—অথচ সেগুলো বর্জনীয় পরিত্যাজ্য ও বিদআত।

কারি সাহেব কখনো কখনো অতি উল্লাসের সাথে তেলাওয়াত শুরু করে এবং গানের মতো সুর করে পড়তে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল উচ্চারণ করে। এদিকে বক্তাগণও আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে সুর করে লাইলি-মজনুর কবিতা বলতে থাকে। কেউ বাহ্বা দেয়... কেউ তালি দেয়... আবেগে কেউ আবার নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলে। আর ধারণা করে– এগুলো বুঝি সওয়াবের কাজ। অথচ জানা বিষয় যে, ভুল উচ্চারণে এভাবে পড়া তো একজন গায়কের মতো হয়ে গেল, যে তার গানের সুর দিয়ে মানুষের অন্তর মজায়, নেশায় আপ্লুত করে এবং আনন্দ জোগায়। সুতরাং এভাবে তেলাওয়াত করা– যা ফাসাদ সৃষ্টি করে, তা কখনো সঠিক পদ্ধতি হতে পারে না।

এক্ষেত্রে বক্তাদেরও একটু হিসাব করে চলা এবং বলা উচিত।

এমনই আরেকটা বিষয় হলো লাশ দাফনকারীদের কর্ম। তারা লাশ দাফন করতে গিয়ে নিজেদের বেদনাদায়ক বিভিন্ন কথার মাধ্যমে আত্মীয়দের ব্যথা-বেদনা ও শোককে আরও উসকে দেয়– যাতে মহিলারা আরও বেশি ক্রন্দন করে। এভাবে তাদের অন্তর বিগলিত করে ফেলে– যাতে তাদেরকে আরও বেশি হাদিয়া ও তোহফা প্রদান করে। কিন্তু তারা যদি এটা না করে, আত্মীয়দেরকে ধৈর্য ও সবরের নির্দেশ দিত, তাহলে আর মহিলারা এমন ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করত না এবং তাদেরকে এত পরিমাণ হাদিয়াও দিত না। এ কারণেই তারা এটা করে না। অথচ দ্বীনের নির্দেশনা এমনই–

আত্মীয়দেরকে ধৈর্যের কথা বলা। এটা না করে তাদের শোককে আরও উসকে দেওয়া দ্বীনের স্পষ্ট বিরোধিতা এবং অবৈধভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পায়তারা।

ইবনে আকিল একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, একবার আমাদের নিকট এক লোকের শোকসংবাদ এলো যে তার পুত্র মারা গিয়েছে। শোনামাত্র আমাদের মাঝের এক কারি সাহেব বলে উঠলেন, يا أسفى على يوسف –হায়, ইউসুফের ওপর আফসোস!

আমি বললাম, এটা তো ঠিক হলো না। এর দ্বারা কোরআনের সাথে ঠাট্টা করা হলো। আর লোকটির আফসোসকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

বক্তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার গভীর মারেফাত ও মুহাব্বাতের ওয়াজ করেন। তখন তুমি দেখবে, সেই পরিচালক বা আয়োজনকারী, যে হয়তো নামাজের ফরজটাও ঠিকমতো জানে না, ওয়াজ শুনে সেও আল্লাহর মুহাব্বাতের দাবিতে তার শরীরের কাপড় ছিঁড়তে থাকে, বুক চাপড়াতে থাকে।

কোনো সুফির অবস্থা এমনও হয় নিজের ধারণামতো কল্পনায় কোনো সত্তাকে উপস্থিত করে—যেমন স্রষ্টাকে, এরপর তার যে বড়ত্ব রহমত ও সৌন্দর্যের কথা শুনেছে, সে কারণে তাকে পাওয়ার আগ্রহে ক্রন্দন করতে থাকে। অথচ তারা কল্পনায় যাকে উপস্থিত পায়– তিনি তো মাবুদ নন। কারণ, মাবুদ কখনো কল্পনায় ধরা দেন না। ধরা যায় না।

এসব বিভ্রান্তি ও ভুল ছড়ানোর পর সঠিক জিনিসটা জানা সাধারণ মানুষদের জন্য খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এসব চিত্তাকর্ষক বর্ণনা শোনার পর তারা আর সত্যের তিক্ততা গ্রহণ করতে চায় না। দ্বীনের ক্ষেত্রে আর উপকৃত হতে পারে না। এটাই হলো বক্তাদের আপদ।

কিন্তু যে বক্তা সত্যের ওপর রয়েছেন, তিনি লোকদেরকে বিভ্রান্তিকর কথা বলেন না। বরং হিকমত প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে তাদেরকে সত্যের দিকে উৎসাহিত করেন। এ ধরনের বক্তা ও বক্তব্য প্রশংনীয়।

আর মূলত বক্তৃতা হলো একটি বিশেষ শিল্প। স্থান ও পাত্রের ভিন্নতায় এটাকে যতটা সুন্দর ও উপযোগী করা যায়, ততই কার্যকর উপকার বয়ে আনে। কিছু

শ্রোতা ভালোবাসে সুন্দর উপস্থাপনা ও ভাষামাধুর্য। আর কিছু শ্রোতা পছন্দ করে সংক্ষিপ্ততা, ইঙ্গিত ইশারা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা। আর কোনো কোনো শ্রোতা ভালোবাসে সুর শের কবিতার ছন্দ এবং সুললিত কণ্ঠ।

কিন্তু এখন আসলে প্রয়োজন, মানুষকে দ্বীনের প্রতিটি মৌলিক বিষয়ে সঠিকভাবে জানানো ও উজ্জীবিত করা– সুন্দর ভাষায় এবং উপযোগী পদ্ধতিতে। একজন বক্তা অবশ্যই তার প্রধান কর্তব্য ও লক্ষ্যের প্রতি খেয়াল রাখবেন, নির্দিষ্ট বিষয়েই আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজন হলে খাবারে সামান্য লবণ মেশানোর মতো বৈধ কিছু হাসি-মজাক বা চিত্তাকর্ষক কথাও বলতে পারেন। এভাবেই তিনি শ্রোতাদেরকে ইবাদতের সংকল্পের দিকে উৎসাহিত করবেন। তাদেরকে সত্যের পথ চেনাবেন।

একবার আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. একটি মজলিসে আগমন করলেন। সেখানে তিনি হারেস মুহাসাবির আলোচনা শুনে অনেক ক্রন্দন করলেন। এরপর তিনি বললেন, হৃদয়ের গভীরে কোনো বিগলন আমাকে এভাবে কাঁদায়নি। কিন্তু পরিবেশটাই এমন হয়ে উঠেছিল যে, ক্রন্দনকে আবশ্যক করেছে।

কোনো কোনো মানুষের পরিবেশ কায়েম করার এই এক আশ্চর্য ক্ষমতা আল্লাহ তাআলা দিয়ে থাকেন। তাদেরকে সেটা সঠিক কাজে ব্যবহার করা উচিত।

সালাফে সালেহিনের কেউ কেউ ওয়াজ বা বক্তৃতার মাঝে ঘটনার মিশ্রণকে দূষণীয় মনে করতেন এবং যারা এমনটি করে, তাদের মজলিসে উপস্থিত হতে নিষেধ করতেন। অবশ্য আজকের দিনে সেটা আর সর্বক্ষেত্রে দূষণীয় নয়। কেননা, তখনকার সময়ে মানুষ ইলমচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সেখানে ঘটনা-কাহিনির উপস্থিতি তাদের জন্য ছিল একটি প্রতিবন্ধকতা। আর আজ ইলমের প্রতিবন্ধকতা অনেক বেড়ে গেছে। সুতরাং আজ ওয়াজের মজলিস– মানুষদের অধিক উপকার করে, তাদেরকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে এবং তাওবার দিকে ধাবিত করে। তাই ওয়াজের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ঘটনা ও কাহিনি বলতেও কোনো অসুবিধা নেই।

আসলে কী—ঘটনার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা হলো ঘটনা বর্ণনাকারীর মধ্যে—তিনি যেন মিথ্যা বা বানানো কাহিনি না বলেন। আল্লাহকে ভয় করে চলেন—তাহলেই চলবে।

আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলি সাব্যস্ত করা

সাধারণ মানুষের ওপর সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় হলো তাবিলকারীদের কথা, আল্লাহর বিভিন্ন গুণ এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়কে নাকচকারীদের কথা। সকল নবী আলাইহিমুস সালাম জীবনভর মানুষের অন্তরে আল্লাহর গুনাবলি প্রতিষ্ঠার জন্য মেহনত করেছেন– যাতে মানুষের অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়। কারণ, অন্তর হ্যাঁ-বাচক বিষয়ের সাথে বেশি একাত্মতা বোধ করে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার গুণাবলি নিয়ে আমাদের আজকের এই ভুলচর্চার কারণে সাধারণ মানুষ এমন শব্দ-বাক্য-কথা শোনে, যেগুলো তাদেরকে না-বাচকতার দিকে ঠেলে দেয়, তাদের অন্তর থেকে তখন হ্যাঁ-বাচকতার বোধই উঠে যায়। এটি তাদের জন্য খুবই ক্ষতিকর একটি বিষয়। অবশ্য আলেমদের কেউ কেউ ধারণা করেন, এই না-বাচকতা নবীগণ যেই হ্যাঁ-বাচকতা প্রচার করেছেন, সেটাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং সাধারণ মানুষ যে সমস্যার মধ্যে আপতিত হয়, তা থেকে উদ্ধার করবে।

আল্লাহ তাআলা নিজেও এমনটি করেছেন। প্রথমে হ্যাঁ-বাচকতা বর্ণনা করে পরে না-বাচকতা বর্ণনা করেছেন।

যেমন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আরশের ওপর 'ইসতিওয়া' সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে অন্তরসমূহ আল্লাহ তাআলার অবস্থিতি ও তার অস্তিত্বে বিষয়ে একাত্মতা বোধ করে ওঠে। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ويبقى وجه ربك –তোমার প্রতিপালকের 'চেহারা' অবশিষ্ট থাকবে। [সুরা রহমান : ২৭]। আরও বলেন, بل يداه مبسوطتان –বরং তার দু-হাত প্রশস্ত। [সুরা মায়েদা : ৬৪]। তিনি আরও বলেন, غضب الله عليهم–আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছেন। [সুরা আল ফাতহ : ৬]। আরও বলেন, رضى الله عنهم– আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। [সুরা মায়েদা :

১১৭]। একইভাবে তাঁর দুনিয়ার আসমানে অবতরণের বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন। আরও বলেছেন, قلوب العباد بين إصبعين বান্দাগণের অন্তর তাঁর দু-আঙুলের মাঝে। আরও বলেছেন, كتب التوراة بيده তাওরাত তিনি নিজ হাতে লিখেছেন। আরও বলেন, وكتب كتابا فهو عنده فوق العرش তিনি একটি কিতাব লিখেছেন, সেটা তার নিকট আরশের ওপর রয়েছে। এমনই আরও বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, যার তালিকা অনেক দীর্ঘ।

এধরনের হ্যাঁ-বাচক কথার মাধ্যমে সাধারণ থেকে সাধারণ, বাচ্চা-কাচ্চা সবার অন্তর হ্যাঁ-বাচকতায় ভরে গেছে। এগুলোকে যখন তারা ইন্দ্রিয় অনুভবের জাগতিক গুণাবলির কাছাকাছি ধরে নিয়েছে, তখন আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করে দিয়েছেন না-বাচক এই কথা— ليس كمثله شيء তাঁর মতো কোনো কিছু নেই। [সুরা শুরা : ১১]

এখন মানুষের অন্তরে যতসব কল্পনা-জল্পনা সৃষ্টি হয়েছিল আল্লাহ তাআলার গুণ সম্পর্কে, সবকিছু তিনি মুছে দিলেন। এবার শুধু হ্যাঁ-বাচকতার বিষয়গুলো নিঃকলুষভাবে শুধু তাঁর জন্যই অবশিষ্ট রয়ে গেল। এ কারণেই শরিয়ত প্রথমে হ্যাঁ-বাচক এবং পরে অসংগত বিষয়ে না-বাচকতা সাব্যস্ত করেছে।

কিন্তু মানুষ শুধু উল্টা পথে চলেছে। হয়তো না-বাচকতা বেশি লাগিয়েছে কিংবা নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে অনুচিত গুণ আরও সংযুক্ত করেছে।

যেমন এক কবি বলেন,

وفوق العرش رب العالمين، فضحك.

আরশের ওপর রয়েছেন আমাদের মহান প্রতিপালক। অনন্তর তিনি হেসেছেন।

এ কবিতা শুনে অন্য আরেকজন বলে বসল, আমাদের প্রতিপালক কি হাসেন? কবি বলল, অবশ্যই। নিশ্চয় তিনি আরশের ওপর এভাবে রয়েছেন। এমন রয়েছেন। এগুলো সে বলল, মানুষের অন্তরের মধ্যে হ্যাঁ-বাচকতা সুদৃঢ় করার জন্য।

এভাবে সৃষ্টির অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ তাআলার গুণাবলির হ্যাঁ-বাচকতার বিষয়টি অবিমিশ্রভাবে অনুধাবন করতে পারে না। তারা তাদের প্রত্যক্ষ বিষয়াদির সাথে আল্লাহর গুণাবলিকেও গুলিয়ে ফেলে। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে এই না-বাচকতার মাধ্যমে কামনা করা হয়– তারা যেন অন্তত তার অনুচিত বিশেষণগুলো বুঝতে পারে।

কিন্তু যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক হ্যাঁ-বাচকতার বোধ থেকে মুক্ত, তার ক্ষেত্রে যদি না-বাচকতার বিষয়গুলো দিয়ে শুরু করা হয়—যেমন আমরা যদি বলি, তিনি আসমানে নেই, আরশেও নেই, তার হাতের কোনো বর্ণনা সম্ভব নয়, তার কথা তার এমন একটি গুণ– যা তার সত্তার সাথে সংলগ্ন, আমাদের নিকট আসল কালামের কিছুই অবশিষ্ট নেই– এটা শুধু শব্দ। তার অবতরণ কল্পনা করা যায় না। তিনি এদিকে নন, ওদিকেও নন ইত্যাদি কথা যদি আমরা ক্রমাগত বলতে থাকি, তবে তার অন্তর থেকে কোরআনের মহত্ব মুছে যাবে এবং তার এই সীমাহীন না-বাচকতার রহস্যের মাঝে আল্লাহ তাআলার হ্যাঁ-বাচকতা প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আমাদের জন্য এটি একটি বড় অপরাধ। নবীগণ জীবনভর কষ্টক্লেশ করে যে বর্ণনাগুলো মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেগুলোকে এভাবে না-বাচকতার প্রাধান্যের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত করা অপরাধ ছাড়া আর কী! এ কারণে কোনো আলেমের জন্য হ্যাঁ-বাচকতায় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ প্রচলিত কোনো বিশ্বাসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা উচিত নয়। তাহলে সে এই বিশ্বাসটাকে আরও নষ্ট করবে এবং তার সংশোধন হয়ে পড়বে কঠিন।

একজন আলেম তো নিরাপদ থাকবে। কারণ, সে জানে, আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মধ্যে নতুন কোনো গুণ যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। নিজের মধ্যে 'ইসতিওয়া' বলতে যে ধরনের আকার ভাসে, আল্লাহ তাআলার 'ইসতিওয়া' এমন নয়। তার গুণের কোনো রূপান্তর হয় না, স্থানান্তর হয় না। তা স্পর্শও করা যায় না।

আর তিনি এটাও জানেন, বান্দাদের অন্তর দুই আঙুলের মাঝে থাকার অর্থ হলো, অন্তরের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকা। আর কোনো ব্যাখ্যায় যাওয়া উচিত নয়।

আর সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, কোরআন ও হাদিসে এই বিষয়গুলো ঠিক যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা সেভাবেই বিশ্বাস করে নাও। এর ব্যাখ্যার দিকে ধাবিত হয়ো না। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে যেকোনো প্রান্তিকতা ছেড়ে মানুষের অন্তরে একটি মৌলিক বিষয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। সালাফে সালেহিন সব সময় এই পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন।

এর সাথে আমাদের শরিয়তের নির্ধারণটাও বুঝতে হবে। নবীদের উদ্দেশ্যটাও অনুধাবন করতে হবে। শরিয়ত যেটাকে গুপ্তিত করে রেখেছে, সেটাকে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাকে তারা নিষেধ করেছেন। এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদর বা ভাগ্যলিপি নিয়ে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। এবং এ ব্যাপারে মতানৈক্য করতেও নিষেধ করেছেন। কারণ, এগুলোর ফলাফল দু-পক্ষকেই কষ্টের মধ্যে ফেলে দেবে। কারণ, এ সম্পর্কে আলোচনাকারী যখন পরিণামে এই সিদ্ধান্তে এসে যাবে যে, সবকিছু আল্লাহ তাআলাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং শাস্তিও নির্ধারিত হয়ে আছে। তখন আল্লাহ তাআলার ন্যায়-ইনসাফ নিয়ে তার ঈমান নড়বড়ে হয়ে উঠতে পারে।

আবার যদি আলোচনা শেষে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তিনি নির্ধারণ করেননি এবং তিনি ফয়সালা করেন না। এবার সে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়েই সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাবে। সুতরাং উত্তম হলো, এই সকল বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত না হওয়া।

এক্ষেত্রে হয়তো কেউ বলে বসতে পারে, এটা তো আমাদের প্রকৃত বাস্তবতা বুঝতে নিষেধ করার নামান্তর। বিশ্লেষণহীন বিশ্বাসের সাথে অবস্থানের আদেশ।

উত্তরে আমি বলব, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমার নিকট চাহিদা হলো সামগ্রিকতার ওপর ঈমান আনা। খুঁটে খুঁটে সকল কিছু বুঝে তার ওপর ঈমান আনার আদেশ তোমাকে দেওয়া হয়নি এবং এটা তোমার দায়িত্বও নয়। তাছাড়া তোমার বুঝশক্তিও এটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝতে সক্ষম নয়।

আল্লাহর খলিল হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে আবেদন করেছিলেন, أرني كيف تحي الموتى –আপনি কীভাবে মৃতকে জীবিত করবেন, আমাকে একটু দেখান। [সুরা বাকারা : ২৬০]

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত প্রাণীকে জীবিত অবস্থায় দেখিয়েছেন। তা ছিল বাহ্যিক দেখা। কিন্তু কীভাবে জীবিত করেছেন– তার অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া তিনি দেখাননি। কারণ, মানব নবীর ক্ষমতা সেটা অনুধাবন করতে অক্ষম।

আর আমাদের নবী– সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাকে পাঠানোই হয়েছে নিজের ওপর অবতারিত বিধি-বিধান মানুষের নিকট পৌঁছানোর জন্য, তিনি মানুষের শুধু স্বীকারোক্তি ও সামগ্রিক বিশ্বাসের ওপরই সন্তুষ্ট থেকেছেন। সাহাবিগণও ছিলেন এমন। তাদের থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তারা تلاوة ও متلو এবং قراءة ও مقروء নিয়ে আলোচনা করেছেন। এবং তারা কখনো বলেননি إستوى অর্থ استولى এবং ينزل অর্থ يرحم । তারা বরং সেই সামগ্রিক হ্যাঁ-বাচকতার ওপর সন্তুষ্ট থেকেছেন, যা মানুষের অন্তরের মধ্যে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিয়ে বিরাজ করে। এরপর ليس كمثله شيء –তার মতো কিছু নেই—আল্লাহ তাআলার এই কথার মাধ্যমে তারা তাদের সকল ধরনের খেয়াল, কল্পনা-জল্পনার লাগাম টেনে ধরেছেন।

আমাদের স্মরণ রাখা দরকার– কবরে আমাদের নিকট যে 'মুনকার' ও 'নাকির' ফেরেশতার আগমন ঘটবে, তারা তো আমাদের দ্বীনের শুধু মৌলিক নীতি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করবেন। কোনো সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মারপ্যাঁচ সেখানে নেই। তারা বলবেন, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? তোমার নবী কে?

এই অধ্যায়টি যে ব্যক্তি ভালোভাবে বুঝে নেবে, সে সকল ধরনের প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। তাশবিহ, তাজসিম ও তাতিল (আল্লাহকে নিষ্ক্রিয় ভাবা) ধরনের ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকবে। এবং অবস্থান করতে পারবে আমাদের সালাফে সালেহিনের মত ও পথের উপর। আল্লাহ আমাদের তাওফিকদাতা।

শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি

নিচের এই আয়াতটি যখন পড়লাম,

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ﴾

> (হে নবী, তাদেরকে) বলো, তোমরা বলো তো, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি এবং তোমাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরে মোহর করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো ফিরিয়ে দেবে? [সুরা আনআম : ৪৬]

আয়াতটি পড়ে আমার দৃষ্টিতে এমন একটি ইঙ্গিত উদ্ভাসিত হলো, যা আমি আগে কখনো অনুধাবন করিনি। আর সেটা হলো, এই আয়াত দিয়ে যদি আল্লাহ তাআলা বাস্তব কান ও চোখ উদ্দেশ্য নেন, তাহলে তো বলতে হয়, কান হলো চারপাশের শব্দ ও আওয়াজ শ্রবণের একটি উপকরণ। আর চোখ হলো দর্শনীয় বিষয়াবলি দেখার একটি উপকরণ। এই দুটি উপকরণ তাদের শক্তিকে কলব বা অন্তরে পৌঁছে দেয়– আর এর দ্বারা অন্তর অনুভব করে ও ধারণ করে। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের যা কিছুই শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির নিকট উপস্থাপিত হয়, সেটাকেই তারা কলব বা অন্তরের নিকট পৌঁছে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন নিষেধ করবেন, তখন আর এগুলো তাদের কাজ করবে না। অন্তর বা মস্তিষ্কের নিকট তাদের খবর পৌঁছে দেবে না।

এর দ্বারাও স্রষ্টার অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এগুলো তাদের স্রষ্টার আনুগত্যের প্রকাশ ঘটায় এবং তার বিরোধিতার ব্যাপারে শাস্তির ভয় করে।

আর যদি এর দ্বারা আল্লাহ অভ্যন্তরীণ শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির কথা উদ্দেশ্য নেন, তখন শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে– আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে সত্য দেখবে না– সত্য শুনবে না। অর্থাৎ তখন ব্যক্তির শাস্তিটা হবে অভ্যন্তরীণ। তার অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তর্চোখের শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে। তখন সে ব্যক্তি কিছু দেখবে, কিন্তু আসলে যেন সে কিছুই দেখেনি। সে শুনবে, কিন্তু আসলে সে যেন কিছুই শোনেনি। সে কী করবে—সে সম্পর্কে সে উদাসীন। তার থেকে কী চাওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে

বেখেয়াল। কোনো পরীক্ষাই তখন তার মাঝে কোনো প্রভাব ফেলবে না। কোনো উপদেশই তার মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না।

তার এমনই পরিণতি হবে যে– সে জানে না, সে কোথায় আছে? আবার কোথায় যাবে, জানে না তা-ও। তার কী উদ্দেশ্য, তা সে জানে না। প্রবৃত্তির অনুসরণে তাৎক্ষণিক লাভের দিকে সে অগ্রসর হয়। কিন্তু তার স্থায়ী ক্ষতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না। সে তার সঙ্গীর দ্বারা শিক্ষা নেয় না। সে তার বন্ধুর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে না। সর্বোপরি সে তার দীর্ঘ সফরের জন্য কোনো পাথেয় সংগ্রহ করে না।

যেমন এক কবি বলেন,

الناس في غفلة والموت يوقظهم   وما يفيقون حتى ينفذ العمر

মানুষ রয়েছে উদাসীনতার মধ্যে। অথচ মৃত্যু তাকে প্রতিদিন সতর্ক করছে। অথচ সজাগ ও সতর্ক হতে না হতেই জীবন হয়ে পড়ছে সমাপ্ত।

يشيعون أهاليهم بجمعهم   وينظرون إلى ما فيه قد قبروا

সে একে একে তার সকল আত্মীয়-পরিজনকে বিদায় দিয়ে আসছে। তাদেরকে কীভাবে কবরে দাফন করা হচ্ছে, দেখছে সেগুলোও।

ويرجعون إلى أحلام غفلتهم   كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا

এরপর তারা আবার তাদের উদাসীন মিথ্যা স্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন হচ্ছে। যেন তারা কিছুই দেখেনি। যেন তারা কিছুই দর্শন করেনি।

এটাই হলো অধিকাংশ মানুষের প্রকৃত অবস্থা। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের অন্তরের অনুধাবনের শক্তি ছিনিয়ে না নেন। আমরা তার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করি। কারণ, এটি মানুষের অবস্থাসমূহের সবচেয়ে ভীতিকর একটি অবস্থা। অনুধাবনহীনতার কারণে মানুষের সত্যে ফিরে আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা

প্রাজ্ঞজনরা প্রেম-ভালোবাসা নিয়ে, তার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে যে সকল কথা বলেছেন, আমি সেগুলোর ব্যাপারে দৃষ্টি প্রদান করলাম। এগুলো নিয়ে আমি একটি কিতাবও রচনা করেছি। কিতাবটির নাম দিয়েছি, ذم الهوى - প্রবৃত্তির নিন্দা।

সেখানে আমি ভালোবাসা নিয়ে অনেক প্রাজ্ঞজনের মন্তব্য উল্লেখ করেছি। যেমন, কেউ বলেছেন, ভালোবাসার সৃষ্টি হয় বেকার মনের চঞ্চলতা থেকে।

কিন্তু এ মতটি সকলে মেনে নেননি। এ কারণে কেউ বলেন, ভালোবাসার উদ্ভব ঘটে মানুষের সৌন্দর্য-প্রীতির কারণে।

অন্যরা বলেন, যারা বাস্তবতার চিন্তা ছেড়ে অলীক কল্পনায় হাবুডুবু খায়, তারাই শুধু ভালোবাসায় আপতিত হয়।

তবে এসব আলোচনা-পর্যালোচনার পর আমার অন্তরে এক আশ্চর্য রকমের চিন্তা এসেছে। চিন্তাটা হলো, প্রেমাস্পদের স্থির স্থিরতা ব্যতীত কোনো ভালোবাসাই স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়।

কারণ হলো, হৃদয়ের উদ্বেল আবেগ হয়তো কারও জন্য ভালোবাসার প্রাসাদ বানায়। সামান্য সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন নৈকট্য অর্জন হয়, তখন হয়তো ভিন্ন মানসিকতা, ভিন্ন জীবনবোধ কিংবা দীর্ঘ মেলামেশার কারণে প্রকাশিত হওয়া তার বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি দেখে অন্তর এসে হোঁচট খায়– ভালোবাসার প্রাসাদ যায় ভেঙে এবং খুব অল্পতেই সে অন্য কারও দিকে ধাবিত হতে চায়।

সুতরাং স্থির ও অপরিবর্তিত সত্তা ব্যতীত ভালোবাসার এমন কোনো আশ্রয় নেই, যে অবস্থাটির সাথে ত্রুটিহীনভাবে ভালোবাসা স্থির থাকতে পারে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, সকল মানব-মানবীর অস্তিত্বই ধ্বংসশীল এবং ত্রুটিযুক্ত এবং প্রতিনিয়ত তার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তাই কোনো বন্ধনই তাদেরকে একটি অবস্থায় বেঁধে রাখতে সক্ষম নয়। একারণে তাদের স্বভাব বা হৃদয়ের আবেগ যদি কোনো ব্যক্তির ভালোবাসার সাথে জড়িয়ে পড়ে, তারপরও তারা এটিকে একটি স্থির ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যেতে

সক্ষম হয় না। কারণ, প্রথমে বেশি আবেগ এবং কম জানাশোনার কারণে দোষক্রটিগুলো অগোচরে থেকে যায়। নির্ভাবনায় পারস্পরিক ভালোবাসায় নিমগ্ন হয়। কখনো বা হৃদয়কে আকর্ষণকারী কিছু গুণাবলির কারণেও দু-জন ব্যক্তির মাঝে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়ে পড়ে। যেমন, সৌন্দর্য, স্বভাবের নৈকট্য, মেজাজের সম্মিলন, সহানুভূতি, হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি। এগুলোও পরস্পরের মাঝে ভালোবাসার সৃষ্টি করে।

কিন্তু ভালোবাসার প্রকৃতি কখনো তার প্রাথমিক প্রচণ্ড আবেগ ও গতিময়তার সময় বোঝা যায় না। যেমন কর্তনের মুহূর্তে অনুভূত হয় না ব্যথার অস্তিত্ব। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এমন এক অস্থির বাসনা– পূর্ণতার বাসনা। ক্রটিহীন প্রাপ্তির বাসনা। কিন্তু এটা সে দুনিয়াতে প্রাপ্ত হয় না। কারণ, সে এমন কিছু কামনা করে, যা কোনো মানুষের মধ্যে পূর্ণভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে আবেগমথিত প্রাথমিক উত্তেজনা যখন কেটে যায়, একে একে তার সামনে নির্দিষ্ট মানব বা মানবীর ক্রটি ও অপূর্ণতাগুলো প্রকাশিত হয়ে পড়ে– তখন অন্তর দমে যায়। প্রবল উদ্ধত উদ্বেলিত ভালোবাসাও তখন ধীরে ধীরে নত করে আনে তার ক্লান্ত শ্রান্ত ডানা। এরপর যা বাকি থাকে– তা হলো অভ্যাস, প্রয়োজন ও লোকদেখানো আচরণ।

এই হলো মানুষ ও মাখলুকের ভালোবাসার ইতিহাস।

কিন্তু স্রষ্টার সাথে মানুষের অন্তরের ভালোবাসার বিষয়টি ভিন্ন রকম। এখানে তার সাথে আর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থিতি নেই। কোনো পরিবর্তন নেই। দোষ-ক্রটির কোনো বালাই নেই। তাই স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা কোনো সৃষ্টিজীবের ভালোবাসার মতো নয়। এটা শুধু বলে বোঝানোর জিনিস নয়।

স্রষ্টার প্রতি এই মারেফাতের ভালোবাসা কখনো এতটাই প্রবল ও প্রতাপী হয়ে ওঠে যে, স্রষ্টার ভালোবাসা তাদেরকে অন্য সকল ভালোবাসা ভুলিয়ে দেয়। অন্তরের নৈকট্য ও মারেফাতের শক্তিমত্তার কারণে পুরো মন-প্রাণ একেবারে তার ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। তখন তার ভালোবাসার অবস্থাটি হয় তেমন, যেমনটি হজরত রাবেয়া বসরি রহ. এই কবিতায় বলেছেন। তিনি বলেন,

أحب حبيبا لا أعاب بحبه   وأحببتهم من في هواه عيوب

> আমি এমন প্রিয়কে ভালোবাসি, যার ভালোবাসায় কোনো নিন্দা-মন্দ নেই। আর তুমি তাদেরকে ভালোবেসেছ, যেখানে শুধু দোষ আর দোষ।

এবার এক দরিদ্র জাহেদের ঘটনা বলি। তিনি একবার এক নারীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। হঠাৎ মেয়েটি তার চোখে ধরে। তিনি বিমুগ্ধ হন। তিনি মেয়েটির বাবার কাছে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব প্রদান করলেন। মেয়েটির বাবা প্রস্তাবে রাজি হলেন। তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার পর খুবই নতুন ও চমৎকার একটি কাপড় পরিধান করিয়ে দিলেন। এরপর যখন রাত হলো। রাত নীরব ও গভীর হলো। এটা ছিল মূলত জাহেদ ব্যক্তির নির্জন ইবাদতের সময়। রাতের কাঙ্ক্ষিত সময়। স্রষ্টার সাথে নির্জন সান্নিধ্যের সময়। একারণে হঠাৎ জাহেদ ব্যক্তিটি সকল কিছু ছেড়েছুড়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন– আমার কাপড় কোথায়? আমার কাপড় কোথায়? যা পেয়েছিলাম তা তো আমি হারিয়েছি। এই সুন্দর কাপড় আর নারী আমার জন্য নয়। এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

এটি ছিল সেই জাহেদের রাস্তায় এমন একটি হোঁচট, যা তাকে বুঝিয়েছে যে, রাস্তা থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে।

আল্লাহর মারেফাতের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে এই অবস্থা সংঘটিত হয়। আর ধ্বংসশীল মানুষের ক্ষেত্রে হয় এর উল্টো।

হজরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, তোমাদের কাউকে যদি কোনো নারী বিমুগ্ধ করে, তবে সে যেন তার মূত্রাশয়ের কথাও চিন্তা করে।

মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ কেন ঘটে?

কারণ, ক্ষুধার্ত মানুষের আকর্ষিত খাবার গ্রহণের সময় মুখের ভেতর নাড়াচারা করা ও গলধঃকরণ করার কষ্ট সম্পর্কে কোনো ভাবনা থাকে না। প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণে সহবাসের মুহূর্তে আপতিত অসুবিধা ও অপছন্দনীয় বিষয়ের কথাও মনে থাকে না। এমনকি নিজের থুথুকে গিলে ফেলার সময়ও কারও মনে থাকে না যে এটি খাদ্য নয়। অবশ্য এই মুহূর্তগুলোতে এই অসুবিধাগুলোর অবগুণ্ঠনের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ– নতুবা মানুষ তার স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারত না।

কিন্তু সচেতন অবস্থায়, উত্তেজনাহীন অবস্থায়– এগুলোর মধ্যে আর কোনো চাহিদা থাকে না। তখন জীবনের এই স্বাদ চাখা তার জন্য বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। প্রবৃত্তির এই নীচতার ওপর তার বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। দোষগুলো ভেসে উঠতে থাকে। দোষগুলো বড় হয়ে উঠতে থাকে। কান্তিমান দেহ বিবর্ণ হয়ে আসে। ঠিক এভাবেই প্রেমাস্পদের দোষগুলোর ওপর দৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ী প্রেমিকের অন্তর হতে প্রেম উধাও হতে থাকে। আর ঠিক একইভাবে মস্তিষ্কের স্থিরতা অনুযায়ী প্রেমের পারদও বাড়তে থাকে।

কবি মুতানাব্বি[৬৬] বলেন,

لو فكر العاشق في منتهى   حسن الذي يسبيه لم يسبه

> যে সৌন্দর্য প্রেমিককে ব্যাকুল বিমোহিত করে, সে যদি সেই সৌন্দর্যের শেষ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করত, তবে আর এই সৌন্দর্য তাকে মুগ্ধ করত না।

দুনিয়ার প্রেমিকদের অবস্থা এমনই। কিন্তু আরেফদের অন্তর সর্বদা আল্লাহর মারেফাতের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে আরও বেশি নৈকট্য ও ভালোবাসার দিকে ধাবিত হতে থাকে।

ভীত বান্দার প্রার্থনা

একবার এক সমস্যার কারণে আল্লাহ তাআলার নিকট আকুলভাবে দুআ ও প্রার্থনা করলাম। প্রার্থনার সময় আমার সাথে এক নেকবান্দাও শরিক হয়েছিলেন। পরে আমি এই দুআ কবুলের বাস্তব প্রভাব আমার মাঝে দেখতে পেলাম। সমস্যা থেকে মুক্ত হলাম।

তখন নফস আমাকে ডেকে বলল, এটা ওই সৎ বান্দার প্রার্থনার কারণে হয়েছে; তোমার প্রার্থনার কারণে নয়।

আমি তাকে বললাম, আমি স্বীকার করি আমার যত গোনাহ ও আমলের কমতি রয়েছে, তাতে দুআ কবুল না-ও হতে পারে। তবে আমি বলি কী–

---

[৬৬]. পুরো নাম: আবুত তীব আহমদ বিন হুসাইন বিন হাসান আলজুফি আলকুফি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত কবি। যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। শ্রেষ্ঠ মেধাবী। 'মুতানাব্বি' নামে অধিক প্রসিদ্ধ। ৩৫৪ হিজরি সনে তিনি নিহত হন। سير أعلام النبلاء : ১৬/১৯৯।

আমার কারণেই তো দুআটি কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, আমার সাথের সৎ ব্যক্তিটি আমার ধারণায় আমার চেয়ে বেশি ভালো, নিষ্কলুষ, পবিত্র। কিন্তু এদিকে নিজের গোনাহের অনুশোচনা নিয়ে আমার ছিল ভগ্ন হৃদয় এবং কম আমলের হীনম্মন্যতা। আর তিনি তার আমলে ছিলেন সন্তুষ্ট।

কখনো কখনো নিজের এই কমতি ও নিঃস্বতা প্রকাশই দুআ কবুলের জন্য অধিক কার্যকর হয়। কারণ, আমি এবং তিনি– আমরা কেউ-ই আমাদের আমলের দোহাই দিয়ে আল্লাহর করুণা প্রার্থনা করিনি। সুতরাং আমি যখন আমার সমূহ গোনাহ স্বীকার করে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দরবারে বলেছি, হে মাওলা, তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাকে দাও, তখন আমার প্রার্থনার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা এটিকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। বরং কখনো কখনো দুআর মধ্যে নিজের সৎ আমলের দিকে দৃষ্টিপাতই দুআ কবুলের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং হে আমার নফস, তুমি আমাকে আর নিরাশ করতে চেয়ো না। কারণ, আমি তো আমার আমলের কমতি নিয়ে ভগ্নহৃদয় হয়েই আছি। তাছাড়া আমার ইলমের কারণে আমার যে আদব, নিজের কমতির কথা স্বীকার করা, নিজের বিপদে আমার যে আকুলকরা প্রার্থনা, কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে আল্লাহর অনুগ্রহের ক্ষেত্রে আমার যে দৃঢ় বিশ্বাস– নিশ্চয় এগুলো সেই বান্দার সাথে ছিল না (আল্লাহ তার ইবাদতের মধ্যে আরও বরকত বাড়িয়ে দিন)। এভাবে কখনো কখনো নিজের কমতি স্বীকার করে নেওয়াটাই দুআ কবুলের জন্য অধিক উপযুক্ত ও কার্যকরী হয়।

চিন্তার শীর্ষচূড়া

নিজের সীমাহীন পাণ্ডিত্যের দাবি করে– এমন এক স্বঘোষিত পণ্ডিতের নিকট আমি একবার আমার কিছু রচনা পড়ে শোনালাম। তিনি শুনলেন। কিন্তু একসময় খেয়াল করলাম– তিনি আমার লেখার প্রতি তেমন একটা আকর্ষণ বোধ করছেন না, মন দিয়ে শুনছেন না। বিষয়গুলোর গভীরতা বোঝারও চেষ্টা করছেন না। পরিণামে আমার বাকি রচনাগুলো তাকে শোনানো বন্ধ করে দিলাম এবং মনে মনে বললাম, এটা হলো এমনই এক অমীয় সুধা, এ ব্যাপারে পিপাসার্ত ব্যক্তিই শুধু তা পান করতে সক্ষম হবে।

এ ঘটনায় আমি একটি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। যেমন, তিনি যদি আমার রচনাগুলো শুনতেন, বুঝতেন এবং লেখার কারণে আমার প্রশংসা করতেন, তাহলে আমার নিকট তার গুরুত্ব বেড়ে যেত এবং আমি আমার আরও সুন্দর রচনাগুলো তাকে দেখাতাম। কিন্তু আমি যখন দেখলাম, তিনি এর প্রতি ততটা আগ্রহী নন এবং এর উপযুক্তও নন, তখন আমি সেগুলো তার থেকে ফিরিয়ে নিলাম এবং আমার মনোযোগও তার থেকে সরিয়ে নিলাম।

এর দ্বারা যে শিক্ষাটা পেলাম সেটা হলো, আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। এগুলোর মাঝে বিস্ময়কর অসাধারণ চমৎকার বিন্যাস দিয়েছেন। সুগঠিত শৃঙ্খলা দিয়েছেন। তারপর এগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই শুধু এটার দিকে দৃষ্টি দেয়, চিন্তা করে। এর শোভা-সৌন্দর্য দেখে এবং নিজের বুঝ ও অনুধাবনের পরিমাণ অনুপাতে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করে। তখন স্রষ্টাও তাকে ভালোবাসেন। তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

একইভাবে তিনি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন— যা অনেক মূল্যবান হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বর্ণনা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি এটা বোঝার জন্য চেষ্টা করে, আগ্রহ রাখে এবং নীরবে-নিভৃতে এগুলো নিয়ে চিন্তা করে, সে এই বাণীর মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং তার নিকট বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যে ব্যক্তি তার সকল চিন্তা-চেতনা শুধু বস্তুগত বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে, আল্লাহর বাণী ও সংবাদের দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না, এটার কোনো গুরুত্ব দেয় না— আল্লাহ তাআলা তাকে এই মর্যাদা অর্জনের পথ থেকে বঞ্চিত করেন। তার থেকে এটিকে সরিয়ে রাখেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি আমার আয়াত বা নিদর্শনাবলি হতে বিমুখ করে রাখব।

[সুরা আরাফ : ১৪৬]

উচ্চাকাঙ্ক্ষা

আমি একদিন দুআয় প্রার্থনা করে বললাম, হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ইলম ও আমলের শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে দিন। এবং আমার জীবন এতটা দীর্ঘ করে দিন, আমি যেন আমার সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারি।

তখন ইবলিসের পক্ষ থেকে একটি ওয়াসওয়াসা এলো। সে বলল, এরপর কী? এরপরেও তো মৃত্যুই এসে যাবে—না-কি? তবে আর এই দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করে লাভ কী?

আমি তাকে বললাম, দূর হ! তুই যদি বুঝতি আমার প্রার্থনার আড়ালে কী রয়েছে, তাহলে তো বুঝতি জীবনের এই দীর্ঘতা কিছুতেই অনর্থক নয়। এটি অনেক মূল্যবান।

আমি যদি জীবিত থাকি, প্রতিদিন কি আমার ইলম ও মারেফাত বাড়বে না? তাহলে আমার শস্যের ফলও বাড়তে থাকবে। তা আহরণের দিন শুকরিয়াও ব্যাপক হবে। আমি যদি আমার ২০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করতাম– সেটা কি আমাকে আনন্দিত করত? আল্লাহর কসম, কিছুতেই না। কারণ, আজ আমার প্রতিপালকের সম্পর্কে যতটুকু আমার পরিচয় ও মারেফাত রয়েছে, ২০ বছর বয়সে মারা গেলে আজকের দশভাগের এক ভাগও আমার জানা হতো না।

সবকিছুই এই জীবনের ফসল—এই দীর্ঘ যাপিত সময়ে আমি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ নিয়ে আরও বেশি জেনেছি। অন্ধ অনুসরণের হাত থেকে দূরদর্শিতার উচ্চভূমিতে আরোহণ করেছি। আরও এমন অনেক ইলম সম্পর্কে অবগত হয়েছি—যার মাধ্যমে আমার মূল্য বেড়েছে এবং আমার নিজেকে আরও বেশি পরিশুদ্ধ করতে পেরেছি।

এছাড়া আখেরাতের জন্য আমার শস্যরোপণ আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষক হয়ে ছাত্রদের মাঝে ইলম বিতরণের মাধ্যমে আমার সওয়াবের ব্যবসাকেও করেছি লাভবান। এভাবে ইলম বাড়ানোর মতো শ্রেষ্ঠত্ব আর কী হতে পারে?

আল্লাহ তাঁর রাসুলকেও নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾

(হে নবী!) তুমি বলো, হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন। [সুরা তোয়াহা : ১১৪]

এবং হাদিসে এসেছে–

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا.

হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার মৃত্যু কামনা না করে। এবং মৃত্যু তার নিকট আসার আগে সে যেন সে ব্যাপারে প্রার্থনাও না করে। কারণ, যখন তোমাদের কেউ মারা যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিনের দীর্ঘ জীবন তার শুধু কল্যাণই বৃদ্ধি করে।[৬৭]

এছাড়া অন্য এক হাদিসে এসেছে–

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَإِنَّ مِنْ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ.

হারেস ইবনে ইয়াজিদ রহ. বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো বান্দার দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হওয়াও তার জন্য একটি সৌভাগ্য। আল্লাহ তাআলা তখন তাকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রদান করেন।[৬৮]

সুতরাং হায়! আমার আফসোস, আমার যদি হজরত নুহ আলাইহিস সালামের মতো দীর্ঘ জীবন হতো! দুনিয়াতে ইলমের ভান্ডার কত বড় ও ব্যাপক। যখনই কেউ এখান থেকে কিছু অর্জন করে– সে আরও উচ্চ ও উন্নত হয়, মর্যাদাবান হয় এবং সে আরও বেশি উপকৃত হয়।

---

[৬৭]. সহিহ মুসলিম : ১৩/৪৮৪৩, পৃষ্ঠা : ১৮১– মা. শামেলা
[৬৮]. মুসনাদে আহমদ : ২৯/১৪০৩৭, পৃষ্ঠা : ৮৬– মা. শামেলা

উপকরণ ও উপায়

দুনিয়া দারুল আসবাব। এখানে স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়াবি উপায়-উপকরণের দরকার হয়।

আরেফদের অন্তরও কখনো কখনো পার্থিব উপকরণের দিকে আকৃষ্ট হয়—কিন্তু কখনোই সেগুলোর ওপর লেগে থাকে না। কারণ, যখনই তারা এগুলো সম্পর্কে একাকী নির্জনে চিন্তা করে, এগুলোর অক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হয়ে পড়েন। তাই যখনই তারা বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা পরীক্ষায় উপনীত হন, তখন তারা উপকরণের সকল প্রভাব একেবারে মুছে ফেলেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইরশাদ করেন,

﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا﴾

স্মরণ করো সেদিনের কথা, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের মুগ্ধ করে তুলেছিল। অনন্তর তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি।
[সুরা তাওবা : ২৫]

আয়াতের বর্ণনায় দেখা যায়—কিছু সময় সাহাবিদের অন্তরও বাহ্যিক উপকরণের দিকে ধাবিত হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা আসার পর তারা আবার সংশোধন হয়ে গিয়েছেন।

এভাবে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾

সেই দু-জনের মধ্যে যার সম্পর্কে তার ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, ইউসুফ তাকে বলল, নিজ প্রভুর কাছে আমার কথাও বলো।
[সুরা ইউসুফ : ৪২]

এভাবে কথাটা বলার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জেলখানায় সাত বছর অবস্থান করালেন। যদিও ইউসুফ আলাইহিস সালাম খুব ভালোভাবেই জানেন ও জানতেন, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তার মুক্তি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আর বাহ্যিক উপকরণের আশ্রয় নেওয়া শরিয়তেও বৈধ। তাই তিনি এভাবে বলেছেন।

কিন্তু এখানে আদবেরও একটি বিষয় রয়েছে। আল্লাহ চান, তার প্রিয় বান্দাগণ সবচেয়ে প্রিয় পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। অন্যদের জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় হবেন। একারণে অনেক সময় বৈধ বিষয়েও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আদব শিখিয়েছেন।

নতুবা উপকরণ হলো একটি পদ্ধতি। মানুষের জন্য তার ব্যবহার অপরিহার্য। তবে আরেফগণ কখনো এগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। কারণ, এগুলোর যে বাস্তবতা, আরেফদের সামনে তা যেমনভাবে প্রকাশিত, অন্য কারও নিকট তা সেভাবে প্রকাশিত নয়। সে কারণে যদিও তারা কখনো পুরোপুরি উপকরণের দিকে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন না, কিন্তু কখনো কখনো তাদেরও এদিকে ঝুঁকে পড়ার কারণে তাদেরকে তাদের অবস্থান অনুপাতে শাস্তি প্রদান করা হয়। কারণ, এটা আদবের খেলাফ। যেমন, আমরা হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিষয়টি চিন্তা করে দেখতে পারি। ঘটনাটি ছিল এমন–

তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আজ রাতে আমি আমার এক শ স্ত্রীর সাথে মিলিত হব। আর তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে।... কিন্তু এ কথা বলার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলেননি কিংবা বলতে ভুলে গেলেন। সে কারণে পরে দেখা গেল, মাত্র একজন স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে। এবং সেই স্ত্রীও একটি বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব করল।

এবার নিজের ঘটনার কথা বলি—

একবার আমার একটি বিষয়ে কিছু জিনিসের প্রয়োজন পড়ল। কিন্তু সেই উপকরণগুলো জোগাড় করতে হলে এক জালেম ব্যক্তির সাথে দেখা করতে হয় এবং তার সাথে তোষামোদের ভাষায় কথা বলতে হয়। আমি বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম—কী করা যায়? এমন সময় আমার নিকট একজন কারী সাহেব এলেন। কোরআন থেকে পড়তে শুরু করলেন। এবং তিনি এমন কিছু আয়াত পড়লেন, যা নিয়ে আমি খুবই আশাবাদী হয়ে উঠলাম। আমি যেন আমার পথ পেয়ে গেলাম। কারি সাহেব পড়ছিলেন—

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾

এবং (হে মুসলিমরা,) তোমরা ওই জালেমদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, অন্যথায় জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে এবং

> আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো রকমের বন্ধু লাভ হবে না আর তখন কেউ তোমাদের সাহায্যও করবে না। [সুরা হুদ : ১১৩]

এমন আকস্মিকভাবে আমার অন্তরের উত্তর প্রাপ্ত হয়ে আমি যেন বিস্ময়ে হতবুদ্ধ হয়ে গেলাম। আমি আমার নফসকে বললাম, খুব ভালোকরে শুনে রাখ, আমি এই জালেমের তোষামোদ করে সাহায্য প্রার্থনার ইচ্ছা করেছিলাম, তখন কোরআন আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, আমি যদি কোনো জালেমের নিকট নত হই কিংবা ঝুঁকে পড়ি, তাহলে যেই সাহায্যের জন্য আমি ঝুঁকলাম সেটা থেকে আমি বঞ্চিত হব।

ওই ব্যক্তির জন্যই কতই না সৌভাগ্য, যিনি আসল দাতাকে চিনিছেন এবং তাকেই সর্বক্ষণ ধরে আছেন। কারণ, সেটিই হলো মূল গন্তব্য। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদের উত্তম রিজিক দান করেন। তিনিই একমাত্র দাতা।

মুমিন ও গোনাহ

মুমিন কখনো গোনাহের ওপর বাড়ন্ত হতে পারে না। কারণ, এটি গোনাহের প্রবণতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কামনার আগুনকে প্রজ্বলিত করে। এবং পরিণামে অধঃপতিত করে।

কারণ, এর রয়েছে একটি দীর্ঘ পরিক্রম প্রবণতা– একজন মুমিন কিছুতেই তাতে আপতিত হতে পারে না। সে কখনো গোনাহ থেকে ফারেগ হয়ে তাতে আবার ফিরে যেতে পারে না। সে রাগান্বিত হলে, কিছুতেই প্রতিশোধে সীমালজ্মন করে না। আর অক্ষমতার আগেই তাওবা করে নেয়।

তুমি একবার ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের কথা চিন্তা করে দেখো– তারা মূলত ইউসুফকে রেখে আসার আগেই তাওবার নিয়ত করেছিল। তারা প্রথমে বলল, اقتلوا يوسف–তোমরা ইউসুফতে হত্যা করো। কিন্তু এরপর এটাকে তাদের নিকট অনেক নিষ্ঠুর মনে হলো। এ কারণে তারা এবার বলল, أو اطرحوه أرضا –কিংবা তাকে কোনো দূরবর্তী জায়গায় ফেলে এসো। এরপর তারা তখনই ভালো হওয়ার প্রতি দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তারা বলল, وتكونوا من بعده قوما صالحين–এরপর তোমরা খুব ভালো দল হয়ে থাকবে।

এরপর তারা যখন হজরত ইউসুফকে সাথে নিয়ে মরুভূমির দিকে বের হলো, তাদের অন্তরের হিংসার কারণে প্রথমে তারা তাকে হত্যা করারই ইচ্ছা করল। কিন্তু তাদের বড়ভাই বললেন, لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ –না, তোমরা তাকে হত্যা করো না। বরং তোমরা তাকে কুয়ার অন্ধকারে ফেলে রেখে এসো।

আর ফেলে রাখার মাধ্যমে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা তিনি করেননি। বরং ইচ্ছা করেছেন যে, কোনো মুসাফির দল তাকে তুলে নিয়ে যাবে। এবার সকলেই বড় ভাইয়ের কথাকেই মেনে নিল।

মানুষের ঈমান ও কর্মের মধ্যে এই ভিন্নতার কারণ হলো, অন্তরের কুঠুরির মধ্যে ঈমান তার শক্তি অনুযায়ী ঘুরতে থাকে। কখনো তা শক্তিশালী হয়ে সংকল্পে সুদৃঢ় হয়। কখনো দুর্বল হয়ে গোনাহের দিকে ধাবিত হয়। কখনো ভালো কাজ করে। কখনো আবার ছেড়ে দেয়। কিন্তু এভাবে যখন উদাসীনতা ও গাফিলতি প্রাধান্য বিস্তার করে, অব্যাহতভাবে গোনাহ সংঘটিত হতে থাকে, তখন মেজাজ ও স্বভাবও নষ্ট হয়ে যায়।

অতএব, এখনই... এখনই ঈমানকে আমলের জন্য জাগ্রত করে তোলো। গোনাহের জন্য তাওবা করো। তাহলে দেখবে, এই অনুশোচনাতেও এমন মজা ও আনন্দ পাবে– সেই গোনাহে লিপ্ত হওয়ার সময়ও যা তুমি পাওনি।

ইলমের ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা

শ্রেষ্ঠ কী?

আমার মতে—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয় হলো ইলমের মধ্যে প্রবৃদ্ধি লাভ করা। কারণ, যে ব্যক্তি যতটুকু জেনেছে, তার ওপরই যদি সে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এটাকেই যথেষ্ট মনে করে, তাহলে সে তার সিদ্ধান্তে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে এবং নিজের প্রতি নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধের কারণে অন্যের থেকে তার উপকৃত হওয়ার রাস্তা রুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা তার ভুলকে প্রকাশ করে তোলে, কিন্তু নিজের ব্যাপারে আত্মগর্বী হওয়ার কারণে সে কখনো সেই ভুল থেকে ফিরে আসার সৎসাহস দেখায় না।

কিন্তু সে যদি অন্যের থেকে উপকৃত হওয়ার মানসিকতা পোষণ করত, তবে এটা তাকে সকলের সমপর্যায়ে এনে দিত। এবং সেই ভুল থেকে ফিরে আসা তার জন্য সহজ হতো।

অপূর্ণ ইলমের একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন ইবনে আকিল রহ.। তিনি বলেন, আবুল মাআলি আল জুওয়াইনি রহ. বলেছেন,

إن الله تعالى يعلم جمل الأشياء ولا يعلم التفاصيل.

> নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সকল কিছু সামগ্রিকভাবে জানেন, কিন্তু প্রতিটি বিষয় বিস্তারিত খুঁটে খুঁটে জানেন না।'

আমি জানি না, ইলমের মাঝে কতটা কমতি ও মূর্খতা থাকলে এমন কথা বলা যায়!

এভাবে আরও অনেকেই তাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা ও একগুঁয়েমির কারণে সকলের সর্বসম্মত মতকে বর্জন করে ভিন্ন মত পোষণ করেছে। এবং এক্ষেত্রে তাদের কোনো শক্তিশালী দলিলও নেই। তাদের মুক্তির কি কোনো পথ আছে?

কেউ যদি মনে করে তার কিতাবের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে এবং সেগুলো সীমাহীন নয়, তবে তার জন্য উচিত হলো, সমসাময়িক গ্রহণযোগ্য আলেমদের সেটা দেখানো। এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ববোধকে বর্জন করা। তাহলে আশা করা যায়, তিনি সঠিক পথে থাকতে পারবেন। নতুবা ইলমের ওপর ব্যক্তির এই সীমাবদ্ধতা যদি নিজেকে প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে, তবে তার বিশুদ্ধতার পথ চির রুদ্ধ হয়ে পড়বে।

এমন অবস্থা থেকে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় চাই।

ইবাদতের মাধ্যমে অনুগ্রহ

আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইরশাদ করেন—

﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾

তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে বলে মনে করে। তাদেরকে বলে দাও, তোমরা তোমাদের ইসলাম দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছ বলে মনে করো না; বরং তোমরা যদি বাস্তবিকই (নিজেদের দাবিতে) সত্যবাদী হও, তবে (জেনে রেখো) আল্লাহই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে ঈমানের হেদায়াত দান করেছেন। [সুরা হুজুরাত : ১৭]

আমি এই আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এক আশ্চর্যতম অর্থের সন্ধান পেলাম। আর সেটা হলো, যেহেতু তাদেরকে মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে এবং এই জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা-ভাবনা করে মূর্তিপূজার দোষ-ত্রুটিগুলো তারা ধরতে পেরেছে এবং তারা বুঝতে শিখেছে যে, এগুলো কিছুতেই ইবাদত বা উপাস্যের উপযুক্ত সত্তা নয়, তাই তারা তাদের ইবাদত বা উপাসনাকে ফিরিয়েছে এমন সত্তার দিকে– যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

তাদের এই বুঝ-বুদ্ধি বা উপলব্ধিটা হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক সেই বুদ্ধি-বিবেকের প্রতিফলে– যার দ্বারা মানুষ চতুষ্পদ জন্তু থেকে ভিন্নতার দাবিদার।

তারা তো মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেকের নির্দেশানুসারে ঈমান আনল, কিন্তু যিনি এই জ্ঞান দান করেছেন– তার সম্পর্কেই থেকে গেল বেখেয়াল।

ঠিক এই একই ব্যাপার ঘটে প্রতিটি ধর্মানুসারী ইবাদতকারী ও ইলমে ইজতেহাদকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে। তারা তো সচেতনতার সাথে, বুঝ-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার সাথে সঠিক পথটি বেছে সেদিকে ধাবিত হয় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। কিন্তু এই বুঝ-বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা দিয়েছেন কে? বহু মানুষের অজ্ঞতা ও মূর্খতার মধ্য থেকে যিনি তাকে নির্বাচন করেছেন এবং যোগ্যতা প্রদান করেছেন– শুকরিয়া তো শুধু তারই করা উচিত। এগুলো তো তার

নিজের ক্ষমতার বলে হয়নি—স্রষ্টাই তাকে প্রদান করেছেন। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি সব সময় নিজের কর্মের দিকেই ধাবিত হয়। সকল কর্মে নিজের কৃতিত্ব দেখতে পাই।

এই জাতীয় একটি ঘটনা হলো সেই তিন ব্যক্তির ঘটনা—যারা একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড পাথর তাদের গুহার মুখে এসে পড়ে এবং বের হওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা নিরুপায় হয়ে বলে, এসো, আমরা আমাদের ভালো কাজের ওসিলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি। এরপর তারা একে একে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বলতে লাগল—আমি এটা করেছি... আমি এটা করেছি... আমি এটা করেছি... এই ওসিলায় খোদা হে, আমাদের এই বিপদ থেকে মুক্ত করো।

কিন্তু তারা যদি নির্ভুলভাবে নিয়ামতদাতার নিয়ামতের প্রতি লক্ষ করত এবং তিনি অন্যদের চেয়ে তাদের প্রতি সেই নিয়ামতগুলো প্রদানের মাধ্যমে যে অনুগ্রহ করেছেন, সে অনুগ্রহের ওসিলা দিত, তাহলে তাদের এই ওসিলা প্রদান আরও সুন্দর হতো।

কিন্তু তারা প্রার্থনা করছে নিজেদের কাজের ওসিলা দিয়ে। তারা এই ধারণা করছে যে, এগুলো তারাই করেছে তাদের শক্তিতে। এ কারণে তাদের প্রতিদান পাওনা হয়েছে।

এক্ষেত্রে তারা আসলে সঠিকতায় ছিল না। আর তাদের প্রার্থনায় যে সাড়া দেওয়া হয়েছে, তা তো তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অব্যাহত অনুগ্রহের ধারাবাহিকতা হিসেবেই। তাদের সেই আমলের ওসিলা এখানে মুখ্য নয়।

কোনো মুত্তাকি ব্যক্তির তাকওয়ার বিষয়টিও এমনই। অথচ কেউ কেউ তার তাকওয়ার কারণে নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভেবে চলতে থাকে। ফাসেক গোনাহগারদের হেয় জ্ঞান করে এবং তাদের ওপর নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করে। এটা আসলে আত্মশুদ্ধির পথে খুবই বিপর্যয়কর একটি অবস্থা। এমনকি এটি তাকে তাকওয়া থেকে বের করে দেয়।

অবশ্য আমি তোমাকে এটা বলি না যে, তুমি পাপাচারী-পাপিষ্ঠদের সামনে নিজেকে হেয়জ্ঞান করে চলাফেরা করো; বরং বলতে চাই, তুমি ভেতরে ভেতরে তাদের ব্যাপারে ক্ষুব্ধ থাকবে। বাহ্যিকভাবে উপেক্ষা করে চলবে।

এরপর তাদের 'তাকদির'-এর বিষয়টির দিকে দৃষ্টি দেবে। তাদের ব্যাপারে অহংকারী হবে না। কারণ, তাদের অধিকাংশই জানে না—তারা কার অবাধ্যতা করছে। তাদের একটি বড় অংশ মূলত অবাধ্যতার ইচ্ছাও করে না। তারা আসলে প্রবৃত্তির খপ্পরে পড়ে আছে। প্রবৃত্তির অবাধ্য হওয়া তাদের জন্য অসাধ্যের মতো হয়ে গেছে। এবং তাদের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে আল্লাহ তাআলার ক্ষমার বিষয়টাকেই প্রাধান্য দিয়ে বসে আছে। ক্ষমার ক্ষেত্রে তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণে সে তার গোনাহগুলোকে হালকা করে দেখছে। এটা ঠিক, তাদের এই কর্মগুলো এবং তাদের এই ধারণা তাদের কোনো ওজর বা আপত্তি হিসেবে গ্রহণীয় হবে না।

কিন্তু তুমি—হে তাকওয়ার দাবিদার, জেনে রেখো, তাদের বিপক্ষে দলিল থাকার চেয়ে তোমার বিপক্ষে দলিল রয়েছে বেশি এবং অবধারিতভাবে। কারণ, তুমি খুব ভালোভাবেই জানো, তুমি কার অবাধ্যতা করছ এবং ভালোভাবেই জানো, তুমি কী করছ!

বরং সতর্কতার সাথে আল্লাহ তাআলার কর্মপদ্ধতির দিকে লক্ষ রেখো—কখন তার করুণা কোন দিকে ধাবিত হয় এবং তার ক্রোধ কার ওপর আপতিত হয়—কেউ জানে না। হয়তো তুমিই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে আর কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক জুড়ে নিল! (আল্লাহ হেফাজত করুন)।

সুতরাং এটা খুব আশ্চর্যের কথা, কেউ তার অর্জিত ইলম দ্বারা অন্যদের উদ্বুদ্ধ করে, অন্যদের শেখায়– অথচ যিনি এই নিয়ামতগুলো তাকে দিয়েছেন, তাকেই সে ভুলে থাকে। এই যোগ্যতা যিনি দিয়েছেন, তার কথাই সে স্মরণে রাখে না।

বিদআত ও সাদৃশ্যপন্থীদের কাণ্ড

জেনে রাখো, আমাদের শরিয়তের মূল ভিত্তিগুলো খুবই মজবুত এবং এর নিয়ম-নীতিগুলো খুবই সুগঠিত ও সুশৃঙ্খলিত। এর মধ্যে কোনো দুর্বলতা ও অস্পষ্টতা নেই। এবং আগের আসমানি প্রতিটি শরিয়ত বা ধর্মও এমনটিই ছিল। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে বিপর্যয় ঘটিয়েছে মূর্খ এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবনকারীরা অর্থাৎ বিদআতিরা।

যেমন খ্রিষ্টধর্মে... তারা দেখল যে, হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হচ্ছে, তখন তারা এই অলৌকিক ঘটনাকে ধারণা করল, এটি মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। এ কারণে তারা তাকে ইলাহ বা উপাস্যের পর্যায়ে নিয়ে বসাল।

কিন্তু তারা যদি হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তা ও ব্যক্তি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখত, তাহলে তারা জানতে পারত– তিনি নিজেই অনেক অসম্পূর্ণতা, প্রয়োজন ও পরনির্ভরতার সমন্বয়ে গঠিত। অন্তত এতটুকু তো কারও ইলাহ বা উপাস্য না হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দলিল। তাহলে তার হাতে যা সংঘটিত হয়েছে, নিশ্চয় তা অন্যের কাজ। অন্য কোনো ক্ষমতাশালী সত্তা এগুলো তার মাধ্যমে সংঘটিত করেছেন। কিন্তু তারা এই সঠিক পথে চিন্তা না করায় বিভ্রান্ত হয়েছে।

এমনিভাবে তারা ধর্মের আরও বহু শাখা-প্রশাখাগত বিষয়েও বিকৃতি সাধন করেছে। যেমন বর্ণিত আছে, তাদের রোজা ছিল একমাস। কিন্তু তারা এর সাথে ২০ দিন বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। এরপর আরও বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের ইচ্ছেমতো এটিকে বছরে চার মাসে উত্তীর্ণ করেছে।

ঠিক একইভাবে ইহুদিরাও তাদের দ্বীনের মূল ও শাখাগত বিষয়ে বিকৃতি সাধন করেছে। এবং এই উম্মতের মধ্যে পদ্ধতিগত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত হয়েছে এই জাতিটি। যদিও একসময় তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই শিরক, সন্দেহ ও বড় ধরনের প্রকাশ্য বিরোধিতা থেকে মুক্ত ছিল। কেননা, তারা ছিল জাতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ও বুদ্ধিমান। কিন্তু শয়তান যখন তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, তারাও শয়তানি চক্রান্তে নিমজ্জিত হয়েছে। এরপর অবস্থা এতটাই ভয়াবহ হয়ে

উঠেছে যে শয়তানেরও এখন আর তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে হয় না। তারা নিজেরাই এক-একটি আস্ত শয়তান হয়ে অন্যদের ভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করে চলেছে।

বিকৃতির ঠিক এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর শেষ নবীর ওপর সর্বশেষ কিতাব অবতীর্ণ করলেন। সেখানে এই কিতাবের পরিচয় সম্পর্কে বলা হলো,

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

আমি এই কিতাবে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিনি। [সুরা আনআম : ৩৮]

এছাড়া যে বিষয়গুলো বুঝতে কষ্টকর, ব্যাখ্যার প্রয়োজন, সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে রাসুলের সুন্নাতের মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ তাআলা নিজেই এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

(হে নবী,) আমি তোমার প্রতিও এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষের সামনে সেইসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। [সুরা নাহল : ৪৪]

এভাবে কোরআন ও সুন্নাহের ব্যাখ্যার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দ্বীন সম্পর্কে বলেছেন,

تركتكم على بيضاء نقية.

আমি তোমাদের একটি স্বচ্ছ শুভ্র ও স্পষ্ট দ্বীনের ওপর রেখে গেলাম।[৬৯]

কিন্তু এরপর এমন একটি দলের আগমন ঘটল, তারা যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বর্ণনা ও ব্যাখ্যার প্রতি পরিতৃপ্ত নয়। তারা তাঁর সাহাবিদের পথ-পদ্ধতির অনুসরণে সন্তুষ্ট নয়। তারা নিজেরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করল। এবং নিজেরাও বিভিন্ন দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

তাদের মধ্যে একটি দল, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে শরিয়ত যা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করেছে, সেগুলো মানুষের অন্তর থেকে মুছে দিতে লাগল।

---

[৬৯]. ঠিক এই শব্দে হাদিসটি এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কোরআন ও হাদিস বিভিন্নভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলি মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে কিছু সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন,

ثم استوى على العرش، بل يداه مبسوطتان، ينزل إلى السماء الدنيا، ويضحك ويغضب... ইত্যাদি।

যদিও এই অভিব্যক্তিগুলো বাহ্যিকভাবে কোনো সাদৃশ্যের কল্পনাকে আবশ্যক করে তোলে; কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রথমে অস্তিত্ব প্রমাণ করা। এরপর শরিয়ত যখন দেখল এগুলো শোনার সময় অন্তরের মধ্যে সাদৃশ্যের এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, তখন এটাকে একবারে রহিত করে দেওয়া হলো এই বাণীর মাধ্যমে—

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

তার মতো কিছুই নেই। [সুরা শুরা : ১১]

এরপর মানুষের অন্তরে তার সাদৃশ্যহীনতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যতই কল্পনা আসুক—বাস্তবে তিনি কারও মতো নন। কিছুর মতো নন। এবং কোনো কিছুই তার মতো নয়। এভাবে মানুষেরা এই বিস্ময়কর কিতাব কোরআনের দিকে মনোনিবেশ করেছে। সাদৃশ্য থেকে মুক্তি পেয়েছে।

কিন্তু একটি সম্প্রদায় এগুলো নিয়ে তৃপ্ত থাকেনি। তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও সাদৃশ্যের পেছনে পড়েছে। তারা কেউ কোরআনের ব্যাপারে বলেছে, এটা 'মাখলুক' বা 'সৃষ্ট'। এটা বলে মানুষের অন্তর থেকে তার সমীহ সম্মান নষ্ট করেছে। আবার বলেছে এটার অবতীর্ণ হওয়া কল্পনা করা যায় না। কারণ, কীভাবে গুণান্বিত সত্তা থেকে গুণ বিচ্ছিন্ন হবে। আমাদের সমুখে লিখিত কোরআন নিছক কিছু কালির আঁচড়। এভাবে তারা একে একে শরিয়ত যা প্রতিষ্ঠা করে গেছে, সেগুলো মুছে ফেলতে শুরু করেছে। তারা বলতে শুরু করেছে, আল্লাহ আসমানে নেই। আবার আরশে রয়েছে—সে কথাও বলা যাবে না। আবার কেউ বলেছে, না, আরশেই আছেন। যেহেতু কোরআনে আছে আরশে থাকার কথা।

এভাবে তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যায় আপতিত হয়েছে। শরিয়তের সীমা অতিক্রম করেছে। তারা আল্লাহর কথা– ثم استوى على العرش –এই কথার ওপর সীমিত থাকেনি। বরং এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে গিয়েছে। আর তাতেই তারা বিভ্রান্তিতে আপতিত হয়েছে।

কেউ আবার শুধু বাহ্যিক অর্থ ধরেই বসে আছে। এটাও বিভ্রান্তিকর। আল্লাহর হাত, মুখ, রাগ, হাসি ইত্যাদি বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করেছে। যেন এটা সেই বোকা আরব জোহার গল্পের মতো। গল্পটি এমন—ছেলেটির নাম জোহা। ভীষণ বোকা। একবার তার মা দূরে কোথাও যাবার সময় তাকে বলে গেল, বাবা, 'احفظ الباب– দরজা সংরক্ষণ করে রেখো'। এ কথা বলে মা বাইরে বেরিয়ে গেল। মা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তারও কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হলো। মায়ের কথামতো সে ঘর থেকে দরজা উঠিয়ে সাথে নিয়ে হাঁটা দিলো। এদিকে চোর-চামারেরা ঘরের সকল মূল্যবান জিনিস হাতিয়ে নিল।

মা কিছুদিন পর বাড়ি ফিরে অবস্থা দেখে ছেলেকে তিরস্কার করে বললেন, বাবা, তুমি এটা কী করেছ? ঘরে চোর ঢুকল কীভাবে?

জোহা সরলভাবে বলল, কেন, তুমিই তো আমাকে দরজা সংরক্ষণ করার কথা বলেছ। তুমি তো ঘর সংরক্ষণের কথা বলোনি!

ঠিক এমনই তাদের বুদ্ধির জোর।

এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের কথা এই বোকা জোহার চেয়েও নিম্নতম। আল্লাহ দাঁড়িয়ে আছেন না বসে আছেন– তারা সেই ঝগড়া বাঁধায় এবং মত প্রকাশ করে যে, আল্লাহ দাঁড়িয়েই আছেন। প্রমাণ কী? প্রমাণ হলো, কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾

তিনি ন্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। [সুরা আলে ইমরান : ১৮]

কিন্তু তাদেরকে কে বোঝাবে এই 'দাঁড়ানো' তো নিছক 'দাঁড়িয়ে থাকা' নয়।

এসকল ব্যাপারে আমাদের গ্রহণ করতে হবে 'সালাফে সালেহিনের' পথ ও পদ্ধতি। হজরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন,

من ضيق علم الرجل أن يقلد في دينه الرجال.

> কোনো ব্যক্তির ইলমের অনুপস্থিতির প্রমাণ হলো সে দ্বীনের ক্ষেত্রে লোকদের অনুসরণ করে।

সুতরাং আমি তোমার ব্যাপারে বলি, তুমি যাদের ব্যাপারে অন্তরে বড় ধারণা রাখো, যাদেরকে সম্মান করো, ধরো, তুমি তাদের থেকে কোনো কিছু শুনলে আর কোনো যাচাই ছাড়া তার অনুসরণ করা শুরু করে দিলে– এটা উচিত নয়। কখনো যদি এমন ব্যক্তিদের থেকে এমন কিছু শোনো, যা বিশুদ্ধ মূলনীতির বিপরীত, তাহলে ধরে নাও, এটা বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে। কারণ, ইতিমধ্যেই তোমার অভিজ্ঞতায় সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনো ভুল মত ও মন্তব্য করেন না।

কিন্তু তারপরও যদি আমরা দেখি– এটি আসলে তিনিই বলেছেন এবং তা যদি দ্বীনের স্পষ্ট বিশুদ্ধ মূলনীতির বিপরীত হয়, তাহলে কিছুতেই তার অনুসরণ করা যাবে না– এমনকি তিনি যদি হজরত আবু বকর, হজরত উমর রাযিআল্লাহু আনহুমাও হন!

এটি এমন এক মূলনীতি—যার ওপর শক্তিমত্তার সাথে অটল ও অনড় থাকা আবশ্যক। এক্ষেত্রে মনের মাঝে সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠ ব্যক্তিও যেন তোমাকে সামান্যতম টলাতে না পারে।

এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনার উদ্দেশ্য হলো, এ কথাগুলো ভালোভাবে বুঝে রাখা যে, আমাদের দ্বীন-ধর্ম সর্বদিক দিয়ে নিরাপদ ও সংরক্ষিত। তবুও এর মাঝে কিছু সম্প্রদায় বাইরের কিছু প্রবেশ করাতে চায়– যা আমাদের কষ্ট দেয়। দ্বীনের ক্ষতি করে।

কিছু মূর্খ জাহেদ ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে এমন আজগুবি কিছু প্রবেশ করিয়েছে– যা মানুষের স্বভাবের বিরুদ্ধ। তাদের এই কাজগুলো দেখে দেখে মানুষরা দ্বীনের পথকে বড় কঠিন ও অসম্ভব ভাবতে শুরু করেছে।

আর এ ধরনের কথা ও কাজের অধিকাংশই ছড়িয়েছে ওয়াজের কেচ্ছা-কাহিনির মাধ্যমে। কারণ, সাধারণ ব্যক্তিরা তাদের ওয়াজের মজলিসে যায়, লোকগুলো হয়তো ভালোভাবে অজুও করতে পারে না, অথচ তাদের সামনে বর্ণনা হতে থাকে হজরত জুনায়েদ রহ.-এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথাগুলো, হজরত শিবলী রহ.-এর মারেফতি বাক্যগুলো– তখন এই সাধারণ ব্যক্তিটিও ভেবে

বসে, তাহলে দ্বীনের সঠিক পদ্ধতি হলো, লোকালয় বর্জন করা, পরিবার-পরিজনের জন্য উপার্জনের পেছনে না পড়া। নির্জনে একাকী আল্লাহর সাথে প্রার্থনায় মগ্ন হওয়া ইত্যাদি।

অথচ বাস্তবতা হলো, এই লোকটির নামাজের রোকনসমূহের জ্ঞান নেই। বিশুদ্ধভাবে কোরআন পড়তে পারে না। ইসলামের মৌলিক ধারণা নেই। কিন্তু তাকে সেই আলেম বা ওয়ায়েজ এই ইলমগুলোর কথা শিক্ষা দেয় না।

আর কেউ কেউ শরীরের স্বাভাবিক আহার গ্রহণ না করতে করতে শরীর শুকিয়ে ফেলে। অবশেষে তার শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ে। মস্তিষ্কে বিকৃতি আসে। দুর্বল অবসন্ন কল্পনায় আজগুবি অনেক কিছু দেখে। এমন অনেককে দেখেছি, যারা লোকালয় ছেড়ে নির্জনে বসবাস করছে। ক্লান্তিতে অবসন্ন। তাদের কাউকে যদি বলা হয়, কোনো অসুস্থকে দেখতে যাও। তখন সে বলে, এটা আমার অভ্যাস নয়।

আমরা বলি, আল্লাহ এমন অভ্যাসের প্রতি লানত বর্ষণ করুন, যা শরিয়তের বিপরীত। এমন আরও অনেক কেচ্ছা-কাহিনি ও শরিয়তবিরোধী উদ্ভট কাজগুলোকেই সাধারণ মানুষ শরিয়ত মনে করে বসছে। আর ভাবছে– আলেম ফকিহগণ যার ওপর রয়েছে, সেটা শরিয়ত নয়। এভাবেই তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে।

অথচ মূর্খ জাহেদদের দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপই করছে না– সে যা করছে তা শরিয়তে বৈধ কি না?

কেউ কেউ নিজের ভাব-মর্যাদা রক্ষার জন্য না জেনে, না বুঝেই বিভিন্ন ফতোয়া ও নির্দেশনা দিচ্ছে। যাতে কেউ বলতে না পারে 'শাইখ কিছু জানে না'।

শাইখ আবু হাকিম রহ. আমার কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমি একবার শরিফ দাহালাতির সাথে দেখা করতে তার নিকট উপস্থিত হই। সে সময় কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তিন তালাকপ্রাপ্তা এক মহিলা, যার একটি ছেলে সন্তান আছে, সে কি তিন তালাকের পর তার এই স্বামীর জন্য বৈধ হবে?

আমি বললাম, না, আল্লাহর কসম, বৈধ হবে না।

এ সময় শরিফ আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, আপনি চুপ করুন। আমি তো এখান থেকে বসরা পর্যন্ত সকল মানুষকে ফতোয়া দিয়ে আসছি, সে মহিলা বৈধ হবে!

শাইখ আবু হাকিম রহ. আমার কাছে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এক কামার লোক নিজেকে ভীষণ পণ্ডিত ভাবত। একবার তার নিকট একটি মেয়ে আসে। মেয়েটির বিয়ের প্রয়োজন। লোকটি তাকে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে করিয়ে দেয়। কিন্তু তার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

কিন্তু বিষয়টি যখন বিচারকের দরবারে উপস্থাপিত হয় এবং প্রমাণিত হয় যে, মেয়েটির ইদ্দত শেষ হয়নি, তখন বিচারক তাদের বিয়ে বাতিল করে দেয় এবং বিবাহসম্পন্নকারীকে তিরস্কার করে।

এরপর মেয়েটি সেই লোকটির কাছে এসে বলে, আমি তো এসবের কিছু জানি না। কিন্তু আপনি আমাকে এ অবস্থায় বিয়ে করিয়ে দিলেন কীভাবে?

লোকটি বলল, তুমি রাখো এসকল বাহ্যিক জ্ঞানের লোকদের কথা। তুমি নিশ্চয় মনের দিক থেকে পবিত্র—তাতেই তো পবিত্র!

একবার একজন ফিকাহবিদ আমার কাছে একজন আবেদ ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করে বলেন। লোকটি বহু বছর নামাজে 'সাহু সিজদা' দিয়ে আসছে। এবং সে মনে মনে বলে, হে আল্লাহ, আমি তো ভুল করিনি। কিন্তু এই 'সাহু সিজদা' দিই সতর্কতাস্বরূপ।

ফিকাহবিদ লোকটিকে বললেন, তোমার এভাবে পড়া সকল নামাজ নষ্ট হয়ে গেছে। কারণ, তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজের মধ্যে এমন অতিরিক্ত সিজদা দিয়েছ, শরিয়তে যার বৈধতা নেই।

এভাবে আমাদের দ্বীনে অতিরিক্ত যে বিষয়টি প্রবেশ করেছে– তা হলো সুফিতন্ত্র। তারা এমন সব পদ্ধতি অনুসরণ করছে, যার অধিকাংশই শরিয়তবিরোধী।

সাধারণ ধার্মিক মানুষও অনেক সময় অনেক বাড়াবাড়ি করে। আমাদের প্রায় সমসাময়িক এক ব্যক্তির ঘটনা বলি– আমরা তাকে চিনি। লোকটি একদিন জামে মানসুরে প্রবেশ করল এবং বলল, আমি আল্লাহর সাথে একটি প্রতিজ্ঞা

করেছিলাম; কিন্তু সেটা রক্ষা করতে পারিনি। এর শাস্তিস্বরূপ আমার নফসের ওপর এটা আবশ্যক করলাম যে, আমি ৪০ দিন কিছু খাব না।

এভাবে সে খাওয়া বন্ধ করে দিলো। দশদিন না খেয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল। শরীর দুর্বল হয়ে গেল। তবুও সে খাবার গ্রহণ করল না। অনেকের চাপাচাপি সত্ত্বেও সে খাবার গ্রহণ করে না। এরপর আরও কিছুদিন অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর কাছাকাছি উপনীত হয়। তবুও খাবার গ্রহণ করে না। এর কিছুদিন পর লোকটি মারাই গেল।

এই লোকটির কাণ্ড দেখো। সে যা করেছে, পুরো মূর্খতার বশে করেছে।

আবার কিছু সাধক ব্যক্তি নিজের চাহিদার সকল নিয়ামত ও স্বাদ-আস্বাদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখে। আর তাসাওউফ বলতে বোঝে অমসৃণ জামা, গামছা, প্যাঁচানো পাগড়ি– অথচ কোথা থেকে খাচ্ছে আর কোথা থেকে পান করছে, সেদিকে কোনো খেয়াল নেই।

কেউ আছে, নিজের সম্পদ ও সম্মান সংরক্ষণের জন্য আমির-উমারা, কর্তৃত্বশীলদের সাথে মেলামেশা করছে, রেশমি কাপড় পরিধানকারীদের সাথেও মিশছে, মদখোরদের সাথেও চলছে।

আর কেউ আছে, বছরের পর বছর এমন কথার ওপর আমল করে আসছে, যার অধিকাংশের কোনো ভিত্তি নেই।

কেউ আবার গান-বাজনা, নৃত্য ও খেলাধুলার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। এবং এর পেছনে বিভিন্ন যুক্তি দিতে শুরু করছে। কেউ বলছে, এর মধ্যে 'এশক'-এর ঝলক রয়েছে। কেউ বলছে, এতে করে মাহবুবের 'পরম সান্নিধ্য' প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল পথই নষ্ট বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত পথ। এতে করে সাধারণ লোকদের আরও নষ্ট করা হচ্ছে।

এ বিষয়গুলো নিয়ে আরও বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন। আমি এ বিষয়ে একটি কিতাব লিখেছি। সেখানে সুন্দরভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তুমি সেখান থেকে দেখে নিতে পার। কিতাবটির নাম تلبيس ابليس 'ইবলিসের চক্রান্ত'।

এ ব্যাপারে এখানেও বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, তুমি যেন স্মরণ রাখো, আমাদের দ্বীন হলো পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ। তুমি যদি এর সঠিক বুঝটি লাভ করতে পারো, তবে তুমি শুধু অনুসরণ করবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তার সাহাবিদেরকে। এবং বর্জন করবে সকল নবোদ্ভাবিত মিথ্যা পথ ও পদ্ধতি। তুমি তোমার দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো লোকের অনুসারী হবে না। আর এতটুকু যদি করতে পারো– তোমার জন্য আর কোনো নসিহত প্রয়োজন হবে না– ইনশাআল্লাহ।

তুমি বর্ণনাকারীদের বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক থাকো। সতর্ক থাকো মুতাকাল্লিমিনদের অনুচিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে, মূর্খ জাহেদদের দল থেকে, প্রবৃত্তির অনুসারীদের লোভ-লালসা থেকে। আমলহীন আলেমদের মত ও মন্তব্য থেকে। এবং ইলমহীন আবেদের কর্মকাণ্ড থেকে।

জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলা যাকে তার অনুগ্রহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন, বুঝ-বুদ্ধি দান করেছেন, অন্যের অনুসরণের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন এবং তার সময়ের কর্মবীর বানিয়েছেন, তিনি কখনো বাধাকে ভ্রুক্ষেপ করেন না। মানুষের মন্দ-নিন্দার দিকে তাকান না। তিনি তার শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে নিজের লাগাম বাঁচিয়ে স্পষ্ট পথে চলতে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং তোমাদেরকে মনের মাঝে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্ধ অনুসরণ থেকে মুক্ত করুন এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর রাসুল ও তাঁর রাসুলের সাহাবিদের অনুসরণের তাওফিক দান করুন। আমিন।

সময়ের পরিক্রমা

জেনে রেখো, সময় কখনো একভাবে চলে না। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

> এ তো দিন-পরিক্রমা, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। [সুরা আলে ইমরান : ১৪০]

সুতরাং কখনো দরিদ্রতা, কখনো সচ্ছলতা, কখনো সম্মান, কখনো অসম্মান। কখনো তুমি খুশি। কখনো খুশি শত্রুরা। কখনো কষ্ট, কখনো আনন্দ-সুখ। এর মধ্য থেকে সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে সকল সময় মৌলিক অবস্থায় অটল থাকে– আর তা হলো সর্বাবস্থায় তাকওয়া বা আল্লাহকে ভয় করে চলে।

এভাবে চললে কী হবে?

সে যদি ধনী হয়, তার দ্বীনের শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। আর যদি গরিব হয়, ধৈর্যধারণ করবে। যদি সুস্থতা ও শান্তিতে থাকে, সকল নিয়ামতের শোকর আদায় করবে। আর যদি অসুস্থ বা কোনো বিপদে আপতিত হয়, তবে তা সহ্য করবে।

অর্থাৎ কোনো অবস্থায় তার কোনো ক্ষতি হবে না। যুগের ঢেউ যদি তাকে উঠায়-নামায়, তার অনুকূল বা প্রতিকূল হয়—কখনো ক্ষুধা কিংবা পেটপূর্ণ তৃপ্তি, কিছুই তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।

কারণ, এসকল জিনিস সদা পরিবর্তনশীল। কখনো থাকে, কখনো থাকে না। কিন্তু 'তাকওয়া' হলো কোনো মানুষের মৌলিক সম্পদ—এটি তাকে সব সময় প্রহরীর মতো রক্ষা করে রাখে—সকল হোঁচট থেকে, পদস্খলন থেকে। এবং তাকে সকল সময় দ্বীনের সীমার মধ্যে সংরক্ষিত রাখে।

আর সাময়িক স্বাদ ও আনন্দ-উল্লাস যাকে বিভ্রান্ত করে, তাকওয়ার পথ ছেড়ে সাময়িক স্ফূর্তিতে যে গা ভাসায়, অচিরেই দেখা যায় তার অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই বিচ্যুতিই তাকে আরও বড় ক্ষতির মুখোমুখি করে ছাড়ে। আর তুমি যদি সর্বক্ষণ তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে চলো, তবে সংকীর্ণতার মাঝেও প্রশস্ততা দেখতে পাবে, অসুস্থতার মধ্যেও সুস্থতার স্বাদ

পাবে। এটি এমন এক ব্যাপার—তাড়াহুড়োকারীরা যার থেকে বঞ্চিত হয়। এবং ধৈর্যশীলদের জন্য এই পুরস্কার একেবারে নিশ্চিত ও নিরারুদ্ধ।

প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ

আমি একবার এক আশ্চর্য বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। ভাবলাম একটি মৌলিক বিষয়ে। বিষয়টা হলো, মুমিনের ওপর পরীক্ষার আবির্ভাব ঘটা। তাকে এমন বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়, যে বিষয়ে তার সক্ষমতা রয়েছে এবং আস্বাদন ও আকর্ষণ রয়েছে। এবং যা অর্জনে বা সংঘটনে তার কোনো কষ্ট পোহাতে হয় না। যেমন, নিরাপদ নির্জনে এমন প্রিয় কোনো জিনিস সহজলভ্য হওয়া– যাতে লিপ্ত হওয়া শরিয়তে নিষেধ।

আমি মনে করি, এসব স্থানে ঈমান এমনভাবে প্রকাশ পায়, যা দু-রাকাত নামাজের ক্ষেত্রেও হয় না। আল্লাহর কসম, হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ঠিক এই ধরনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তো এমন শ্রেষ্ঠত্বের কাতারে শামিল হয়েছেন। হে আমার সাথিভাই, একবার সেই নির্জন নিরাপদ চিত্তাকর্ষক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে দেখুন তো, এমন পরিস্থিতিতে তিনি যদি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করতেন, তিনি কি আজ এই সীমাহীন মর্যাদা ও পবিত্রতার প্রতীক হয়ে উঠতে পারতেন? এমনই হয়।

এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ কাউকে এভাবেই এত উপরে তুলে ধরেন! তাই প্রতিটি সাময়িক স্ফূর্তি ও ভোগের সময় পরিস্থিতির অনুধাবন নিজের জন্য ঢাল বানিয়ে নাও। সাময়িক উত্তেজনায় লিপ্ত হয়ে যেয়ো না।

কারণ, এভাবেই মুমিনের সামনে অবৈধ আস্বাদনের বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়। এগুলোকে যেন সে নফসের যুদ্ধের ময়দান হিসেবে দেখতে পায়; কিন্তু যখনই সে পরিণামের চিন্তা-ভাবনার সৈন্য পাঠাতে বিলম্বিত করবে, তখনই সে পরাজিত হবে।

এগুলোর মুখোমুখি ব্যক্তিদের যেন আমি নিজ চোখে দেখতে পাই, পরিস্থিতির ভাষা তাকে যেন ডেকে বলে, বাছা, তুমি তোমার স্থানে দৃঢ় ও অটল থাকো, নতুবা সাময়িক উত্তেজনায় তুমি তোমার নফসের জন্য যা নির্বাচন করবে, তা পরিণামে তোমার আফসোস, ক্রন্দন ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

তাছাড়া এই গোনাহের গর্তে আপতিত হওয়ার পর বাহ্যিকভাবে কেউ আর নিরাপদে ফিরে আসতে পারে না। কেউ যদি ফিরে আসেও, তবুও তার গায়ে পঙ্কিলতার আবর্জনা লেগে যায়। কত ব্যক্তিই তো এরপর আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। কিংবা তার পদস্খলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ভেবে দেখো, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছিল, অবস্থা এতটা স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছিল যে, হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করতে হয়েছিল– وتصدق علينا– আমাদের কিছু দান করুন।

কিন্তু কেউ যদি তাদের অবস্থা আর নিজেদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে একটি পার্থক্য দেখতে পাবে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের তাওবা কবুল করা হয়েছিল। নবীর মাধ্যমে তারা তাদের দুআ কবুল করিয়েছে।

কিন্তু আমাদের অবস্থা!

সুতরাং হে সাথিবৃন্দ, সাময়িক অবৈধ উৎফুল্লতার সময় নফসের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। নফসের লাগামকে দৃঢ়ভাবে আটকে ধরো।

অক্ষম মানুষের প্রার্থনা

একটি আশ্চর্য বিষয় নিয়ে চিন্তা করলাম। আর তা হলো– মুমিনের ওপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের বিপদ আসে। এ জন্য সে দুআ করতে থাকে। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য অনেক আকুতি-মিনতি করতে থাকে। কিন্তু হয়তো অনেক দিন এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না, দুআ কবুলের কোনো আলামত পাওয়া যায় না। অবশেষে যখন সে একেবারে হতাশার কাছাকাছি উপনীত হয়ে যায়, তখন তার অন্তরের দিকে লক্ষ করা হয়, তখনো সে যদি 'তাকদির'-এর ওপর সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ না হয়, তখন দ্রুত তার ডাকে সাড়া প্রদান করা হয়। কেননা, বিপদের এই মুহূর্তে এসেই ঈমানের চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়। উত্তীর্ণ হতে পারলে শয়তান পরাজিত হয়। পরীক্ষার এই অবস্থাতে এসেই মানুষের মর্যাদার উন্নতি কিংবা অবনতি প্রকাশিত হয়।

আল্লাহ তাআলা এদিকে ইশারা করে বলেন,

﴿حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

এমনকি রাসুল এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? জেনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটেই। [সুরা বাকারা : ২১৪]

এমনটাই ঘটেছিল হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে। প্রথমে তার একটি সন্তান হারায়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। এরপর তার ছোট আরেকটি সন্তান বিনইয়ামিনও তার সান্নিধ্যহারা হয়। এ সময়ও তিনি তার প্রতিপালকের অনুগ্রহের আশা থেকে নিরাশ না হয়ে বলেছিলেন,

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾

আল্লাহর প্রতি আশা, তিনি সকলকেই আমার কাছে আবার এনে দেবেন। [সুরা ইউসুফ : ৮৩]

এমনিভাবে হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বলেছেন,

﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾

হে আমার প্রতিপালক, আমি আপানাকে ডেকে কখনো ব্যর্থ হইনি।

[সুরা মারইয়াম : ৪]

সুতরাং, তুমি কিছুতেই দুআ কবুলের সময়টাকে কখনোই বিলম্বিত ভেবো না। এটা স্মরণে রাখো, তিনি তোমার প্রতিপালক। সকল বিষয়ে সবচেয়ে বেশি প্রজ্ঞাবান। সর্বাধিক কল্যাণ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি তিনিই অবহিত।

আবার এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে, হয়তো তিনি এর মাধ্যমে তোমার আন্তরিক ঈমানের পরীক্ষা নিতে চান। তিনি চান, তুমি যেন এই কারণে তার কাছে মিনতি করো, বিনয়ী হও। তিনি হয়তো এই বিপদে তোমার ধৈর্যধারণের প্রতিদান দিতে চান। কিংবা তিনি পরীক্ষা করতে চান, ঈমানের এই পরীক্ষায় ইবলিসের ওয়াসওয়াসার সাথে তুমি যুদ্ধ করে বিজয়ী হতে পারো কি না? আর যদি এগুলোই তিনি ইচ্ছা করে থাকেন, তবে এগুলো তার অনুগ্রহের ধারণাকেই আরও শক্তিশালী করে। এ জন্য তোমার বরং শোকর আদায় করা উচিত।

কারণ, এই বিপদের মাধ্যমে তিনি তোমাকে তার কাছে প্রার্থনাকারীর উপযুক্ত করে তুলেছেন। তোমাকে তার দিকে ঝুঁকিয়ে নিয়েছেন। আর কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয়গ্রহণ করা—এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে!

মানুষের প্রকৃতি

মানুষের শরীর সুস্থ থাকার জন্য প্রাকৃতিকভাবে উপকারী কিছু অর্জন এবং ক্ষতিকারক কিছু বর্জনের দরকার রয়েছে। এ কারণে তার মাঝে ইচ্ছা ও আকর্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে সে ভালোগুলো অর্জন করতে পারে। খারাপগুলোকে বর্জন করতে পারে।

মানুষের শরীরে খাবার দরকার–

খাবারের প্রতি যদি মানুষের কোনো ক্ষুধা, আকর্ষণ ও তৃপ্তি অনুভব না হতো, তাহলে মানুষ কখনো খাবার গ্রহণ করত না। তাহলে তার শরীরও ঠিক থাকত না। এ কারণে তার মাঝে খাবাবের ক্ষুধা, স্বাদ ও তৃপ্তি উদ্রেক করা হয়েছে। এরপর যখন তার শরীর সুস্থ থাকা পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ হয়ে যায়, তখন আকর্ষণকারী এই বিষয়গুলোও আর থাকে না। তখন আর খেতে ভালো লাগে না। এই একই বিষয় ঘটে পানি পানের ক্ষেত্রে, পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধানের ক্ষেত্রে এবং বিয়ে ও সহবাসের ক্ষেত্রে।

বিয়ের উপকারিতা দুটো :

১. মানুষের বংশ পরম্পরা অব্যাহত রাখা। এটিই প্রধান উদ্দেশ্য।

২. শরীরের মাঝে সৃষ্ট হওয়া সেই পদার্থকে বিদূরিত করা, যা আটকে রাখলে শরীরের কষ্ট বাড়ে।

এই যে একটি পদ্ধতি– যারা বুঝবান, তারা মূল উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারেন। কিন্তু যারা মূর্খ, তারা শুধু এর স্বাদ ও লাজ্জত উপভোগ করে। প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে চলতে থাকে। এগুলোর আসল উদ্দেশ্য বোঝে না। তারা তাদের দীর্ঘ দীর্ঘ সময় এমন কাজে ব্যয় করে, যার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই। তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলোই যেন তারা বোঝে না। জানে না। জানতে চায় না। তাদের প্রবৃত্তি এভাবে তাদের সম্পদ, লক্ষ্য ও

দ্বীনকে নষ্টের দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর এক সময় ধ্বংসের গহ্বরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়।

এমন আরও বহু মানুষকে দেখেছি, যারা নতুন নতুন নারীর দিকে ধাবিত হয়, নিজের প্রবৃত্তির নতুন চাহিদা মেটাতে। কিংবা কেউ তার প্রতাপিত যৌন চাহিদা মেটাতে গিয়ে অতি সহবাসের কারণে নিজেও ধ্বংস হয় এবং স্ত্রীকেও ধ্বংস করে ছাড়ে।

এগুলো ঘটে একেবারে বুঝ-বুদ্ধি না থাকার কারণে।

কিন্তু মানুষের এই যে খাদ্য গ্রহণ এবং তার মাঝের এই যে শাহওয়াত বা যৌন চাহিদা– এগুলো কিসের জন্য? এগুলো প্রদত্ত হয়েছে দুনিয়ার এই সফর পাড়ি দেওয়ার সময় শরীরের সুস্থতার জন্য। এগুলো আসলে মজা বা স্ফূর্তির জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। যতটুকু মজা বা শান্তি অর্জিত হয়, অনুভূত হয়—এগুলো মূলত একটি কৌশলের মতো। এর আকর্ষণেই মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে—যাতে শরীর ঠিক থাকে। মানুষ সহবাস করে—যাতে বংশ পদ্ধতি ঠিক থাকে। খাদ্যের স্বাদ বা সহবাসের মজা এখানে কিছুতেই মূল উদ্দেশ্য নয়। নতুবা শুধু যদি এই স্বাদ ও মজাই উদ্দেশ্য হতো, তবে তো মানুষের চেয়ে পশু-প্রাণীই এগুলোর ক্ষেত্রে অধিক উপযুক্ত। চিন্তাহীনভাবে এগুলোই তারা বেশি আস্বাদন করতে সক্ষম।

কিন্তু মানুষ...?

সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যিনি নিজেকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যগুলো, আসল বাস্তবতাগুলো বুঝতে পারেন। প্রবৃত্তির ডাকে অন্ধ উন্মাতাল হয়ে পড়েন না।

গোনাহ্ ও সওয়াবের প্রতিফল

যে ব্যক্তি গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করবে, সেই বুঝবে—গোনাহ কতটা নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকারক।

আমি আমার পরিচিত কিছুলোক সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছি, তারা অব্যাহত জিনার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে, হারাম কাজে সম্পৃক্ত রয়েছে—দুনিয়ায় তাদের সীমাহীন সম্পত্তি ও উত্তম খাদ্য-খাবার থাকা সত্ত্বেও তাদের দেখে মনে হয়—তাদের চেহারায় যেন মেঘের কালিমা ছেয়ে রয়েছে। কেমন শ্রীহীন অসুন্দর। কৃত্রিম। অন্তর কিছুতেই তাদের দিকে আকৃষ্ট হয় না।

আবার এর বিপরীত কিছু ব্যক্তিকেও আমি দেখেছি– তারা প্রবৃত্তির ওপর ধৈর্যধারণ করে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখে। হারাম ও অবৈধ বিষয় থেকে নিজেকে সব সময় বিরত রাখে। তাদের মধ্যে অনেকের দুনিয়ার সমৃদ্ধিও রয়েছে। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব রয়েছে। সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। এবং এগুলো দ্বারা তারা ইসলাম ও ঈমানের সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছে। অন্য মুমিনদের অভাব-অনটনে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ধরেছে। আবার নিজের ক্ষেত্রেও যদি কখনো কোনো অভাব-অনটন কিংবা বিপর্যয় এসেছে, তখনও তারা অভিযোগহীন ধৈর্যধারণ করেছে। তাকদিরের ওপর সন্তুষ্ট থেকেছে। এবং তাদের মাঝে কোনো ধরনের নিরাশা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়নি।

এগুলো দেখেই আল্লাহ তাআলার এই কথার মর্ম ভালোভাবে বুঝে আসে–আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾

> নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্যধারণ করে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সৎকর্মশীলদের কর্মের প্রতিদান নষ্ট করেন না। [সুরা ইউসুফ : ৯০]

রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত, সর্বক্ষণ তার প্রতিপালকের দরজা ধরে রাখা। এবং তার ডাকে সাড়া দেওয়া হোক বা না হোক– কিছুতেই রবের অনুগ্রহ ও দয়া থেকে নিরাশ না হওয়া। বরং সে নির্জনে-নিরালায় ইবাদত ও প্রার্থনার মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। তার সাথে যদি অপরিচিতি বা সম্পর্কহীনতার সৃষ্টি হয়, তবে দ্রুতই সেটি দূর করে নেওয়ার চেষ্টা করবে। যেমন এক কবি বলেন,

أمستوحش أنت مما جنيت   فأحسن إذا شئت واستأنس

তুমি কি তোমার অপরাধের কারণে বড়ই সম্পর্কহীন পেরেশান?
তাহলে যদি চাও, সৎ কর্ম করো এবং সম্পর্কের দিকে হও আগুয়ান।

কোনো ব্যক্তি যদি দেখে তার অন্তর দুনিয়ার দিকে ধাবিত, তাহলে দুনিয়ার বিষয়াদিও প্রভুর কাছেই প্রার্থনা করবে। আর যদি দেখে আখেরাতের দিকে ধাবিত, তাহলে সে যেন আখেরাতের আমলের তাওফিক তার কাছেই প্রার্থনা করে। এরপর সে দুনিয়ার জন্য যা কামনা করছে, তাতে যদি ক্ষতির আশঙ্কা করে, তবে সে তার অন্তর বিশুদ্ধ করার জন্যও তার কাছেই প্রার্থনা করবে। তার অন্তরের রোগ নিরাময়ের জন্য তার কাছেই চাইবে। কারণ, অন্তর যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে সে এমন কিছু আর কামনা করবে না, যা তার দ্বীনের জন্য ক্ষতিকর কিংবা যা তার শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

যে ব্যক্তি এভাবে চলতে পারবে, সে একটি প্রাচুর্যপূর্ণ সুখী জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।

হ্যাঁ, তবে তাকে এই অবস্থানের জন্য সার্বক্ষণিক তাকওয়া অর্জন করতে হবে। কারণ, তাকওয়া ছাড়া কিছুতেই প্রতিপালকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন হবে না। হওয়া সম্ভব নয়। আর তাকওয়া অবলম্বনকারীরা সবকিছু থেকে বিরত থাকতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা ও আশ্রয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকে না।

বর্ণনা পাওয়া যায়–

বীরযোদ্ধা কুতাইবা ইবনে মুসলিহ রহ. যখন তুর্কিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কাতারবদ্ধ হলেন, শত্রুপক্ষের এই বিশাল বাহিনীর সাথে লড়াই তাকে ভাবিয়ে

তুলছিল। তিনি তখন অন্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে কোথায়?

পাশের লোকেরা জানাল– তিনি ডান দিকের শেষপ্রান্তে নিজের ধনুকের তিরের ওপর ঝুঁকে আঙুল দিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করছেন।

হজরত কুতাইবা রহ. বললেন, আমার কাছে এই শূন্য আঙুল হাজার প্রশিক্ষিত তরবারি থেকে বেশি প্রিয়। হাজারো তীক্ষ্ণ বর্শার ফলা থেকে বেশি উপকারী।

এরপর যুদ্ধ শুরু হলো। তিনি তুর্কিদের ওপর বিজয়ী হলেন। যুদ্ধ শেষে হজরত কুতাইবা রহ. মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এভাবে আকাশের দিকে হাতের ইশারা করে কী করছিলেন?

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য বিজয়ের সকল পথ ও পদ্ধতি জমা করে দিচ্ছিলাম।

নিয়ামতের ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞতা প্রদর্শন

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ দুনিয়াবি নিয়ামত দিয়েছেন, সে যেন এটাকে খুব বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করে। বেশি কৃপণতা করবে না; বরং নিয়ামতের কিছুটা প্রকাশ যেন তার জীবনযাপনে থাকে। আবার খুব বেশি খরচ করবে না এবং প্রকাশ করে বেড়াবে না। সকলের কাছে সকল সম্পদের কথা প্রকাশও করবে না।

কিন্তু মানুষের প্রকৃতিই এমন যে, সম্পদ অর্জিত হলে তা অন্য মানুষের কাছে প্রকাশ করে বেড়ায়। এটি নফসের একটি গোপন আনন্দ ও স্বাদ গ্রহণের বিষয়। কিন্তু এটাকে নিয়ন্ত্রণ রাখা একটি প্রশংসনীয় ও কল্যাণকর স্বভাব– অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা না থাকলে যা করা সম্ভব হয় না। সকলে এটা পারেও না। অথচ এতেই রয়েছে সমূহ কল্যাণ। তাছাড়া অধিক প্রকাশে চোখ লাগে, অনিষ্ট হয়– এটা সত্য। এটাকে আমরা এভাবে বুঝতে পারি–

আমার হয়তো অনেক সম্পদ হয়েছে– এটা মানুষের কাছে প্রকাশ করে বেড়াতে আমার ভালো লাগে। নফস চায়– মানুষ দেখুক, আমার কত সম্পদ। দেখাতে ভালো লাগে।

কিন্তু আমাকে এর পরিণতি নিয়েও ভাবা উচিত। অধিক সম্পদের কথা যদি আমি আমার কোনো বন্ধুর কাছে প্রকাশ করি– গোপনে সে আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত– এমনকি রাগান্বিত হয়ে উঠতে পারে। কিংবা বিষয়টা নিজেদের মাঝে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে– এমনকি তাকে বন্ধু থেকে শত্রুও বানিয়ে দিতে পারে।

আর যদি আমি তা আমার কোনো শত্রুর নিকট প্রকাশ করি, তবে নিশ্চয় তাতে চোখ লাগবে, হিংসার কারণ হয়ে উঠবে। সে তা ধ্বংসের চেষ্টা করবে। এটা আমার ক্ষতির কারণ হবে।

সম্পদ বা কল্যাণের কথায় হিংসা থেকে মুক্ত পরিবেশ আমি তেমন কখনো দেখিনি। এটাই হলো মূলনীতি, শত্রুর নিকট সমস্যা ও অনটনের কথা বলা হলে, শত্রু মনে মনে তৃপ্তি পাবে। আর যদি সুখ ও স্বচ্ছলতার কথা বলা হয়, তবে সীমাহীন হিংসা করবে।

তাহলে কেন প্রয়োজন এই অনর্থক আত্মপ্রকাশ!

তাছাড়া সকল ক্ষেত্রেই নিজের বিষয়গুলো অপ্রকাশিত রাখা একটি চারিত্রিক দৃঢ়তার ব্যাপার– এটা সকলে পারে না। কিন্তু অনেক স্থানেই এটিই কল্যাণকর। যেমন ধরো, কেউ কোথাও অপ্রয়োজনে তার বয়সের কথা প্রকাশ করল, সেখানে অন্যদের চেয়ে তার বয়স বেশি হলে, সকলেই তখন তাকে বয়োবৃদ্ধ জীর্ণ অথর্ব ভাবতে শুরু করবে। আবার বয়স কম হলে, অন্যরা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতে পারে।

এমনকি কোথাও অনর্থক নিজের বিশ্বাস ও মতবাদের কথা প্রকাশ করাও উচিত নয়। তাহলে সেখানে তার মতের বিরোধীরা তার শত্রুতে পরিণত হবে।

কিংবা কোথাও নিজের সম্পদের কথা প্রকাশ করে দিলো– সম্পদ যদি উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে তুলনামূলক কম হয়, অন্যরা তুচ্ছ ভাববে। আর যদি বেশি হয়, হিংসা করবে।

আর ঠিক এই তিনটি বিষয় নিয়ে এক কবি বলেন,

احفظ لسانك لا تبح بثلاثة   سن ومال من ما استطعت ومذهب

فعلى الثلاثة تبتلى بثلاثة   بمموه وبمخرق و مكذب

নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করো। তিনটি জিনিস করো না ফাঁস– তোমার বয়স, তোমার সম্পদ এবং আদর্শ।

অন্যথায় এই তিনটির ক্ষেত্রে পড়বে তিনটি সমস্যায়– হবে প্রতারিত, করবে অনিষ্ট, অবিশ্বাস করবে তোমায়।

এখানে সংক্ষেপে ও ইশারায় যা কিছু উল্লেখ করলাম, এটা দিয়েই নিজের অন্য বিষয়গুলো অনুমান করে নাও। অর্থাৎ তুমি কিছুতেই সেই গল্পকার ও পেটপাতলা লোকদের মতো হয়ো না, যারা এমন লোকদের কাছে গল্প করে বেড়ায়, অচিরেই সেগুলো তারা জায়গায়-অজায়গায় যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে বেড়াবে– পরিণতিতে যা শুধু ক্ষতিই ডেকে আনবে।

প্রবাদ আছে,

رب كلمة جرى بها اللسان، هلك بها الانسان.

মনে রেখো, মানুষের মুখে কখনো এমন কথা এসে যায়, যা তার ধ্বংসের কারণ হয়।

হোঁচটের স্থানে সতর্ক হও

আমি দেখেছি, যখনই কেউ কোথাও হোঁচট খায় কিংবা বৃষ্টি-কাদায় পিছলে পড়ে, তখন সে তার হোঁচট খাওয়া জায়গার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকায়। এটিই মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাস। এই তাকানোর পেছনে দুটি কারণ থাকে।

১. ভবিষ্যতে এই স্থান বা পরিস্থিতি থেকে সতর্ক থাকা।

২. নিজের ভেতরে একটি কৌতূহল ও বিস্ময় কাজ করে– তার এত সতর্কতা ও সচেতনতা সত্ত্বেও এখানে সে হোঁচটটা খেল কীভাবে– জায়গাটি আসলে কেমন!

আমি মানুষের এই আচরণ থেকে একটি মূল্যবান ইশারা পেয়েছি। একটি শিক্ষা পেয়েছি। নিজেও মেনে চলি এবং অন্যদেরও সেই শিক্ষার কথা বলি, হে সেই ব্যক্তি, যে বারবার দ্বীনের পথে আছাড় খাও, হোঁচট খাও– তুমি কি

একবারও তোমার হোঁচট খাওয়া স্থানের দিকে তাকিয়ে দেখো না, তাহলে বারবার তো এ ধরনের হোঁচট খাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারতে?

হে নিজেকে পঙ্কিলকারী, তুমি তোমার পঙ্কিলতার স্থান সম্পর্কে সতর্ক হও না কেন? তাহলে তুমি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা ও পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকতে পারতে!

তোমার কী আশ্চর্য রকম দুর্ভাগ্য– তুমি কীভাবে একইভাবে বারবার অমুক-অমুক গোনাহে হোঁচট খেলে?! কেমন প্রতারণায় বেহুঁশ হয়ে রইলে যে নিজের বুদ্ধি দিয়ে তার মর্ম বুঝলে না? চিন্তার চোখ দিয়ে তার লক্ষ্য দেখলে না? কীভাবে তুমি অস্থায়ীকে স্থায়িত্বের ওপর প্রাধান্য দিলে? কীভাবে প্রবল শাস্তির ওপর সাময়িক উৎফুল্লতাকে গ্রহণ করে নিলে?

আহা! সাময়িক উত্তেজনার বিনিময়ে তুমি এমন লাঞ্ছনা কিনে নিলে, যা কোনো পিঠ বহন করতে সক্ষম নয়। উচ্চ মাথাকে অবনত করে দিলে। চোখ থেকে বিরামহীন অশ্রু প্রবাহের ব্যবস্থা করে নিলে। এসকল অবস্থা যেন তোমাকে বারবার ডেকে ডেকে বলছে–

তুমি এটা কেন করলে?

কী জন্য করলে?

কিসের বিনিময়ে করলে?

কিয়ামতের মাঠে হিসাবের পাল্লার কথা তোমার কি একটিবারের জন্যও স্মরণ হলো না?

তাকওয়ার প্রতিদান

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾

আর যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখগ্রস্ত হবে না। [সুরা তোয়াহা : ১২৩]

আমি আল্লাহর তাআলার এই বাণী নিয়ে চিন্তা করলাম। তাফসিরকারকগণ বলেন, এখানে 'হিদায়াত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাসুল ও কিতাবের অনুসরণ। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর কোরআন ও রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ করে চলবে, নিঃসন্দেহে সে পথভ্রষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আখেরাতের কষ্ট তার থেকে দূরে থাকবে।

ঠিক একইভাবে তার দুনিয়ার কষ্টও আর থাকবে না। এটা বুঝে আসে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মাধ্যমে– তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন। [সুরা তালাক : ২]

অতএব, তুমি যদি এমন ব্যক্তিকে কখনো কোনো কষ্টের মাঝেও দেখতে পাও, তবু এতে ধৈর্যধারণে যে পুরস্কার নিহিত রয়েছে, সে বিষয়ে তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকার কারণে তিক্ত-কষ্টকেও তার কাছে মধুর মতো মিষ্ট অনুভব হয়।

তাছাড়া এ ধরনের লোক একটি অন্যরকম সুখময় জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। তার ওপর বিপদ-আপদ কম আসে। তবে কখনো যদি কোনো কাজের ক্ষেত্রে তাকওয়া থেকে দূরে সরে যায়– তাহলে দ্রুতই বিপদে আপতিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সর্বক্ষণ যে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে থাকে, তার নিকট বিপদ আসে না। তার কোনো বিপর্যয় ঘটে না। এটিই সাধারণ নিয়ম। নতুবা কখনো যদি তাকওয়ার অবস্থায় কোনো বিপদ আসে, তাহলে সেটা তার পূর্বের কোনো গোনাহের কারণে আসে।

এরপরও যদি তার ওপর কোনো বিপদ আপতিত হয়, সেটাকে সে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিয়ামত মনে করে। বিপদে সে কোনো কষ্টই অনুভব করে না।

হজরত শিবলী রহ. বলেন,

أحبك الناس لنعمائك، وأنا أحبك لبلائك.

খোদা হে, মানুষ তোমাকে তোমার নিয়ামতের কারণে ভালোবাসে। আর আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমার প্রদত্ত বিপদের কারণে।

গোনাহের প্রভাব

উদাসী মত্ততায় মাতাল হওয়া ছাড়া কোনো গোনাহে পূর্ণ লাজ্জত বা পরিপূর্ণ স্বাদ উপভোগ করা সম্ভব নয়। আর মুমিন ব্যক্তি তো গোনাহের স্বাদ পেতেই পারে না। কারণ, গোনাহের স্বাদ আস্বাদনের সময় তার নিকট উপস্থিত হয় এর হারামের জ্ঞান এবং শাস্তির সতর্কতা। আর তার জ্ঞানটা যদি আরও প্রবল ও ব্যাপক হয়, তবে তো সে তার ইলমের চোখ দিয়ে নিষেধের তীব্রতা অনুভব করতে থাকে, তখন তার থেকে সকল আস্বাদনের মজা ও স্ফূর্তি দূর হয়ে যায়।

কিন্তু কখনো যদি প্রবৃত্তির মত্ততা প্রবল হয়ে ওঠে এবং গোনাহে লিপ্ত হয়, তবুও তার অন্তর এসকল চিন্তার কারণে ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে। গোনাহের কামনা প্রবল হয়ে ওঠে—কিন্তু তা খুবই অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু যখন সকল উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যায়, পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে—তখন এর পরিণামের চিন্তা লাফ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন শুরু হয় অব্যাহত আফসোস ক্রন্দন ও অনুশোচনা। এমনকি কান্না ও তাওবার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মাগফিরাতের বিষয়টি নিশ্চিত হলেও চারপাশের মানুষের তিরস্কার ও ধিক্কার অব্যাহত থেকেই যায়। নিকৃষ্ট সংবাদটি চারপাশে জানাজানি হয়ে যায়। এর একটি পঙ্কিল প্রভাব রয়ে যায় সারাজীবন।

তাই মানুষের গাফলাত ও বেহুঁশ মত্ততা থাকে যতটুকু– ততটুকুই শুধু কেউ গোনাহের লাজ্জত বা স্বাদ অনুভব করে।

নির্জন বিচ্ছিন্নতার প্রভাব

একবার আমি পূর্ণ নির্জনতার প্রত্যাশা নিয়ে খুব সকালে জাগ্রত হলাম এবং একাকী হাঁটতে শুরু করলাম। বহুদূর হাঁটার পর জনশূন্য একটি জায়গায় গেলাম। সেখানে কিছু আলেম ও সৎ ব্যক্তির দেখা পেলাম। এদের অনেকেই এই নির্জন এলাকায় দীর্ঘদিন বসবাস করছে। আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতদিন এখানে অবস্থান করছেন?

তিনি ইশারায় জানালেন, প্রায় চল্লিশ বছর।

তাকে আমি সেখানে একটি জীর্ণশীর্ণ অপরিচ্ছন্ন ঘরে বসবাস করতে দেখতে পেলাম। আমি তার এই দীর্ঘ সময় বিবাহহীন অতিবাহনের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলাম। তখন, আমার নফস এটিকে খুবই অসাধারণ ও দৃঢ়তাপূর্ণ সৎ কাজ বলে ভাবতে শুরু করল। নফস ভীষণ প্রভাবিত হলো। সে তখন মনে মনে দুনিয়ার নিন্দা-মন্দ শুরু করে দিল। এবং দুনিয়ার বিষয়ে নিমগ্ন হওয়াকে তিরস্কার করল।

এসময় আমার ইলম আমার নফসের বিরোধিতায় জেগে ওঠল। শরিয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও আমার ইলমের সমর্থন জোগাল। এ কারণে আমি নফসকে ডেকে বলি, এখানে যে-সকল লোককে তুমি দেখছ, তারা দু-ভাগে বিভক্ত :

১. এদের একটি অংশ নিজের নফসের সাথে লড়াই করে এসকল কষ্টকর পরিস্থিতির ওপর ধৈর্যধারণ করে চলছে। কিন্তু এর কারণে তারা আহলে ইলমদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সম্মিলিত আমল থেকে দূরে থাকছে। সন্তান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্য মানুষদের উপকার করা থেকে বিরত থাকছে। এবং দ্বীনের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মজলিসে বসে নিজেদের উপকার করা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

এমনকি এভাবে একাকী অবস্থানের কারণে তাদের মধ্যে একধরনের অপরিচিত রুক্ষতা, হৃদয়হীনতা ও বন্যতা এসে যাচ্ছে। একাকী থেকে আরও বেশি একাকী ও নির্জন হয়ে উঠছে। কখনো শরীর ও মেজাজ নষ্ট হয়ে পড়ছে। এমনকি বিবাহহীন থাকার কারণে বীর্যের বহির্গমন না হওয়ায় সেটা আবদ্ধ থেকে শরীর ও মস্তিষ্কের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলছে।

কখনো কখনো এই সীমাহীন নির্জনতা তার মাঝে বিভিন্ন ধরনের ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করছে। নিজেকে কখনো সে ভাবছে 'ওলি' বলে। আলেমদের জ্ঞাত ইলমকে অনর্থক ভাবছে। কিংবা শয়তান কখনো তার কল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ের অলৌকিক রূপায়ণ ঘটাচ্ছে আর সেগুলোকে সে নিজের কারামত ভাবছে।

কখনো সে ভাবছে, সে যা করছে, এটাই হলো দ্বীনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু সে আসলে বুঝছে না– সে অপছন্দের কতটা কাছাকাছি চলে গেছে।

কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের একাকী থাকা নিষিদ্ধ করেছেন। অথচ এদের সকলে একাকী নির্জন বাস গ্রহণ করছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। অথচ তারা বিবাহ থেকে বিরত রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রাহবানিয়াত' বা এই সকল কৃচ্ছতা সাধন থেকে নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো, শয়তানের এক গোপন ষড়যন্ত্রের অংশ– যার মাধ্যমে সে মানুষদের সূক্ষ্মভাবে ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করছে।

২. আর কিছু লোক এখানে রয়েছে, যারা খুবই বৃদ্ধ। জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন ও চাহিদা যাদের রহিত হয়ে গেছে। তাদের বুঝ-বুদ্ধির সঠিক সক্ষমতা আর নেই। অথর্ব বয়সে উপনীত হয়েছে। এদের কথা ভিন্ন। এদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

কিন্তু প্রথম শ্রেণি– যারা নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ইলম, সম্মিলিত আমল ও উপার্জন থেকে নিজেদের একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এরা দর্শনের পর অন্ধ হয়েছে। শারীরিক সক্ষমতা নিয়েও অথর্ব হয়ে বসে আছে।

আমার এসব কথা শুনে নফস আমাকে বলল, আমি তোমার এ কথার ওপর সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তুমি তো ঝুঁকে আছ সুন্দর খাবার ও সুন্দর নারী বিবাহের দিকে। এই সকল ত্যাগের দিকে তো যাওনি। তাই নিজে তো আবেদ হলেই না। এখন আবার তাদের নিয়ে নিন্দায় মত্ত হয়ো না।

আমি নফসকে বললাম, তোমার যদি বুঝ থাকে, তবে তোমার সাথে কথা বলা যায়। আর যদি তুমি শুধু এদের বাহ্যিক কষ্ট ও অবস্থা দেখে প্রভাবিত হও, তবে আর তোমার সাথে কিসের আলোচনা!

জেনে রেখো, বিবাহের উদ্দেশ্য হলো মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখা। এবং শরীরের মধ্যে যে কষ্টদায়ক পদার্থের উদ্ভব হয়—তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা। এর মাধ্যমে শরীর সুস্থ থাকে। ইবাদতে নির্মল মগ্নতা আসে। মন ভালো থাকে।

এরপর হলো দ্বীনের কাজের কথা। ইলমের ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। অথচ এই নির্জন নিরালার 'জুহদ'—এটা তো তার চৌকাটও পেরুতে সক্ষম নয়। তাহলে মানুষের মাঝে ইলম ও প্রজ্ঞার সাথে দ্বীনের কাজ করবে কে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس.

> জগতের যতকিছুর ওপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়, তোমার মাধ্যমে আল্লাহর একজন ব্যক্তির হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া, তার সকল কিছু থেকে উত্তম।[৭০]

জেনে রেখো নবীদের চেয়ে রাসুলদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার কথা। স্মরণ রেখো, যে প্রাণী শিকার করতে পারে না, তার ওপর শিকারী প্রাণীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা।

একটু ভেবে দেখো—মানুষদের মধ্যে অবস্থানকারী আলেমদের দ্বারা বহু মানুষ উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে। মানুষের দ্বীনের পরিশুদ্ধতা এসেছে। অন্যদিকে নির্জনতা অবলম্বনকারী মূর্খ জাহেদদের থেকে অন্যদের উপকৃত হওয়া তো দূরের কথা, তারা নিজেরাই ভ্রষ্ট হয়েছে।

আলেম যদি লোকদের মাঝে থেকেও শুধু নিজের খারাবি থেকে বিরত থাকে—এটাই তার জন্য যথেষ্ট। এতেই অনেকের উপকার হবে। তার কোনো নির্জনবাসের প্রয়োজন নেই।

---

৭০. সূত্রঃ পূর্বে চলে গেছে।

গোনাহের সমাপ্তি টানা

প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও সচেতন ব্যক্তির জন্য উচিত– গোনাহের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক থাকা। কারণ, মানুষ ও আল্লাহর মাঝে কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। কোনো বংশগত নৈকট্যও নেই। তিনি হলেন অবিচল একজন ইনসাফকারী। অটলভাবে সাম্যতা বিধানকারী। ন্যায়ের ওপর দণ্ডায়মান।

তাঁর দয়া ও রহম যদিও সকল গোনাহকে পরিব্যাপ্ত করে নিতে পারে– কিন্তু কথা হলো, তিনি যদি ক্ষমা করার ইচ্ছা করেন, তবে আকাশভরা সকল গোনাহই মাফ করে দেবেন। কিন্তু তিনি যদি ধরে বসেন, তবে সামান্য কোনো অপরাধও ধরে বসবেন। কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

সুতরাং আবারও বলি, গোনাহের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। গোনাহের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন।

আমি এমন অনেক মানুষকে দেখি, যারা সীমাহীন গোপন ও প্রকাশ্য গোনাহের মধ্যে লিপ্ত। তারা গোনাহ করতে করতে যেন ক্লান্ত হয়ে গেছে। তাদের এগুলো করার কারণ হলো, তারা আল্লাহ তাআলার পাকড়াওয়ের বিষয়টি হালকাভাবে নিয়েছে। তারা ধারণা করছে, তারা যে ভালো কাজগুলো করে যাচ্ছে, এগুলোই সেই গোনাহের সমপরিমাণ ও সমতুল্য হয়ে যাবে। এভাবেই তাদের ধারণার জাহাজ চলতে থেকেছে। কিন্তু কখন যে এখানে আল্লাহর কৌশলের পানি ঢুকে পড়েছে এবং জাহাজকে ডুবিয়েছে– তাদের কোনো খবরই নেই।

আমি আরও কিছু ব্যক্তিকে দেখেছি, যাদেরকে লোকেরা আলেম বলে, অথচ নির্জন নিরালায় তারাও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে না। নির্জনে তাদের সকল সুন্দর জিকির, বিনম্র নামাজ, সন্তুষ্টচিত্ত তেলাওয়াত– কিছুই থাকে না। এ কারণে তাদের অস্তিত্ব যেন না থাকারই মতো। এ কারণে তাদেরকে দর্শনের মাঝে মানুষের কোনো তৃপ্তি নেই। তাদের সাক্ষাতে অন্তরের কোনো আগ্রহ ও আকর্ষণ নেই।

আবারও বলি, সর্বক্ষণ আল্লাহর পর্যবেক্ষণের দিকে সতর্ক থাকা চাই। কারণ, হাশরের দিনের দাঁড়িপাল্লা এমনই সাম্যপূর্ণ হবে যে, সেখানে অণু পরিমাণ আমলও প্রকাশ পেয়ে যাবে। এবং অণু পরিমাণ ভুলের প্রতিদানও পাওয়া যাবে– বিলম্বে হলেও।

কেউ কেউ তার ভালো অবস্থা দেখে ধারণা করে– তার গোনাহ মাফ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ– অব্যাহত গোনাহের কঠিন শাস্তির জন্য এই অবকাশ প্রদান। এটা ক্ষমা নয়।

আমরা আমাদের নির্জনতার বিষয়ে সতর্ক হই। আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সচেতন হই। আমাদের নিয়তের ব্যাপারে বিশুদ্ধ হই।

কেননা, আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বক্ষণ তোমাদের দেখা হচ্ছে। আর তোমরা তার দয়া ও অনুগ্রহের কারণে ধোঁকায় পড়ে থেকো না। কতজনকেই তো দুনিয়ার সাময়িক অবকাশ প্রদান করা হয়। এরপর শাস্তির মুখোমুখি করা হয়। তাই তোমরা তোমাদের গোনাহ ও অপরাধের দিকে লক্ষ রাখো। সেগুলোকে তাওবার মাধ্যমে মুছে ফেলার চেষ্টা করো।

গোনাহের ব্যাপারে লক্ষ রেখে আল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হয়ে কাকুতি-মিনতি করার চেয়ে উপকারী কিছু নেই।

এগুলো এমন কিছু কথা, আল্লাহর দিকে তাকিয়ে যে ব্যক্তি এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, নিশ্চয় সে উপকৃত হবে। আল্লাহর এক বান্দা তার নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন,

একবার আমার সামনে একটি গোনাহের ব্যাপার এলো– যা সংঘটন করতে আমি সক্ষম ছিলাম এবং যার আস্বাদন আমাকে প্ররোচিত করছিল এবং গোনাহটিও খুব বড় ছিল না। আমার নফস আমাকে সেদিকে প্ররোচিত করছিল– সেটির ক্ষুদ্রতা ও আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের বিশালতার কথা বলে।

তখন আমি আমার নফসকে বললাম, এটি যদি না করো, তবে তো তুমি তুমিই রয়ে গেলে। কিন্তু তুমি যদি এটি করে বসো, তখন তুমি কি আর শুভ্র রইলে?

এরপর নফসকে আমি এমন লোকদের অবস্থা স্মরণ করালাম, যারা নিজেদের ভুলের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিল। পরিণামে তাদের জিকির-আজকার সব দূর হয়ে গেল এবং এগুলো থেকে একসময় তারা মুখ ফিরিয়ে নিল।

এসকল কথায় আমার নফসও অবনত হলো এবং যে গোনাহের ইচ্ছা করেছিল, তা থেকে বিরত রইল।

গোনাহকে ছোট মনে করা

মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে ভুল করে এবং এগুলোকে তারা সামান্য ধারণা করে। অথচ এটি খুবই খারাপ এক মানসিকতা। যেমন, ছাত্রদের কারও থেকে কিছু ধার নেওয়া, এরপর সেটা ফেরত না দেওয়া। কারও খাবারের সময়ে এই উদ্দেশ্যেই যাওয়া যে, তার সাথে বসে খাবে। স্বল্প ভুলেই কারও দিকে অবজ্ঞার চোখে তাকানো। না জেনেও ফতোয়া প্রদান করা—যাতে কেউ মূর্খ ধারণা না করে বসে।

এ ধরনের ভুল বা গোনাহকে ছোট মনে করা হয়। কিন্তু এগুলো আসলে অনেক বড় গোনাহ এবং খুবই ক্ষতিকর।

এমনকি এরচেয়েও ছোট ছোট ভুলও একজন ব্যক্তিকে মানুষদের মাঝে ব্যতিক্রমী মানুষের মর্যাদা থেকে নিচে নামিয়ে দেয়। আল্লাহর নিকট তার সম্মানের স্তর থেকে নিচে নেমে যায়। যুগের ভাষা যেন তাকে ডেকে ডেকে বলে, হে সেই ব্যক্তি, যে এত সামান্য বিষয়েও খিয়ানত করে বসো, তুমি কীভাবে বড় কোনো বিষয়ে দ্বীনদার ব্যক্তিদের পরিচালনায় তাদের সন্তুষ্টির আশা করো?

আমাদের একজন সালাফ বলেন, একবার আমি এক লোকমা খাবার ভুল করে খেয়ে ফেলেছিলাম, সেই থেকে আজ চল্লিশ বছর অধঃপাতের দিকেই চলেছি।

আল্লাহর ওয়াস্তে যারা এ রাস্তায় অভিজ্ঞ, তাদের কথা শোনো। সর্বদা সতর্ক থাকো। পরিণামের দিকে লক্ষ রাখো। আর নিষেধকারীর বড়ত্ব ও ক্ষমতার কথা স্মরণ রাখো– তিনি আমাদের স্রষ্টা ও রব। তাঁর ক্ষমতা অসীম। তাঁর শাস্তিও সহ্যের বাইরে। তাই সামান্য অহংকার থেকেও সতর্ক থাকো। সামান্য স্ফুলিঙ্গ থেকেও বেঁচে থাকো– কারণ, এই সামান্যটুকুও একটি পুরো দেশ পুড়িয়ে দিতে সক্ষম।

আমি এ বিষয়ে এখানে অতি অল্পকিছু উল্লেখ করলাম– যা অনেক কিছুর প্রতি ইশারা করছে। কিংবা সামান্য কিছু উদাহরণ পেশ করলাম, এর মাধ্যমে অন্য গোনাহের ক্ষেত্রগুলোকেও চিনে নাও।

ইলম এবং সতর্কতা– আমি যা হয়তো উল্লেখ করিনি, এ দুটো জিনিস তোমাকে সেগুলোর পরিচয় করিয়ে দেবে। তুমি যদি দূরদর্শিতার চোখে লক্ষ করো, তবে এ দুটি জিনিসই তোমাকে গোনাহের নিকৃষ্ট প্রভাব সম্পর্কে জানিয়ে দেবে।

সকল শক্তি ও সক্ষমতা এক আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

আগে তাওবা তারপর প্রার্থনা

আমি আমার নফসের একটি আশ্চর্য বিষয় খেয়াল করেছি। সেটা হলো, সে আল্লাহ তাআলার নিকট তার প্রয়োজনগুলো প্রার্থনা করে—কিন্তু তার নিষেধিত বিষয়গুলোর কথা সে যেন ভুলেই থাকে!

আমি একদিন তাকে ডেকে বললাম, হে নিকৃষ্টতম নফস, তোমার মতো কেউ কি এ ধরনের প্রার্থনা-আবেদন করতে পারে? যদি কিছু প্রার্থনা করতে চাও, তবে তার কাছে আগে ক্ষমা প্রার্থনা করো। এত কিছু দাবি করার অধিকার কি তুমি রাখো?

নফস বলল, তাহলে আমি আমার প্রয়োজনের বিষয়গুলো কার কাছে প্রার্থনা করব?

আমি বললাম, আমি তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো প্রার্থনা করতে নিষেধ করছি না। আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, আগে তো প্রকৃতভাবে তাওবা করো– এরপর যা ইচ্ছা প্রার্থনা করো।

যেমন, পাপের উদ্দেশ্যে সফরকারীর ক্ষেত্রে আমরা বলি, সে যদি ক্ষুধার কারণে কোনো হারাম জিনিস খেতে বাধ্য হয়, তবুও তার জন্য তা খাওয়া জায়েজ নয়।

হ্যাঁ, এখন কেউ যদি আমাদের প্রশ্ন করে—তবে কি লোকটি না খেয়ে মারা যাবে?

আমরা তখন বলি, না—না খেয়ে মারা যাবে কেন? বরং প্রথমে নিজের কাজের ব্যাপারে তাওবা করবে—এরপর খেতে পারবে।

নতুবা এটা কত বড় দুঃসাহসের কথা বলুন, নিজের অঢেল গোনাহের কথা ভুলে থেকে, সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহর কাছে শুধু নিজের

আবেদন-আবদার পেশ করা হবে! অথচ গোনাহের বিশালতা নিয়ে আগে তার মাথা নুইয়ে আসা দরকার ছিল।

আসল কাজ হলো, আগে তাওবা করা। গোনাহের কাজ থেকে ফিরে থাকার চেষ্টা করা। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যদি অতীতের গোনাহের বিষয়ে অনুতপ্ত হও, নিজেকে সংশোধন করে নাও, তবে দেখবে আপনাআপনিই তোমার আকাঙ্ক্ষা ও কামনাগুলো বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। যেভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

> عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ.
>
> হজরত সাইদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন ও আমার জিকিরের মগ্নতায় আমার কাছে প্রার্থনার সুযোগ কম পায়, আমি তাকে যারা প্রার্থনা করে তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম জিনিস প্রদান করি।[৭১]

হজরত বিশর হাফি রহ. দুআর জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেন। এরপর আবার হাত গুটিয়ে নিয়ে বলতেন, গোনাহের এত প্রাচুর্য বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমার মতো মানুষ কি কিছু প্রার্থনা করার অধিকার রাখে!

অবশ্য বিশর হাফির এই অবস্থার কথা ভিন্ন। তার মারেফাতের আধিক্যের কারণে কখনো কখনো এমনটি তিনি করেছেন। তার প্রার্থনা ছিল এমন– যেন তিনি মুখোমুখি আল্লাহর কাছে চাচ্ছেন। এতটাই নৈকট্য অনুভব করতেন তিনি!

কিন্তু অন্যদের বিষয়– তারা তো মানসিকভাবেই অনেক দূর থেকে প্রার্থনা করে। তাদের মাঝে তো এই নৈকট্যের সৃষ্টি হয়নি। তাদের উচিত আকুল মনে আল্লাহ তাআলার নিকট নিজ গোনাহের জন্য মাফ চেয়ে নেওয়া। ক্ষমা প্রার্থনা করা।

---

[৭১]. সুনানে তিরমিজি : ১০/২৮৫০, পৃষ্ঠা : ১৬৯– মা. শামেলা

যা কিছু বলা হলো, এগুলো বোঝার চেষ্টা করো এবং তাওবার দিকে ধাবিত হও। এছাড়া তোমার প্রার্থনার আরেকটি ভুল পদ্ধতি হলো, তুমি তোমার প্রার্থনার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংশোধনের প্রার্থনা না করে, শুধু প্রার্থনা করো বিভিন্ন ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের বিষয়ে। আর দুনিয়ার প্রাপ্তি নিয়ে যেমন বেশি বেশি প্রার্থনা করো, তেমন তো অন্তর ও দ্বীনের সংশোধন নিয়ে প্রার্থনা করো না!

প্রতিপালকের কাছে তোমার এ কেমন প্রার্থনা! তুমি তোমার বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখো। অব্যাহত গাফলত ও ভ্রুক্ষেপহীনতায় ধীরে ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে পড়েছ– এ বিষয়ে সচেতন হও। এখনই হও।

তুমি তোমার কামনা ও বাসনার চিন্তা বাদ রেখে, আগে তোমার স্খলন ও অপরাধ সম্পর্কে চিন্তিত হও। হজরত হাসান বসরি রহ. তার গোনাহের ব্যাপারে সব সময় প্রচণ্ড ভয়ের মধ্যে থাকতেন। একবার তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি এত ভয় পান কেন?

উত্তরে তিনি বলেন, আমার কোন কোন গোনাহ্ মাফ করা হয়নি, সে বিষয়ে আমার নিশ্চিত জ্ঞান নেই। হায়, কিয়ামতের মাঠে যদি আমাকে বলা হয়, যাও জাহান্নামে, তোমার এই এই গোনাহ্ এখনো ক্ষমা করা হয়নি, তখন আমার কী অবস্থা হবে!

আবেদদের ধোঁকায় পতিত হওয়া

সবচেয়ে আশ্চর্যতম বিষয় হলো, আল্লাহর মারেফাত থেকে বহুদূরে অবস্থান করেও কোনো ব্যক্তির 'আরেফ' হওয়ার দাবি করা কিংবা ভান করা। আল্লাহর কসম, যে তাকে ভয় করে চলে, সেই তাকে চিনেছে। আর আরেফ তো একমাত্র সেই ব্যক্তিই হতে পারে, যে নিজের সম্পর্কে এই ধারণা রাখে যে, তার মতো মানুষ কখনো 'আরেফ' হতে পারে না।

অথচ জাহেদদের মাঝে এমন কিছু বুদ্ধিহীন মূর্খ লোক রয়েছে, তারা যেন নিজেদের ক্ষেত্রে নিশ্চিত হয়ে বসে আছে যে, তারা এই পৃথিবীর একেক জন ওলি, মাহবুব এবং মাকবুল ব্যক্তি– আরেফ বিল্লাহ।

হয়তো কখনো তাদের কারও ক্ষেত্রে কোনো সহজতা বা অনুগ্রহ করা হয়– আর সেটাকেই সে ভেবে বসে 'কারামত'। আর আল্লাহর অবকাশের কথা ভুলে যায়। অন্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে– আর ভাবে, নিজের ভবিষ্যৎ বুঝি নিরাপদ ও সংরক্ষিতই হয়ে আছে। তার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাধি তাকে ধোঁকায় ফেলে রাখে। তাকে ধোঁকায় ফেলে রাখে, তার দিকে যেসকল ইবাদতের কথা সম্পৃক্ত করা হয়– সেইগুলো। এভাবে কখনো সে নিজেকে পৃথিবীর 'কুতুব' ভাবে। কখনো ভাবে জগতের 'ওলি'। যেন তার পর কেউ আর এই মর্যাদা ও স্থান প্রাপ্ত হবে না।

সে কি জানে না সেই বালআম বিন বাউরার কথা– যে ছিল 'মুস্তাজাবুত দাওয়াত', এক সময় সেই হয়ে উঠল 'কুকুরের মতো'। বোঝা উচিত, যে শরীর সুস্থ থাকে, তা কখনো অসুস্থও হয়ে উঠতে পারে।

এমন কত কবি-সাহিত্যিক অতিবাহিত হয়ে গেছে– যারা বলেছিল, আমার মতো কেউ নেই। আমার মতো আসবে না কেউ।

কিন্তু তারা যদি আরও কিছুদিন বেঁচে যেতে পারত, তবে তারা পরবর্তী শ্রেষ্ঠ রচনা ও সাহিত্যগুলো দেখে নিজেরাই অনুভব করে যেতে পারত– তাদেরটা ছিল কতটা নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের।

সুতরাং সকল সময় নিজের পদস্খলনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা এবং কখনো নিজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হওয়া উচিত। অন্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা থেকে

সতর্ক থাকা– নিজেরই অবস্থা তেমন না হয়ে যায়। এবং তাকদিরের বিষয়েও নিজের ব্যাপারে ভয়ে ভয়ে থাকা উচিত।

জেনে রাখো, এখন আমি যেসকল বিষয়ের দিকে ইশারা করলাম, এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে যদি লক্ষ রাখা হয়, তবে নিশ্চয় আত্মগর্বের মাথা নত হয়ে আসবে। অহংকারের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

বিপদের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন আচরণ

যাকে আল্লাহ তাআলা সব সময় নিয়ামত দিয়ে আসছেন এবং সুখী ও নিরাপদ রেখেছেন, তার কাছে বিপদ ও দারিদ্র্যের কষ্ট অনুপস্থিত। অথচ এটিই হলো মূল পরীক্ষার সময়। কারণ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনো গড়েন, কখনো ভাঙেন। তিনিই প্রদান করেন। তিনিই আবার বঞ্চিত করেন। প্রতিপালকের প্রতি মানুষের রাজি ও সন্তুষ্টির বিষয়টি এই কষ্টের সময়ই তো প্রকাশ পায়!

সুতরাং যাকে অব্যাহত নিয়ামত প্রদান করা হচ্ছে, সে ব্যক্তি তার এই নিয়ামতের কারণে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত রয়েছে। কিন্তু যখন তার ওপর কোনো বিপদের কষ্ট এসে আঘাত করছে, তখন তার সন্তুষ্টি, রাজি ও দৃঢ়তা পলায়ন করছে। তাহলে আর প্রতিপালকের ফয়সালার প্রতি তার কিসের সন্তুষ্টি?

হজরত হাসান বসরি রহ. বলেন,

كانوا يتساوون في وقت النعم فإذا نزل البلاء تباينوا.

> তারা নিয়ামতপ্রাপ্তির সময় খুবই শান্ত-শিষ্ট থাকে, কিন্তু যখনই বিপদ এসে উপস্থিত হয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—দূরে সরে যায়।

কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের ভান্ডার প্রস্তুত করে রাখে। পাথেয় সঞ্চয় করে রাখে। বিপদের আশঙ্কার কথা ভেবে অনেক রকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। আকস্মিক মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে উঠা ছাড়াও জীবনের বাঁকে হরেক রকম বিপদ আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ না করুন– কেউ যদি মৃত্যুর সময়ের বিপদে সন্তুষ্ট না থাকে, ধৈর্যধারণ করতে না পারে, তবে তো সে কুফর নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে।

আমি এমন একটি লোকের কথা শুনেছি, যার ক্ষেত্রে আমি ভালো ধারণা করতাম। কিন্তু লোকটি তার মৃত্যুর আগে বিপদের রাতগুলোতে বলত, আমার প্রতিপালক আমার প্রতি জুলুম করছে। নতুবা আজ আমার এই অবস্থা কেন?

ঠিক এই অভিযোগ-অনুযোগ করা অবস্থায় তার মৃত্যু এসে গেছে। এটা কেন হলো? বর্ণনা করা হয়, শয়তান মানুষের ঠিক এই অবস্থাগুলোর ব্যাপারে তার সাথিদের তাকিদ দিয়ে বলে,

عليكم بهذا، فإن فاتكم لم تقدروا عليه.

> এই হলো তোমাদের সময়, একে অবশ্যই গোমরাহ করে ছাড়বে। এখন যদি সে তোমাদের হাত থেকে ফসকে যায়, কোনোদিন তাকে আর নাগাল পাবে না– এই হলো শেষ সময়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমারা খুব করে শেষ সময়ে দৃঢ় 'ইয়াকিন'-এর প্রার্থনা করি; যেন বিপদের ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারি কিংবা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। এবং তার প্রতি দৃঢ় আশা রাখি– তিনি তার প্রিয়দের যে নিয়ামত দান করেন, তা আমাদেরও প্রদান করবেন। সে কারণে আমাদের দুনিয়াতে অবস্থানের চেয়ে তার সাথে সাক্ষাৎই যেন প্রিয় হয়ে ওঠে। আমাদের নিজেদের ইচ্ছা ও নির্বাচনের চেয়ে তার নির্ধারিত বিষয়ের দিকেই যেন আমরা আগ্রহী ও সন্তুষ্ট থাকি।

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, আমাদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়লে, আমরা যেন তাকদিরের প্রতি ক্রোধান্বিত না হয়ে উঠি। সেটা হবে একটি অকাট মূর্খতা। স্পষ্ট লাঞ্ছনা। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমিন।

আরেফের গুণাবলি

দুনিয়া কিংবা আখেরাত—আরেফদের চেয়ে সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবন কারও নেই এবং হবেও না। কারণ, যারা আল্লাহ তাআলার মারেফাত অর্জন করেছে, তারা তার সাথে নির্জনে নিরালায় আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

যখন তাকে কোনো নিয়ামত প্রদান করা হয়, তখন সে বুঝতে পারে, কে তাকে এটা দিয়েছে। এবং যখন কোনো কষ্ট ও তিক্ততা আসে, তখন এই তিক্ততাও তার মুখে স্বাদ লাগে। কারণ, সে খুব ভালোভাবেই জানে, তাকে পরীক্ষাকারী মহান সত্তাটি কে!

সে যদি তার কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করে আর তাতে সাড়াদানে বিলম্ব হয়, তখন সে তার আকাঙ্ক্ষাকে তার তাকদিরের ওপরই ছেড়ে দেয়। কারণ, সে তার রবের কল্যাণকামিতার কথা জানে এবং জানে তার হিকমতের কথাও। তার সবচেয়ে সুন্দর পরিচালনার প্রতি রয়েছে তার অটল বিশ্বাস।

একজন আরেফের গুণ হলো, সে তার রবের বিষয়ে সব সময় খেয়াল রাখে। যেন তার সমুখেই সে অবস্থান করে। তার প্রতি দৃঢ় ইয়াকিন রাখে। এবং তার এই মারেফাতের বরকত ও প্রভাব তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

আরেফ যদি কখনো কোনো কষ্টে আপতিত হয়, তবে সে কিছুতেই এই কষ্টের বস্তুগত কারণের দিকে তাকায় না। সে তো তাকিয়ে থাকে এটি প্রদানকারী মূল কর্তার দিকে। সে তার রবের ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

যখন সে চুপ থাকে, তখন সে তার সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা করে। যখন সে কথা বলে, তখন এমন কথাই বলে, যাতে সে তাকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তার অন্তর কখনো স্ত্রী-সন্তান-স্বজনের দিকে মগ্ন থাকে না। এবং তার প্রভু ব্যতীত অন্য কারও ভালোবাসাতে হৃদয় ঝুলে থাকে না।

সে মানুষদের সাথে চলাফেরা ও আচরণ করে যেন শুধু শরীর দিয়ে– বাহ্যিক আকৃতি দিয়ে। কিন্তু তার অন্তর পড়ে থাকে সব সময় তার প্রতিপালকের দিকে। দুনিয়ার এসকল ভোগ-বিলাসের দিকে তার কোনো ঝোঁক নেই।

দুনিয়ার এই জীবন ছেড়ে যেতে তার কোনো দুঃখ নেই। কবরের ব্যাপারে তার কোনো অপরিচিতি নেই। বিচার দিবসের ব্যাপারেও তার আলাদা কোনো ভয় নেই।

কিন্তু যার মধ্যে তার প্রতিপালকের কোনো মারেফাত নেই, সম্পর্ক নেই, সে শুধু হোঁচট খায় আর যেকোনো বিপদ-মসিবতে বিচলিত হয়ে পড়ে। কেননা, বিপদ কে দিচ্ছেন, তার দিকে তার কোনো লক্ষ নেই। নিজের উদ্দেশ্য সাধিত না হলে সে বিগড়ে যায়। কারণ, সে আসল কল্যাণ সম্পর্কে অবগত নয়। সে তার সমজাতীয় মানুষদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। কেননা, তার এবং তার প্রতিপালকের মাঝে কোনো পরিচিতি-পরিচয় নেই। সে এই জগৎ থেকে আখেরাতের যাত্রাকে ভয় করে। কারণ, তার রাস্তার কোনো পাথেয় নেই। রাস্তা সম্পর্কে জ্ঞানও নেই।

এমন কত আলেম ও জাহেদ রয়েছে– যাদের হয়তো একজন সাধারণ মানুষের মতোও মারেফাত অর্জিত হয়নি। বরং একজন সাধারণ মানুষও তাদের চেয়ে বেশি মারেফাতের অধিকারী হয়ে পড়ে। তাছাড়া এমন কিছু সাধারণ ব্যক্তি আছে, যাদেরকে এমন মারেফাত দেওয়া হয়েছে, অনেক আলেম ও জাহেদ তাদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানে পৌঁছুতে পারেনি।

এটা আসলে তাকদির ও ভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে এই নিয়ামত দান করেন।

সত্যের পথে দৃঢ়তার আনন্দ

হে তাকওয়ার মাধ্যমে উচ্চে আরোহণকারী ব্যক্তি, তুমি কিছুতেই গোনাহের মাধ্যমে এর মর্যাদা ভূলণ্ঠিত করো না। প্রবৃত্তির প্রচণ্ড কামনা, দ্বিপ্রহরের তীব্র তৃষ্ণায় তোমার অন্তর যদি যন্ত্রণায় ফেটে যেতে চায়, তাপে ঝলসে যেতে চায়—তবুও তুমি গোনাহের প্রলুব্ধকর তীব্রতার ওপর ধৈর্যধারণ করো। কারণ, এটাই হলো সবচেয়ে মর্যাদা কিংবা সবচেয়ে অধঃপতনের সীমারেখা।

ঠিক এখানেই নির্ধারিত হয়ে আছে তোমার পতন কিংবা উত্থান।

আল্লাহর দোহাই! নিষিদ্ধ জিনিস থেকে বিরত থাকার আন্তরিক মিষ্টতা তুমি একবার চেখেই দেখো না! কারণ, এটি এমন একটি গাছ– যার ফল হলো দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান ও মর্যাদা। তোমার যখন প্রবৃত্তির পিপাসা খুব বেড়ে যায়, তখন তুমি তার কাছেই প্রার্থনা করো– যার কাছে রয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তির উপকরণ। এবং প্রার্থনায় হাত উঠিয়ে বলো, কষ্টকর এই দিনগুলো কষ্টের মধ্যেই কেটে চলেছে, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দেখা তুমি আমাকে দাও হে প্রভু।

আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি সেই ব্যক্তির কথা চিন্তা করো, যে তার প্রায় গোটা জীবন তাকওয়া ও আনুগত্যের মধ্যে অতিবাহিত করেছে; কিন্তু শেষ বয়সে কোনো পরীক্ষায় আপতিত হয়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে বসল—তবে তো তার সৌভাগ্যের তরী তীরে এসে ডুবে গেল!

এমন ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার কোনো আফসোস নেই। তার জন্য আফসোস হলো জান্নাতের। এই সর্বশেষ পরীক্ষাটায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই তার জন্য জান্নাত ছিল অনিবার্য।

হায়, সে এই মুহূর্তটুকু তার অবৈধ প্রিয় বস্তু বা প্রিয় ব্যক্তিকে যদি একটু উপেক্ষা করতে পারত!

নতুবা হে ওই ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর মুহূর্তকাল ধৈর্যধারণ করতে পারো না, তুমি আমাকে বলো, তুমি আসলে কে? তোমার আমল কী? কতটুকু তোমার সম্মান ও মর্যাদা?

তুমি কি জানো, প্রকৃত বীর ও সাহসী পুরুষ কে?

প্রকৃত বীর ও সাহসী ব্যক্তি সে, যে কোনো নিরাপদ নির্জন নিরালায় কোনো হারামের মুখোমুখি হয়, জ্বলে ওঠে কামনার অগ্নি এবং তা নিরাপদে সম্পাদন করতেও সক্ষম হয়—কিন্তু ঠিক সেই সময় সে তার প্রতিপালকের দৃষ্টির প্রতি তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং তার ভেতরে প্রতিপালকের অপছন্দনীয় কাজ করতে লজ্জার সৃষ্টি হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে তৃষ্ণা তার বুকের মধ্য থেকে বিদূরীত করে দেয় এবং কাজটি থেকে সে বিরত হয়ে পড়ে।

পরবর্তীতে তার অবস্থা দেখলে মনে হবে, এ ব্যাপারে তার যেন আগ্রহই জন্মেনি, তার প্রবৃত্তি যেন তাকে এ ব্যাপারে প্ররোচিতই করেনি। আর সে যেন এটি সংঘটিত করতেও সক্ষমও ছিল না! অথচ শুধু আল্লাহ তাআলার ভয়ে সে এর থেকে বিরত থেকেছে সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহর কসম, এভাবে গোনাহের ঝাপটা তোমার কাছেও আসবে, তুমি যদি ভেঙে পড়ো, তবে অধঃপতিত হবে। আর যদি আগের মতোই গোনাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারো, তবে প্রশংসনীয় ব্যক্তিদের কাতারে উঠে আসতে পারবে।

সুতরাং আল্লাহর জন্য তুমি তোমার ভালোগুলো ব্যয় করো। অবৈধ প্রবৃত্তি-চাহিদাগুলো ত্যাগ করো। কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করো। আর জেনে রাখো, তুমি এমন একজন আল্লাহর কর্মচারী—জীবনের সূর্য ডুবলেই যার হাত ভরে উঠবে পারিশ্রমিকের পুরস্কারে। সীমাহীন জীবনজুড়ে নেমে আসবে শ্রান্তি শেষের সুখ, শান্তি ও মর্যাদা।

হিকমতের রহস্য

আকলের মাধ্যমে যখন চিন্তা করেছি, তখন তাতে আল্লাহ তাআলার সকল কার্যাবলি অনুধাবনে এক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনুভব করেছি। কখনো কখনো তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কিছু হিকমতের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। যেমন, কিছু নির্মাণের পর আবার তার ধ্বংস। তখন আকলের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধা কাজ করে। আর ঠিক শয়তান এই সুযোগটিই গ্রহণ করে ওয়াসওয়াসা দিয়ে বলতে থাকে—এখানে কী হিকমত আছে দেখাও?

তখন আমি তাকে বলি, ধুর হ দুর্ভাগা, আমাকে আর তুই ধোঁকা দিতে আসিস না। এ যাবৎ আমি যা দেখেছি, তাতেই আমার রবের হিকমত ও কল্যাণকামনার সর্বোচ্চ দলিল আমার কাছে সাব্যস্ত হয়ে আছে। আর কিছু দরকার নেই।

হে নফস, এখন যদি তোমার নিকট কোনো কিছু বোঝার অস্পষ্টতা থাকে, তাহলে সেটা তোমার অনুধাবনের কমতির কারণেই হয়েছে। দুনিয়ার সামান্য-রাজা-বাদশাহর ক্ষেত্রেও এমন কত রহস্য ও গোপন বিষয় থাকে, যেগুলোর তুমি কিছুই জানো না। তাহলে তুমি এমন কী হয়ে পড়েছ যে, মহান রবের সকল রহস্য বা একান্ত বিষয়গুলো তুমি জেনে যাবে? সামগ্রিকভাবে তুমি যা কিছু জানো, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং যেগুলো তোমার অনুধাবনের বাইরে, তুমি সেগুলোর পেছনে পড়ো না।

মনে রেখো, তুমি হলে তার অসংখ্য অগণিত বিশাল সৃষ্টির মাঝে খুবই সামান্য ও ক্ষুদ্র একটি সৃষ্টি। সুতরাং তুমি কীভাবে তার ব্যাপারে বিরূপ হতে পারো, যার থেকে তোমার সৃষ্টি হয়েছে? যার থেকে তোমার প্রকাশ ঘটেছে? যিনি তোমার স্রষ্টা।

এছাড়া তোমার কাছে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তার আরও কত হিকমত, তার বিধান এবং তার রাজ্য ও রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রকাশ। সুতরাং তোমার যতটুকু সম্ভব, সেগুলোর অনুধাবনের জন্য তুমি তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও উপকরণ ব্যবহার করো। এগুলোই তোমাকে তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারবে।

আর যেগুলো তোমার অনুধাবনের বাইরে রাখা হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে তুমি নিঃশর্ত তার আনুগত্য করে চলো। এটাই ইবাদত। কারণ, বাস্তবতা হলো- দুর্বল চোখের মানুষ সূর্যের আলোর সাথে পাল্লা দিতে পারে না।

নফসের সাথে জিহাদ

নফসের সাথে জিহাদ একটি অন্যরকম বিষয়। এতে খুব প্রজ্ঞা দূরদর্শিতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

কারণ, কিছুলোক নফসের লাগাম ছেড়ে দিয়ে তার সকল চাহিদা পূরণে লেগে পড়ে। এ কারণে তারা নিজেরা বিভিন্ন সমস্যা ও বিপদের মধ্যে আপতিত হয়। আবার কিছুলোক নফসের বিরোধিতায় খুবই বাড়াবাড়ি করে। নফসের সকল বৈধ অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করে। এমনকি তার ওপর জুলুমও করে।

তাদের এই জুলুমের কারণে তাদের ইবাদতের মধ্যেও বিরূপ প্রভাব পড়ে। কেউ হয়তো ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে না। এতে তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে দেখা যায় আবশ্যক আমলগুলোও সে করতে সক্ষম হয় না। কেউ কেউ নির্জননিরালা বেছে নেয়। এতে মানুষদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক-সংস্রব থাকে না। এগুলো তাদের বিভিন্ন ফরজ কিংবা শ্রেষ্ঠ কাজ থেকে বঞ্চিত করে রাখে। যেমন, রোগী দেখতে যাওয়া, পিতা-মাতার খেদমত, মানুষের সংশোধন। এভাবে নিজেও উপকৃত হওয়া এবং অন্যদের উপকৃত করা থেকে বঞ্চিত থাকে।

সঠিক ও আদর্শবান ব্যক্তি তো তিনি, যার থেকে মানুষ একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিকতা এবং মৌলিক বিষয়াবলির জ্ঞান শিখতে পারে। মানুষদের মাঝেই অবস্থান করে। এবং নফসকে বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়, কিন্তু অবৈধ বিষয়ে ছাড় দেয় না। নফসের সাথে তার আচরণ হয় অতি ভারসাম্যপূর্ণ। যেমন, কোনো বাদশাহ তার কোনো সৈনিকের সাথে হাসি-তামাশা করেন। কিন্তু বিষয়টা যখন বেশি খোলামেলা এবং সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায়, তিনি তখন আবার রাজসিক ক্ষমতা ও আভিজাত্যের গাম্ভীর্য দিয়ে পরিবেশ শান্ত করে আনেন।

একজন দূরদর্শী ও আদর্শবান ব্যক্তিও নফসের সাথে এমন আচরণ করেন। তার বৈধ প্রাপ্যগুলো তাকে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু নিষেধিত বিষয়গুলো থেকে তাকে অতি কঠোরতার সাথে হলেও ফিরিয়ে রাখেন।

সময়ের অপচয়

আমি অধিকাংশ মানুষকে দেখি—তারা খুবই আশ্চর্যরকম অবহেলায় সময় কাটিয়ে দেয়। রাত যদি দীর্ঘ হয়, তবে গল্প-গুজবের মাধ্যমে নষ্ট করে। কিংবা অনর্থক যুদ্ধ-কাহিনি ও চিত্তাকর্ষক প্রেম-ভালোবাসার কাহিনির বই পড়ে সময় পার করে। আর যখন দিবস হয়ে পড়ে দীর্ঘ—তখন দুপুরের ঘুমে সময় কাটিয়ে দেয়। এছাড়া দিবসের আরও বিভিন্ন সময় বাজারে কিংবা দজলা নদীর পাড়ে ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করে।

এদের উদাহরণ হলো এমন এক জাহাজের অধিবাসীদের মতো, যারা নিজেদেরকে বিভিন্ন খোশ-গল্পে মত্ত রেখেছে—অথচ স্রোতের টানে জাহাজ ভেসে চলেছে কোথায়, সেদিকে তাদের কোনো খেয়ালই নেই।

তবে খুবই অল্প মানুষকে দেখেছি, যারা পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্বের অর্থ অনুধাবন করতে পারে। তারা জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করে। যাত্রার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

তবে তাদের মাঝেও ভিন্নতা রয়েছে। তাদের ভিন্নতার কারণ হলো, আখেরাতের সম্বল সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে নিজেদের ইলমের স্বল্পতা কিংবা আধিক্য। সতর্ক যারা, তারা সব সময় নিজেদের প্রধান লক্ষ্যের দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখে। এ কারণে তারা ব্যবসায় বেশি লাভবান হয়। আর যারা এ সম্পর্কে উদাসীন ও অজ্ঞ– তারা স্রোতের টানে চলতে থাকে, কখনো মানজিল পায়। কখনো ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে।

কত মানুষকে দেখেছি, জীবনের দীর্ঘ সফর পাড়ি দিয়ে সূর্য ডুবুডুবু– কিন্তু অর্জনের খাতা একেবারে শূন্য। নেকির পাতায় শূন্যতায় ভরা। আল্লাহর দোহাই, আল্লাহর দোহাই! জীবনের মৌসুমকে বুঝতে শেখো। সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আগেই দ্রুত অর্জনের থলে পূর্ণ করে নাও। ইলম শেখো। হিকমত অর্জন করো। সময়ের সাথে পাল্লা দাও। নফসের ওপর সওয়ার হও। পাথেয়ের মাধ্যমে সজ্জিত হও।

আমলদার আলেম

আমি আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে অনেক 'মাশায়েখ'-এর সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাদের একেকজনের অবস্থা ছিল একেক রকম। ইলমের ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থা ও মর্যাদা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তবে তাদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত করেছেন তারাই, যাদের ইলমের সাথে আমলও ছিল। অথচ তাদের চেয়ে অন্যদের ইলম হয়তো বেশিই ছিল– কিন্তু তাদের দ্বারা তেমন বেশি উপকার হয়নি।

আমি আলেম-মুহাদ্দিসদের এমন ব্যক্তিদের সাথেও সাক্ষাৎ করেছি, যারা ছিলেন অনেক জ্ঞানের অধিকারী। বুঝমান। প্রাজ্ঞ। তাদের কলবে ও কিতাবে সংরক্ষিত ছিল অনেক ইলম ও জ্ঞান। কিন্তু তাদের মজলিস ছিল গিবতে ভরপুর। অন্যদের অবস্থান নির্ণয়ের (জারহ ও তাদিল শাস্ত্র) সুযোগে তারা গিবত করে বেড়াত। এবং হাদিসের এই পঠনের ওপর তারা প্রতিদান গ্রহণ করত। সম্মান বজায় রাখতে গিয়ে যেকোনো প্রশ্নের দ্রুত উত্তর প্রদান করত– অথচ ভুলের দিকে ভ্রুক্ষেপ করত না। তাদের সত্যানুসন্ধান নেই। যাচাই-বাছাই নেই।

আমি আবদুল ওয়াহহাব আনমাতি রহ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি ছিলেন 'সালাফে সালেহিন'-এর পথ ও পদ্ধতির ওপর অটল একজন ব্যক্তিত্ব। তার মজলিসে কখনো গিবত শোনা যায়নি। হাদিস শ্রবণের ক্ষেত্রে তিনি কখনো প্রতিদান গ্রহণ করতেন না। আমি যখন তার নিকট 'কিতাবুর রাকাইক'-এর হাদিসগুলো পাঠ করি, তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখেছি। তিনি হাদিস শুনছেন—আর তার দুটি চোখ দিয়ে বিরামহীন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে! আমার সেই ছোট বয়সে তার এই আশ্চর্য হৃদয়বিগলিত ক্রন্দন তখনই আমার অন্তরের মাঝে এক অন্য ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করেছিল। আসলে তিনি ছিলেন সেই সকল মহান মনীষীদের অন্তর্ভুক্ত—আগের যুগে আমাদের আকাবিরদের গুণাবলি যেমন শোনা যায়।

এছাড়া আমি শাইখ আবু মানসুর আল-জাওয়ালিকি রহ. এর সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি ছিলেন খুবই চুপচাপ ধরনের মানুষ। যা বলতেন, কঠিনভাবে যাচাই-বাছাই ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে দৃঢ়তার সাথেই বলতেন।

তার মজলিসে কোনো প্রশ্ন করা হলে, কখনো কখনো তার ছাত্ররা তার উত্তরে হয়তো তাড়াহুড়া করে ফেলত। কিন্তু তিনি তাদের থামিয়ে দিতেন। বিষয়টির ওপর দীর্ঘ পর্যালোচনার পর নিশ্চিত হয়ে তারপর উত্তর দিতে বলতেন।

তিনি বেশি বেশি রোজা রাখতেন। চুপচাপ থাকতেন। কথা কম বলতেন।

আমি এই দুই ব্যক্তির মাধ্যমে যেভাবে অধিক পরিমাণে উপকৃত হয়েছি, আর কারও দ্বারা তেমন উপকৃত হতে পারিনি। এর দ্বারা আমি একটি জিনিস খুব ভালোভাবে বুঝেছি, আর তা হলো এই–

الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول.

কথার প্রমাণের চেয়ে কাজের প্রমাণ অনেক বেশি কার্যকর ও হৃদয়গ্রাহী।

এছাড়া আমি এমন অনেক শাইখকে দেখেছি, যাদের একান্ত সময়গুলো ছিল হাসি-মজাক ও বিলাসিতায় পূর্ণ। এ কারণে তাদের লিখিত ও সংরক্ষিত অসংখ্য কিতাব থাকা সত্ত্বেও তারা মানুষের অন্তরে জায়গা করে নিতে পারেনি। তাদের জীবদ্দশায়ও মানুষরা তাদের দ্বারা বেশি উপকৃত হতে পারেনি। আর তাদের মৃত্যুর পর তো তারা মানুষের অন্তর থেকে একেবারেই মুছে গেছে। এ কারণে পরে আর কেউ তাদের সেসকল কিতাব ও রচনার দিকে দৃষ্টিপাতও করেনি।

আল্লাহর দোহাই! ইলমের সাথে আমল করো। কেননা, এটাই হলো মূল কাজ।

তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে, যে তার গোটা জীবন ইলমের সাধনায় অতিবাহিত করল, কিন্তু আমল করল না? সে তো দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকেও বঞ্চিত হলো, আবার আখেরাতের সমূহ কল্যাণের জন্যও কিছু করল না। আখেরাতে সে তো আমলে নিঃস্ব হয়ে উঠবেই– সেই সাথে নিজের বিপক্ষে নিজেই নিয়ে উঠবে এক শক্তিশালী দলিল।

শাস্তির ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে না করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কত মহান ও ক্ষমতাধর!

তাকে যে চিনতে পেরেছে, সে তাকে ভয় করবেই। আর যে তার শাস্তি ও আজাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করছে, সে আসলে তাকে চিনতেই পারেনি। এ ব্যাপারে আমি একটি আশ্চর্য বিষয় চিন্তা করে বের করলাম। বিষয়টি হলো এই–

আল্লাহ তাআলা কখনো কাউকে এমনভাবে ঢিল দেন, যেন তাকে তিনি ছেড়েই দিয়েছেন। এভাবে জালেমের হাত বাড়তেই থাকে। তাকে যেন আটকে রাখার কেউ নেই। ক্রমে তার ঔদ্ধত্য বাড়তেই থাকে। এরপরও অন্তর ফিরে আসে না বা ভীত হয় না– তখন তিনি হঠাৎ তাকে তার ক্ষমতা দিয়ে কঠোরভাবে ধরে বসেন।

কিন্তু মাঝখানে এই যে তাকে অবকাশ দেওয়া, ঢিল দেওয়া– এর মাঝে দুটো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লুকিয়ে আছে–

১. জুলুমের মাধ্যমে ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়া।

২. জালেমকে ফিরে আসার সুযোগ প্রদান করা।

এদিকে ধৈর্যশীলের ধৈর্যের কারণে তার ওপর আল্লাহর প্রতিদান নেমে আসে। আর জালেমের নিকৃষ্টতম কাজের আধিক্যের কারণে তার শাস্তিরও প্রবৃদ্ধি হতে থাকে।

আবার কখনো কখনো মানুষের নিকট জালেমের শাস্তির কারণটি মানুষের অগোচর থাকে। হঠাৎ তার ওপর শাস্তি দেখে মানুষরা বলাবলি করতে থাকে– অমুককে তো আমরা ভালো বলেই জানি। তার ওপর এ বিপদ আসার কী কারণ?

তখন অদৃশ্যের ভাগ্য এসে বলতে থাকে, এটি তার গোপন পাপের শাস্তি। তার সেই গোপন পাপ শাস্তির মাধ্যমে প্রকাশ্যে এসে গেল। আল্লাহ হলেন মহান সত্তা– যার কাছে কিছুই গোপন নেই। তাই শাস্তিও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু বান্দা যদি তাওবা করে, তখন মানুষের গোনাহকে এমনভাবে

গোপন করেন, যেন তিনি তা জানেনেই না! আর অন্য মানুষের জানার প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু তিনি কখনো কাউকে ঢিল দেন আর তাই দেখে জালেম আরও ভুল ও অবাধ্যতার মধ্যে অগ্রসর হয়। আবার তিনিই যখন ধরে বসেন, তার ভয়াবহতায় মানুষের অন্তর কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে।

আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। আমিন।

নফসকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া

আমি একবার ইলম, ইলমের ঝোঁক এবং তার চর্চায় মশগুল থাকা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। লক্ষ করলাম—এগুলো অন্তরকে যেমন শক্তি প্রদান করে আবার মনের মধ্যে এক ধরনের কঠোরতাও সৃষ্টি করে।

অন্তরের শক্তির প্রয়োজন আছে। কারণ, অন্তরের এই শক্তি যদি না থাকত এবং তার একটি দীর্ঘ আশা না থাকত, তবে আর সে ইলমে মগ্ন থাকতে পারত না। যেমন, আমি হাদিস লিখি এবং এগুলো বর্ণনা করার আশা রাখি। এগুলো রচনা শুরু করেছি এবং সেগুলো শেষ করার প্রত্যাশা করি। আমি একটি দীর্ঘজীবন কামনা করি। আরও কত কত কাজ করার স্বপ্ন দেখি।

কিন্তু আমি যখন শুধু 'মোআমালা'র বিষয়ে চিন্তা করি, তখন এসকল বাহ্যিক প্রত্যাশা কমে আসে। তখন শুধু আখেরাতের ভাবনা আসে। দুনিয়ার কাজের ব্যাপারে অন্তর দমে যায়। চোখ দিয়ে অশ্রু নামে। প্রার্থনায় নত হয়ে পড়ি। তখন মনের মধ্যে অন্য ধরনের এক প্রশান্তি অনুভব করি। আর অবস্থা এমন হয়—যেন আমি মোরাকাবার মধ্যে রয়েছি।

অবশ্যই আমি মানি, ইলম হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। সবচেয়ে মর্যাদার বিষয়। তার জন্য কিছু এদিক-সেদিক হলেও, ইলমের ব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

আর 'মোআমালা'– তাতেও অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেগুলোর দিকে একটু আগে আমি নিজেই ইশারা করেছি, তবুও সেটা যেন এমন অলস ভীরু ব্যক্তির কাজ—যে শুধু নিজের অন্তরের পরিশুদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত থাকে– অন্যের

হেদায়াতের ব্যাপারে কিছুই করে না। নিজের নির্জনতা নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। মানুষদের তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে না। আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি হলো, আলেম ব্যক্তি সঠিকভাবে তার ইলমচর্চায় লেগে থাকবে—সাথে সাথে অন্তরকে মোরাকাবা ও মোশাহাদার চাবুকে মৃদু মৃদু আঘাত করবে। তবে এত প্রবল আঘাত করবে না– যাতে আবার পূর্ণভাবে ইলমচর্চায় মশগুল হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু আমার অবস্থার কথা বলি—

আমি আমার অন্তরের দুর্বলতা ও অধিক কোমলতার কারণে অধিক কবর জিয়ারত এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হওয়াকে পছন্দ করি না। কারণ, এটি আমার চিন্তার মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং ইলমচর্চা থেকে বের করে অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুর চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়। মনে হয়—আমি যেন আর বেঁচে থাকব না! বাহ্যিক কাজগুলো তখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়।

তবে এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, ওষুধ হতে হবে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী। এ কারণে যার অন্তর কিছুটা কঠোর ও কঠিন, যার কাছে এমন মোরাকাবা একেবারেই অনুপস্থিত—যা তাকে গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে, তার জন্য উচিত হবে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এবং মুমূর্ষু ব্যক্তিদের কাছে উপস্থিত হওয়া, কবর জিয়ারত করা এবং অন্তরকে নরম করার চেষ্টা করা।

কিন্তু যার অন্তর আগে থেকেই নরম ও কোমল, তার বিদ্যমান অবস্থাই তার যথেষ্ট। তাকে বরং এখন এমন কিছু ভালো কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকা উচিত– যেগুলো তাকে আরও বেশি নরম হওয়া থেকে ভুলিয়ে রাখবে। যাতে সে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারে এবং নিজের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কখনো কখনো হাসি-মজাক করতেন। আয়েশা রা.এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। গল্প করতেন। এভাবে নফসকে কিছুটা স্বস্তি ও বিশ্রাম দিতেন।

যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী অধ্যয়ন করেছে, সে বুঝবে, নফসকে স্বস্তি প্রদানের যে কথা আমি বলছি, তার প্রয়োজন আছে।

মৃত্যুক্ষণ

অনেক সৌভাগ্যের একটি বিষয় হলো, মৃত্যুর সময় মুমূর্ষু ব্যক্তির উপলব্ধি আসা। কারণ, তখন যে সচেতনতা আসে, তার কোনো বর্ণনা হয় না। তখনকার অস্থিরতারও কোনো সীমা থাকে না। তখন সে অতীতের ত্রুটিগুলোর ওপর আফসোস করতে থাকে।

মুমূর্ষু ব্যক্তি কামনা করে, সে যদি এবারের মতো বেঁচে যায়, তবে এতদিনের ছুটে যাওয়া ভালো কাজগুলো সে করবে। অতীতের সকল ভুল-ত্রুটির ওপর তাওবা করবে যথার্থভাবে– মৃত্যুর ওপর তার যেমন দৃঢ় বিশ্বাসের রয়েছে।

আর যখন এ কাজগুলো না করেই নিজের মৃত্যুর আশঙ্কা করে, সেই চিন্তা ও আফসোস মৃত্যুর আগেই যেন তাকে মেরে ফেলার উপক্রম হয়।

কথা হলো, সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় এই উপলব্ধিগুলোর সামান্য অণু পরিমাণও যদি কারও অর্জিত হতো, তাহলে সে দৃঢ় তাকওয়ার ওপর আমল করার কারণে তার সকল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যেত। সে আরেফদের কাতারে উঠে যেতে সক্ষম হতো। কিন্তু আফসোসের কথা হলো, এই উপলব্ধি আমাদের আগে থেকে হয় না।

কিন্তু বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি, যে নিজের ক্ষেত্রে মৃত্যু-মুহূর্তের উপলব্ধিগুলো অনুধাবন করে নেয় এবং সে অনুযায়ী আমল করে। যদিও মৃত্যুর বাস্তব সেই অবস্থা অনুভব করা কখনো সম্ভব নয়, তবুও নিজের উপলব্ধির সক্ষমতা অনুপাতে কল্পনা করে নেওয়া যায়। এভাবে সে প্রবৃত্তির বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখে এবং কল্যাণের দিকে ধাবিত হয়।

হজরত হাবিব আজমি রহ.[৭২] থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি প্রতিদিন সকালে স্ত্রীকে বলতেন, 'আমি যদি আজ মারা যাই, তবে অমুক আমাকে গোসল দেবে আর অমুক আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে।'

---

[৭২]. পুরো নামঃ আবু মুহাম্মদ আল ফারসি। বসরার অধিবাসী। তিনি ছিলেন সেখানকার বিখ্যাত আবেদ ও জাহেদ। মুস্তাজাবুত দাওয়া। তার থেকে অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ১৩৯ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। سير أعلام النبلاء : ৬/১৪৩। حلية الاولياء : ৬/১৪৯।

একবার হজরত মারুফ কারখি রহ. এক ব্যক্তিকে বললেন, 'আপনি আমাদের জোহরের নামাজে ইমামতি করুন।' লোকটি বলল, 'আমি যদি আপনাদের জোহরের নামাজে ইমামতি করি, তাহলে হয়তো আসরের নামাজ আর পড়াতে পারব না।'

হজরত মারুফ রহ. তাকে বললেন, 'তার মানে আপনি আশা করে বসে আছেন যে, আপনি আসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। জীবন সম্পর্কে কত দীর্ঘ আপনার আশা!

সূক্ষ্মদর্শীদের অনুধাবন ও শিক্ষা

কখনো কখনো এমনও হয়—সচেতন অনুভূতিশীল কোনো ব্যক্তি হয়তো একটি কবিতা পড়লেন কিংবা শুনলেন-এর থেকে তিনি এমন একটি ইশারা বা শিক্ষা প্রাপ্ত হন, যা তার জীবন পাল্টে দেয়। যা তাকে অনেক উপকার করে।

হজরত জুনায়েদ রহ.[৭৩] বলেন, একবার আমার এক সুহৃদ ব্যক্তি আমাকে একটি কাগজের টুকরা এনে দেন। তাতে লেখা ছিল, আমি মক্কার পথে এক উটচালককে বলতে শুনেছি এই কবিতা–

أبكي وما يدريك ما يبكيني　　　أبكي حذارا أن تفارقيني

وتقطعي حبلي وتهجريني

আজ আমি কাঁদি। তুমি কি জানো, কেন আমি অশ্রু ঝরাই?
তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে, কাঁদি আমি সেই বেদনায়
ছিন্ন হবে সকল বাঁধন; তুমি আমায় ছেড়ে যাবে হায়!

একজন গোপন প্রেমিকের নিকট কবিতার এই চরণগুলোর প্রভাবের বিষয়টি লক্ষ করে দেখো তো। সে এর দ্বারা যা বুঝেছে, সেটাকে হজরত জুনায়েদ

---

৭৩. পুরো নাম: জুনায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জুনায়েদ আননাহাওন্দি। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুফি সাধক ও আবেদ। হজরত আবু ছাউর-এর নিকট দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করেছেন। তার মারেফাতের গভীরতা নিয়ে তুমি চিন্তা করতেও পারবে না। তার বাবা ছিলেন একজন তাঁতী। আর তিনি নিজে ছিলেন একজন মুচি। তাদের পৈতৃক আবাস ছিল নাহাওন্দ। কিন্তু তার জন্ম ও বেড়ে উঠা বাগদাদে। তিনি অনেক আলেম থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তিনি ২৯৮ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। طبقات الحنابلة : ১/১২৭-১২৯ এবং سير أعلام النبلاء : ১৪/৬৬।

রহ.-কেও অবহিত করাকে ভালো মনে করেছে। আর এটা বোঝার জন্য তো হজরত জুনায়েদকেই প্রয়োজন—আর কে হবে এর সমঝদার!

মানুষের মধ্যে অনেক শ্রেণি রয়েছে। এদের কিছু ব্যক্তির মেজাজ-স্বভাব খুবই মোটা ধরনের। তাদের অনুভব-অনুভূতি অতটা সূক্ষ্ম নয়। তাদের কেউ যখন এ ধরনের কোনো কবিতা শোনে, তখন সে বলে ওঠে, এর দ্বারা কী বোঝায়?

এর দ্বারা যদি খোদাকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তবে তো কিছুতেই স্ত্রী-বাচক শব্দ দিয়ে তার দিকে ইশারা করা হতো না। আর যদি কোনো নারীই উদ্দেশ্য হয়, তবে আর এখানে তাসাওউফ বা দুনিয়াবিমুখতা কিংবা শিক্ষার কী আছে?

আমার জীবনের কসম! এগুলো আসলে উদাসীন উটচালকদেরই গান—এগুলো তারাই শোনে। এ কারণেই এ ধরনের কবিদের কবিতা ও গায়কদের গান শুনতে নিষেধ করা হয়। কারণ, অধিকাংশ ব্যক্তিই এই কবিতার চরণগুলোকে প্রবৃত্তির কামনা এবং জৈবিক বাসনা হিসেবে অনুধাবন করে। নতুবা আমাদের আর কি সেই জুনায়েদ ও সেই গোপন প্রেমিক আছে! যদি আজ তাদের মতো কেউ থাকত, তাহলে তারাই বুঝত এর মর্ম! অন্যদের জন্য এগুলো শোনা নিষেধ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তবে একেবারে মোটা দাগে বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ করে যারা এটির ক্ষেত্রে আপত্তি পেশ করেন, তাদের কথাও গ্রহণীয় নয়। এটাকে অন্তরের গভীরতম বোধ দিয়ে বুঝতে হবে। আর তা হলো,

গোপন সেই প্রেমিক শাব্দিক কোনো ইশারা-ইঙ্গিত গ্রহণ করেনি এবং এটাকে তার নিজের চাহিদার ওপরও উপলব্ধি করে নেয়নি যে—এখানে নারী বা পুরুষের কোনো বিষয় আসবে। এখানে সে শুধু অর্থের দিক থেকে একটি ইশারা বা বোধকে গ্রহণ করেছে। যেন সে এই চরণগুলোর অর্থ দিয়ে তার হাবিব বা প্রিয়কে আহ্বান করছে। সে বলছে, আমি তোমার বিরহ ও বিচ্ছিন্নতার ভয়ে ক্রন্দন করি।' এটিই তার মূল উদ্দেশ্য। এখানে সে নারী বা পুরুষবাচক শব্দের দিকে কখনোই খেয়াল রাখছে না।

বিষয়টির মর্মকথা মর্ম দিয়েই বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

অনুভূতিশীল সচেতন ব্যক্তিরা এই ধরনের কথা থেকে নিজের শিক্ষণীয় বিষয়ের ইশারা-ইঙ্গিত গ্রহণ করে নিতে পারে। এমনকি অতি সাধারণ ব্যক্তিরাও যে সকল কথা বলে—সেগুলোকেও তারা একটু এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে মহান কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

আমি নিজে ইবনে আকিলের লেখায় দেখেছি—তিনি তার এক শাইখের থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক মেয়েকে বলতে শোনেন–

غسلت له طول الليل فركت له طول النهار

خرج يعاين غيري زلق وقع الطين

তার জন্য রাতভর গোসল করলাম। তার জন্য দিনভর শরীর করলাম পরিচ্ছন্ন।

আর সে বের হলো অন্যকে দেখতে। তাই পড়ল নরম কাদামাটিতে পা পিছলে।

এর দ্বারা শাইখ এই অর্থ নিয়েছেন—যেন আল্লাহ তাআলা বলছেন, হে আমার বান্দা, আমি তোমার শারীরিক গঠনকে কত সুন্দর করেছি। তোমার অবস্থা কত ভালো করেছি। তোমার গঠন শক্তিশালী করেছি। তোমাকে কত নিয়ামত প্রদান করেছি। তোমার জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি। আর তুমি ধাবিত হয়েছ অন্যের দিকে। শিরকের দিকে। তাহলে অচিরেই আমার বিরোধিতার শাস্তি তুমি লক্ষ করবে। পা পিছলে পড়বে জাহান্নামে!

ইবনে আকিল আরও বলেন, আমি একটি মেয়েকে বলতে শুনেছি। কথাটি দীর্ঘ দিন আমার অন্তরের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে রেখেছিল। কথাটি এই–

كم كنت بالله أقول لك ... لذا التواني غائله

وللقبيح خميرة ... تبين بعد قليل

আমি কতবার তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলেছি, এই অবহেলার কারণেই তার ধ্বংস।

সকল নিকৃষ্টতার এমন একটি উপরি গাজনা রয়েছে, যা অচিরেই প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

কবিতাটির শেষে ইবনে আকিল রহ. বলেন, আমাদের পালনীয় বিষয়ের অনেক ক্ষেত্রে শিথিলতার বিষয়টিও এই রকম লজ্জাজনক– যা অচিরেই আল্লাহ তাআলার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করো

একবার দুনিয়ার কিছু আসবাব খুবই সস্তায় আমার অর্জিত হয়। এরপর যখন এভাবে আরও কিছু অর্জিত হতে লাগল, আমার অন্তর থেকেও যেন কিছু হারাতে থাকল। যখনই আমার সামনে তা অর্জনের আনন্দ আসতে লাগল, অন্যদিকে আমার অন্তরের আকাশ অন্ধকারে ছেয়ে যেতে লাগল।

এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে আমি একদিন নফসকে ডেকে বললাম, 'হে নিকৃষ্টতম নফস, গোনাহ হলো অন্তরের চর্মরোগ। গোনাহ ঘটলেই তার শরীর ও চেহারার আকৃতি পাল্টে যায়। এ কারণে বলা হয়েছে–إستفت قلبك– তুমি আগে তোমার অন্তরকে জিজ্ঞেস করো।'

দুনিয়াভরতি সকল বস্তু অর্জনের ক্ষেত্রেও যদি অন্তরে কোনো ধরনের কদর্যতা অর্জিত হয়, তবে তাতেও কোনো কল্যাণ নেই।

দ্বীনের মধ্যে কিংবা লেনদেনের মধ্যে কোনো কদর্যতা-পঙ্কিলতা আপতিত হওয়ার মাধ্যমে যদি দুনিয়ার 'জান্নাত'ও মিলে যায়, তবু তাতে শান্তি নেই। অন্তরের পঙ্কিলতা নিয়ে বাদশাহর বহুদামি পালঙ্কে শুয়ে থাকার চেয়ে, অন্তরের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি নিয়ে জীর্ণ ময়লার ভাণ্ডে শুয়ে থাকাও বেশি আরামদায়ক।

এভাবে আমি নিজের নফসের সাথে নিজেই তর্ক-বিতর্ক করতে থাকি। কখনো আমিই নফসের উপর বিজয়ী হই, কখনো নফস আমার ওপর জয়ী হয়ে পড়ে। কিন্তু এর মাঝেই হঠাৎ 'জীবনের প্রয়োজন' এসে দাবি করে বসে, উপায়-উপকরণ তার জীবনধারণে অবশ্যই দরকার। এছাড়া তার উপায় কী! আমি বাহ্যিকভাবে বৈধ ছাড়া অবৈধ কোনো জিনিসের দিকে তো হাত বাড়াইনি! তাহলে অসুবিধা কী?

আমি প্রয়োজনকে বললাম, তুমি যা করেছ, এটি কি তাকওয়ার খেলাফ নয়?

সে বলল, হ্যাঁ।

আমি আবার বললাম, তুমি যা অর্জন করেছ, তা কি ধীরে ধীরে অন্তরের নম্রভাব দূর করে সেখানে রূঢ়তা ও কঠোরতা আনয়ন করবে না?

সে বলল, হ্যাঁ, করবে বৈ কী!

আমি বললাম, এটার পরিণাম যদি এগুলোই হয়, তবে কিছুতেই তোমার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।

এর কিছুদিন পর এ বিষয়ে আমি একদিন আমার নফসের সাথে নির্জনে বসলাম। তাকে বললাম, বাড়াবাড়ি বন্ধ করে এবার একটু চুপ করে আমার কথাগুলো শোনো—

দুনিয়াতে তুমি যে উপায়ে সম্পদ অর্জন করো—যার মধ্যে সন্দেহ আছে, তার সকল কিছুই কি তুমি খরচ করে যাওয়ার ওপর নিশ্চিত?

নফস বলল, না।

আমি বললাম, তাহলে এটাও কষ্টের কথা। তোমার অনুপস্থিতিতে অন্যরা এগুলো গ্রহণ করে নেবে আর তুমি এগুলো অর্জনের কারণে দুনিয়াতেও কদর্য হলে আর আখেরাতের শাস্তি তো রয়েছেই।

তোমার দুর্ভোগ হোক– তুমি এগুলো বর্জন করো– যেগুলো তাকওয়ার বিপরীত– আল্লাহর দিকে তাকিয়ে সেগুলো বর্জন করো। হারাম ও সন্দেহযুক্ত জিনিস ছাড়া তোমার কি আর কিছুই অর্জন করার নেই? সেদিকে ধাবিত হও না কেন?

তুমি কি শোনোনি—যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কিছু বর্জন করে, আল্লাহ তাকে তার চেয়ে আরও উত্তম জিনিস প্রদান করেন?

তুমি শিক্ষা নেবে সেই সকল ব্যক্তি থেকে—যারা অনেক সম্পদ জমা করেছে, কিন্তু সেগুলো অন্যরা উপভোগ করেছে। তারা কামনা করেছে, কিন্তু তাদের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেনি। কত আলেম রয়েছেন, কত কিতাব জমা করেছেন, কিন্তু তা দ্বারা উপকৃত হতে পারেননি। আবার এমন কতজন এগুলো দ্বারা উপকৃত হয়েছে—অথচ তার কাছে হয়তো কিতাবের দশটি খণ্ডও নেই। এমন কত সুখ-শান্তিতে বসবাসকারী রয়েছে, যারা সামান্য কিছু দিনারেরও মালিক নয়। আবার সুখ-শান্তিহীন কত ধনাঢ্য ব্যক্তিও রয়েছে।

তোমার কি এই বুদ্ধি হবে না, যে ব্যক্তি হয়তো অন্যের থেকে সস্তায় বা অন্য যেকোনো উপায়ে কিছু অর্জন করল, তার থেকে এগুলো বিভিন্ন বিপর্যয়ের

মাধ্যমে আবার বিনষ্ট হয়ে পড়বে না– সে কথা তোমাকে কে বলল? হয়তো দেখা যাবে বাড়ির মালিক বা পরিবারের কারও এমন অসুখ হলো যে, বছর জুড়ে বিভিন্ন উপায়ে যা কিছু অর্জন করেছিল, তার দ্বিগুণ বের হয়ে গেল!

সুতরাং দুনিয়া বা আখেরাত– তাকওয়ার চেয়ে উপকারী কোনো জিনিস তাদের জন্য নেই।

আমার এই তিরস্কার-ভর্ৎসনায় নফস চিৎকার করে উঠে বলল, আমি যদি শরিয়তের আবশ্যক সীমাকে অতিক্রম না করি– তখন আমার ক্ষেত্রে মন্তব্য কী?

আমি তোমার ধোঁকা বা প্রতারণার ওপর নিশ্চিত নই। আর তোমার গোপন বিষয়ে তুমিই সবচেয়ে ভালো জানো।

তখন নফস আমাকে বলল, তাহলে বলে দিন– আমি কী করব?

আমি বললাম, তোমাকে সর্বক্ষণ যিনি দেখছেন, তার ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হবে। কোনো কর্তৃত্বশীল অভিজাত ব্যক্তি তোমাকে যদি সর্বক্ষণ দেখত, তখন তুমি তার সাথে কেমন আচরণ করতে– তার সাথে তুলনা করো। আর আল্লাহর নিকট কোনো বিষয়ই গোপন থাকে না– যা তোমার ওই ব্যক্তির নিকট গোপন থাকা বা রাখা সম্ভব।

সুতরাং সর্বক্ষণ সতর্ক থাকো। কিছুতেই সাময়িক প্রবৃত্তির প্ররোচনায় পড়ে তোমার ইয়াকিন ও তাকওয়াকে বিক্রয় করে ফেলো না। আর যদি এগুলো করতে জীবনযাপনে খুবই কষ্ট ও কঠোরতা অনুভব হয়—তবে মেজাজ ও স্বভাবকে বলো, আর কিছুদিন অপেক্ষা করো। প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার সময় তো এখনো আসেনি।

আল্লাহই তোমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। সাহায্যের মাধ্যমে সক্ষমতা প্রদান করবেন।

সুফিদের বিভিন্ন বিভ্রান্তি

বুদ্ধি ও শরিয়তের চাহিদা হলো, কল্যাণকর জিনিসের প্রতি চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত করা।

যেমন সম্পদ অর্জন করা, সম্পদ সংরক্ষণ করা এবং সেগুলো প্রবৃদ্ধির জন্য আগ্রহ রাখা এবং চেষ্টা করা। কারণ, মানুষের অস্তিত্বের অবশিষ্ট থাকা খাদ্য ও সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে মানুষের সম্পদের অপচয় ও বিনষ্ট করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾

তোমরা তোমাদের সম্পদ নির্বোধ বোকাদের নিকট অর্পণ করো না–যে সম্পদকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জীবনধারণের মাধ্যম বানিয়েছেন।' [সুরা নিসা : ৫]

অর্থাৎ এই সম্পদ হলো তোমাদের জীবনযাপনের মাধ্যম। এর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের জীবন পরিচালনা করে থাকো। এ কারণে এগুলো নষ্ট করো না।

অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾

অপব্যয়ী হয়ে হাত সম্পূর্ণরূপে খুলে রেখো না, তাহলে তোমাকে নিন্দিত ও নিঃস্ব বসে থাকতে হবে। [সুরা ইসরা : ২৯]

আরেক আয়াতে বলেন,

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ○ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

আর নিজের অর্থ-সম্পদ অপ্রয়োজনীয় কাজে ওড়াবে না। জেনে রেখো, যারা অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ওড়ায়, তারা শয়তানের ভাই। [সুরা ইসরা : ২৬-২৭]

অন্য আয়াতে বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا﴾

এবং যারা ব্যয় করার সময় না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তা হয় উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্যমান। [সুরা ফুরকান : ৬৭]

এছাড়া আল্লাহ তাআলা সম্পদের শ্রেষ্ঠত্বের কথাও বলেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ খরচ করে। [সুরা বাকারা : ২৬১]

অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করছ না!
[সুরা হাদিদ : ১০]

হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

نعم المال الصالح للرجل الصالح.

একজন সৎ ব্যক্তির জন্য হালাল সম্পদ কতই না উত্তম![৭৪]

এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

ما نفعني مال كمال أبي بكر.

আবু বকরের সম্পদের মতো অন্য কোনো সম্পদ আমাকে এত বেশি উপকার করেনি।[৭৫]

হজরত আবু বকর রা. ব্যবসার জন্য বের হয়ে যেতেন। রাসুলের সাহচর্য ছেড়ে যেতেন; কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ জন্য নিষেধ করতেন না।

---

[৭৪]. হাদিসটি ইমাম বোখারি রহ. তার 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া মুসনাদে আহমাদেও বর্ণিত হয়েছে– ৪/১৯৭,২০২।

[৭৫]. ইমাম ইবনে মাজা রহ. তার 'মুকাদ্দামা'য় এটি উল্লেখ করেছেন– ১/৯৪। এবং মুসনাদে আহমদ : ২/২৫৩, ২৬৬। শাইখ আহমদ শাকের বলেন, এর সনদ বিশুদ্ধ।

হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলতেন,

لأن أموت بين شعبتي جبل أطلب كفاف وجهي أحب إلي من أن أموت غازياً في سبيل الله.

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে শহিদ হওয়ার চেয়েও আমার নিকট প্রিয় হলো, আমি পাহাড়ের দুই প্রান্তের মাঝে মারা যাব, আমার জন্য প্রয়োজনীয় হালাল জীবিকা অন্বেষণ করতে করতে।

এভাবে সাহাবিদের একটি বড় অংশ ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। তাবেয়িদের অনেকেই ব্যবসা করেছেন। তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়েব রা. অনেক সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। তিনি যাইতুন মজুত করতেন।

সালাফে সালেহিনদের সময়ও এমনই চলেছে। কিন্তু এরপর এক দুরারোগ্য অসুখের মতো বিপর্যয় নেমে এসেছে। এখন– যখন মানুষের সম্পদের প্রয়োজন হচ্ছে, তখন আর মানুষ কারও থেকে কোনো কৌশলেই সম্পদ পাচ্ছে না– যতক্ষণ না সে তার বিনিময় দিচ্ছে কিংবা নিজের দ্বীন বিক্রয় করছে। সম্পদ অর্জনের জন্য শারীরিক শক্তিও প্রয়োজন। এ সময় একটি দল অলসতার পথ অবলম্বন করল এবং দাবি করতে লাগল যে, তারাই হলো একমাত্র তাওয়াক্কুলকারী। আর তারা বলে বেড়াতে লাগল– আমরা কোনোকিছু জমিয়ে রাখি না। কোনো সফরের জন্য পাথেয় রাখি না। শরীরের রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে।

এই কাজ ও মানসিকতা স্পষ্ট শরিয়তের বিরোধী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম যখন হজরত খাজির আলাইসি সালামের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফরে বের হন, তখন তিনিও পাথেয় সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিলেন।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যখন হিজরতের জন্য বের হন, পাথেয় নিয়েই বের হন। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম প্রমাণ হলো আল্লাহ তাআলার আদেশ। তিনি বলেন,

﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾

তোমরা পাথেয় গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। [সুরা বাকারা : ১৯৭]

এরপর এসকল সুফিগণ দুনিয়ার প্রতি ঘৃণার দাবি করে। কিন্তু আসলে নিজেরা বোঝেই না, কোন জিনিসের জন্য ঘৃণা হওয়া উচিত। তারা কোনো মানুষের সম্পদের প্রাচুর্য প্রার্থনাকে লোভ ও লালসা বলে ধারণা করে।

মোটকথা, তারা নিজেরা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী এমন একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, যা মূলত খ্রিষ্টানদের 'রাহবানিয়াত' বা কৃচ্ছতাসাধন থেকে উৎসারিত। এটি তাদের একটি বাহ্যিক ভোজবাজি। যেন তারা 'জুহুদ' বা দুনিয়াবিমুখতার আবরণে শিকারের জাল পেতেছে। আর এর মাধ্যমে লোকদের হাত থেকে তাদের নিকট রিজিক পৌঁছায়, এগুলোকে তারা নাম দিয়েছে বিজয়।

হজরত ইবনে কুতাইবা রহ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে اليد العليا– উচ্চ হাতের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি হলো প্রদানকারী হাত। আমি সেসকল সুফির কথায় আশ্চর্য বোধ করি, যারা বলতে চায়, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'গ্রহণকারী হাত'।

আসলে আমি মনে করি, এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা অন্যের থেকে চেয়ে-খেয়ে জীবনযাপন করতে ভালোবাসে। হীনতার পথ অবলম্বন করে। শরিয়ত তাদের এই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর সাথে শরিয়তের কোনো সম্পর্ক নেই।

হাদিসে এসেছে, যখন ইবরাহিম এবং লুত আলাইহিমাস সালামের নিকট নিজ এলাকায় জীবিকার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা দেখা গেল, তখন তারা জীবিকার অন্বেষণে অন্য এলাকায় হিজরত করেন।

হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম সম্পদশালী ছিলেন। এরপরও অধিক উপার্জনের আশায় হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে বললেন,

﴿أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾

'তুমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আট বছর আমার এখানে কাজ করবে। আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, সেটা তোমার নিজ স্বাধীনতা। [সুরা কাসাস : ২৭]

আমাদের এক সালাফ বলেছেন,

> من ادعى بغض الدنيا فهو عندي كذاب إلى أن يثبت صدقه، فإذا ثبت صدقه فهو مجنون.
>
> যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি ঘৃণার দাবি করে, আমার মতে সে মিথ্যা বলছে। আর যদি সে তার সত্যতা প্রমাণ করতে পারে, তবে সে অবশ্যই পাগল।

সুফিদের একটি দল নবী, সাহাবি ও সালাফদের পথ ও পদ্ধতি বর্জন করে অলসতার জীবনযাপন শুরু করেছে। বিভিন্ন খানকা জমিয়ে বসেছে। সেখানে খায় আর নর্দন-নৃত্য করে। হজম হয়ে গেলে আবারও খেতে বসে। কোনো ধনবান ব্যক্তির নিকট খাবারের দাওয়াতের সুযোগ পেলে সেটাকে আবশ্যক করে নেয়। তারা এটা করে শুকরিয়া আদায় কিংবা মাগফিরাত কামনার বাহানায়। আর সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো, তারা দাবি করে– এটা নাকি সওয়াবের কাজ!

এগুলো সবই শয়তানের প্রতারণা। শয়তান তার ধোঁকার জালের মধ্যে তাদেরকে আটকে রেখেছে।

এছাড়া আরও আশ্চর্য ব্যাপার হলো, কেউ একজন খুব দুনিয়ার ঘৃণার কথা বলে বেড়ায়, কিন্তু তৃপ্তিভরে খায় এবং খাবারটি কোথা থেকে কীভাবে এলো– সেদিকে কোনো লক্ষ রাখে না। গোনাহগার পাপী ভ্রষ্ট ব্যক্তিদের সম্পদ ভক্ষণ করেও বলে বেড়ায়—এটা আল্লাহ আমাদের রিজিক হিসেবে দিয়েছেন।

তারা শরিয়ত থেকে মুক্ত। শরিয়তও তাদের থেকে মুক্ত।

মহাজগৎ নিয়ে ভাবনা

একবার হজের সফরে আমরা আরবের রাস্তায় চলছিলাম। চলতে চলতে আমরা এক সময় খায়বারের রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। সেখানে আমি অনেক বড় বড় পাহাড় ও আশ্চর্য বিস্ময়কর সব রাস্তা-পথ দেখতে পেলাম। এগুলো আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আমি যেন মুগ্ধ হতবুদ্ধ হয়ে সেগুলো দেখছিলাম। আমার অন্তরে স্রষ্টার বড়ত্ব ও মহত্ব উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল। এখনো এসকল রাস্তার আলোচনায় আমার অন্তরে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা অন্য কিছুর স্মরণে হয় না।

একবার আমি আমার নফসকে ডেকে বললাম, তোমার এ কী অবস্থা! তুমি সমুদ্রে যাও, তার আশ্চর্য বিষয়াবলির দিকে চিন্তার দৃষ্টি নিয়ে তাকাও। সেগুলো তো এগুলোর চেয়েও আরও বিশাল ও বিস্ময়কর। এরপর আশপাশের সকল সৃষ্টির দিকে তাকাও এবং সেগুলো লক্ষ করো। সপ্ত আসমান ও শূন্য দিগন্তের তুলনায় এগুলো তো একটি বিশাল ময়দানের মাঝে একটি বিন্দুর মতো।

এরপর কল্পনায় ঘুরে বেড়াও আকাশের দিগন্তে। চক্কর দাও আরশের চারপাশে। এবং লক্ষ করার চেষ্টা করো সেখানকার আলো উজ্জ্বলতা ও বিশালতা। এরপর সকল কিছু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অবশেষে এগুলোর স্রষ্টার দিকে তোমার দৃষ্টি ফেরাও– এবার দেখতে পাবে এই বিশাল জগৎ ক্ষমতাশীল স্রষ্টার এমন ক্ষমতার অধীন হয়ে যাচ্ছে, যে ক্ষমতার কোনো শেষ নেই, সীমা নেই।

এরপর তোমার নিজের দিকে তাকাও। লক্ষ করো তোমার ক্ষুদ্রতা ও নশ্বরতা। তোমার অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব। তোমার সূচনা ও সমাপ্তি। এরপর চিন্তা করো, সূচনার আগে তুমি কিছুই ছিলে না। এরপর একদিন ধ্বংসের মাটি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

তাহলে তুমি কীভাবে তোমার এই অস্তিত্ব নিয়ে তার পূর্ণ পরিচয় ও পরিচিতি পেতে চাও– যিনি এর সকল কিছুর শুরু-সমাপ্তি দেখতে পান? যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন– তার বিশালত্ব কীভাবে তোমার ক্ষুদ্রতা দিয়ে পরিমাণ করতে

চাও? তিনিই তোমার স্রষ্টা। তাহলে তোমার অন্তর কীভাবে এই মহান ইলাহ ও স্রষ্টার স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে?

আল্লাহর কসম, মানুষের গাফেল অন্তর থেকে যদি তার প্রবৃত্তির বেহুঁশি ছুটে যায়, তবে অবশ্যই স্রষ্টার বড়ত্বে ও মহত্বে তার অন্তর ভীত ও নত হয়ে পড়বে। কিংবা তার ভালোবাসায় নিমগ্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তিটাই বেশি প্রাধান্য লাভ করে, প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এ কারণে সে পাহাড় ও সমুদ্র দেখে সেগুলোর বড়ত্ব ও বিশালত্ব বোঝে। কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান যদি এগুলোর দিকে তাকায়, তখন বাহ্যিক এই পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্রের বড়ত্ব ও বিশালত্বের চেয়ে এগুলোর স্রষ্টার সীমাহীন ক্ষমতা ও মহত্বই তাকে বেশি উজ্জীবিত করে।

বিপদ ও ধৈর্য

দুনিয়ার সকল বিপদেরই একটি নির্ধারিত সময় ও শেষ আছে। আল্লাহ তাআলা সেটা জানেন। এ কারণে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য উচিত হবে, সেই বিপদের সমাপ্তির সময় পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা। নতুবা সে যদি নির্ধারিত সময়ের আগেই অস্থির বেচাইন হয়ে হায়-হুতাশ করতে থাকে, তবে এটা তাকে কোনো উপকার করবে না। যেমন, কোনো ভারি ধাতব গোলাকার বস্তু যদি ওপর থেকে নিচে পতিত হয় কিংবা ঘূর্ণন শুরু করে, তবে আর তাকে ঠেকানো যায় না। বরং তখন তার স্থির হওয়া বা গতিহীন হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে হয়। এভাবে একটি নির্ধারিত সময় থাকা সত্ত্বেও যদি বিপদ দ্রুত দূর হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা হয়, তবে এতেও কোনো উপকার হয় না।

সুতরাং উচিত হলো ধৈর্যধারণ করা। যদিও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য দুআ করা বৈধ এবং এর মাধ্যমেই উপকার হয়। কিন্তু দুআকারীর জন্য সাড়াদানের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। বরং সে তার 'দাসত্ব' বা আনুগত্যকে প্রকাশ করবে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে, প্রার্থনার মাধ্যমে এবং প্রজ্ঞাবান সত্তার ফয়সালা মেনে নেওয়ার মাধ্যমে।

আর এদিকে সম্ভাব্য যে অপরাধগুলোর কারণে এই বিপদ এসেছে, সেগুলো বর্জন করবে। কারণ, অধিকাংশ বিপদই হয়ে থাকে শাস্তিস্বরূপ। কিন্তু দ্রুত সাড়াপ্রত্যাশী ব্যক্তি তো প্রতিপালকের অমান্যতা প্রদর্শন করে। এটা বান্দার কাজ নয়। এটা বান্দার জন্য শোভনও নয়। বরং বান্দার কাজ হলো, প্রতিপালকের ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং ধৈর্যধারণ করা।

হ্যাঁ, অধিক দুআ ও প্রার্থনার মাধ্যমে মিনতি করা তো ভালো কাজ। বরং বিমুখ থাকা– প্রার্থনা না করাই হারাম ও অবাধ্যতা। কিন্তু এক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করাও তো তার পরিচালনা-পদ্ধতির মাঝে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতে চাওয়ার নামান্তর।

আলোচিত বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করো। নিশ্চয় এগুলো আপতিত বিপদকে তোমার নিকট সহনীয় করে তুলবে।

ধৈর্যের পুরস্কার

জগতে ধৈর্যের চেয়ে কঠিন কিছু নেই।

কারণ, কখনো ধৈর্যধারণ করতে হয় প্রিয় ব্যক্তির বিচ্ছেদের ওপর কিংবা অপছন্দনীয় জিনিস সয়ে নেওয়ার ওপর। বিশেষকরে ধৈর্যধারণটা কঠিন হয়ে পড়ে তখন, যখন বিপদের সময়টি অতি দীর্ঘ হয় কিংবা উদ্ধারের ক্ষেত্রে নিরাশা এসে যায়।

ঠিক এই সময়গুলোতে এমন কিছু অবলম্বন ও পাথেয় দরকার– যার মাধ্যমে এই কঠিন যাত্রাটা পার করা সম্ভব হয়। পাথেয় অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন,

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বিপদের পরিমাণের দিকে লক্ষ করবে। কারণ, বিপদটি এর চেয়ে আরও বেশি হতে পারত। কিংবা ভেবে নেবে, এরপর আল্লাহ আরও বেশি ভালো প্রতিদান দেবেন। যেমন, কারও সন্তান মারা গেল। কিন্তু আল্লাহর কাছে তো এর চেয়ে আরও উত্তম প্রতিদান রয়েছে। হয়তো সেটা দুনিয়াতেই হতে পারে– তাকে আরও নেককার সন্তান প্রদানের মাধ্যমে। কিংবা এর প্রতিদান হতে পারে আখেরাতে।

তাছাড়া শুধু শুধু চিন্তা-ভাবনা করা এবং এ নিয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করে তো কোনো উপকার হয় না। এমন আরও কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে, ধৈর্যধারণ সহজ হয়ে যায়।

ধৈর্যের পথে উপকার ছাড়া কিছু নেই। সুতরাং ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য এই সকল ভাবনায় নফসকে ব্যস্ত রাখা উচিত। এর মাধ্যমে তার বিপদের সময়গুলো সহজে সহনশীলতার সাথে অতিবাহিত হবে এবং কষ্টের আঁধার কেটে সুখময় সকালের উদয় ঘটবে।

আল্লাহ তাআলার নির্বাচন

কখনো কোনো বিপদে আপতিত হলে আমাদের কর্তব্য হবে, আল্লাহর নিকট দুআ করা। কিন্তু দুআ কবুলে বিলম্ব হলে কিংবা একান্ত প্রার্থনায় সাড়া না পেলেও অন্তরে যেন কোনোপ্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়—সে দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

কেননা, আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতিপালক। তিনি সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী। তার কাছে শুধু প্রার্থনা করা যায়। যদি সাড়া না দেন– তবে তিনি তার রাজত্বে যা ইচ্ছা সেটাই করতে পারেন। আর যদি বিলম্ব হয়, তাহলেও তো তিনি তার হিকমত অনুযায়ী কাজ করেছেন।

সুতরাং তার এই একান্ত হিকমত ও অদৃশ্য কল্যাণকামনার ওপর বিরূপতা প্রদর্শন করা আনুগত্যশীল বান্দার কাজ নয়। এরপর জেনে রাখা উচিত, নিজের নির্বাচনের চেয়ে সব সময় আল্লাহ তাআলার নির্বাচনই উত্তম। কারণ, কখনো বান্দা এমন বিষয় প্রার্থনা করতে পারে, পরিণামে যা তার জন্য ক্ষতিকর।

হাদিসে এসেছে–

إن رجلا كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد فهتف به هاتف : أن غزوت أسرت وأن أسرت تنصرت.

কোনো কোনো মানুষ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, আল্লাহ যেন তাকে জিহাদের ময়দানে নিয়ে যান। তখন তার অদৃশ্যে কেউ বলতে থাকে, তুমি যদি লড়াইয়ে যাও, তবে বন্দি হবে। আর যদি বন্দি হও, তবে তুমি আর কষ্টের কারণে নিজের ঈমানের ওপর অটল থাকতে পারবে না।[৭৬]

[৭৬]. মুসনাদে আহমদ: ৩/১৮ এবং হাকেম ইবনে মুসতাদরাক: ১/৪৯৩। এবং ইমাম বোখারি রহ.ও এটি 'আলআদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–২/৭১০। ইমাম যাহাবি রহ. এবং তবারনি রহ. এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

আর বান্দা যদি পূর্ণভাবে তার সকল হিকমত ও হুকুমকে মেনে নেয় এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখে যে, সকল কর্তৃত্ব আল্লাহ তাআলারই, তবে তার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে– তার প্রয়োজন পূরণ হোক অথবা না হোক।

হাদিসে এসেছে–

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَهَا لَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ.

> হজরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মুসলিম ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার দিকে তার মুখ উঠিয়ে দুআ করে কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে তা প্রদান করেন। তবে হয়তো সেটা তাৎক্ষণিক প্রদান করেন কিংবা সেটাকে তিনি বান্দার আখেরাতের জন্য জমা করে রাখেন।[৭৭]

এরপর বান্দা যখন কিয়ামতের দিন দেখবে, দুনিয়াতে তাকে যা প্রদান করা হয়েছিল, সবই আজ উধাও হয়ে গেছে। আর যেটা প্রদান করা হয়নি, তার প্রতিদান আখেরাতের জন্য অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তখন সে বলতে থাকবে, হায়! আমার কোনো দুআই যদি দুনিয়ার জন্য কবুল না করে আখেরাতের জন্য রেখে দেওয়া হতো, কতই না ভালো হতো!

এই বিষয়গুলো অনুধাবন করো। এবং অন্তরকে আশ্বস্ত করো– সেখানে যেন কোনো প্রকার সন্দেহ কিংবা তাড়াহুড়া না আসে।

---

[৭৭]. মুসনাদে আহমদ: ১৯/৯৪০৯, পৃষ্ঠা: ৪৫২– মা. শামেলা।

ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব

যে ব্যক্তি জাহেদদের ওপর আলেমদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেখতে চায়, সে যেন জিবরাইল আ., মিকাইল আ. এবং যে সকল ফেরেশতাকে সৃষ্টিজীবের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, তাদের মর্যাদার দিকে তাকায়। অথচ অন্য ফেরেশতাগণ বিভিন্ন ইবাদতের জায়গায় রাহেবদের মতো ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

প্রথম শ্রেণির ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে তাদের ইলমের পরিমাণ অনুপাতে সম্মান ও নৈকট্য অর্জন করেছেন। কিন্তু অন্যদের অবস্থা তাদের চেয়ে নিচে। যেমন বলা হয়েছে, যখন তাদের মধ্যে কেউ কোনো হুকুম নিয়ে আসে, আসমানবাসীরা বিরক্ত হয়– যতক্ষণ না তাদেরকে সংবাদ প্রদান করা হয় যে, এটা প্রভুর পক্ষ থেকে। এ ক্ষেত্রে কোরআনে ইরশাদ হয়েছে–

﴿حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ﴾

> পরিশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করে দেওয়া হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা উত্তর দেয়, সত্য কথা বলেছেন। [সুরা সাবা : ২৩]

একইভাবে কোনো জাহেদ যখন কোনো হাদিস শোনে আর কোনো আলেম যখন তাকে এর বিশুদ্ধতা ও অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন সে জাহেদ ব্যক্তি বিরক্ত হয়।

আল্লাহর প্রশংসা– যিনি কিছু ব্যক্তিকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, যেগুলো দিয়ে তিনি তাদের সমশ্রেণির ওপর তাদের মর্যাদাবান করেছেন। আর ইলমের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে মর্যাদার বড় কোনো জিনিস নেই। ইলমের আধিক্যের কারণেই হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করতে বলা হয়েছে। আর ইলমের কমতির কারণে ফেরেশতারা হয়েছেন সেজদাকারী।

আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্যশীল ব্যক্তিরা হলেন আলেমগণ। তবে ইলম বলতে শুধু তার বাহ্যিক আকৃতি-শব্দ-লফজ উদ্দেশ্য নয়। এখানে অর্থ-মর্ম উদ্দেশ্য। আর সে ব্যক্তিই এর অর্থ-মর্ম অনুধাবনে সক্ষম, যিনি ইলম অনুযায়ী আমল করেন। তার প্রমাণ হলো, যখন ইলম কোনো বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলতের

বিষয়ে জানায়, তখনই সে তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করে। যখন কোনো বিষয়ের নিষেধ আসে, তখন সে সেই নিষেধিত বিষয় থেকে বিরত থাকে।

নিজের অর্জিত ইলমের সাথে যখন কেউ এভাবে চলতে সক্ষম হয়, তখনই শুধু ইলম তার নিকট নিজের রহস্য প্রকাশ করে। এটা তখন তার জন্য অর্জন হয়ে যায়। সে ইলমের জন্য এমনই আকর্ষণ ও আগ্রহ অনুভব করে যে, কোনো নতুন বিষয় তাকে আকর্ষণ করার সাথে সাথে সে তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেদিকে ধাবিত হয়।

আর যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে না, ইলম তার রহস্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করে না। তার মূল মর্ম তার কাছে প্রকাশ করে না। তার অবস্থা হয় সেই পাগলের মতো– বিভিন্ন পাগলামির আকর্ষণ যাকে উদ্বুদ্ধ করে। নিছক সে শুধু জ্ঞান অর্জন করে– এটা তার সচেতন ইলমের আকর্ষণ নয়।

এই উদাহরণগুলো বোঝার চেষ্টা করো। তোমার উদ্দেশ্য শোধিত করো– নতুবা আমলহীন ইলমের পেছনে আর গলদঘর্ম হয়ো না।

মধ্যপন্থাই শ্রেষ্ঠ

জেনে রেখো, সকল বিষয়ে মধ্যপন্থাই হলো শ্রেষ্ঠ পন্থা। যখন দেখি দুনিয়াদাররা তাদের সম্পদের উচ্চাশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং আখেরাতের ভালো কাজগুলো থেকে দূরে সরে যায়, তখন আমি তাদেরকে বেশি বেশি মৃত্যু, কবর ও আখেরাতের কথা স্মরণ করতে আদেশ করি।

কিন্তু যখন কোনো আলেমের ক্ষেত্রে এমন হয় যে, তার স্মরণ থেকে মৃত্যু কখনো অনুপস্থিত থাকে না। প্রায় সর্বক্ষণ আখেরাতের কথা-সংবলিত বহু হাদিস তার কাছে পড়া হয় এবং নিজেও বহু হাদিস পাঠ করে, তখন এগুলো তার মৃত্যুর স্মরণকে এমনভাবে বাড়িয়ে দেয় যে, স্বস্তির সাথে সে অন্য কাজও করতে পারে না।

তাহলে সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি প্রচণ্ড ভয় ও আখেরাতের অধিক স্মরণকারী এই আলেমের জন্য উচিত হবে, মৃত্যুর স্মরণ থেকে তার অন্তরকে কিছুটা বিরত রাখা। যাতে তার নফস দুনিয়ার অন্য কাজের দিকেও কিছুটা অগ্রসর হতে পারে। যেমন, কিতাব রচনা, আত্মীয়স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখা। কল্যাণকর কাজ এবং বিবাহ ও সন্তান অন্বেষণ ও প্রতিপালন ইত্যাদি।

সুতরাং তার এই অবস্থায় সে যদি আরও মৃত্যুর স্মরণে লেগে থাকে, তবে সেটা তার উপকারের চেয়ে ক্ষতিই করবে বেশি। তুমি কি শোনোনি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী হজরত আয়েশা রা.-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন? কখনো আয়েশা রা. অগ্রগামী হয়েছেন, আবার কখনো তিনি অগ্রগামী হয়েছেন। এভাবে তিনি হাসি-মজাকও করেছেন। কিছু সময় অন্তরকে স্বস্তি দিয়েছেন।

সুতরাং কঠোরতার ওপর যদি আবার কড়াকড়ি শুরু হয়, তবে তা শরীরকে নষ্ট করে এবং অন্তর তাতে ত্যক্ত বিরক্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

হজরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি একবার আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করলেন যে, তিনি যেন তার ওপর তার ভয়ের দরজা খুলে দেন।

প্রার্থনা অনুযায়ী তার ওপর ভয়ের দরজা খুলে দেওয়া হলো। সর্বক্ষণ প্রচণ্ড ভয়। পরিণামে তার মস্তিষ্ক বিগড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। হজরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. আবার দুআ করলেন– ভয়ের তীব্রতা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য।

সুতরাং জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই মূলনীতিটি অনুসরণ করবে। কখনো কখনো নফসকে একটু স্বস্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এর মাঝেই রয়েছে তার কল্যাণ।

পূর্ণতার অন্বেষণ

কারও যদি একটি পরিশুদ্ধ চিন্তা থাকে, তাহলে চিন্তাটি তাকে কোনো বিষয়ের সর্বোচ্চ মর্যাদায় উপনীত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে এবং তাকে নীচতার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে নিষেধ করবে। কবি আবুত তিব আল মুতানাব্বি বলেন,

ولم أر في عيوب الناس عيباً ... كنقص القادرين على التمام

মানুষের ত্রুটিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দোষ বলি আমি
পূর্ণতার ওপর সক্ষম ব্যক্তি যদি নিচে আসে নামি।

সুতরাং কোনো বুদ্ধিমানের জন্য উচিত হবে, তার জন্য সম্ভব সর্বোচ্চ স্থানে পৌছার চেষ্টা করা।

মানুষের জন্য যদি আকাশে আরোহণের বিষয়টি সম্ভব হতো, তবে আমি তার জন্য জমিনে বসে থাকাটা পছন্দ করতাম না।

নবুয়ত যদি চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জনের বিষয় হতো, তবে আমি তা অর্জনে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিকে ভাবতাম নিম্নশ্রেণির লোক। কিন্তু তা যেহেতু অর্জন করা সম্ভব নয়, তাহলে যা সম্ভব তা অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক।

পণ্ডিতরা বলেন, ইলম ও আমলে, জ্ঞান ও কর্মে যথাসম্ভব পূর্ণতায় পৌছানো ব্যক্তির জীবনই একটি শ্রেষ্ঠ জীবন।

অর্থাৎ তারা বলতে চান—মানুষের শারীরিক আকৃতি ও চেহারা তার স্বেচ্ছায় অর্জনের বিষয় নয়। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা এবং নিজেকে পরিপাটি করে রাখা নিজ ইচ্ছায় সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রেও অনেক মানুষ ভীষণ অবহেলা ও অলসতা প্রদর্শন করে। শরিয়ত এসব বিষয়ে সতর্ক করেছে। এখানে তার কিছু উল্লেখ করছি। যেমন, হাতের নখ কাটা, বগলের পশম ওঠানো, নাভির নিচের পশম কাটা। জনাকীর্ণ জায়গার ক্ষেত্রে রসুন-পেঁয়াজ না খাওয়া– যাতে দুর্গন্ধ না ছড়ায়। সুগন্ধি ব্যবহার করা।

একজন মুসলমানের জন্য এগুলোর ওপর কিয়াস করে জীবনের অন্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রেও শুভ্রতার পরিচয় দেওয়া উচিত। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পরিমাণে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্যতার পরিচয় দেওয়া উচিত। আমরা জানি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরের

ঘ্রাণের সৌরভে তার আগমন উপলব্ধি করা যেত। এটি ছিল তার সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকার উত্তম উদাহরণ।

এসকল আলোচনা দ্বারা আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে, এ বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা হবে। যেমন লৌকিকতা প্রদর্শনকারীরা করে। কিন্তু মধ্যপন্থা সব সময়ই প্রসংশনীয়।

এরপর একজন মুসলমানের জন্য তার শারীরিক শক্তিমত্তার ব্যাপারেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ, এই শরীরটাই তার বাহন। এর শক্তি যদি কমে যায়, তার নিজের শক্তিও কমে যাবে। এ বলে আমি অবশ্যই বাছ-বিচারহীন 'ভক্ষণ'-এর কথা বলতে চাচ্ছি না। আমি বলতে চাচ্ছি একটি উপযুক্ত পরিমাণের কথা– যার মাধ্যমে শারীরিক শক্তিমত্তা অটুট থাকে। শরীর হলো একটি প্রবাহিত ঝরনার মতো। এটা ঠিক থাকলে নিজে উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যরাও উপকৃত হতে পারে।

তুমি কিছুতেই সেই কঠোর কঠিন জাহেদদের কথায় কান দিয়ো না, যারা নিজেরা খুবই স্বল্প খায়। এবং দুর্বল হতে হতে ফরজ ও আবশ্যক কাজগুলো থেকেও অক্ষম হয়ে পড়ে। অথচ দুনিয়াতে কত কাজ! শান্তি লুকিয়ে থাকে সত্য শক্তিমত্তার আড়ালে!

তাদের এই বিষয়গুলো কিছুতেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবিদের থেকে বর্ণিত নয়। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে সাহাবিরা যখন খাওয়ার কিছু পেতেন না, তখন ক্ষুধার্ত থাকতেন এবং ধৈর্যধারণ করতেন। আবার আল্লাহ রিজিক দিলে খেতেন এবং শুকরিয়া আদায় করতেন।

যেহেতু তোমার শরীর হলো তোমার বাহন—তাই এর দানা-পানির ব্যাপারেও তোমাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সুতরাং তার কষ্ট হয়– এমন কিছু করবে না। বরং তার সুস্থতার ব্যাপারে নজর রাখবে। আর সেই জাহেদের কথার দিকে দৃষ্টি দেবে না, যে বলে, 'আমি কিছুতেই নফসকে শাহওয়াতের ওপর নিয়ে যেতে চাই না। তাই খাই না।'

হ্যাঁ, খাবারের ক্ষেত্রে বেঁচে থাকতে হবে হারাম থেকে। অধিক ভক্ষণ থেকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথিরা খাদ্য বর্জন করেছেন কোনো হারামের কারণে অথবা সর্বক্ষণ নফসের চাহিদা বৃদ্ধির ভয়ে। এটা বৈধ।

এরপর সকল সক্ষম ব্যক্তির জন্যই উচিত—ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা উপার্জনের উপযুক্ত কোনো মাধ্যম গ্রহণ করা। যাতে সে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। অন্যরা যেন তার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে না পারে। তবে অবশ্যই এর মধ্যে একটি সীমা বেঁধে নেবে—যাতে উপার্জনে অধিক মগ্নতার কারণে ইলমচর্চা থেকে গাফেল হয়ে না পড়ে। এরপর যার সুযোগ ও সক্ষমতা রয়েছে তার জন্য উচিত হবে, ইলমের সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা।

এরপর সে আল্লাহ তাআলার সর্বোচ্চ মারেফাত অর্জনের জন্যও চেষ্টা করবে। তার জন্য একনিষ্ঠতার সাথে আমল করবে। এটাই হবে তার জীবন-পথের ধারাবাহিক কাজ ও কর্তব্য।

মোটকথা– তার জন্য যে শ্রেষ্ঠত্বগুলো অর্জন করা সম্ভব, সে তার সবগুলোই অর্জন করার চেষ্টা করবে। কারণ, সর্বোচ্চে উঠে নমনীয়তা দেখানোই হলো সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক।

কবি বলেন,

فكن رجلاً رجله في الثّرى ... وهامة همّته في الثريّا

> তাহলে তুমি এমন এক ব্যক্তি হও, যার পা রয়েছে মাটিতে। এমন সাহসী ও প্রত্যয়ী হও, যার হিম্মত ও উচ্চাশা ছুঁয়েছে আকাশের 'সুরাইয়া' তারকাকে।

ইলম ও আমলে তুমি যদি বর্তমানের সকল আলেম ও জাহেদকে ছাড়িয়ে যেতে পারো, তবে তুমি তা-ই করো। তারাও যেমন রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ, তুমিও তেমন এক মানুষ। কোনো ব্যক্তি যদি হীন, অক্ষম ও গৌণ হয়, সে তার হিম্মতের হীনতা ও নীচতার কারণেই হয়।

জেনে রেখো, তুমি এক প্রতিযোগিতার ময়দানে রয়েছ। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। মুহূর্তের জন্যও অবহেলা ও অলসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কারণ,

فما فات ما فات إلا بالكسل   ولا نال من نال إلا بالجد والعزم

> মানুষের জীবনে যত বঞ্চনা এসেছে, সেটা তার অলসতার কারণেই এসেছে।

এবং যতটুকু অর্জন করেছে, সে তার হিম্মত ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অর্জন করেছে।

হিম্মত ও প্রত্যয় এমন এক জিনিস—যা অন্তরকে উজ্জীবিত করে রাখে। যেমন আগুন উত্তপ্ত রাখে পাতিলের মাঝের তরলতাকে। আমাদের একজন সালাফ বলেন,

ليس لي مال سوى كرّي ... فبه أحيا من العدم

قنعت نفسي بما رزقت ... وتمطت في العلا همي

আমার সম্পদ নেই, কিন্তু রয়েছে তার ঝোঁক। আর তাতেই আমি রয়েছি জীবিত ও উজ্জীবিত।

নফস যদিও প্রদত্ত রিজিকের প্রতিই সন্তুষ্ট। কিন্তু হিম্মত আমার ছুটে চলেছে আরও উচ্চে অবিরত।

আলেমদের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব

আলেমদের জন্য দুনিয়ায় ইলমের পর সবচেয়ে উপকারী হলো তার সম্পদ অর্জন। কারণ, যখন তার ইলমের সাথে এই সম্পদ একত্রিত হবে, তখন তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা পাবে। মানুষের নিকট হাতপাতা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। নিজেকে লাঞ্ছনার মুখোমুখি হতে হবে না।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমই তাদের ইলমের ব্যস্ততার কারণে সম্পদ অর্জনের সুযোগ পান না, কিন্তু এগুলো ছাড়া দুনিয়ার জীবনযাপনও সম্ভব নয়। একালে আমাদের এবং আলেমদের ধৈর্যও গেছে কমে।

এ কারণে তারা এমন কিছু জায়গায় যাওয়া-আসা করছে, যা তাদের সম্মান নষ্ট করে। যদিও তারা এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও তাবিলের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু আসলেই এর বিপরীত পথ অবলম্বন করাটাই ছিল তাদের জন্য উত্তম সুন্দর ও সম্মানজনক।

অতীতেও আলেমদের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। যেমন, ইমাম জুহরি খলিফা আবদুল মালেকের নিকট যাওয়া, হজরত আবু উবাইদা, তাহের বিন হুসাইনের দরবারে যাওয়া। ইবনে আবিদ দুনয়া তো ছিলেন খলিফা মু'তাদের দরবারি শিক্ষক। আর ইবনে কুতাইবা মন্ত্রীর প্রশংসায় একটি কিতাবই লিখে ফেলেছেন। এভাবে অনেক আলেম ও জাহেদ ব্যক্তি এমন শাসকদের ছত্র-ছায়ায় বাস করেছেন– যারা ছিল জালেম।

এসকল ক্ষেত্রে যদিও আলেমগণ নিজেদের পক্ষে কিছু ব্যাখ্যা ও ওজর পেশ করেছেন, কিন্তু বাস্তবতা হলো, তারা শাসকদের থেকে যতটা দুনিয়া অর্জন করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তারা তাদের অন্তর থেকে দ্বীন ও তাকওয়া খুইয়েছেন।

আমরা অনেক আলেম ও সুফিকে দেখি, তারা শাসক-মন্ত্রীদের চারপাশ আবৃত করে আছে– যাতে করে তাদের থেকে পার্থিব কিছু প্রাপ্ত হতে পারে। তাদের তোষামদ করছে, লৌকিকতা করছে। আর কেউ নাজায়েয প্রশংসাও করছে। কেউ তাদের দোষ ও জুলুম সম্পর্কে চুপ থাকছে। আরও বিভিন্ন ধরনের তোষামদ ও মোসাহেবি করছে। এবং এর অধিকাংশই করা হচ্ছে নিজেদের দরিদ্রতার কারণে এবং দুনিয়াপ্রাপ্তির আশায়।

এ কারণেই আমরা বারবার বলি– পরিপূর্ণ মর্যাদাবান হতে হলে এবং লোক দেখানো লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকতে হলে, এসকল জালেম শাসক, মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। আর এটি করতে হলে আলেমদের দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে :

১. আলেম ও মুহাদ্দিসদের সম্পদের অধিকারী হতে হবে।

যেমন ছিলেন হজরত সাইয়েদ ইবনে মুসাইয়িব রহ.। তাঁর যাইতুন ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবসা ছিল। আরও ছিলেন সুফিয়ান সাওরি রহ.। তাঁর অনেকগুলো পানি সিঞ্চনের কূপ ছিল। জমি-জায়গা ছিল। সেগুলো থেকে উপার্জন হতো। আরও ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ.। তিনিও অনেক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। এমন ছিলেন আরও অনেকেই।

২. আর সম্পদ যদি না থাকে, তাহলে আলেম ও মুহাদ্দিসদের সীমাহীন ধৈর্যের অধিকারী হতে হবে। অর্জিত সম্পদে যথেষ্ট হোক বা না হোক– তাতেই সন্তুষ্ট থাকার মতো হিম্মত থাকতে হবে।

যেমন ছিলেন বিশর হাফি রহ., আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এবং অনেকে।

কিন্তু এমন ধৈর্যশীল যদি না পাওয়া যায় এবং উল্লিখিতদের মতো ধনবান যদি না হয়, তাহলে অনিবার্যভাবেই একজন আলেম বা মুহাদ্দিস ফিতনা ও পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাবে। ভীষণ কষ্টের শিকার হবে। কিংবা নিজের দ্বীনকেই বিনষ্ট করে ফেলবে।

হে তালিবুল ইলম, তোমাকে এবার বলি, ইলমের সাথে সাথে সম্পদ অর্জনেরও চেষ্টা করবে– যাতে মানুষের নিকট হাত পাতা থেকে বিরত থাকা যায়। এটা তোমার দ্বীনের হেফাজতের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

ধর্মের নামে, দুনিয়াবিমুখতার নামে এবং খোদাভীরুতার নামে যারাই মুনাফেকি করছে এবং আলেমদের মধ্যে যারাই কষ্টে পতিত হতে হচ্ছে– এর অধিকাংশই হচ্ছে দুনিয়ার সম্পদের প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকার কারণে এবং তাদের ভীষণ দরিদ্রতার কারণে। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন অবৈধ পথেও প্রবেশ করে ফেলছে এবং অন্যরাও তাদের নিয়ে খেলছে– তাদের এই দারিদ্র্যের সুযোগে।

কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকার পরও যারা দুনিয়াদারদের সাথে দ্বীন বিক্রয়ে মেলামেশা করছে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তারা তো আলেমদের

কাতার থেকেই বিচ্ছিন্ন। তাদেরকে আলেম বলার কোনো কারণই নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের এমন অবস্থা থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

একজন ফিকাহবিদের শ্রেষ্ঠত্ব

কোনো জিনিসের শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ হলো তার পরিণাম বা ফলাফলের উৎকৃষ্টতা। যে ব্যক্তি ফিকহর প্রতিফল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, সেই বুঝবে যে ইলমগুলোর মধ্যে ফিকহ হলো শ্রেষ্ঠ ইলম। কেননা, মাজহাবগুলোর বিন্যাসদানকারী ইমামগণ এই ফিকহের মাধ্যমেই সকলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। অথচ তাদের সময়েই কোরআন, হাদিস ও ভাষা-সাহিত্যে তাদের চেয়েও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ছিলেন। আজকের দিনেও একইভাবে বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখতে পারো।

এমন কত আলেম রয়েছেন, যারা কোরআন, হাদিস, তাফসির কিংবা ভাষা-সাহিত্যে অনবদ্য ও অনন্যসাধারণ জ্ঞান রাখেন, কিন্তু বয়সের আধিক্য সত্ত্বেও শরিয়তের প্রধান ও মৌলিক হুকুমগুলোর জ্ঞান রাখেন না। কারও অবস্থা এতটাই খারাপ যে, নামাজের মাসআলাগুলোও ঠিকমতো জানা নেই।

কিন্তু একজন ফকিহ– তাকে ব্যাপক অধ্যয়ন করতে হবে; ফিকহের পাশাপাশি অন্য ইলমগুলোর ক্ষেত্রেও যেন সে একেবারে অজ্ঞ থেকে না যায়। নতুবা সে তো একজন প্রাজ্ঞ ফকিহই হতে পারবে না। বরং সে প্রতিটা ইলমে যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান আহরণ করবে, এরপর ফিকহের সাধনায় মনোনিবেশ করবে। এটাই হবে তার দুনিয়া ও আখেরাতের মর্যাদার মাধ্যম।

প্রবৃত্তির প্রাধান্য

আমি অনেক মানুষকে দেখি—নাপাকির ছিটেফোঁটা থেকেও তারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু গিবত থেকে বিরত থাকে না। অনেক দান-সদকা করে, কিন্তু সুদের কারবার বর্জন করে না। রাতের গভীরে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু অনেক ফরজ কর্তব্যও বিলম্বিত করে রাখে কিংবা আদায় করে না। এভাবে অনেক শাখাগত বিষয় তো পালন করে, কিন্তু মৌলিক বিধানগুলোই বিনষ্ট করে ছাড়ে ইত্যাদি।

এগুলো নিয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করলাম– এর কারণ কী? এর দুটি কারণ হতে পারে।

১. অভ্যাস। অভ্যাসের কারণেই মানুষ এমনটি করে। অভ্যাসের কারণেই সে হয়তো কঠিনটাও করে ফেলছে। আবার অভ্যাসের বাইরে হওয়ার কারণে সহজ কাজটাও অনেক সময় সে করছে না। তার নিকট কঠিন মনে হচ্ছে।

২. প্রবৃত্তির প্রাধান্য। হয়তো কোনো বিষয় অর্জনের ক্ষেত্রে তার প্রবৃত্তি বা কামনা প্রবল হয়েছে। সে এর জন্য সে প্রাণপণ পরিশ্রম করছে। অন্যদিকে দৃষ্টিপাতের যেন কোনো সুযোগই নেই। যেকোনো মূল্যে সে এটাকে অর্জন করেই ছাড়বে। এমনকি এ ব্যাপারে সে তার হালাল-হারামেরও বাছ-বিচারও করতে রাজি নয়।

এ ধরনের কাজের উদাহরণ হিসেবে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের কথা উল্লেখ করা যায়। যখন তারা মিসরে এসে খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে ফিরে চলছিল– এ সময় তাদের পেছন থেকে একজনের আহ্বান শুনতে পেল যে-﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾–হে মুসাফির দল, নিশ্চয় তোমরা চোর।

তখন তারা লোকটির দিকে ফিরে বলল,

﴿تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾

আল্লাহর কসম, তোমরা তো জানোই, আমরা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য আসিনি। আর আমরা চোরও নই। [সুরা ইউসুফ: ৭৩]

তাফসিরে বর্ণিত হয়েছে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যখন মিসর এসে নামলেন, তখন তারা তাদের উটের মুখে 'মুখবন্ধনী' পরিয়ে দিলেন– যাতে উটগুলো অন্য কারও জিনিসে মুখ দিতে না পারে। কারও জিনিস খেতে না পারে। এখন ভাইয়েরা 'আমরা চোর নই' কথার মধ্যে এই দিকে ইশারা ছিল যে, অন্যের সামান্য কোনো জিনিসও যেন আমাদের উট খেয়ে ফেলতে না পারে, সে জন্য আমরা আমাদের উটের ক্ষেত্রে যা করেছি, যা তোমরা দেখছ। তাহলে আমরা কীভাবে চোর হতে পারি?

এখানে ভাইদের অবস্থা কেমন? অবস্থাটা এই যে– অন্যের মালিকানার সামান্য কিছুও যেন উট খেয়ে না ফেলে– এ বিষয়ে তাদের 'তাকওয়া'

এতটাই উচ্চ পর্যায়ের... অন্যদিকে তারাই আবার ইউসুফকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছে এবং সামান্য কিছুর বিনিময়ে নিজের ভাইকে গোলাম হিসেবে বেচে দেওয়ার মতো গর্হিত কাজ করেছে!

কিছু মানুষ এমন আছে, যারা দ্বীনের ছোট ছোট বিষয়ও মেনে চলে; কিন্তু বড় বিষয়গুলোই মান্য করে না এবং তার অভ্যাসের কারণে যেটা করতে তার কষ্ট হয়, সেটাও করে না– বিষয়টি ছোট হোক কিংবা বড়। এবং খাদ্য-খাবার ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে যেগুলো তার অভ্যাসের মধ্যে কোনো ব্যাঘাত ঘটায় না– সেগুলোই শুধু মানে। আর বিপরীতগুলো মানে না।

এমন কিছু লোককেও দেখি, যারা সুদ গ্রহণ করে। অথচ তারাই আবার আলোচনায় গল্প করে– মানুষ কীভাবে আজান শুনে মসজিদে না গিয়ে পারে!

কারও তো অজুর মধ্যে ওয়াসওয়াসা হতেই থাকে। একের পর এক পানি ব্যবহার করতে থাকে। অথচ এর কারণে যে প্রচুর পানির অপচয় হচ্ছে, সেটাকে সে কিছুই মনে করছে না। তার থেকে বিরতও থাকছে না।

কিছু মানুষ অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছে– অথচ সে জানে, এটা জায়েয নয়।

এমনকি আমার নিজের দেখা একজন লোকের কথা বলি– তাকে আমি ভালোই মনে করতাম। তাকে একবার এক ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণের জন্য কিছু সম্পদ প্রদান করল। কিন্তু লোকটি তা দিয়ে মসজিদ না বানিয়ে নিজেই আত্মসাৎ করে নিল—নিজের প্রয়োজনে খরচ করে ফেলল।

আবার কিছু লোক এমন আছে, যারা গোনাহের উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকার কারণে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এবং গোনাহ বর্জনের ব্যাপারে তৃপ্তও থাকে। কিন্তু যখন তারাও গোনাহের নিকটবর্তী হয় কিংবা সেই পরিবেশে আসে, তখন আর নিজেকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না কিংবা তা থেকে বিরত থাকে না। বরং তারা নিজেরাই গোনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়।

মানুষের মাঝে এমন আশ্চর্য আচরণের অধিকারী অনেক শ্রেণি আছে– যার আলোচনা অনেক দীর্ঘ।

আমরা নিজেরাও জানি, ইহুদি আলেমদের অনেকেই তাদের ধর্ম ও ইবাদতের ক্ষেত্রে অনেক কষ্ট স্বীকার করত। অনেক আমল করত। কিন্তু যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন এবং তারা তার সত্যতা সম্পর্কেও অবগত হলো, তখন তারা তাদের নেতৃত্বের মোহের ওপর সত্যকে প্রাধান্য দিতে সক্ষম হয়নি।

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ক্ষেত্রেও এমনটিই হয়েছিল। সে-ও বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা জেনেছিল– কিন্তু সে সত্যকে তার প্রবৃত্তির চাহিদা ও রাজত্বের মোহের ওপর প্রাধান্য দিতে সক্ষম হয়নি।

আল্লাহর দোহাই, মৌলিক জিনিস নষ্ট না করা চাই। আর প্রবৃত্তিকে তার ইচ্ছামতো চরতে দেওয়ার অবহেলা থেকেও বেঁচে থাকা চাই। কারণ, তুমি যদি একবার তাকে তার ইচ্ছায় ছেড়ে দাও, তাহলে সে মুহূর্তের মধ্যে তোমার এতদিনের সাজানো তাকওয়ার বাগান সমূলে বিনষ্ট করে দেবে। প্রবৃত্তির উদাহরণ হলো একটি হিংস্র প্রাণীর মতো—যার গলায় শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে। সে যদি দেখে শিকল শক্তিশালী, তখন সে তার থাবাকে গুটিয়ে রাখে। কিন্তু কখনো কখনো তার প্রবল প্রতাপ বাসনা এই শিকলের শক্তিকেও ডিঙিয়ে যায়। তখন আর শিকল তাকে বেঁধে রাখতে সক্ষম হয় না। শিকল যায় ছিঁড়ে। প্রবৃত্তি তখন তার কামনার থাবা নিয়ে গোনাহের রাজ্যে দাপিয়ে বেড়ায়—যতক্ষণ না তাকে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রবৃত্তিকে বেঁধে রাখে শিকল দিয়ে। কেউ রশি দিয়ে। আর কেউ কেউ সুতো দিয়ে। তাই গোনাহের দিকে তার ঝাঁপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রেও মানুষের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত হবে, প্রবৃত্তির এসকল 'শয়তানি' সম্পর্কে সতর্ক থাকা। সে যে সকল উপায়ে এবং যাদের ওপর শক্তিশালী হয়ে ওঠে– সেসব বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

বন্ধুর ব্যাপারে সতর্কতা

মানুষের সবচেয়ে বড় ভুল হলো না জেনে অন্যের ওপর আস্থা রাখা এবং বন্ধুদের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদর্শন করা। কারণ, মানুষকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় বন্ধু থেকে পরিবর্তিত হওয়া শত্রু। কারণ, সে সকল গোপনীয়তা ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত থাকে।

যেমন কবি বলেন,

احذر عدوك مرة ... واحذر صديقك ألف مرة

فلربما انقلب الصديق فكان أعم بالمضرة

শত্রুর ক্ষেত্রে সতর্ক হও একবার। বন্ধুর ক্ষেত্রে সতর্ক হও হাজারবার।

বন্ধু যদি শত্রুতে পরিণত হয়, সে তোমার ক্ষতির ক্ষেত্রে বেশি খবরদার।

মানুষের অন্তরে যে সকল গোপন বিষয় লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে প্রধান হলো অন্যের কল্যাণের ব্যাপারে হিংসা, ঈর্ষা এবং নিজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা।

সুতরাং যখন তোমার সমশ্রেণির কেউ তোমাকে দেখবে যে, তুমি তার চেয়ে বেশি উন্নতি করছ, অবশ্যই এটা তার ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এমনকি এটা তাকে হিংসায় নিপতিত করবে। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে তার ভাইদের বিষয়টি এই হিংসার কারণেই ঘটেছিল।

এখন তুমি যদি বলো, মানুষের বন্ধু দরকার হয়। বন্ধু ছাড়া সে কীভাবে জীবনযাপন করবে?

আমি তোমাকে বলি, তুমি কি নিজেই দেখোনি, সমশ্রেণিরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি কীভাবে হিংসা করে? আর যদি সাধারণ ব্যক্তিদের কথা ধরো, তবে তো তাদের অধিকাংশের বিশ্বাস—একজন আলেম 'মুচকি'ও হাসবে না। দুনিয়ার কোনো বিষয়েই তার আকর্ষণ থাকবে না। তাই যখন তারা কোনো আলেমকে কোনো বৈধ আনন্দ বা উপভোগ্যতার দিকে হাত বাড়াতে দেখে, তাদের চোখে সে আলেমের পতন ঘটে যায়। এই হলো সাধারণ ব্যক্তিদের অবস্থা। আর আমরা তো বলছি বিশেষ ও একান্ত ব্যক্তিদের কথা—একটু এদিক-সেদিক হলেই অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তাহলে তুমি ঘনিষ্ঠ হবে কার সাথে?

কিছুতেই না। আল্লাহর কসম, দুনিয়াতে কিছুতেই কোনো হৃদয়ের সাথে নিঃস্বার্থ ঘনিষ্ঠ হওয়া কিংবা একনিষ্ঠ বন্ধুত্ব প্রাপ্তি সম্ভব নয়। কারণ, মানুষের অন্তর হলো 'বহুরূপী'। ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ পাল্টাতে পারে এবং পাল্টায়। হ্যাঁ, মানুষের সাথে ওঠাবসা করা, চলাফেরা করা এবং সামাজিক আচার-আচরণ চলতে পারে।

হ্যাঁ- এটাও ঠিক, কোনো ধরনের প্রত্যাশা ও বাসনা ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া বা গ্রহণ করার বাস্তবতাও স্বীকৃত। তবে এমন বন্ধু পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি হয়ও- তবে সে হয়তো তোমার সমশ্রেণি থেকে হবে না। কারণ, সমশ্রেণির মধ্যে হিংসাটাই প্রধান থাকে। এবং সে হবে সাধারণ থেকে একটু উচ্চের। এবং এমন ব্যক্তি হবে- যে তোমার পর্যায়ের সম্মান ও মর্যাদার আকাঙ্ক্ষী নয়।

তবে এমন সঙ্গ বা বন্ধুত্বের দ্বারা মনে পূর্ণ পরিতৃপ্তি আসে না। কারণ, বন্ধুত্ব হওয়া দরকার ছিল তোমার সমশ্রেণির আলেম এবং একই মানসিকতাপূর্ণ ব্যক্তিদের মাঝে- একই বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের মাঝে। তাহলে সেখানে এমন ইশারা-ইঙ্গিতে কথা চলতে পারত- যার কারণে মজলিস হয়ে উঠতে পারত প্রাণবন্ত ও প্রাঞ্জল। কিন্তু এটা যেন হওয়ারই নয়- সমশ্রেণির মাঝে পারস্পরিক হিংসার কারণে।

এ কারণে যাদের সাথে একনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়, তাদের দিয়ে মন ভরে না। আর যাদের সাথে মন ভরতে পারত, তাদের সাথে বন্ধুত্ব হয় না। মানুষের মনের রাজ্যে এ এক আশ্চর্য বিচরণ।

ঠিক এই ধরনের জটিল বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয় বাড়িতে কোনো কাজের লোক রাখার ক্ষেত্রে। তুমি যদি বুদ্ধিমান কাউকে রাখো, তবে সে তোমার গোপন ও একান্ত বিষয়গুলোও জেনে যাবে। আর যদি নির্বোধ কাউকে রাখো, তবে তোমার কোনো কাজই তাদের দ্বারা আদায় হবে না। এ কারণে তোমার কর্তব্য হবে, তুমি বাইরের কাজের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান দেখে রাখবে আর বাড়ির ভেতরের কাজের জন্য রাখবে সরল ও নির্বোধ ধরনের কাউকে।

আর বন্ধুর ক্ষেত্রে তেমন বন্ধুর ওপরই আস্থা রাখতে পারো- যার বৈশিষ্ট্য আমি তোমাকে কিছুক্ষণ আগে বর্ণনা করেছি। তবে তার সঙ্গেও সতর্কতার

সাথে চলবে। যে গোপন বিষয়গুলো তাকে না জানালেও চলে, সেগুলো তার থেকে গোপন রাখাই শ্রেয়।

বন্ধুত্বের আচরণের ক্ষেত্রে তুমি হবে একই সাথে স্ফূর্ত ও সতর্ক। খোলামেলা, কিন্তু সজাগ। যেমন নেকড়ের কথা বলা হয়–

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخى الأعادي فهو يقظان هاجع

সে তার দুটি চোখের একটি দিয়ে ঘুমায়। আর অন্যটি দিয়ে শত্রুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে; যেন সে একই সাথে জাগ্রত ও ঘুমন্ত।

আলেমের বিপর্যয়

আমি এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখেছি, যে তার জীবনের শুরুর সময়গুলো, জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশগুলো ব্যয় করেছে ইলমের অন্বেষণে। এতে সে বিভিন্ন কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করেছে। কত রকম আনন্দ-বিশ্রাম বর্জন করেছে– মূর্খতার গ্লানি ও তার অপদস্থতা থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য। কষ্ট সয়েছে ইলম ও তার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য।

কিন্তু সে হয়তো এতে এমন শীর্ষচূড়া অর্জন করতে পারেনি যে, এটি তাকে দুনিয়াদারদের স্থান থেকে আরও উর্ধ্বে স্থান করে দেবে। আর যা কিছু অর্জন করেছে, খুবই তাড়াহুড়োর সাথে করেছে। এ কারণে তার জীবন ও জীবিকা হয়ে পড়েছে সংকীর্ণ। কিংবা সে তার নিজের জন্য যে প্রত্যয় ও কামনা রেখেছিল, তার অংশ প্রাপ্তিতেও তার কমতি হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন কারণে, ইলমের ক্ষেত্রে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়েছে।

এবার সে ভিড়ে গেল বিভিন্ন দেশের নিম্নশ্রেণির লোকদের সাথে। নিজেকে অবনত করল নিম্নস্তরের লোকদের নিকট, নিচু মানসিকতার লোকদের নিকট, বিভিন্ন কারবারি লোকদের নিকট... আরও আরও লোকদের নিকট।

আমি তাদের প্রত্যেককে সম্বোধন করে বলি, এ তুমি কী করছ? মূর্খতার থেকে মুক্তির সেই সম্মানবোধ কি তুমি একেবারে ভুলেই গেছ– যার জন্য কত কত রাত তুমি জেগে কাটিয়েছ? সেই ইলম কোথায় গেল– যার অর্জনে কত দিবস তুমি পিপাসার্ত থেকেছ? যখন তুমি সুউচ্চ হয়েছ, উপকৃত হতে শুরু করেছ, ঠিক তখনই তুমি ঝুঁকে পড়েছ নিচুদেরও নিচুতর স্থানের দিকে!

তোমার নিকট কি সেই আত্মসম্মানবোধের অণু পরিমাণও বিদ্যমান নেই, যার মাধ্যমে এই নিম্নতম স্থান থেকে তুমি উঠে আসতে পারো? তোমার নিকট এতদিনের শেখা সেই ইলমের সামান্যতমও কি অবশিষ্ট নেই, যার মাধ্যমে তুমি এই প্রবৃত্তির বিভ্রান্তিকর জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারো? তোমার ইলমের মাধ্যমে এমন একটু শক্তিও কি অর্জিত হয়নি, যার মাধ্যমে নফসের লাগামকে আঁকড়ে ধরতে পারো তার নিকৃষ্টতর চারণভূমি থেকে?

না, এতদিন যা তুমি অর্জন করেছিলে– তোমার রাত জাগরণ, তোমার শ্রম ও সাধনা, আসলে সবই কি ছিল দুনিয়া অর্জনের জন্যই?

কিন্তু তুমি যদি দাবি করো যে, তুমি প্রত্যয় করেছ, কিছুটা সম্পদ অর্জন করে নেবে, যাতে সেটা তোমার ইলম অর্জনের পথে সহায়ক হয়। তাহলে জেনে রাখো, নিম্নশ্রেণির মানুষদের নিকট হাত পাতা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে তোমার যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ অর্জনের দিকে ধাবিত হওয়া তোমার তত পরিমাণ ইলম বৃদ্ধি হওয়ার চেয়ে উত্তম।

কিন্তু তুমি যে সম্পদ অর্জনের জন্য সেই 'নিম্নশ্রেণির' মানুষদের দরজায় ধরনা দিয়ে চলেছ। তুমি যদি জানতে, এতে তোমার দ্বীনের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তবে তুমি কিছুতেই এ পথে পা বাড়াতে না। এটা তো নফসের একটি ধোঁকা। তোমার মতো ব্যক্তির এ ধরনের দিকে ঝুঁকে পড়া কিছুতেই উচিত নয়। আর এ ধরনের কারবারে একবার নেমে পড়ার পর ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসা খুবই কঠিন ব্যাপার। আর তুমি তো জানোই– ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের পরও 'চাওয়া' বা মানুষের কাছে 'হাতপাতা'র গোনাহের কথা।

আর অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন তো আরও অনেক দূরের কথা।

তুমি কি এখনই নিরাপদে ফিরে আসতে পারো না? পারো না এখনই নিজ পরিবেশে ফিরে আসতে? দারিদ্র্যের তির তোমাকে আর কতই বা বিক্ষত করবে? সম্পদ যা অর্জন করেছ, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে যে ইলম তোমাকে প্রদান করা হয়েছে, তা তো কখনো নিঃশেষ হবে না।

এখন তোমার ফিরে আসাটাই যথেষ্ট! কারণ, তুমি তো দুনিয়ার এসব ঘৃণ্যতা ধোঁকা ও প্রতারণার কথা জানোই। মাঝে যা কিছু করেছ– ইলমের বিপরীতেই করেছ। আর যেহেতু একটি দীর্ঘ সময় তুমি ইলমের পেছনেই অতিবাহিত করেছ– সেগুলো তো ফেলনা নয়।

কেউ একজন বলেন,

ومن أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي.

যে তার অতীত ভালো কর্মে কাটিয়েছে, নিশ্চয় তার ভবিষ্যৎও ভালো হবে।

ইলম অর্জনের পদ্ধতি

জাগতিক সম্পদ অর্জনের প্রচণ্ড লোভ অনেক ক্ষেত্রেই লোভীকে তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত রাখে। আমি এমন অনেককে দেখেছি– সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে যার প্রচণ্ড লোভ রয়েছে এবং তার অনেক সম্পদ অর্জনও হয়েছে, কিন্তু এরপরও সে আরও আরও সম্পদ অর্জনের প্রতি আগ্রহী। অশেষ সম্পদ অর্জনের জন্য দিনরাত একাকার করে ফেলছে।

কিন্তু সে যদি বুঝমান হতো, তাহলে জানত, সম্পদ দ্বারা লক্ষ্য হচ্ছে তা জীবনে খরচ করা। কিন্তু সে যখন পুরো জীবনটাই খরচ করে দিচ্ছে সম্পদ অর্জনের পেছনে, তখন তো তার দুটি উদ্দেশ্যই হাতছাড়া হয়ে পড়ছে। জীবন চলে যাচ্ছে– অথচ আরামের সাথে সেটা খরচও করতে পারছে না।

এমন কত মানুষকে দেখেছি– বহু সম্পদ অর্জন করেছে, কিন্তু তা দিয়ে নিজে উপকৃত হতে পারেনি। এগুলো অন্যদের জন্য রেখে দুনিয়া থেকে শূন্য হাতেই তাকে প্রস্থান করতে হয়েছে।
যেমন কবি বলেন,

كدودة القز، ما تبنيه يهدمها ... وغيرها بالذي تبنيه ينتفع.

রেশমের পোকা—তার অর্জনই তাকে করে ধ্বংস। আর সেই অর্জিত জিনিসে উপকৃত হয় অন্যরা।

এভাবে কিছু মানুষকে দেখি, যাদের কিতাব জমা করার ওপর খুব আগ্রহ। তারা সেগুলোর অনুলিপি তৈরি করে করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে

দিয়েছেন। অনেক হাদিসবিশারদদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, গোটা জীবন তারা খরচ করছেন হাদিস জমা করা, প্রতিলিপি করা, শ্রবণ করা এবং লেখার কাজ ইত্যাদিতে। তারা নিজেরা কোনো উপকার লাভ করতে পারেনি।

কিন্তু সবার অবস্থা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি একরকম নয়। এখানে দুটি শ্রেণি হয়–

১. প্রথম শ্রেণি– যিনি ব্যস্ত হন হাদিসের অধ্যয়নে, হাদিসের ইলম অর্জনে এবং সেগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধির বিন্যাস ও নির্বাচনে। এগুলো নিয়েই তিনি মগ্ন থাকেন। যেন তিনি চারপাশের নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে কিছু জানেনই না। খবরই রাখেন না। হাদিসের শত বর্ণনাকারীর উৎস তার কাছে জমা হয়। আমার কাছে একজন হাদিসবিশারদের কথা বলা হয়েছে– তিনি হাদিসের একটি অংশ নিশ্চিত হওয়ার জন্য একশত শাইখ থেকে শ্রবণ করেছেন। এবং তার কাছে এর সত্তরটি লিপি বিদ্যমান রয়েছে।

২. দ্বিতীয় শ্রেণি– যিনি অনেক কিতাব জমা করেছেন। অনেক হাদিস শ্রবণ করেছেন। কিন্তু এগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে নিজে কিছুই জানেন না। তার অর্থও তিনি বোঝেন না। অথচ তিনি গর্বের সাথে বলে বেড়ান, আমার কাছে অমুক অমুক ব্যক্তির লেখা রয়েছে। অমুক অমুক থেকে শ্রবণ করেছি। আমার কাছে তার লিপি রয়েছে। কিন্তু এগুলোর কোনটি সহিহ, আর কোনটি দুর্বল ও জয়িফ বা মাওজু– তার কোনো জ্ঞান নেই। এগুলো অর্জনের ব্যস্ততাই যেন তাকে ইলমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে বিরত রেখেছে।

যেমন কবি হাতিয়া– জারওয়াল ইবনে আউস বলেন,

زوامل للأخبار لا علم عندها ... بمثقلها إلاّ كعلم الأباعر

لعمرك ما يدري البعير إذا غدا ... بأوساقه أوراح في الغرائر

খবরের স্তুপ জমা হয়ে আছে তার কাছে। কিন্তু এ ব্যাপারে এক ছটাক জ্ঞানও তার নেই। এ যেন গাধার মতো।

তোমার জীবনের কসম, গাধার ভীষণ বোঝা নিয়ে চলা কিংবা আরামের বিছানায় নতুন স্ত্রী নিয়ে শয্যা গ্রহণ করা– তার কিছুই সে বোঝে না।

ইলমের এই অবস্থা সত্ত্বেও কেউ কেউ নিজেই নিজের বর্ণনা নিয়ে ইলমের নেতৃত্ব দিতে চায়। যা তার যোগ্যতা ও সক্ষমতার বাইরে– তা-ই করতে

চায়। তাই যখন সে কোনো ফতোয়া দেয়, ভুল করে। যখন কোনো উসুল নিয়ে কথা বলে, ভ্রান্তি ছড়ায়। আমি যদি নাম উল্লেখ করে বর্ণনা করা অপছন্দ না করতাম, তবে আজ এখানে এ ধরনের ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে দিতাম। আমাদের অনেক বড় আলেমের ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো ঘটেছে। তবে যারা মুহাক্কিক আলেম ও মুহাদ্দিস– তাদের নিকট এ নামগুলো গোপন নেই।

হাদিসে তো এসেছে–

منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا.

দু-ধরনের ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। এক হলো ইলমের আকাঙ্ক্ষী। দুই দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষী।[৭৮]

হাদিসের এই কথা তুলে কেউ যদি বলে বসেন, তাহলে আর এ ধরনের ব্যক্তির ইলম সংগ্রহের ব্যাপারে দোষারোপের কী আছে?

আমি তো কোনো আলেমকে বলি না যে, ইলমের ওপর পরিতৃপ্ত হও এবং ইলমের কিছু অংশের ওপর সীমিত থাকো।

আমি বরং তাকে বলি, এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আগে অর্জন করো। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার জীবনকে বিন্যাস করে নেন, পরিকল্পনা এঁটে নেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকেন। যেহেতু এই পরিমিত স্বল্প জীবন দিয়ে দুনিয়ার সকল ইলম ও জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়, তাই সেগুলোকে গুরুত্বের ভিত্তিতে বিন্যাস করে নিতে হয়– কোনগুলো এবং কী পরিমাণ আগে হবে আর কোনগুলো পেছনে? এভাবে এককেটি ঘাঁটিতে উপনীত হতে হতে, নতুন পাথেয় ও রসদ পেতে পেতে যতদূর যাওয়া যায়। সমাপ্তির আগেই যদি মৃত্যু এসে যায়– তবে হয়তো নিয়ত সেখানে পৌঁছে যাবে! মুমিনের নিয়তই উত্তম।

সুতরাং একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন জানবে যে, জীবন হলো সংক্ষিপ্ত আর ইলম বা জ্ঞান হলো অনেক। কেউ যদি সকল ইলম সম্পূর্ণভাবে অর্জন করতে চায়– তবে এটা নির্বোধের মতো কাজ হবে। যেমন হাদিস শোনা, লিপি

---

[৭৮]. মুসনাদে আহমদ: ১/২৮৬ পৃষ্ঠা: ৩০২, তবারনি: ৯/১০২৩৫ পৃষ্ঠা: ২৬– মা. শামেলা।

সংগ্রহ করা এবং প্রতিটি সূত্রে হাদিসটি অর্জন করতে চাওয়া। প্রতিটি বর্ণনাকারী বের করা। অপ্রচলিত বর্ণনাগুলোও অন্বেষণ করা ইত্যাদি। এভাবে করতে গেলে পঞ্চাশ বছরেও শেষ হবে না। বিশেষ করে যদি নসখের বিষয়ে কাজ করতে যায়। তখন এর সাথে যুক্ত হবে কোরআন, ইলমুল কোরআন। ফিকহ, ইখতিলাফ। উসুল ইত্যাদি।

তাই অর্জনের এই পদ্ধতিটি সঠিক নয়। যেহেতু জানা হয়েছে, জীবন ছোট; কিন্তু ইলমের পরিধি অনেক বিস্তৃত। এ কারণে জ্ঞান-অন্বেষী ব্যক্তির জন্য উচিত হবে, কোরআনের মাধ্যমে শুরু করা। প্রথমে হিফজ করবে। এরপর মধ্যম ধরনের তাফসির দেখবে– যাতে সকল বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা রয়েছে।

যখন কোরআনের পাঠ ও অধ্যয়ন শেষ হবে, এরপর আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের প্রাথমিক ও মৌলিক নীতিগুলো অধ্যয়ন হবে। এরপর হাদিস বিষয়ে অধ্যয়ন শুরু করবে। সহিহ, মুসনাদ ও সুনানগুলো অধ্যয়ন করবে। এরপর ইলমুল হাদিস বিষয়ে মনোবিবেশ করবে। যেমন, দুর্বল ও সবল বর্ণনাকারী ও তাদের বিস্তারিত পরিচয়। পাশাপাশি এগুলো অধ্যয়নের মূলনীতিসমূহ জেনে নেবে।

তবে আমাদের অনেক পূর্বসূরি এগুলোর অনেক কিছুই জমা করে দিয়েছেন। তাই এ ব্যাপারে এখন কষ্ট কম হয়।

এরপর মনোযোগ দেবে ইতিহাসের দিকে। যেমন, রাসুলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ, তার আত্মীয়স্বজন, স্ত্রী, তার পূর্ণ সিরাত এবং পরবর্তীদের আমল ও ঘটনাবলি।

এরপর আবার মনোনিবেশ করবে ফিকহের দিকে, মাজহাব ও এগুলোর মতবিরোধের দিকে এবং মাসআলা গ্রহণের মূল উৎস—তথা আয়াতের তাফসির, হাদিসের ব্যাখ্যা, এমনকি শব্দ-বাক্যের বিশ্লেষণ ইত্যাদি—এর দিকে।

এরপর সেই মূলনীতিগুলো জেনে নেবে, যা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তার গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেবে। তার সাথে কী সম্পৃক্ত হতে পারে এবং কী না পারে, সে সম্পর্কেও জানবে। এরপর রাসুল প্রেরণের সত্যতা, তার প্রমাণ, তাকে মান্য করার আবশ্যকতা ইত্যাদি সম্পর্কেও অধ্যয়ন করবে।

এরপর সময় যদি তাকে সঙ্গ দেয়, তবে সে পুরোপুরিভাবে ফিকহের ব্যাপারে মনোনিবেশ করবে। কারণ, এটিই সবচেয়ে উপকারী ইলম।

আর তার যদি সুযোগ ও সক্ষমতা থাকে, তবে ইলমগুলো লিপিবদ্ধ করার মধ্যেও সময় দেবে। এতে করে সে তার পরে একটি সৎ ও শিক্ষিত প্রজন্ম তৈরি করতে সক্ষম হবে।

এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের চেষ্টা করবে। কখনোই নিজেকে তার সক্ষমতার নিম্নে অবস্থান করাবে না। যেমন, তার যদি চেষ্টার মাধ্যমে নবুয়ত প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকত, তবে তার ওলি হওয়ার ওপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত হতো না। কিন্তু নবী হওয়া আর সম্ভব নয়, তাই ওলি হওয়ার চেষ্টা করবে। এমনিভাবে কেউ যদি প্রত্যয় রাখে, সে খলিফা হতে পারবে, তবে তার উজির হওয়ার ওপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ ইলম ও আমলে সর্বোচ্চ সম্ভাবনার ব্যক্তি নিম্নবর্তী অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে না। সে তার সকল সক্ষমতা ও যোগ্যতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে।

তবে আল্লাহ তার কিছু বান্দাকে যেন নিজেই তারবিয়ত করেন। শৈশব থেকে তার মধ্যে সঠিক আদর্শ গ্রহণের বুদ্ধি-বিবেক দান করেন। এরপর দান করেন জীবন গঠনের যথাযথ অনুধাবন ও বুঝশক্তি। তার জীবন হয়ে ওঠে সভ্য ও সজ্জিত, পবিত্র ও কর্মময়। জীবনের সকল স্তরেই সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের পথ অনুসরণ করে। এভাবেই একটি আদর্শ জীবন তার গড়ে ওঠে।

আল্লাহ তার সকল অসুবিধাগুলো দূর করে দেন। তার সকল সমস্যার সমাধান করে দেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট আকুল প্রার্থনা– তিনি যেন আমাদেরকেও সে সকল বান্দার অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং জীবনের প্রতিকারহীন লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত রাখেন। আমিন।

নির্জনে আল্লাহর ধ্যান

নির্জন ধ্যানমগ্নতার প্রচুর প্রভাব রয়েছে। অনেক মুমিন ব্যক্তি ধ্যানের এই প্রভাব অনুধাবন করতে পারে। মুমিন তখন তার অনেক অবৈধ কামনা ও বাসনা বর্জন করার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞ হয়– আল্লাহর শাস্তির ভয়ে কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কারের আশায় অথবা তার বড়ত্বের প্রতি অনুগত হয়ে। এভাবেই সে পূত-পবিত্র হয়ে ধূপদানিতে যেন এক 'হিন্দুস্তানি সুগন্ধি উদ'-এ পরিণত হয়। চারদিকে তার সুবাস ও সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন তার ঘ্রাণ অনুভব করে– কিন্তু কেউ জানতে পারে না বস্তুটি কোথায়!

এভাবে গোনাহ বর্জনের প্রচেষ্টার পরিমাণ অনুপাতে প্রভুর প্রতি তার ভালোবাসাও বাড়তে থাকে। একই সাথে দুনিয়ার কোনো 'প্রিয়তম' কিংবা 'প্রিয়তমা'র আহ্বান উপেক্ষার কষ্টের পরিমাণ অনুযায়ী তার সম্পর্কের সুঘ্রাণ ছড়াতে থাকে।

তখন মানুষের চোখ তাকে সম্মান করতে শুরু করে। মানুষের জিহ্বা তার প্রশংসা করতে থাকে– কিন্তু তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে না, কেন এটা তারা করছে! এর রহস্য তাদের বোধগম্য না হওয়ার কারণে এর গুণাগুণও তারা বর্ণনা করতে সক্ষম হয় না।

আর এই প্রশংসা ও সৌরভ মূলত তার মৃত্যুর পর তার মর্যাদা অনুযায়ী আরও বিস্তৃত হতে থাকে। সাধারণ কোনো ব্যক্তির কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করা হয় কিছুকাল– এরপর তাকে সকলে ভুলে যায়। আর কাউকে স্মরণ করা হয় শত বছর। এরপর আস্তে আস্তে তার আলোচনাও কমতে থাকে এবং একসময় বন্ধ হয়ে যায়। আর কেউ কেউ এমনই অমর আদর্শ হয়ে ওঠেন যে, তাদের স্মরণ-আলোচনা চিরদিন চলতেই তাকে। কখনো শেষ হয় না। বন্ধ হয়ে যায় না।

ঠিক এর বিপরীত অবস্থা হলো তার, মানুষজন যাকে ভয় করে। যার অনিষ্টকে ভয় করে। প্রকৃতপক্ষে তার অনুপস্থিতিতে কেউ তাকে সম্মান দেখায় না। আর এটা হয়ে থাকে তার গোনাহ ও অপরাধের অনুপাতে। তার থেকে কেমন যেন অপছন্দের বাতাস আসতে থাকে। অন্তরসমূহ তার প্রতি বিরক্ত বিতৃষ্ণ ও বিরূপ হয়ে ওঠে। তার ক্ষতির আশঙ্কা যখন কমে যায়, তখন লোকজনের

জিহ্বাও তার কল্যাণের আলোচনা কমিয়ে দেয়। তখন শুধু বাহ্যিক সম্মানটাই বাকি থাকে। আর যদি ক্ষতির আশঙ্কা বেড়ে যায়– তখন অধিকাংশ মানুষ চুপ থাকে। তার প্রশংসাও করে না। নিন্দাও করে না।

হজরত আবু দারদা রা. বলেন,

> إن العبد ليخلو بمعصية الله تعالى فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر.
>
> মানুষ যখন নির্জনে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে, তখন আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে তার প্রতি অপছন্দনীয়তা এমনভাবে স্থাপন করেন যে, তা সেই ব্যক্তি নিজেও টের পায় না।

যেগুলো লিখলাম, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করো। যা উল্লেখ করলাম, সেগুলো স্মরণ করো। নিজেদের একান্ত ও নির্জন অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবহেলা করো না। আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপর। আর প্রতিদান প্রদান করা হয় ইখলাস বা একনিষ্ঠতা অনুসারে।

অন্তরের হিসাব-নিকাশ

বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত, তার সক্ষমতার অতিরিক্ত কোনো বিষয়ের প্রত্যয় না করা এবং তা বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর না হওয়া। কারণ, বহু মানুষ আবেগের বশবর্তী হয়ে আকাশ সমান বিষয় জমিয়ে নেয়। কিন্তু ভেবে দেখে না- এগুলোর সাধনা ও অর্জনের কষ্টের ওপর সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে কি না? এ ধরনের ব্যক্তি অবশেষে নিরাশ হয়, হতাশ হয়ে ফিরে আসে এবং লজ্জিত হয়।

এভাবে অন্যদের দেখাদেখিও কোনো জিনিস করতে না যাওয়া উচিত। ময়দানে নামার আগে নিজের ক্ষমতার ওজন মেপে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, সবার সক্ষমতা একরকম নয়।

যিনি বুদ্ধিমান- তিনি সব সময় নিজেকে মানুষদের মাঝে 'মধ্যপন্থার' পোশাকে আচ্ছাদন করে রাখেন। এর দ্বারা তিনি সম্পদশালীদের কাতার থেকে বের হয়ে যান না, আবার তাকে অভাবগ্রস্তও মনে হয় না। তার যদি আমল ও ইবাদতের আগ্রহ বেড়ে যায়, তিনি সেগুলো বাড়ির ভেতরে পালন করেন। আর সৌন্দর্যপূর্ণ কাপড় বর্জন করেন- নিজের অবস্থা অপ্রকাশিত রাখার জন্য। মানুষের সামনে সবকিছু প্রকাশ করে বেড়ান না। আর এভাবেই অহংকার থেকে দূরে থাকা যায়। আবার মানুষদের থেকে 'কিপটে'র অপবাদও শুনতে হয় না।

সুখের পরে দুঃখ

বোকার চেয়েও বোকা হলো সেই ব্যক্তি- বর্তমানের সুখকে যে এমন ভবিষ্যতের ওপর প্রাধান্য দেয়, যার অন্তহীন কষ্ট থেকে সে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ নয়।

আমরা পৃথিবীতেই এমন কত আমির, সুলতান ও ধনবান ব্যক্তির কথা শুনেছি- যারা, নিজেদেরকে অবাধ কামনা-বাসনা ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। হালাল-হারামের দিকে কোনো লক্ষ রাখেনি। কিন্তু মৃত্যুর সময় এসে শুধু আফসোসই করেছে। সারাজীবন যা ভোগ করেছে, মৃত্যুর

সময় তার বহুগুণ অনুশোচনায় বিদগ্ধ হয়েছে। প্রতিটি অবৈধ আনন্দের পরিবর্তে বিশাল পরিমাণ আফসোস এসে ভর করেছে তাদের মাথায়।

তাছাড়া পৃথিবীর এই শোক-তাপ-অনুশোচনা দ্বারাই তো তার মুক্তি মিলবে না। এ শাস্তিই সবটুকু নয়। বরং আখেরাতের স্থায়ী শাস্তি-শাপ ওত পেতে আছে তার জন্য– যার থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় তার নেই।

সত্যকথা হলো, দুনিয়ার আনন্দ-স্ফূর্তি মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। একে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। তার অন্বেষণ, উপার্জন এবং ভোগের বিষয়ও আমি অস্বীকার করি না কিংবা অপছন্দ করি না। কিন্তু আমার কথা হলো, সে যেন তার উপার্জনে হালাল-হারামের বিষয়ে লক্ষ রাখে। যাতে তার আনন্দের পরিণামও আনন্দকর হয়। নতুবা সেই সাময়িক আনন্দের মাঝে কি কোনো কল্যাণ আছে– যার পরিণাম হলো দীর্ঘ ও স্থায়ী কষ্ট ও আগুন?

কথার কথা, কাউকে বলা হলো, 'তুমি একবছরের জন্য রাজ্য শাসন করো– এরপর আমরা তোমাকে হত্যা করব।'

এটা যে গ্রহণ করবে, তাকে কিছুতেই বুদ্ধিমান ভাবা যায় না। বরং বুদ্ধিমান তো সে-ই, যে একবছর– প্রয়োজনে বছরের পর বছর অপেক্ষা করবে, ধৈর্যধারণ করবে, পরবর্তী পুরো ভবিষ্যৎ আরাম-আয়েশে থাকার জন্য।

মোটকথা– যে আনন্দের পরিণাম হলো স্থায়ী দুঃখ, আফসোস তার জন্য।

দালফ ইবনে আবি দালফ নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমি আমার বাবার মৃত্যুর কয়েক দিন পর স্বপ্নে দেখলাম, যেন একজন আগন্তুক আমার নিকট এসে বলল, তোমাকে আমির ডেকেছে। আমি তার সাথে রওনা দিলাম। সে আমাকে একটি অপরিচিত কামরায় প্রবেশ করাল। জীর্ণ শীর্ণ পুরোনো কালো জানালা। ছাদ এবং দরজাও বন্ধ। এরপর আমাকে সেখান থেকে আরেকটু ওপরে নিয়ে গেল। এরপর আমাকে সামনের আরেকটি কামরায় প্রবেশ করাল। এ কামরার জানালায় কিছুটা আলোর ছিটা বাইরে থেকে এসে পড়ছে বলে ঘর কিছুটা আলোকিত। নিচে অনেক পুড়া ছাইয়ের স্তূপ। এবং এর পাশেই আমার বাবাকে দেখলাম– তিনি তার মাথা দু-হাঁটুর মাঝে গুঁজে মাথা নিচু করে বসে আছেন।

আমাকে আগন্তুক ব্যক্তিটি বলল, হে দালফ, কিছু কি বুঝতে পারছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ আমিরকে পরিশুদ্ধ করুন।

এরপর তিনি কবিতা আকারে বললেন,

أبلغن أهلنا ولا تخف عنهم ... ما لقينا في البرزخ الخفاق

قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا ... فارحموا وحشتي وما قد ألاقي

এই বারযাখের জগতে আমাদের যে কষ্ট ও হৃদয়ের ধুকপুকানি– তা আমাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দিয়ো– কিছুই করবে না গোপন।

আমরা যা করেছি, তার সবকিছু সম্পর্কে এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়, আমাদের এই অসহায়-আপতিত বিপদের ক্ষেত্রে একটু করো তো রহম।

এতটুকু বলে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, বুঝতে পারছ কী বলছি?

আমি বললাম, জি, বুঝতে পারছি।

এরপর তিনি আবার কবিতার আকারে বললেন,

فلو أنا إذا متنا تركنا . .. لكان الموت راحة كل حي

ولكنا إذا متنا بعثنا . .. ونسأل بعده عن كل شيء

মৃত্যুই যেহেতু সকল প্রাণের অবশ্যম্ভাবী বাহন, তাই যখন মারা গেলাম, তখন যদি সবই ছেড়ে আসতে পারতাম, সাথে না আসত কোনো কর্ম!

কিন্তু যখন আমাদের হলো মৃত্যু, আমাদের উত্থিত করা হলো সকল কর্মসহ। এরপর জিজ্ঞাসা করা হলো সকল কিছু সম্পর্কে।

ইন্দ্রিয় ও আকলের আনন্দ অনুভব

মানুষের সকল সুখানুভব দুই ভাগে বিভক্ত।

১. ইন্দ্রিয়জাত– অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সুখটা অনুভব করা হয়।

২. মস্তিষ্ক বা হৃদয়জাত– অর্থাৎ মস্তিষ্ক বা হৃদয় দ্বারা অনুভব করা হয়।

তবে সবচেয়ে তীব্র সুখানুভব হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই এবং তার সর্বোচ্চ স্তর হলো সহবাস।

আর আকল বা মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ সুখানুভব ঘটে ইলম বা জ্ঞানার্জনে।

যে ব্যক্তি এই দুটি জিনিসই দুনিয়াতে যথার্থ পরিমাণে অর্জন করতে সক্ষম হয়, তার মতো সুখী আর কেউ হয় না।

কিন্তু আমি তো শিক্ষার্থীদের এর চেয়ে আরও উচ্চের ও ঊর্ধ্বের স্তরের দিকে পথ দেখাতে চাই। তাদের সুখ যেন শুধু অর্জনেরই সুখ নয়; তা হবে 'পাগলপ্রায়' আনন্দ ঢেউয়ের মতো– তা হলো, ইলমের সাধনায় নিমগ্ন হওয়া।

কিন্তু ইলম অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যেমন উঁচু হিম্মত থাকতে হবে। এই হিম্মত আবার কারও ক্ষেত্রে শৈশব থেকেই প্রকাশ পায়। এ ধরনের কোনো বাচ্চাকে শৈশব থেকেই ভালো ভালো ব্যতিক্রম বিষয় গ্রহণ করতে দেখা যায়।

যেমন বর্ণনা করা হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা আবদুল মুত্তালিবের একটি মূল্যবান গালিচা ছিল। সেটা 'দারুন নাদওয়া'র কামরায় বিছানো থাকত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শৈশবের সেই ছোট বয়সে এই একান্ত গালিচার ওপর এসে বসতেন। তখন দাদা আবদুল মুত্তালিব বলতেন, 'নিশ্চয় আমার এ নাতির আলাদা একটি আভিজাত্য রয়েছে।'

এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন, আমার তো হিম্মত, শক্তি ও সাহস রয়েছে; কিন্তু যা কামনা করি তার কোনোটিই প্রাপ্ত হই না– আসলে এর কী সমাধান?

উত্তরে আমি বলব, কিছু ক্ষেত্রে সফল না হতে পারা সকল ক্ষেত্রে সফল না-হওয়াকে আবশ্যক করে না। তোমার উপযুক্ত কোনো একটা পথ তো বের হবেই। তাছাড়া, তোমাকে হিম্মত ও সাহস প্রদান করা হয়েছে, আর সেটা কার্যকর করার জন্য তোমাকে সাহায্য করা হবে না– এমন তো কখনো হবে না।

বরং তুমি গভীরভাবে তোমার নিজের দিকে আবার একটু তাকাও, সম্ভবত, তিনি তোমাকে এমন কিছু দিয়েছেন, যার শুকরিয়া তুমি করোনি। কিংবা প্রবৃত্তির বাসনার কোনো বিষয়ে তোমাকে পরীক্ষা করা হয়েছে; কিন্তু তুমি তাতে ধৈর্যধারণ করোনি।

আবার এটাও জেনে রেখো, তোমার থেকে হয়তো এই কারণে দুনিয়ার বেশি উপভোগ্যতা সরিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে তুমি বেশি বেশি ইলম ও প্রজ্ঞার স্বাদ অনুভব করতে পারো। কারণ, তুমি একজন মানুষ। খুবই দুর্বল। দুনিয়ার ভোগ ও ইলমের স্বাদ– উভয়টি সমানভাবে একত্রে সন্নিবেশ করতে তুমি শক্তি রাখো না। তাই তোমাকে ইলমের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তোমার প্রতিপালক– তিনিই তোমার তুলনামূলক কল্যাণের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন।

এবার তোমাকে জীবনসূচনার বিবরণগুলো বলি–

একটি কিশোরের জন্য উচিত হবে, কোরআন দিয়ে শিক্ষা শুরু করা। এরপর সকল প্রকার ইলম থেকে প্রাথমিক জ্ঞানগুলো অর্জন করা। এবং এগুলোর মাঝে ইলমে ফিকহকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। শুধু বর্ণনার ওপর নির্ভর করবে না। নিজেও চিন্তা-ভাবনা করবে। এরপর যখন এগুলো স্পষ্টভাবে জানা হয়ে যাবে– সেই সাথে অর্জিত হবে ভাষা-সাহিত্যের জ্ঞান, তখন তার ভাষা ও বক্তব্য হয়ে উঠবে অধিকতর ধারালো শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী। এভাবে সে যদি সত্যকে চেনার হক আদায় করে এবং রবের প্রতি অনুগত থাকে, তবে তার জন্য এমন এমন সৌভাগ্যের দরজা খুলে যাবে– যা সে কল্পনাও করতে পারে না।

এরপর তার জন্য উচিত হবে, খুবই সতর্কতার সাথে কিছু সময় কোনো উপার্জন বা ব্যবসায় ব্যয় করা। কিন্তু সরাসরি সার্বক্ষণিকভাবে তাতে যুক্ত

থাকবে না। আর খরচ ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে খুবই মিতব্যয়ী হবে। অপচয় ও অপব্যয় থেকে বিরত থাকবে।

কিন্তু কখনো কখনো ইলমের বর্ণনা, প্রচার ও আমল– ধীরে ধীরে কাউকে আল্লাহ তাআলার মারেফাতের দিকে এমনভাবে ধাবিত করতে থাকে যে, সে এতেই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সাংসারিক বিষয়াবলির কথা ভাবার যেন সময় থাকে না। ইলমের এই স্বাদ ও আস্বাদন তাকে সকল কিছু থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে রাখে। তার আর বাহ্য উপভোগের কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

কিন্তু কেউ যদি নিজের মধ্যে বাহ্যিক উপভোগ্যতার তীব্র আকর্ষণ বোধ করে, তবে তার জন্য উচিত হবে দ্রুত বিয়ে করে নেওয়া। কিন্তু এতেও আবার এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়বে না যে– শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্রুত শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। তাহলে তো তার আসল উদ্দেশ্য– ইলমই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের আনন্দ উপভোগ্যতার কিছু বিষয় এখানে ইশারার মাধ্যমে উল্লেখ করলাম। আর যা বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো না, সেগুলো ইশারার মাধ্যমেই বুঝে নাও।

ইলম সংরক্ষণের পদ্ধতি

জেনে রেখো, সকল তালিবুল ইলম বা শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন হলো তার অধ্যয়নকে অব্যাহত ও সচল রাখা– পরিমাণে কম হলেও এবং বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে হলেও।

কিন্তু একটা ভুল পদ্ধতি হলো, রাতদিন একাকার করে কিছু পড়া বা অধ্যয়ন করা এবং করতেই থাকা। কারণ, এ ধরনের অধ্যয়নকারী কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে নিজেই পড়া ছেড়ে দেবে কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

হজরত আবু বকর ইবনুল আনবারীর অবস্থা আমরা নিজেরাই দেখেছি। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় বিছানাগত। ডাক্তার এলেন দেখতে। ডাক্তার কামরায় প্রবেশ করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার শত শত কিতাবের দিকে দৃষ্টি

বোলালেন। এরপর রোগীকে বললেন, আপনি আসলে এমন কাজ করতেন, যা কোনো মানুষ করতে পারে না। এই জন্যই আজ এই অবস্থা।'

ডাক্তার তার সাধ্যমতো ব্যবস্থাপত্র দিয়ে বের হয়ে গেলেন। ইবনুল আনবারী তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তিনি আমার কোনো উপকার করতে পারবেন না।'

এ সময় তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি আসলে কী করতেন? ডাক্তার কিসের কথা বলে গেল?

জবাবে তিনি বললেন, আমি প্রতি সপ্তাহে দশ হাজার পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করতাম।

জীবনের এই হলো সেই ভুল পদ্ধতি– অনেক আবেগি আগ্রহী ও জেদি মানুষ যা করে থাকে।

তাছাড়া আরেকটি ভুল পদ্ধতি হলো, বেশি বেশি মুখস্থ করার চেষ্টা করা এবং অনেক প্রকার শাস্ত্র বা বিষয় মুখস্থ করার ক্ষেত্রে নিজের ওপর চাপ বাড়ানো। সকল অঙ্গের মতো অন্তর বা মস্তিষ্কও একটি অঙ্গ। যেমন একটি মানুষ হয়তো সহজেই ১০০ রিতল বহন করতে পারে। সেখানে আরেকজনের জন্য হয়তো ২০ রিতল বহন করাই কষ্টকর। অন্তর বা মস্তিষ্কও ঠিক এই রকম– মানুষভেদে তার সক্ষমতার তারতম্য রয়েছে। সুতরাং মানুষের জন্য কর্তব্য হলো– তার সাধ্যানুযায়ী কিংবা তার চেয়েও কিছুটা কম বহন করা। কারণ, সাধ্যাতীত কিছু বহনের ক্ষেত্রে একবার যদি পদস্খলন ঘটে, একবার যদি বিচ্যুতি ঘটে, তবে হয়তো চিরদিনের জন্যই তার আগ্রহের সকল কিছু হারাতে হবে!

যেমন, কোনো পেটুক ও লোভী ব্যক্তি সাধ্যের বাইরে গিয়ে আরও দু-এক লোকমা ভক্ষণ করল, তাহলে এমনও হতে পারে, এই অতিরিক্ত দুটি লোকমাই তাকে জীবনের অনেক খাবার থেকে বঞ্চিত করবে।

এ কারণে সাধ্য ও সামর্থ্যের মধ্যে চলাই সঠিক পথ। শ্রম বা অধ্যয়নকে সে দিনরাতের মধ্যে বণ্টন করে নেবে। বাকি সময়গুলোতে নিজেকে একটু শান্তি ও স্বস্তি প্রদান করবে।

সব কথার মূলকথা হলো, সাধ্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখা। এমন অনেক মুখস্থকারীকে দেখা যায়, একবারে অনেক মুখস্থ করেছে; কিন্তু দীর্ঘদিন আর সেগুলো স্মরণ করেনি। ফলে ভুলে গেছে। সেগুলোই পুনরায় মুখস্থ করতে আবার সময় দিতে হয়েছে।

হিফজ বা মুখস্থের জন্য জীবনের বিশেষ কিছু সময় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে শৈশব ও কৈশোরই হলো উত্তম সময়। আর মুখস্থের জন্য প্রভাত ও দিবসের অর্ধভাগই সবচেয়ে উত্তম। তাছাড়া সন্ধ্যার চেয়ে অন্য সকল সময়ই উত্তম।[৭৯] এভাবে পেটপূর্ণ অবস্থার চেয়ে কিছুটা ক্ষুধার অবস্থাই উত্তম।

তবে চারপাশের বিশাল সবুজ এবং নদীর তীরবর্তী স্থান মুখস্থের জন্য আদর্শ স্থান নয়। কারণ, বাইরের আকর্ষিত পরিবেশ মনকে ভিন্ন দিকে টেনে নিয়ে যায়। নিচু স্থানের চেয়ে উঁচু স্থান হিফজের জন্য ভালো। তবে নির্জনতা ও নীরবতা সব সময়ই কাম্য।

কিন্তু সকল কথার মূলকথা, হিফজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো, মনোযোগিতা এবং একাগ্রতা।

সপ্তাহে একদিন নিজেকে মুখস্থ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা প্রয়োজন। তাহলে এটি অন্তরকে শক্তিশালী করবে। নিজেকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সতেজ রাখবে। যেমন কোনো ঘর বা বিল্ডিং বানানোর সময় কাঁচা নতুন গাঁথুনিকে কয়েকদিন ফেলে রাখা হয়– যাতে সেটা শক্ত ও মজবুত হয় এবং তার উপর নতুন করে গাঁথুনি দেওয়া যায়।

মুখস্থ অল্প হোক– কিন্তু সেটা অব্যাহত রাখাটাই আসল। আগের পড়াটি মজবুত ও টেকসই না করে নতুন পড়া শুরু করবে না। আর যে মুখস্থ করতে উৎসাহ পায় না, তার মুখস্থ না করাই ভালো। কারণ, এভাবে নফসের ওপর বল প্রয়োগ করা ভালো নয়। যেকোনো বিষয়ে মানুষের স্বভাব, রুচি ও মেজাজ সংগতিপূর্ণ হওয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা লক্ষ রাখা চাই।

---

৭৯. এটা হয়তো সেই সময়ের জীবনযাপনের পদ্ধতি অনুসারে। তখন মাগরিবের পরই খাওয়া-দাওয়া হয়ে যেত। নামাজ পড়ে ঘুম। এখন অবস্থা অনেকটাই পাল্টে গেছে। তাই কথাটি এখন আর এ সময়ের জন্য প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

এছাড়া খাবার-খাদ্যের ভিন্নতার মাঝেও হিফজের কিছু প্রভাব রয়েছে। কিছু কিছু খাবার হিফজশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে। কোনোটা কমিয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও সাধ্যমতো সঠিক খাবার খাওয়া উচিত।

ইমাম জুহরি রহ. বলেন, আমি যখন থেকে হিফজ শুরু করেছি, (কোরআন, হাদিস) তারপর আর কখনো সিরকা (একপ্রকার টকজাতীয় পানীয়) পান করিনি।

একবার ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি এত ফিকহ মুখস্থ রাখেন কীভাবে?

জবাবে তিনি বলেন, নির্বিঘ্ন মনোযোগের মাধ্যমে।

একই প্রশ্নের উত্তরে হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. বলেন, দুঃখ-দুশ্চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে।

হজরত মাকহুল রহ. বলেন, যার কাপড় বেশি পরিষ্কার, তার মনোযোগিতায় বিঘ্ন ঘটে। তবে যে ব্যক্তি সুঘ্রাণ ব্যবহার করে, তার মেধা-বুদ্ধি বেড়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি এ দুটির (পরিষ্কার পোশাক ও সুঘ্রাণ) মাঝে সমন্বয় করতে পারে, তার পৌরুষ ও আভিজাত্য বেড়ে যায়।

আমি মনে করি, ইলমের অন্বেষণে যারা নবীন, যথাসম্ভব তাদের দেরিতে বিয়ে করাই উত্তম। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. জীবনের চল্লিশ বছরে এসে বিয়ে করেছিলেন। এটার কারণ, যাতে ইলমের অন্বেষণে নির্বিঘ্ন মনোযোগ দেওয়া যায়। কিন্তু কারও জন্য যদি কষ্টকর হয় এবং জিনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে সে বিয়ে করে নিতে পারে। তবে যথাসম্ভব বেশি সঙ্গ ও আসঙ্গ এড়িয়ে চলবে। যাতে শক্তি অটুট থাকে এবং ইলম অন্বেষণে অধিক সময় ব্যয় করা যায়। এবং ইলম সংরক্ষণ করা যায়। কারণ, জীবন অতি মূল্যবান ও অল্প। কিন্তু ইলম অনেক বেশি ও ব্যাপ্ত।

কিছু মানুষকে দেখি, তারা এমন বিষয় মুখস্থের মধ্যে সময় ব্যয় করে, অথচ অন্যটি ছিল তার চেয়ে উত্তম। যদিও সকল ইলমই উত্তম ও মূল্যবান– কিন্তু এর মধ্যেও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই প্রথমে প্রাধান্য দিতে হবে।

এ কারণে তোমার প্রথম ও প্রধান কাজ হবে কোরআন হিফজ করা। এরপর ফিকহ। এরপর অন্য বিষয়গুলো। যার সচেতনতা রয়েছে, সে নিজেই বুঝে নিতে পারে, কোনটি অগ্রগণ্য আর কোনটি পশ্চাদগণ্য– এর জন্য আলাদা কোনো দলিল-প্রমাণ লাগে না। আর যে ব্যক্তি তার ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, তার লক্ষ্যই তো তাকে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য ইলমের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

তোমরা অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখো। আল্লাহই তোমাদের শিক্ষা দেবেন। এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। [সুরা বাকারা : ২৮২]

মানুষের গোনাহ ও তাওবা

যে ব্যক্তি স্থায়ী নিরাপত্তা ও শান্তি চায়, সে যেন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে চলে। কারণ, যে ব্যক্তি তাকওয়াহীন কোনো বিষয়ে নিজেকে জড়িয়েছে, তা যত ছোটই হোক, সে তার শাস্তি অবশ্যই পেয়েছে– তাৎক্ষণিকভাবে কিংবা বিলম্বে।

অনেক সময় মানুষ ধোঁকা খায়। যেমন ধরো, তুমি কোনো গোনাহের কাজ করলে। এরপরও তুমি নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করছ, আর ভাবছ সেটা তো তেমন অপরাধ ছিল না এবং ভুলে থাকো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾

যে-কেউ কোনো অপরাধ করবে, তার প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে।

[সুরা নিসা: ১২৩]

কখনো নফস বলে, আল্লাহ হলেন গাফফার; তিনি তো এটা মাফ করে দেবেন।

নিঃসন্দেহে তিনি গাফফার, মাফ করে দেবেন; কিন্তু যাকে চান, তাকে মাফ করবেন।

আমি এই অবস্থাটা তোমার কাছে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, তুমি একটু চিন্তা করে দেখো। এতেই তোমার কাছে 'মাগফিরাত'-এর প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন, কেউ হয়তো একটি ভুল করল কিংবা অপরাধ করল। কিন্তু এই অপরাধের ব্যাপারে তার কোনো ইচ্ছা ছিল না। এটা সংঘটিত হওয়ার আগে এ ব্যাপারে তার কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। কিন্তু হয়ে গেছে। আবার এটি সংঘটিত হয়ে যাবার পর পুনরায় এটা করার কোনো ইচ্ছাও তার নেই। এ অবস্থায় এই হঠাৎ সংঘটিত অপরাধের ব্যাপারে সে সচেতন হয়ে ওঠে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

তখন তার এই কাজটি যদিও ইচ্ছার সাথেই সংঘটিত হয়েছে; কিন্তু এটি 'অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল' হিসেবেই গণ্য হবে।

যেমন ধরো, কোনো পুরুষের সামনে একজন রূপসী যুবতী মেয়ে [মেয়েদের ক্ষেত্রে যুবক] এসে পড়ল, মানবিক স্বভাবের তাড়নায় তার ওপর চোখ আটকে গেল। দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে দৃষ্টির স্বাদ অনুভব করল। আর এই আস্বাদনের বেহুঁশি তাকে যেন 'নিষিদ্ধ'র চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তার অবস্থা তখন আত্মভোলা কিংবা মোহগ্রস্ত ব্যক্তির মতো। নিজের কাজের ব্যাপারে যেন কোনো খেয়ালই নেই। কিন্তু যখন হঠাৎ সে সচেতন হয়ে ওঠে, তার মোহ কেটে যায়, তখন সে নিজের কাজের ব্যাপারে আফসোস ও অনুশোচনা করতে থাকে। আকুল হৃদয়ে মাওলার দরবারে তাওবা করে। আর এটিই যেন প্রবল বন্যা হয়ে তার গোনাহের সকল ময়দা-আবর্জনা দূর করে নিয়ে যায়।

যেন এটা ছিল নিছক এক 'ভুল'—যাতে তার কোনো ইচ্ছা ছিল না। এটা ক্ষমার আশা করা যায়।

আল্লাহ তাআলার এই আয়াতটি এদিকেই হয়তো ইঙ্গিত করছে–

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে যখন শয়তানের পক্ষ হতে কোনো কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে, তখন তারা (আল্লাহকে) স্মরণ করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়। [সুরা আরাফ : ২০১]

কিন্তু যে ব্যক্তি এই অবৈধ দৃষ্টি প্রদানের বিষয়টি অব্যাহত রাখে, বারবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে সে এই নিষিদ্ধ বিষয়টি ইচ্ছাকৃতভাবেই করছে। সে যেন আল্লাহর নিষেধের বিরোধিতা করছে। এভাবে অব্যাহত গোনাহের পরিমাণ অনুপাতে তার থেকে তার ক্ষমার বিষয়টিও দূরে সরে যেতে থাকে।

তাওবা না করা এবং সে জন্য ক্ষমা না পাওয়ার একটি প্রতারণামূলক চিন্তা হলো– কৃত গোনাহের বিপরীতে কোনো শাস্তির ভাবনা মনের মধ্যে না রাখা। কিন্তু বিষয়টি তো এমন নয়। যেমন ইবনুল জালা তার নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, আমি একদিন বাইরে দাঁড়িয়ে এক খ্রিষ্টান বালকের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে ছিলাম। এ সময় আমার শাইখ আমাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন, এ কী করছ? অবশ্যই তুমি এর প্রতিফল দেখতে পাবে– দেরিতে হলেও।

এবং ঠিক তা-ই হলো, এর চল্লিশ বছর পর আমি কোরআন ভুলে গেলাম– যা আমার সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল।

জেনে রেখো, সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, গোনাহের পরও নিরাপদ ও নির্ভাবনায় অবস্থান করা। কারণ, এখানে শাস্তি আসে বিলম্বে এবং ভয়াবহভাবে।

আর সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো, মানুষ এ ব্যাপারে সচেতন না থাকা। হয়তো তার দ্বীন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। তার অন্তর কালো হয়ে যায়। নিজের জন্য সে খারাপ পথ অবলম্বন করে। অথচ বাহ্যিকভাবে তার শরীর সুস্থ থাকে। জাগতিক উদ্দেশ্যগুলো পূরণ হয়। সম্পদ-সচ্ছলতায় জীবন ভরে ওঠে। কিন্তু এটা তো তাকে ঢিল প্রদান করা হচ্ছে– এটা তো প্রবল ঝড় ও বর্ষণের আগে সাময়িক স্থিরতা।

এ বিষয়ে একজন সরাসরি ভুক্তভোগী বলেন, আমি একবার এমন দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলাম, যা আমার জন্য জায়েয ছিল না। এরপর আমি এর শাস্তির জন্য ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। এরপর হঠাৎ এক দীর্ঘ সফরের জন্য বের হলাম। সফরে ভীষণ কষ্টে আপতিত হলাম। সৃষ্টির মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় একজনের মৃত্যু হলো। আমার অনেক মূল্যবান জিনিস বিনষ্ট হয়ে গেল। আমি বুঝছিলাম– এর সবই আমার সেই কুদৃষ্টির ফল।

আমি প্রভুর দরবারে প্রবলভাবে তাওবা করতে লাগলাম। একসময় হয়তো মাফ করা হলো এবং অবস্থা ভালো হয়ে উঠল।

কিন্তু এরপর আবারও আমি একই ধরনের গোনাহে লিপ্ত হলাম– চোখের গোনাহ। এবার আমার অন্তর কালো হয়ে গেল। চোখের আদ্রতা ও কোমলতা চলে গেল। প্রথম যা হয়েছিল, তার চেয়ে অধিক পরিমাণে আমার থেকে দ্বীন উঠিয়ে নেওয়া হলো। মুহূর্তের অপরাধের কারণে যা প্রাপ্ত হলাম– তা প্রাপ্ত না হওয়া কতই না ভালো ছিল!

এরপর যখন সেই অপরাধের আনন্দ ও তার পরিমাণ এবং তার পরিবর্তে শাস্তি ও তার পরিমাণ নিয়ে চিন্তা করলাম– আমার অন্তর আচমকা চাবুকের আঘাতে চিৎকার করে উঠল! এটা তুমি কেন করলে?

বন্ধুগণ,

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি চটের বিছানায় কুকুরের সাথেও ঘুমোতে হয়, তাহলেও তো সেটা তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খুবই কম কষ্টের বিষয়। তাছাড়া তুমি পৃথিবীর সকল কাম্যবস্তুও যদি প্রাপ্ত হও, আর আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, তবে তোমার আজকের এই বাহ্যিক শান্তিই তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠবে। তোমার নিরাপত্তাই হবে তোমার ভয়ের কারণ। তোমার সুস্থতাই হবে তোমার রোগ।

জগতের সকল বিষয় বিবেচিত হয় তার সমাপ্তি দিয়ে। সুতরাং বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি, যে পরিণামের বিষয়ে লক্ষ রাখে।

বন্ধুগণ,

দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত কষ্টে পড়ে হলেও ধৈর্যধারণ করো, আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করবেন। তিনি কত দ্রুতই তো এটাকে দূর করে দিতে পারেন। আল্লাহই তাওফিকদাতা। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া কোনো শক্তি ও আশ্রয় নেই।

উচ্চাভিলাষ

সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হলো, তোমাকে হয়তো হৃদয়ভরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেওয়া হলো; কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করার শক্তি ও সামর্থ্য তোমাকে দেওয়া হলো না। তোমার উচ্চ হিম্মতের কারণে অন্যদের অনুগ্রহ গ্রহণ তোমার নিকট খুবই বড় ও কষ্টকর মনে হয়। কিন্তু তুমি যদি দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েই যাও– তখন তোমাকে তাদের অনুগ্রহ গ্রহণ করতে হয়। এটাও তোমার জন্য বড় কষ্টকর।

মনে করি, তোমার রুচি-চরিত্র খুবই অভিজাত, সাধারণ সহজলভ্য খাবার তোমার রুচিসম্মত হয় না। এ কারণে তোমাকে খাবারের জন্য বেশি খরচ করতে হয়।

আবার এদিকে তোমার সম্পদ কম, কিন্তু আশা ও আকাঙ্ক্ষা হলো রূপসী সুন্দরী বিয়ে করার। কিন্তু দরিদ্রতা এক্ষেত্রেও তোমার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ইলমের প্রতি তোমার ঝোঁক হলো প্রেমাস্পদের মতো। কিন্তু তোমার দুর্বল শক্তিহীন শরীর সেগুলো অব্যাহত অধ্যয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক কিতাব ক্রয়ের জন্য যে টাকা-পয়সা দরকার, তা থেকেও তোমার হাত খালি।

মনে করি, তোমার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো, আরেফ ও জাহেদদের মর্যাদা প্রাপ্তির। কিন্তু দুনিয়ার উপার্জনের বাধ্যবাধকতার কারণে দুনিয়াদারদের সাথে তোমার দিবস-রজনী অতিবাহিত হয়।

এগুলো একটি স্পষ্ট ভয়াবহ পরীক্ষা ও কষ্টের বিষয়।

কিন্তু যার মানসিকতা অতি নিম্নমানের– মানুষদের নিকট প্রার্থনা করতে কিংবা হাত পাততে তার কোনো লজ্জাবোধ নেই। স্বল্প ইলম ও জ্ঞান নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকে। আরেফদের অবস্থা ও মর্যাদাপ্রাপ্তিরও কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা রাখে না। এমন ব্যক্তিকে কোনোকিছুর বঞ্চনাই কষ্ট দেয় না। সে যা পেয়েছে এবং যে অবস্থায় রয়েছে– সেটাকেই সে শেষসীমা হিসেবে ভেবে নিয়েছে। এতেই সে বাচ্চাদের মতো রঙিন তুচ্ছ জিনিসে আনন্দ প্রকাশ করে চলেছে। এর কোনোকিছুই তার সম্মানবোধে আঘাত করে না। তার কোনো সমস্যা বোধ হয় না।

কিন্তু সমস্যাটা দাঁড়ায় জ্ঞানে ও সম্পদে উচ্চাভিলাষী রুচিবান ব্যক্তির ক্ষেত্রে– তার উচ্চাশা তাকে সকল বিপরীত জিনিস একত্রকরণের দিকে ঠেলে নিতে চায়– যাতে সে সকল দিক দিয়ে পূর্ণতায় উপনীত হতে পারে। কিন্তু তার মানবিক ত্রুটিগুলো তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে দেয় না। এটাই তার কষ্ট ও পরীক্ষার বিষয়। এই হলো সেই অবস্থা, যেখানে এসে অনেক সময় ধৈর্যশীলদেরও ধৈর্যের পাথেয় ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু যার হিম্মত এর চেয়েও আরও উঁচু– সে কখনো হিম্মত হারিয়ে নিচে আপতিত হয় না। সে কখনো নিরাশ হয় না।

দৃঢ়তাই প্রধান

একবার আমার নফস তার কিছু চাহিদা পূরণের জন্য আমাকে একটি ভ্রান্ত ব্যাখ্যার প্রতি প্ররোচিত করছিল।

আমি তাকে বললাম, আল্লাহর দোহাই, ধৈর্যধারণ করো। কারণ, যে ব্যক্তি সমুদ্রের নানা রঙ ও চমৎকার দৃশ্যাবলিতে বিমুগ্ধ হয়ে তার ঢেউয়ের আধিক্য নিয়ে সতর্ক থাকে না, সে অচিরেই ডুবে মরে। সুতরাং যখন তুমি কোনো কাজের ইচ্ছা করো, তখন তা অর্জনের সীমানা নির্ধারণ করো এবং লক্ষ করো তার পরিণামের কথা। এবং জেনে নাও– এর দ্বারা তোমার কী অর্জন হবে।

এটার অর্জন যদি তোমার সামান্যতম অনুশোচনারও কারণ হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির আশঙ্কা হয়, তবে এর বিনিময়ে যদি তোমার 'দুনিয়ার কথিত জান্নাত'ও মেলে, তবুও তোমার জন্য আফসোস ছাড়া কিছু নেই। এর থেকে বিরত থাকো।

হে নফস, জেনে রেখো, এতদিন এলোমেলোভাবে যা অতিবাহিত হয়েছে– তা তো হয়েছেই। আল্লাহ তাআলা কখনো ধরেছেন– কখনো ছেড়েছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিনে ন্যায়পূর্ণ হিসাবের দাঁড়িপাল্লায় 'অণু-পরমাণু' পরিমাণও প্রকাশিত হয়ে পড়বে। সুতরাং জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক হও এবং তার দিকে লক্ষ রাখো, যিনি তোমার ভালো-মন্দের কথা, বেশি ও কমতির কথা ছড়িয়ে দেবেন।

সেই সত্তার প্রশংসা, যিনি অদৃশ্যের সকল বিষয় জানেন এবং মানুষের সামনে তার প্রতিফল প্রকাশ করে দেন। এর প্রেক্ষিতে ভালো সৎ ব্যক্তিদের প্রতি

মানুষের অন্তরের ভালোবাসা ঝুঁকতে থাকে। এবং অসৎ লোকদের প্রতি অসন্তুষ্টি আসতে থাকে। কিন্তু এগুলো তারা অনেক সময় কোনো প্রকার কারণ না জেনেই করতে থাকে।

এ সময় ইবলিস এসে বলে, তবে কি তুমি শুধু মানুষের কিছু প্রশংসা পাওয়ার জন্য তোমার দুনিয়ার লক্ষ্য ও চাহিদা বিসর্জন দেবে?

আমি বললাম, না, কিছুতেই না। মানুষের প্রশংসার জন্য কেন! এটা তো আমার মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রাসঙ্গিক অনিবার্য কিছু অর্জন। এটা তো মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হলে মানুষের প্রশংসা আপনিই এসে যায়।

আমরা দেখি, কেউ কেউ শত মাইলের দৌড় প্রতিযোগিতা করে, উদ্দেশ্য– তাকে যেন 'শ্রেষ্ঠ দৌড়বিদ' বলা হয়। কিন্তু মুত্তাকি ব্যক্তি যদিও প্রশংসা ও সম্মান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এটা তো তার কাম্য নয়। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাসঙ্গিকভাবে আপনিই এসে যায়।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং অনেক সৎকর্ম করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য (সকলের অন্তরে) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।

[সুরা মারয়াম : ৯৬]

তখন নফস চিৎকার করে বলে উঠল, তবে কি তুমি আমাকে আজাবের ওপর ধৈর্যধারণের আদেশ দিতে চাচ্ছ? কারণ, আমার চাহিদাগুলো বর্জন করা তো আমার জন্য আজাবস্বরূপ।

আমি তাকে বললাম, দেখো, তোমার প্রতিটি অবৈধ চাহিদা বর্জনের পরিবর্তে বিনিময় রয়েছে। প্রতিটি বর্জনের জন্য তুমি তার উত্তম বিনিময় পাবে। তাছাড়া তুমি তো রয়েছ একজন বান্দার স্তরে। আর একজন শ্রমিকের জন্য কর্মের সময়ে বিশ্রামের পোশাক সমীচীন নয়। তাকওয়ার প্রতিটি সময় দিবসের রোজার মতো। যে ব্যক্তি পরিণামের ভয় করে, সে তার চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। আর যে নৈকট্যের আশা করে, সে তাকওয়া অর্জন করে। আর ধৈর্যের মিষ্টতা প্রকাশ পায় ঘটনার অনেক পরে।

প্রবৃত্তির আগুন

অধিকাংশ ব্যক্তির নফস তাকে অবৈধ আনন্দের দিকে প্ররোচিত করে এবং তার দৃষ্টিকে এর পরিণাম ও শাস্তি থেকে সরিয়ে রাখে। কিন্তু আকল বা বিবেকের কণ্ঠ তাকে বলতে থাকে, তোমার কী হলো? তুমি এটা করো না। এতে তোমার উচ্চে আরোহণ ব্যাহত হবে। তুমি নিচের দিকে নামতে থাকবে। দোহায় তোমার, যা করতে চাচ্ছ– তা থেকে বিরত থাক।

কিন্তু তার প্রবৃত্তির ভীষণ কাম্যতা তাকে এ কথাগুলোর দিকে মনোনিবেশ করতে দেয় না। পরিণামে সে গোনাহে লিপ্ত হয় এবং ক্রমে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

তার এই খারাবিকে গ্রহণের দৃষ্টান্ত হলো গল্পের সেই কুকুরের মতো। গল্পটি এমন–

একদিন এক কুকুর এসে সিংহকে বলল, হে প্রাণীদের রাজা, আপনি আমার নামটি পরিবর্তন করে দিন। আমার এ নামটি খুবই নিকৃষ্ট ও অপমানকর। এটা আমার পছন্দ হয় না।

সিংহ বলল, তুমি হলে একটি বিশ্বাসঘাতক প্রাণী। এ নামটিই তোমার জন্য মানানসই। ভালো কোনো নাম তোমার উপযুক্ত নয়।

কুকুর বলল, কিছুতেই আমি বিশ্বাসঘাতক প্রাণী নই। আমাকে একবার পরীক্ষা করেই দেখুন।

সিংহ কুকুরের দিকে এক টুকরো গোশত ছুড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি এটি আগামীকাল পর্যন্ত আমার জন্য সংরক্ষণ করে রাখবে। কাল যখন গোশতের টুকরোটি নিয়ে আমার নিকট আসবে, তখন আমি তোমার নাম পরিবর্তন করে দেবো।'

কুকুর গোশতের টুকরোটি নিয়ে বিদায় নিল। কিছুক্ষণ পর সে যখন ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল, গোশতের দিকে লোভাতুরভাবে তাকাল। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে রাখল। ধৈর্যধারণ করল। মনকে বোঝাল– নাম পরিবর্তন করতে চাইলে এটা খাওয়া যাবে না। কিন্তু একসময় যখন তার খাওয়ার কামনা আরও তীব্র হয়ে উঠল, তখন সে মনে মনে বলল, আমার এ নামেই বা ক্ষতি কী! 'কুকুর'

নামটি তো একেবারে খারাপ না! ভালোই তো। এই বলে কুকুরটি তার কাছে রক্ষিত গোশতের টুকরোটি খেয়ে নিল।

মানুষের নিম্নতম মানসিকতাও ঠিক এমনই। নিজের অমর্যাদাকর অবস্থা নিয়েই সে সন্তুষ্ট থাকে। পরিশ্রমলব্ধ শ্রেষ্ঠ জিনিসের চেয়ে তাৎক্ষণিক ও সাময়িক আনন্দকেই সে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

আল্লাহর দোহাই! নফস যখন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখনকার সেই আগুন থেকে সতর্ক থাকো। কীভাবে তাকে নেভানো যায়– তা নিয়ে চিন্তা করো। কারণ, কিছু কিছু পদস্খলন মানুষকে তলাহীন কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়। কিছু কিছু কলঙ্ক-দাগ– কিছুতেই আর মুছে না। যা হারিয়ে যায়, তা আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সুতরাং ফিতনার উপকরণগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ, নিকটবর্তী হওয়াই এমন একটি পরীক্ষা– যাতে অধিকাংশ মানুষই ফেল করে। নিরাপদ থাকতে পারে না।

শয়তানের সাথে লড়াই

আমি যখন ভিন্ন একদৃষ্টি নিয়ে মানুষের অবস্থার দিকে তাকাই, তখন তাদের সকলকে যুদ্ধের ময়দানে কাতারবদ্ধ দেখতে পাই।

কার সাথে যুদ্ধ? শয়তানের সাথে।

শয়তান ক্রমাগত মানুষের দিকে বিভিন্ন প্রবৃত্তির তির নিক্ষেপ করছে। ভোগ-উপভোগ, আনন্দ-স্ফূর্তির তরবারি চালনা করে। যার একটু দুর্বল ঈমান, এলোমেলো চলাচল, অস্বচ্ছ লেনদেন– এগুলোর আঘাতে প্রথমেই সে ধরাশায়ী হয়ে যায়। পরাজিত হয়।

কিন্তু যারা মুত্তাকি, খোদাভীরু, মজবুত ঈমানের অধিকারী– তাদেরকে জানপ্রাণ কষ্ট করে লড়াইয়ে টিকে থাকতে হয়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। তারা তবুও অনড় ও অটল থাকে। আঘাতে আঘাতে তাদের অন্তরের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়। কিন্তু তারা হেরে যায় না। নতও হয় না। তারা আহত হয়, আবার ওষুধ লাগায়। এবং শেষমেশ মৃত্যুর মাধ্যমে সংরক্ষিত ও নিরাপদ হয়ে যায়।

বরং তাদের এই প্রতিটি আঘাত ও ক্ষতের বিনিময়ে পুরস্কৃত করা হয়। চেহারায় উজ্জ্বলতা চকমক করতে থাকে।

সুতরাং, হিম্মতের সাথে এই লড়াইটির জন্য সচেতন সতর্ক ও প্রস্তুত থাকো।

দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্কতা

দুনিয়া হলো একটি ফাঁদ।

মূর্খ ব্যক্তি প্রথম পদক্ষেপেই এতে আপতিত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমান মুত্তাকি ব্যক্তি ক্ষুধার ওপর ধৈর্যধারণ করে। ফাঁদের দানার চারপাশে ঘুরতে থাকে। দানা খায় না। তবে এখান থেকে দূরে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ।

কারণ, অনেক লড়াইকারী ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে দেখেছি, বছরের পর বছর ধৈর্য ধরে থেকেছেন; কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন।

সুতরাং খুবই সতর্কতা প্রয়োজন! অনেক মানুষ তো প্রায় জীবনভর সঠিক পথে থেকে কবরের প্রান্তে এসে ভ্রান্ত হয়েছে। তীরে এসে তরী ডুবিয়েছে।

একনিষ্ঠ হিম্মত

একবার আমি একটি বিষয়ে ভীষণ সংকটের মধ্যে পড়ে যাই। বিষয়টি আমাকে সর্বক্ষণ চিন্তিত ও বিষণ্ন করে রাখে। অসহ্য সংকটটি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি সকল প্রকার পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন নিয়ে ব্যাপক চিন্তা করছিলাম। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ এক সময় কোরআনের এই আয়াতের কথা মনে পড়ল–

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

> যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন। [সুরা তালাক : ২]

আমি এর দ্বারা যেন নতুন করে জানলাম, তাকওয়াই হলো সকল প্রকার দুঃখ-চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়। সে মতে আমি সকল ক্ষেত্রে তাকওয়ার বিষয়টি আরও জোরদারভাবে লক্ষ করতে লাগলাম। আল্লাহর রহমে আমি আমার সংকট থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম।

সুতরাং প্রতিটি মানুষের জন্য উচিত, শুধু আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করা, তার কাছে প্রার্থনা করা এবং তার আনুগত্যের চিন্তা করা। তার আদেশ-নিষেধগুলো মান্য করা। কারণ, প্রতিটি পেরেশানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এটিই একমাত্র পথ।

এরপর মুত্তাকির জন্য এটাও জানা উচিত, আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং সে তার অন্তর অন্যকিছুর দিকে ঝুঁকাবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

> যে-কেউ আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য যথেষ্ট। [সুরা তালাক: ৩]

এরপর আল্লাহ তাআলা তার ভরসা অনুযায়ী তার জন্য এমন ব্যবস্থা করবেন, কোনো কল্পনাকারীও যা কল্পনা করতে পারে না। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

> এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। [সুরা তালাক: ৩]

সাড়াদানে বিলম্ব তোমারই কল্যাণ

মানুষ খুবই অধৈর্য!

যখন যা কামনা করে, তখনই সে তা পেতে চায়। তোমার অবস্থাও তা-ই। তোমার কাম্য বস্তু প্রার্থনার ক্ষেত্রে তোমার বেশি পীড়াপীড়ি করা উচিত নয়। হয়তো প্রার্থনার কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেতে দেরি হয়, এদিকে তোমারও পীড়াপীড়ি বাড়তে থাকে। এটা কী ধরনের স্বভাব!

অথচ প্রার্থনা গ্রহণীয় না হওয়ার বহু কারণ থাকতে পারে– তুমি সেগুলো ভুলে থাকো কেন? যেমন, তোমার আবেদন কবুল না হওয়ার দুটি কারণ হতে পারে–

১. আবেদন কবুল না হওয়া কিংবা বিলম্ব হওয়া– এটা তোমার জন্যই কল্যাণকর। কারণ, এমন তাড়াহুড়ার বস্তু অনেক সময়ই ক্ষতিকর হয়।

২. আবেদন কবুল না হওয়ার কারণ হলো, তোমার নিজেরই গোনাহ। গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকা ব্যক্তির আবেদন কবুল হবে কীভাবে? গোনাহের ময়লা থেকে সাড়া প্রদানের পথ আগে পরিষ্কার করো।

এরপর গভীরভাবে লক্ষ করো, তোমার এই প্রার্থনা তোমার দ্বীনের কোনো কল্যাণের জন্য নাকি নিছক নিজের নফসের চাহিদা পূরণের জন্য?

যদি এটা তোমার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য হয়, তাহলে জেনে রেখো, তোমার প্রার্থনার বিষয়ে সাড়া প্রদান না করাই হবে তোমার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন। কারণ, তুমি এক অবুঝ বাচ্চার মতো এমন বিষয়ের প্রার্থনা করছ, পরিণামে যা তোমাকে শুধু কষ্টই দেবে। যা তোমার শুধু ক্ষতিই করবে। সুতরাং তোমার প্রতি অনুগ্রহশীল হয়েই এটা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে।

আর এই আবেদন যদি হয় তোমার দ্বীন ও ধর্মের কোনো কল্যাণের জন্য, তাহলে তো এমনও হতে পারে– এটার বিলম্বের মধ্যে কিংবা এটাকে একেবারে প্রদান না করার মধ্যেই রয়েছে আসল কল্যাণ।

মোটকথা, তোমার জন্য তোমার নিজের ইচ্ছা-বাসনার চেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্বাচনই বেশি কল্যাণকর। তিনি যেটা চান, সেটাই সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ ও নিরাপদ।

এছাড়া কখনো কখনো তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সাড়াদান না করে তিনি তোমার ধৈর্যের পরীক্ষা করেন। অতএব, তুমি তাকে তোমার পক্ষ থেকে 'সবরে জামিল' বা 'সুন্দর ধৈর্য' প্রদর্শন করো। দেখবে, অচিরেই তুমি এমন প্রতিদান পাবে– যা পেয়ে খুশি হয়ে যাবে।

এভাবে তুমি যদি গোনাহের ময়লা থেকে আবেদন কবুলের রাস্তা পরিষ্কার রাখো এবং তার ফয়সালার ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারো, তাহলে সাড়া দেওয়া হোক বা না হোক– উভয়টিই তোমার জন্য কল্যাণকর।

যাত্রাদিনের প্রস্তুতি

যে ব্যক্তি জানে না, কখন আকস্মিকভাবে তার মৃত্যু এসে যেতে পারে, তার জন্য উচিত হলো সর্বক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। নিজের যৌবন বা সুস্থতা নিয়ে ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। চারপাশে একটু তাকিয়ে দেখুক সে- বয়স্কদের চেয়ে কম বয়সীরাই বরং অধিকহারে মৃত্যুবরণ করছে। এ কারণেই তো বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সংখ্যা কম।

কবি বলেন,

يعمّر واحدٌ فيغرّ قوماً ... وينسى من يموت من الشباب

একজনের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তিতে ধোঁকায় পড়ছে পুরো জাতি।

ভুলে যাচ্ছে মরছে কত যুবক-তরুণ– অল্প দিনের প্রদীপ-বাতি।

আর ধোঁকার আরেকটি বড় কারণ হলো, দীর্ঘ আশা। এর চেয়ে বড় কোনো বিপদ নেই। যদি এই দীর্ঘ আশা না থাকত, তবে সে কিছুতেই এই অবহেলার মধ্যে আপতিত হতো না। জীবনের এই দীর্ঘ আশার কারণেই একজন অপরাধী গোনাহ করছে, কিন্তু তাওবা করতে বিলম্ব করছে। এই দীর্ঘ আশার কারণেই প্রবৃত্তির কামনার দিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তার থেকে ফিরে আসার কথা ভুলে থাকছে।

এই দীর্ঘ আশাই হলো একটি মারাত্মক প্রতারক সূত্র।

তুমি যদি তোমার জীবনের আশাকে ছোট ভাবতে সক্ষম না হও, তবে দীর্ঘ জীবন ও আশাকে না হয় ছোট ছোট ভাগ করে হিসাব নাও। সন্ধ্যায় তুমি তোমার পুরো দিবসের একটি হিসাব নাও। সেখানে যদি কোনো বিচ্যুতি বা অপরাধ দেখতে পাও, দ্রুত তাওবার মাধ্যমে তা মুছে ফেলো। আর যদি কোনো গোনাহ দেখতে পাও, তাওবার মাধ্যমে তা বিদূরীত করে নাও। আর যখন সকাল যাপন করো, তখন রাতের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করো এবং কোনো সমস্যা দেখলে একইভাবে তাওবা ও ইস্তেগফার করে নাও।

অলসতা ও গড়িমসি থেকে খুবই সাবধান! কারণ, এটা হলো ইবলিসের সবচেয়ে বড় ফাঁদগুলোর একটি।

জীবনের স্বল্পতা ও ক্ষুদ্রতা নিয়ে কল্পনা করো। চিন্তা করো এর ব্যস্ততা নিয়ে। মৃত্যুর সময় এই অবহেলাগুলোর ওপর আফসোসের তীব্রতা নিয়ে চিন্তা করো। আর তখন দ্রুত সময় ও সুযোগ ফুরিয়ে যাওয়ার ওপর দীর্ঘ অনুশোচনার কথাও ভেবে দেখো।

পূর্ণ ও সম্পূর্ণ ব্যক্তিদের কথা চিন্তা করো– সেই তুলনায় তুমি কত ত্রুটিপূর্ণ। মুজতাহিদদের কথা ভাবো, সেই তুলনায় তুমি কত অলস ও বেখেয়াল। যে নসিহত বা উপদেশগুলো শোনো, তা থেকে নিজেকে কখনো মুক্ত মনে করো না। পরস্পর যে আলোচনাগুলো করো, সে চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে রেখো না। নফস হলো এক বিবাগী ঘোড়ার মতো, তুমি যদি তার লাগামে সামান্য ঢিল দাও, সে তোমাকে উল্টে ফেলে দেবে।

তোমার এই অবৈধ কামনা-বাসনাগুলো তোমাকে পঙ্কিল করে তুলছে। তোমার জীবনকে নষ্ট করে তুলছে। এখনো সময় আছে– বাকিটা ধ্বংস হওয়ার আগেই তুমি তাকে বাগে আনো ও সংশোধন করো। নিজের নিয়ন্ত্রণের ওপর অযথা ভরসা করে থেকো না। সাবধান! বহু প্রত্যয়ী মজবুত ব্যক্তিরও ডানা আটকে গেছে প্রবৃত্তির ফাঁদে। বহু সচেতন ব্যক্তিও নিপতিত হয়েছে অধঃপাতের গভীর কূপে। সাবধান!

আল্লাহর নিকট কিছুই হারিয়ে যায় না

হে বন্ধুগণ, তোমরা তার নসিহত শোনো– যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ।

তোমরা আল্লাহ তাআলাকে যে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করবে, আল্লাহ তাআলা সে পরিমাণ তোমাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করবেন। তোমরা যেভাবে তার বিধি-বিধানকে সংরক্ষণ ও পালন করবে, আল্লাহ তাআলা সে পরিমাণ তোমাদের পুরস্কার ও সম্মান বাড়িয়ে দেবেন।

আমি এমন অনেক আলেমকে দেখেছি, ইলমের চর্চায় যিনি তার জীবন অতিবাহিত করেছেন। বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। এরপর আল্লাহর বিধানের অবাধ্য হওয়া শুরু করেছেন। তখন তিনিও মানুষের নিকট ছোট ও নীচু হয়ে পড়েছেন। তার অঢেল ইলম, সীমাহীন কষ্ট ও পরিশ্রম সত্ত্বেও মানুষ এখন আর তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

আবার এমন ব্যক্তিদেরও দেখেছি, যারা তাদের শৈশব থেকে আল্লাহ তাআলার দিকে দৃষ্টি রেখে চলেছে, পূর্বোক্ত আলেমের তুলনায় ইলমে কম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। মানুষের অন্তরে তাদের তার মর্যাদা ঢেলে দিয়েছেন। মানুষ শুধু তাদের কল্যাণের আলোচনাই করে। তার প্রশংসা করে।

আবার এমন ব্যক্তিদেরও দেখেছি, তারা যখন ভালো কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন তো থাকেই– কিন্তু আবার কখনো বিচ্যুত হলে, পুরোভাবেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তখন তাদের থেকে সকল কোমলতা লীন হয়ে যায়। যদি আল্লাহ তার রহম দিয়ে তাদের এই বিচ্যুতিগুলো সংশোধন না করেন, তবে অচিরেই তারা মানুষদের মাঝে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সুযোগ দেন। কিংবা শাস্তির ক্ষেত্রে বিলম্ব করেন। আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি এতটাই রহমশীল!

যেমন কবি বলেন,

ومن كان في سخطه محسناً ... فكيف يكون إذا ما رضي

ভাবো একবার, যিনি তার ক্রোধের অবস্থাতেই এমন দয়াবান,

তাহলে যখন তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তখন হবেন কত মেহেরবান!

কিন্তু কিয়ামতের দিনের ন্যায়বিচারের কথা সব সময় খেয়াল রেখো। স্মরণ রেখো বিচারকের কোনোপ্রকার অন্যায় না হওয়ার কথা। আর তার নিকট থেকে কিছুই যে হারিয়ে যায় না, সে কথাও বিস্মৃত হয়ো না।

ধৈর্যের ওপর দৃঢ়তা

হে অপরাধী,

তুমি যখন কোনো প্রতিফল বা শাস্তির মুখোমুখি হও, তখন বেশি অস্থির হয়ো না ও চেঁচামেচি করো না। আর বলতে থেকো না– আমি কত তাওবা করলাম, অনুতপ্ত হলাম! এরপরও আমার থেকে কেন এই শাস্তি বিদূরীত হলো না?

এমন তো হতে পারে– সঠিকভাবে তোমার তাওবা করা হয়নি। এছাড়া দীর্ঘ অসুস্থতার মতো কখনো কখনো শাস্তির সময়ও দীর্ঘ হয়। সুতরাং তার

নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে তুমি আর অন্য কোনো বিরূপতা দেখিয়ো না।

সুতরাং হে অপরাধী, ধৈর্যধারণ করো। তোমার চোখের পানি নাপাক অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশের সুযোগ করে দাও। এরপর অনুশোচনার হাত দিয়ে পানি নিংড়ে নাও। এভাবে আবারও করো। তবেই এক সময় তোমার অন্তরে পবিত্রতার হুকুম লাগানো হবে।

স্মরণ রেখো, হজরত আদম আলাইহিস সালাম দীর্ঘ ৩০০ বছর ক্রন্দন করেছেন। হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম দীর্ঘ ১৮ বছর তাঁর বিপদের মধ্যে ধৈর্যধারণ করেছেন। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর সন্তান ইউসুফের জন্য দীর্ঘ ২৮ বছর অশ্রু ঝরিয়েছেন।

এভাবে প্রতিটি বিপদ-আপদের একটি নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময় রয়েছে– সেই সময় পর্যন্ত তা বিলম্বিত হয়। এমনকি কারও কারও ক্ষেত্রে এই বিপদ তার মৃত্যু পর্যন্তও বিলম্বিত হয়!

সুতরাং তোমার জন্য কর্তব্য হলো, অপরাধের কথা স্মরণ করে বিনয়-অবনত হওয়া। নতুনভাবে তাওবা করা। উঠতে-বসতে চিন্তা ও ক্রন্দনের মধ্যে থাকা। কারণ, মাঝে মাঝে বিপদ এতটা বিলম্বিত হয় যে, সুসংবাদদাতা যখন আসে, ততদিনে দুঃখে-কষ্টে ক্রন্দন করতে করতে 'ইয়াকুব'-এর চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

আর যদি তুমি এই বিপদের মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নাও, তবুও তো কারও জন্য এমন হয় যে, আখেরাতের সীমাহীন কষ্টের পরিবর্তে শুধু এই দুনিয়াতেই কষ্ট পেয়ে যায়। কিন্তু আখেরাতে শান্তি পায়। এটা তো অনেক বড় লাভ ও সৌভাগ্যের কথা।

নফসের সাথে বোঝাপড়া

যে ব্যক্তি 'আরেফ বিল্লাহ' বা আল্লাহ সম্পর্কে অবগত, সে কি কখনো আল্লাহর বিরোধিতা করতে পারে– পরিণামে জীবন চলে গেলেও? দুনিয়া ও আখেরাত শুধু আল্লাহর জন্যই! তার সন্তুষ্টি ছাড়া কীভাবে তার জীবন চলে?

সে ব্যক্তির জন্য বড় আফসোস, যে ব্যক্তি নিজের পছন্দনীয় বিষয় অর্জনের জন্য আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয়ে লিপ্ত হয়! আল্লাহর কসম, এর মাধ্যমে সে যা অর্জন করে, তার চেয়ে বহুগুণ কল্যাণ থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত করে।

হে আস্বাদনকারী, আমি যা বলি তার উত্তর দাও—তোমার জীবনে তুমি কি খুবই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছ? তোমার অবস্থা কি খুবই সঙ্গীন? জেনে রেখো, আল্লাহর বিরোধিতার চেয়ে বড় কোনো বিপর্যয় বা সঙ্গীন অবস্থা হতে পারে না!

কবি বলেন,

ولا انثنى عزمي عن بابك ... إلاّ تعثرت بأذيالي

> তোমার দরজা থেকে আমার আরজি এমনিতেই ফিরে আসেনি। আমারই দোষে– গোনাহের লেজ-লেজুড়ে বেঁধে আছড়ে পড়েছি আমি।

তুমি কি সেই সালাফের ঘটনা শোনোনি? আমাদের একজন মুরুব্বি ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদিন বৈরুতের ব্রিজের কাছে এক যুবককে বসে আল্লাহর জিকির করতে দেখলাম। আমি মনে করলাম– ভিক্ষুক বোধ হয়। আমি তাকে বললাম, তোমার কি কোনো প্রয়োজন রয়েছে? আমাকে বলো।

যুবক বলল, আমার যখন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়, আমি তা আমার অন্তর দিয়ে আল্লাহর কাছে চাই, তিনিই পূরণ করে দেন। মানুষের দরকার হয় না।

তুমি তোমার নফস নিয়ে মোরাকাবায় বসো। এরপর বলো, একজন বান্দার বৈশিষ্ট্য কী? আমি যদি কারও বান্দা হই, তবে আমার জন্য উচিত হলো আমার মালিকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করা। এর জন্য আমাকে কোনো প্রতিদান দিতে হবে– এমন তো কোনো শর্ত নেই। আমি যদি তার প্রতি

ভালোবাসাই রাখি, তবে তো তার সন্তুষ্টির জন্য আমার সকল ইচ্ছাকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকব।

হে দুনিয়ার উদ্দেশ্য সাধনে অন্ধ ও প্রতারিত মানুষ! তুমি যদি তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিপদ সহ্য করতে না পারো, তবে তার কাছেই আশ্রয় চাও। তার কোনো নির্বাচন তোমাকে যদি কষ্টে ফেলে, তবে তো তুমি তার সামনেই আছ। তার কাছে চাও। প্রার্থনা করো। রহম ও দয়া থেকে কিছুতেই নিরাশ হয়ো না—বিপদ যদি অনেক কঠিন ও দীর্ঘও হয়।

আল্লাহর কসম, বুদ্ধিমানদের এটাই কামনা। কাঙ্ক্ষিত সত্তার ইবাদত ও হুকুম মানার মধ্যেই যদি জীবনাবসান হয় তাহলে সে জীবন তো বড় সৌভাগ্যময়।

তুমি তোমার নফসকে ডেকে বলো,

হে আমার নফস, তোমাকে যা প্রদান করা হয়েছে, তুমি তার আশাও করতে পারতে না। তোমাকে এমন জায়গায় উপনীত করা হয়েছে, যা তুমি প্রার্থনাও করোনি। তোমার দোষ-ত্রুটিগুলো তিনি গোপন রেখেছেন। সেগুলো প্রকাশিত হলে মানুষের মাঝে তুমি লাঞ্ছিত হতে। তোমার সৎ কর্মগুলোর জন্য রয়েছে আখেরাতের মহান পুরস্কার। তবে আর দুনিয়ার সামান্য কামনাগুলোর অপূর্ণতা নিয়ে এত চেঁচামেচি করছ কেন? এত হায়-হাপিত্যেশই বা করছ কেন?

তুমি তার বান্দা-অধীন, নাকি মুক্ত-স্বাধীন? তুমি কি জানো না, তুমি রয়েছ কর্মের সময়ের মধ্যে? এটা কি বিশ্রাম ও আরামের সময়? মূর্খরা না হয় এ ধরনের কাজ করতে পারে– কিন্তু তুমি তো আরেফ– আল্লাহ সম্পর্কে অবগত হওয়ার দাবিদার! তোমার আচরণ তবে কেন এমন!

তুমি কি ভেবে দেখেছ, এক ঝড়ের ঝটকায় তোমার দু-চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে? তখন তোমার দুনিয়ার সাধ-আহ্লাদ কোথায় যাবে? কিন্তু তোমার জন্য আফসোস– তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ চোখ– অন্তরের চোখই যেন হারিয়েছ। তুমি ভুলের দিকেই অগ্রসর হয়ে চলেছ। জীবনের জাহাজ কবরের তীরে এসে প্রায় উপনীত। অথচ তোমার বাহনে জীবনের ব্যবসার লাভের কোনো সঞ্চয় নেই। শূন্য তরী।

কী আশ্চর্যতম কথা, তোমার জীবন উচ্চে উঠতে শুরু হয়েছে, আর তুমি নিজে নিচে নামতে শুরু করেছ। এমন কত মানুষকেই তো দেখো, বিপদ ও ফিতনার মধ্যেই যার জীবন অবসান হয়েছে? তবুও কি শিক্ষা নেবে না?

আহা! তোমার এই পরবর্তী জীবনের চেয়ে তো প্রথম জীবনই ভালো ছিল। তোমার এই বয়সকালের আমলের চেয়ে তোমার যৌবনের আমলই তো ছিল পরিশুদ্ধ। নিজের আমলের দিকে দয়া করে আরেকবার ফিরে তাকাও। তা সংশোধন করো। তুমি কি খেয়াল করেছ, তুমি কী হতে গিয়ে কী হয়ে গেছ? কী করতে গিয়ে কী করে চলেছ? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন–

﴿وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاس وَمَا يعقلها إِلاَّ الْعالِمُون﴾

> আমি মানুষের কল্যাণার্থে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা বোঝে কেবল তারাই, যারা জ্ঞানবান। [সুরা আনকাবুত : ৪৩]

সকল প্রার্থনা কেবল আল্লাহ তাআলার নিকট। তার ইশারা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না।

ধৈর্যের ওপর উত্তম পুরস্কার

আমি একদিন আমার নফসের এমন একটি চাহিদা পূরণের সুযোগ পেলাম–যা ছিল তার কাছে তীব্র পিপাসিত মুসাফিরের মুখের কাছে স্বচ্ছ শীতল পানির চেয়েও মিষ্টিকর। নফস বিভিন্ন ব্যাখ্যা জানাচ্ছিল, এটাতে কোনো অসুবিধা নেই। শুধু একটু তাকওয়ার ব্যাপার। তবে প্রকাশ্যভাবে বিষয়টি জায়েযের পর্যায়ে মনে হচ্ছিল।

আমি বিষয়টিতে অগ্রগামী হওয়া বা না-হওয়া নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলাম। কী করা যায়! কিন্তু অবশেষে আমি সেটা থেকে নফসকে বিরত রাখতে সক্ষম হলাম। আমি শরিয়তের নিষেধের বিষয়টিকেই প্রাধান্য প্রদান করলাম। কিন্তু মনের মাঝে অস্থিরতা বিরাজ করতে লাগল। নিজের সর্বোচ্চ চাহিদার বিষয়টি সুযোগ পেয়েও অর্জিত হলো না বলে শুরু হলো নফসের ছটফটানি।

আমি তাকে বললাম, হে নফস, তুমি এটা করতে গেলে তোমার ধ্বংস ছাড়া আর কীই-বা হতো?

নফস তবুও আকুলি-বিকুলি করতে লাগল।

আমি তাকে ধমকের সুরে বললাম, এরকম কামনার ক্ষেত্রে আমি তোমাকে আর কতবার জানাব, এ ধরনের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে চলে যায় আর বাকি থেকে যায় শুধু আফসোস আর অনুশোচনা। এই কামনা চরিতার্থ করার ক্ষেত্রেও তুমি হিসাব করে দেখো, এটা কি সাময়িক অর্জিত আনন্দ তার পরিবর্তে বহুগুণ আফসোস ও অনুশোচনার উপলক্ষ রেখে যাবে না?

নফস কিছুটা নত হয়ে বলল, তবে আমি এক্ষেত্রে কী করতে পারি?

আমি তাকে কবিতার মাধ্যমে বললাম,

صبرت ولا والله ما بي جلادة ... على الحب لكني صبرت على الرغم

ধৈর্যধারণ করেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম, ভালোবাসার ওপর আমার তো কোনো ধৈর্য নেই। তবুও অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধৈর্যই ধরেছি।

এভাবে আমি আমার নফসের অবৈধ চাহিদা থেকে বিরত থাকি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এর উত্তম প্রতিদানের অপেক্ষা করতে থাকি। সুন্দর প্রতিদানের আশা নিয়ে দিন গুণতে থাকি। কারণ, আমি জানি, নিশ্চয় তিনি ধৈর্যের প্রতিদান দিয়ে থাকেন– হয়তো দ্রুতই কিংবা বিলম্বে। তিনি যদি দ্রুত প্রদান করেন, তবে করলেনই। আর যদি বিলম্বে প্রদানের পথ অবলম্বন করেন, তবুও তো তার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তাআলার জন্য কষ্ট সত্ত্বেও কোনো নিষিদ্ধ জিনিস বর্জন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাকে এর চেয়েও উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

আল্লাহর কসম, আমি এটা শুধু আল্লাহর জন্যই বর্জন করেছিলাম। আর ভেবেছিলাম, নিশ্চয় এটা আমার একটি গচ্ছিত সম্পদ হবে। এমনকি আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো, আপনার কি এমন কোনো দিনের কথা স্মরণ হয়, যখন আপনি নিজের প্রবৃত্তির ওপর আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন?

আমি নির্দ্বিধায় বলে দিতে পারতাম, হ্যাঁ, অমুক অমুক দিন... অমুক অমুক বিষয়ে প্রবৃত্তির ওপর আমি আল্লাহকেই প্রাধান্য দিয়েছি– ভীষণ কষ্ট সত্ত্বেও।

সুতরাং সে নফস, যে তোমাকে এটি করতে সক্ষম করেছে, তাকে নিয়ে গর্ব করো। তোমাকে ছাড়া আর কতজনই তো এতে আপতিত হয়ে লাঞ্ছিত

হয়েছে। তুমিও তেমন কাজে লাঞ্ছিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকো। আল্লাহ তাআলাই সকল কিছুর ক্ষমতাদাতা।

আমার এই ধৈর্যের ঘটনাটি ঘটেছিল ৫৬১ হিজরিতে। এরপর আমি যখন ৫৬৫ হিজরিতে পদার্পণ করলাম, তখন সেই উল্লিখিত বিষয়ে ধৈর্যের বিনিময় আমি প্রাপ্ত হলাম– তাকওয়ার সাথে এবং আত্মসম্মানবোধের সাথে।

আমি মনে মনে বললাম, এটা হলো আল্লাহর জন্য কিছু বর্জনের দুনিয়ার প্রতিদান– আখেরাতের পুরস্কার তো আরও উত্তম। সকল প্রশংসা শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই।

সচেতনতার চোখ খুলে রাখো

যে ব্যক্তি বৈধভাবে দুনিয়ার স্বাদ অন্বেষণ করে, তার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। কারণ, সকল মানুষই সমানভাবে স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করতে সক্ষম হয় না।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তার জন্য– যে ব্যক্তি অবৈধভাবে দুনিয়ার অন্বেষণে লিপ্ত হয়। হয়তো সে দুনিয়া পায় কিংবা আরও চায়। দুনিয়ার অন্বেষণে এমনভাবে লিপ্ত হয় যে, সেটা কীভাবে অর্জিত হলো, সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। এই দুর্ভাগ্যটি সংঘটিত হয় নিজের বুদ্ধি বা আকল না খাটানোর কারণে। কিংবা সে তার বুদ্ধি দিয়ে সামান্যতমও উপকৃত হয়নি। কারণ, সে যদি তার বুদ্ধি দিয়ে তার কৃতকর্মের দ্বারা শাস্তির বিষয়টা পরিমাপ করে নিত, তাহলে সে দেখতে পেত, অচিরেই বিদূরীত আনন্দের পাল্লাটি বিশাল শাস্তির কণা পরিমাণও নয়।

কত ব্যক্তিকে দেখেছি, নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে নিজের দ্বীন-ধর্মই বিনষ্ট করে ফেলেছে এবং ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।

এ কারণে সর্বক্ষণ সচেতনতার চোখ খুলে রাখা উচিত। কারণ, তোমরা সর্বক্ষণ অবস্থান করছ জীবন-যুদ্ধের ময়দানে, কোন দিক থেকে যে শয়তানের তির এসে বিদ্ধ করে—তা বলা মুশকিল। সুতরাং সর্বক্ষণ নিজেদের সাহায্যের কাজে নিয়োজিত থাকো। নিজেদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে যেয়ো না।

আনুগত্যের পরিতৃপ্তি

আল্লাহ তাআলা তার বান্দার ঘাড়ের শাহরগের চেয়েও নিকটবর্তী। কিন্তু বান্দার সাথে তিনি এমন অবস্থান নিয়ে থাকেন, তিনি যেন বান্দার থেকে অনেক দূরে। এ কারণে তিনি তার নিয়তের ইচ্ছা করতে আদেশ দেন। তার দিকে হাত তুলতে বলেন এবং প্রার্থনার কথা বলেন।

কিন্তু মূর্খদের অন্তর তাকে বহু দূরবর্তী ভাবে। এ কারণেই তাদের থেকে গোনাহ সংঘটিত হয় বেশি। কিন্তু তাদের চেতনায় যদি তার 'হাজির-নাজির' হওয়ার বিষয়টি সঠিকভাবে উদ্ভাসিত হতো, তাহলে তারা অবশ্যই এই ভুল করা থেকে বিরত থাকত। কিন্তু যারা সচেতন, জাগ্রত হৃদয়, তাদের নিকট তার নৈকট্য-চেতনা উদ্ভাসিত, সে কারণে এটা তাদেরকে অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখে।

কিন্তু কিছুটা পর্দা বা আবরণ তো থেকেই যায়। প্রকৃত মুরাকাবার ক্ষেত্রে চোখে যদি এই আবরণটুকু না থাকত, তবে তো কেউ খাবার খেতে পারত না। চোখ দিয়ে অন্য কিছু দেখতে পেত না।

ঠিক এই বিষয়টার দিকে ইঙ্গিত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, إنه ليغان على قلبي –আমার অন্তরেও কখনো কিছুটা আবরণ আসে।[৮০]

এভাবে যখন পরিপূর্ণ নৈকট্যের চেতনা আসে, তখন মারেফাতও অর্জিত হয়। আর এই মারেফাত বা ঘনিষ্ঠতা অর্জিত হয় প্রকৃত আনুগত্যের মাধ্যমে। অন্যদিকে অবাধ্যতা ও অমান্যতা অপরিচয় ও দূরত্ব সৃষ্টি করে। আর আনুগত্যের মাধ্যমে আসে স্বতঃস্ফূর্ততা।

হায়, কে বুঝবে ঘনিষ্ঠদের আনন্দ! আর কেই-বা অনুধাবন করবে অপরিচিতদের দুর্ভাগ্য!

---

৮০. সহিহ মুসলিম : ১৩/৪৮৭০, পৃষ্ঠা : ২১৬। মুসনাদে আহমদ : ৩৭/১৭৫৭৫, পৃষ্ঠা : ২৪৩– মা. শামেলা। পুরো হাদিসটি এমন–

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

তবে আনুগত্য বলতে শুধু সেগুলোই নয়; যা অনেক মূর্খ ধারণা করে। তারা ধারণা করে, ইবাদত যেন শুধু নামাজ, রোজা, হজ। মূলত আনুগত্য হলো আল্লাহ তাআলার সকল আদেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা।

এটাই হলো মূলনীতি এবং প্রকৃত পদ্ধতি। তাছাড়া কত ইবাদতকারীই তো তার নৈকট্য থেকে বঞ্চিত। কারণ, তারা শরিয়তের মূল বিষয়কে বিনষ্ট করে। প্রকৃত পদ্ধতিকে ধ্বংস করে। কারণ, তারা আদেশগুলো মান্য করে না এবং নিষেধগুলো থেকে বিরত থাকে না। প্রকৃত বীর তো সেই, যে নিজের হিসাব-নিকাশের দাঁড়িপাল্লা নিজের মুঠোয় ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। গোনাহের কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছে। যা কর্তব্য তা করেছে। আর যা বর্জনীয়– তা থেকে বিরত থেকেছে। এরপর যদি অতিরিক্ত আরও ভালো কাজের তাওফিক পায়, ভালো। আর যদি না পায়– তবুও তার কোনো ক্ষতি নেই। সেই নিরাপদ।

ভালোবাসার জিনিসের সৌন্দর্য রক্ষা

দুনিয়া আসলে একটি মুসাফিরখানা। সুতরাং মানুষদের এখানে এর স্বাদ-আনন্দ উপভোগের জন্য প্রতিযোগিতায় নামা উচিত নয়। সময়গুলো এর পেছনে ব্যয় করাও বুদ্ধিমানের কাজও নয়। এখানে মোটামুটি কাজ চলে যাওয়ার মতো হলেই যথেষ্ট– গভীর অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন নেই।

যেমন, গোশতজাতীয় কোনো খাবারের ক্ষেত্রে– কেউ যদি প্রাণীটির জবাই দেখে। শ্রমিকদের অপরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ করে। যদি দেখে স্থান ও পাত্র। এবং স্মরণে রাখে পরিবেশনার আগের ও পরের অবস্থা ও চিত্র। আর এগুলো নিয়ে বেশি চিন্তা-কল্পনা করে– তাহলে তার অনেক খাবারের ক্ষেত্রেই আর রুচি থাকবে না।

এমনকি কেউ যদি তার মুখের মধ্যে খাদ্যের লালার সাথে মিশ্রিত হওয়া, তার ঘুরতে থাকা, চক্কর কাটা, দাঁতের নিচে পিষ্ট হওয়া, থুথু ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করে– তারও খেতে ভালো রুচি হবে না। এ কারণে সাময়িক উপভোগ্যতার ক্ষেত্রে গভীর অনুসন্ধানে না যাওয়াই ভালো।

উপভোগ্যতার মানসিকতার বিচারে মানুষ দু-প্রকার–

১. বৈধ আনন্দ-উপভোগ্যতার মাধ্যমে বিলাস-ব্যসনের কামনা করা।

২. প্রয়োজনগুলো পূরণের মাধ্যমে যেকোনোভাবে দিন অতিবাহিত করতে চাওয়া।

এখন কথা হলো, যার যেই উদ্দেশ্যই থাক, তার উচিত হবে, তার উপভোগ্যতার বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানে না যাওয়া। কারণ, কেউ যদি তার স্ত্রীর গোপন বিষয়গুলো অকপটে দেখে ও চিন্তা করে, তবে অচিরেই তার স্ত্রী থেকে তার মন আকর্ষণহীন হয়ে পড়বে।

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা. বলেন,

ما رأيته من رسول الله ولا راه مني.

আমি কখনো রাসুলুল্লাহর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] গোপনাঙ্গ দেখিনি, তিনিও কখনো আমার থেকে দেখেননি।[৮১]

এ কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য উচিত, স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রাখা। স্ত্রীকে সে সময় সাজ-গোজ করে থাকতে নির্দেশ দেওয়া।

এছাড়া জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকা। নতুবা জীবন কখনো সুখের হবে না। কারণ, কেউ-ই দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। নিজেও না।

আর স্ত্রীরও উচিত হবে, সর্বক্ষণ স্বামীর সাথে না ঘেঁষে থাকা। কিছুটা মনোরম দূরত্ব রাখা উচিত। আর যখনই সে স্বামীর নিকট উপস্থিত হবে কিংবা মিলিত হবে, কিছুটা সাজ-সজ্জা ও সুঘ্রাণে সুমণ্ডিত হয়ে উপস্থাপিত হবে।

এগুলো অনুসরণের মধ্যেই নিহিত আছে সুখময় জীবন।

কিন্তু কেউ যদি বেশি অনুসন্ধান চালাতে যায়, এটা-ওটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে যায়, তাহলে তার দৃষ্টিতে বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি প্রকাশিত হতে থাকবে। অন্তর আকর্ষণহীন হয়ে পড়বে। সঙ্গী পাল্টাতে চাইবে। কিন্তু তার অভ্যাস

---

[৮১]. সুনানে ইবনে মাজা:১/২১৭/৬১৯। এবং মুসনাদে আহমদ: ৬/১৯০, ৬৩। শামায়েলে তিরমিজি: ৩৪৪। তবে ইবনে মাজা বর্ণনায় হাদিস এভাবে এসেছে–

مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ.

সুনানে ইবনে মাজা: ২/৬৫৪, পৃষ্ঠা: ৩৪০– মা. শামেলা।

যদি না পাল্টায়– তবে দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রেও এই একই বিষয় সংঘটিত হবে– যা প্রথমজনের ক্ষেত্রে হয়েছে।

পুরুষের জন্যও এই একই কথা। পুরুষ নিজেও পরিচ্ছন্ন সুঘ্রাণ ও উপযুক্ত পরিপাটি হয়ে থাকবে– যেমনটা সে স্ত্রীর ক্ষেত্রে ভালোবাসে। এটা কোনো লৌকিকতা নয়; জীবনযাপনের সুন্নত পদ্ধতি। নবীর চেয়ে সুঘ্রাণ ও পরিপাটি আর কেউ ছিলেন না।

কিন্তু এভাবে যদি কারও দাম্পত্য জীবন না চলে, তবে অচিরেই সেখানে দুটি বিষয়ের একটি বিষয় সংঘটিত হবে। হয়তো স্বামী বা স্ত্রী সঙ্গী পরিবর্তন করে ফেলবে কিংবা নিজেদের মধ্যে বিতৃষ্ণা ভাব চলে আসবে।

বিতৃষ্ণা ভাব এলে, তখন তার কাঙ্ক্ষিত বাসনাগুলো চরিতার্থ না হওয়ায় তাকে নিয়েই ধৈর্যধারণ করতে হবে। আর যদি তালাকের সিদ্ধান্তে চলে আসে, তখনো তাকে একে-অপরের প্রতি অনুগ্রহ ও সহানুভূতির কথা মনে করে বিরত থাকতে হবে– কিন্তু দুটি বিষয়ই কষ্টকর। এটা দুজনকেই কষ্টে ফেলে দেবে।

তাই যেভাবে চলার বর্ণনা প্রদান করা হলো, সেভাবে না চললে জীবন সুখময় হবে না এবং জীবন ও সময় যেভাবে কাটানো উচিত, সেভাবে কাটাতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহর সীমাহীন নিয়ামত

একবার আমার নফস আমাকে শরিয়তে 'মাকরুহ' একটি বিষয়ের দিকে প্ররোচিত করছিল। আমার জন্য জায়েযের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছিল। মাকরুহটাকে দূরে সরিয়ে রাখছিল। কিন্তু আসলে তার ব্যাখ্যাগুলো ছিল ভুল। সেটা মাকরুহ হওয়ার ওপর স্পষ্ট প্রমাণ ছিল।

আমি আমার নফসের এই চক্রান্ত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করলাম। কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত শুরু করলাম। আমার পড়ার ধারাবাহিকতা 'সুরা ইউসুফ' পর্যন্ত এসেছিল। আমি সুরা ইউসুফ খুলে বসলাম। কিন্তু আমার অন্তরের বিক্ষিপ্ততার জন্য আমি বুঝতে পারছিলাম না, কোথা থেকে এখন পড়া শুরু করতে পারি। অবশেষে সুরা ইউসুফ থেকেই পড়া শুরু করলাম। পড়তে পড়তে যখন এই স্থানে এসে পৌঁছালাম–

﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾

নারীটি বলল, এসে পড়ো। ইউসুফ বলল, আল্লাহর পানাহ! তিনি আমার মনিব। তিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন।

[সুরা ইউসুফ : ২৩]

এই আয়াতের দ্বারা আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। এটা দ্বারা যেন আমাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমার সেই হতভম্বতা থেকে জেগে উঠতে সক্ষম হলাম। আমি আমার নফসকে ডেকে বললাম, হে নফস, কিছু কি বুঝতে পারছ?

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন স্বাধীন বালক। তাকে অন্যায়ভাবে বিক্রয় করে গোলাম বানিয়ে ফেলা হয়। এরপর যিনি তাকে কিনে স্বাধীন করে তার ওপর অনুগ্রহ করেছেন, তার প্রতি তিনি কতটা সন্তুষ্টচিত্ত ছিলেন এবং তাকে 'রব বা মালিক' বলে উল্লেখ করছেন। যদিও তার ওপর তার প্রকৃত মালিকানা নেই। এরপরও তিনি বলছেন, তিনি আমার মনিব। এরপর তিনি নিজের ক্ষেত্রে এমন বিষয় না করার কথা উল্লেখ করছেন– যা তার মালিককে কষ্ট দেবে এবং বলছেন– তিনি আমার অবস্থানকে সুন্দর করেছেন।

এবার হে নফস, তোমার ব্যাপার দেখো। তুমি এক মাওলার প্রকৃত বান্দা বা গোলাম। তোমার অস্তিত্বের সূচনা থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তোমার প্রতি তার কত অনুগ্রহ ও দয়া। অসংখ্য বালি-কণার চেয়েও তোমার কত দোষ-ক্রটি তিনি আবৃত করে রেখেছেন। তুমি কি একটু স্মরণ করে দেখবে না– তিনি তোমাকে কীভাবে লালনপালন করেছেন? তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, রিজিক দিয়েছেন। তোমার বালা-মুসিবত দূর করেছেন। কত কল্যাণ তোমাকে দান করেছেন! সঠিক পথে তোমাকে পথ দেখিয়েছেন। সকল ষড়যন্ত্র থেকে তোমাকে রক্ষা করেছেন। বাহ্যিক আকার-আকৃতির সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ জ্ঞান-বুদ্ধির সৌন্দর্য দান করেছেন। তোমার জন্য ইলম অর্জনকে সহজ করেছেন। দীর্ঘ পরিশ্রম ও অধ্যয়নে অন্যরা যা শিখতে পারে না, তুমি তা অল্পদিনের মধ্যেই অর্জন করতে পেরেছ। তোমার বিশুদ্ধ সুধাময় ভাষার মাঝে ইলমের ফল্গুধারা জারি করেছেন। মানুষের থেকে তোমার কত গোনাহ ও অপরাধ গোপন রেখেছেন। তারা তোমার সাথে কত সুন্দর ও ভালো ধারণা

নিয়ে সাক্ষাৎ করে। কোনো ধরনের অসম্মান ও বড় কষ্ট ছাড়া তোমার রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহর কসম, হে নফস, আমি বুঝতে পারছি না, তোমার প্রতি প্রদত্ত আর কত নিয়ামতের কথা আমি উল্লেখ করব! আকার গঠনের সৌন্দর্যের কথা? সুস্থ ও নিরাপদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা? নাকি সুন্দর স্বভাবের কথা? নাকি বলব ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের কথা? নাকি বলব পঙ্কিলতামুক্ত সূক্ষ্ম অভিরুচির কথা? নাকি শৈশব থেকেই একটি অনাবিল সঠিক সৌন্দর্যের পথে পরিচালিত হওয়ার কথা? নাকি বলব তোমার ফাহেশা ও বিচ্যুতি থেকে সংরক্ষিত থাকার কথা? নাকি তোমার কোরআন হাদিসের মৌলিক বর্ণনা ও হেদায়েতের পথে থাকার কথা? বিদআত ও কুসংস্কার থেকে নিরাপদ থাকার কথা?

আমাকে বলো– আর কোন কোন নিয়ামতের কথা তোমাকে আমি বলি? এ কারণে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾

> তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুণতে শুরু করো, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। [সুরা নাহল : ১৮]

হে নফস, কত ষড়যন্ত্রকারী তোমার জন্য কত রকম ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু সেগুলো থেকে তিনি তোমাকে রক্ষা করেছেন?

কত শত্রু তোমাকে নিন্দার আবরণে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল, কিন্তু তিনি তা থেকে তোমাকে মুক্ত ও উজ্জ্বল করেছেন?

তোমার সম-সাথিদের কতজনই তো কাঙ্ক্ষিত পিপাসা নিবারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তিনি তোমাকে তা পান করিয়ে তৃপ্ত করেছেন?

তোমার সঙ্গীদের কতজনকেই তো তাদের চাহিদা পূর্ণ হওয়ার আগেই আল্লাহ মৃত্যু দিয়েছেন, কিন্তু তিনি তোমাকে এখনো জীবিত রেখেছেন?

তুমি এখনো নিরাপদ সুস্থ শরীরে সকাল-সন্ধ্যা পার করছ। ইলম ও আমলে সজ্জিত হয়ে দ্বীনকে সংরক্ষণ করছ। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেছ। আবার যদি কোনো লক্ষ্যে পৌঁছুতে না পারো, বিপদ আসে– তখনো তুমি ধৈর্যের নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে সেগুলো সয়ে নিচ্ছ। কারণ, তুমি তো প্রতিপালকের কল্যাণ

প্রদানের পদ্ধতি ও হিকমতের কথা জানো। সে কারণে তুমি মেনে নাও যে, দুনিয়াতে কখনো কখনো প্রদানের চেয়ে বঞ্চনাই অধিকতর কল্যাণকর।

হে নফস, এভাবে তুমি যদি এসকল নিয়ামতের কথা গণনা করতে থাকো, তবে তার গণনা শেষ হবে না। লিখতে চাইলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শেষ হয়ে যাবে– কিন্তু লেখা শেষ হবে না। আর তুমি নিজেও জানো, এখানে যত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করলাম, অনুল্লেখ রয়েছে তারচেয়ে অনেক বেশি। আর যেগুলোর প্রতি ইশারা করেছি, তার ব্যাখ্যাও করা হয়নি।

তাহলে কীভাবে তোমার জন্য শোভা পায়, তিনি যা অপছন্দ করেন তা করতে থাকা?

এবার তোমারও কি বলা উচিত নয়–

﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾

আল্লাহর পানাহ! তিনি আমার মনিব। তিনি আমাকে ভালোভাবে রেখেছেন। বাস্তবতা হলো, জালেমরা কখনো সফলকাম হয় না।

[সুরা ইউসুফ : ২৩]

ফিতনার গোড়া কেটে ফেলা

আমি মনে করি, ফিতনার নিকটে থাকাই হলো সবচেয়ে বড় ফিতনা। এর চেয়ে বড় ফিতনা আর হয় না। কারণ, কেউ ফিতনার নিকটে থাকে আর ফিতনার মধ্যে আপতিত হয় না– এমন খুবই কম ঘটে। যে ব্যক্তি আগুনের চারপাশে ঘোরে, তার আগুনে পোড়ার আশঙ্কাই বেশি।

এক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, একবার আমার এমন একটি বাসনা পূরণের সুযোগ হয়– যা প্রকাশ্যভাবে হারাম, আবার হালালেরও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, বিষয়টি ছিল সন্দেহপূর্ণ।

এসময় আমার নফস বলে উঠল, তুমি আসলে এটি করতেই সক্ষম নও। সে কারণে এটা বর্জন করতে চাচ্ছ। তুমি আগে বিষয়টির নিকটবর্তী হও, এরপর যখন তা অর্জনে সক্ষম হবে এবং বর্জন করবে, তখনই শুধু তুমি প্রকৃত বর্জনকারী হিসেবে গণ্য হবে।

আমি নফসের কথামতো তা-ই করলাম এবং সেটি বর্জন করতে সক্ষমও হলাম।

এর কিছুদিন পর আবার এমন একটি বিষয়ে উপনীত হলাম, বিভিন্ন ব্যাখ্যা হালাল হওয়ার প্রতি ইশারা করে– কিন্তু বিষয়টি আসলে সন্দেহযুক্ত। এরপর যখন আমি সেটি করার উপযোগী হলাম, আমার অন্তরের মধ্যে এক ধরনের অন্ধকার অনুভব করলাম। ভয় পেলাম, এটা বুঝি হারাম হবে। এভাবে আমার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। কখনো নফস তার ব্যাখ্যা ও সহজতা নিয়ে আমার ওপর শক্তিশালী হয়ে ওঠে, আবার কখনো আমিই চেষ্টা ও দৃঢ়তা দ্বারা তার ওপর বিজয়ী হয়ে উঠি।

এখন কথা হলো, আমি যদি সহজতাকে গ্রহণ করি, তবে এ ব্যাপারে নির্বিঘ্ন থাকতে পারি না– এটি আসলেই নিষিদ্ধ ছিল কি না? তাছাড়া নগদ আমি আমার অন্তরের মধ্যে এর খারাপ প্রভাব অনুভব করছিলাম। সহজতার ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমি নিরাপত্তা বোধ করছিলাম না, তখন এই বিষয়টির আশা অন্তর থেকে দূর করার পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। অবশেষে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করলাম। আমি আমার নফসকে বললাম, তুমি এটাকে নিশ্চিত বৈধ বলেও যদি সাব্যস্ত করো– আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তবুও আমি কিছুতেই এটা করব না।

এ কথা বলার পর আমি আশ্চর্য রকমের ফল পেলাম। এই কসম ও ওয়াদার কারণে অন্তর থেকে এর আশা একেবারে রহিত হয়ে গেল। নফস আর কোনো ব্যাখ্যার দিকে ধাবিত হলো না। এ ধরনের বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্য আমি একটি উপযুক্ত ওষুধ প্রাপ্ত হলাম। কারণ, এখন ব্যাখ্যাটা কসম ভঙ্গ করা ও কাফফারা প্রদানের দিকে নিয়ে যেতে সাহস করবে না।

এ কারণে সবচেয়ে উত্তম হলো ফিতনার গোড়া কেটে ফেলা। তার কোনো শিকড় না রাখা। আর যা হারামের দিকে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রাখে, সে রকম সহজতা ও শিথিলতাকে বর্জন করা। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা।

প্রবৃত্তির উত্তেজনা এক ধরনের আবরণ

অপরাধ সংঘটনের সময় অপরাধীর মধ্যে যদি এক ধরনের আবরণ ও পর্দা না পড়ত, তবে সে অপরাধটাকে স্পষ্ট খনিজ পদার্থের মতো দেখতে পেত। কিন্তু প্রবৃত্তির তীব্র কামনা তার মাঝে এবং পরিস্থিতি অনুধাবনের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তখন সে শুধু বাসনাটি পূরণের দিকেই পূর্ণভাবে ঝুঁকে থাকে। সাময়িকের জন্য তার অপরাধের হুঁশ-জ্ঞান বা চেতনা রহিত হয়ে যায়।

যদি এমনটি না হতো- অপরাধের সময় যদি তার মাঝে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতার পূর্ণ সচেতনতা থাকত, তবে সেই বিরোধিতার কারণে ঈমান থেকে বের হয়ে যেত। সে আর মুমিনই থাকত না। কিন্তু আসলে তখন সে কোনো দিকে লক্ষ না করে অচেতন মাতালের মতো তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে বসে, বিরোধিতা ঘটে এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে। আর মানুষের জাহান্নামে যাওয়ার অধিকাংশ বিষয় এভাবেই সংঘটিত হয়।

কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান যদি মুহূর্তের উত্তেজনায় সাময়িক স্ফূর্তি ও এর পরিণামে বাকি জীবনের আফসোস ও অনুশোচনার ক্ষতির মাঝে পার্থক্য করতে পারে, তাহলে সে কিছুতেই অপরাধের নিকটবর্তীও হবে না- এমনকি পুরো দুনিয়া তাকে প্রদান করা হলেও না। কিন্তু প্রবৃত্তির উত্তেজনা তার মাঝে এবং তার চিন্তার মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তাই অপরাধ বা গোনাহ সংঘটিত হয়ে পড়ে।

আহা! আফসোস! কত গোনাহের স্বাদ মুহূর্তের মধ্যেই উধাও হয়ে যায়- যেন তা কখনো করাই হয়নি। কিন্তু তার কুপ্রভাব স্থায়ী কলঙ্কের মতো অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্তত এতটুকু তো হয়-ই, জীবনভর তাকে এর অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হয়।

এ কারণে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো, ফিতনার উপকরণের মুখোমুখি না হওয়া, তার নিকটবর্তীও না হওয়া।

যে ব্যক্তি এই কথাগুলো বুঝবে এবং সতর্ক থাকার জন্য প্রবল চেষ্টা করবে- আশা করা যায়, সেই কেবল নিরাপদ ও গোনাহমুক্ত থাকতে সক্ষম হবে।

অভ্যন্তরকে সংশোধন করা

কোনো আলেমের নিয়ত যদি বিশুদ্ধ থাকে, তবে তিনি লৌকিকতার কষ্ট থেকে মুক্ত থাকেন। কারণ, অনেক আলেম আছে, তারা যেন কিছুতেই 'আমি জানি না' কথাটা বলতে চান না। তাই নিশ্চিত উত্তর না জানা সত্ত্বেও তারা মানুষদের বিভিন্ন ফতোয়া প্রদান করে। এতে করে তারা মানুষদের নিকট নিজেদের সম্মান রক্ষা করেন; যেন মানুষরা বলতে না পারে– অমুক আলেম উত্তর জানে না।

এটা একটি সীমাহীন খিয়ানত ও লাঞ্ছনার বিষয়।

হজরত মালেক ইবনে আনাস রহ.-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত আছে—একবার একলোক তাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। মালেক বিন আনাস রহ. বললেন, আমি এটা জানি না।

লোকটি বলল, আমি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আপনার নিকট এসেছি মাসআলাটি জানার জন্য– আর আপনি বলছেন, জানেন না। আমি ফিরে গিয়ে আমাদের লোকদের কী বলব?

মালেক বিন আনাস রহ. বললেন, তুমি তোমার দেশে গিয়ে বলো, আমি মালেককে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমি জানি না।

তুমি এই মহান ব্যক্তিত্বের দ্বীন ও বিবেচনাবোধের দিকে লক্ষ করো– কী চমৎকারভাবে তিনি সকল লৌকিকতা ও লোকদেখানো কষ্ট থেকে নিজেকে মুক্ত রাখলেন। আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখলেন।

একজন আলেম আল্লাহর দিকে চেয়ে ফতোয়া দেবেন। মানুষদের সম্মান ও বাহবা প্রাপ্তির জন্য নয়। কিন্তু যদি এমনটি করা হয়, তাহলে আলেমদের অন্তর নিয়ন্ত্রণ করবে মানুষদের ইচ্ছা, মানুষদের বাসনা। মানুষ যেভাবে কামনা করবে, লোভী আলেম ঠিক সেভাবেই চলবে এবং বলবে!

আল্লাহর কসম, আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা অনেক নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, চুপচাপ থাকে। পোশাকে-আচরণে বিনয়ী ভাব প্রকাশ করে;

কিন্তু মানুষের অন্তর তবুও তার দিকে আকর্ষণবোধ করে না। মানুষের অন্তরে তার প্রতি তেমন একটা সম্মানবোধ জাগ্রত হয় না।

আবার এমন অনেক মানুষকে দেখেছি, যারা পরিপাট্য অভিজাত পোশাক পরিধান করে, খুব বেশি বিনয়ী ভাব প্রকাশ করে না। আবার খুব বেশি নফল ইবাদত করে- এমনও না। কিন্তু মানুষের অন্তরসমূহ তার ভালোবাসায় পাগলপারা। তার জন্যে সবার অন্তরে একটি অন্য ধরনের সম্মানবোধে স্থান দখল করে রাখে।

আমি এই পার্থক্যের কারণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলাম। আমি একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় অনুধাবন করলাম। যেমন হজরত আনাস ইবনে মালেক রহ. সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়- তিনি খুব বেশি নফল নামাজ পড়তেন না বা খুব বেশি নফল রোজা রাখতেন না। কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ আমল ছিল অতি শক্তিশালী। তাতে কোনো লৌকিকতা ও শিরকের মিশ্রণ ছিল না।

এভাবে যে ব্যক্তি তার গোপনীয় আমলকে বিশুদ্ধ করে নেয়, তার শ্রেষ্ঠত্বের সুবাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অন্তরসমূহ তার ছড়ানো সুভাসে সুভাসিত হয়ে ওঠে।

আল্লাহর দোহাই! নিজেদের অভ্যন্তরকে বিশুদ্ধ করে নাও। বাহ্যিক যতই চাকচিক্যময় ও উজ্জ্বল হোক- অভ্যন্তর যদি সঠিক না হয়, তবে এগুলো কোনোই কাজে আসবে না।

দুআ কবুল না হওয়ার কারণসমূহ

আমি একবার একটি কঠিন বিষয়ে আপতিত হই। আমি এর থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অনেক দুআ করতে থাকি। কিন্তু তা কবুলে বিলম্ব হয়। নফস এতে অধৈর্য ও অস্থির হয়ে উঠতে থাকে।

আমি নফসকে ধমক দিয়ে বলে উঠলাম, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি তোমার নিজের বিষয়টি একটুও চিন্তা করে দেখেছ? তুমি তার বান্দা নাকি স্বাধীন মালিক? তুমিই কি পরিচালক না তার দ্বারা পরিচালিত?

তুমি কি জানো না, পৃথিবী হলো পরীক্ষা ও কষ্টের স্থান? যখন তুমি তোমার বাসনার কথা প্রার্থনা করো এবং এরপর তোমার কামনামতো যখন সবকিছু

প্রদান করা না হয়, তখন যদি তুমি ধৈর্যধারণ না করো, তবে আর তোমার পরীক্ষার বিষয় থাকল কোথায়? তোমার দাসত্ব ও আনুগত্য থাকল কোথায়?

তোমার ইচ্ছা ও কামনার বিপরীত হওয়াটাই তো তোমার পরীক্ষা!

সুতরাং 'তাকলিফ'-এর অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। আজ ভারি জিনিস তোমার নিকট হালকা হয়েছে। আর কঠিন জিনিসও তোমার নিকট সহজ হয়েছে।

এভাবে আমি যা বললাম, তা নিয়ে নফস যখন চিন্তা-ভাবনা করল, তখন সে কিছুটা চুপ হলো।

এরপর তাকে বললাম, দুআ কবুল না হওয়ার ওপর আমার নিকট আরও অনেক যুক্তি রয়েছে। আর তা হলো—এটা তুমি তোমার নিজের কামনা-বাসনা দিয়ে পাওয়ার ইচ্ছা করছ। অথচ তোমার নিজেকে প্রভুর ইচ্ছার সাথে আবশ্যক করে দিয়ে তা পেতে চাচ্ছ না। এটা তো স্পষ্ট মূর্খতা। বরং বিষয়টি হওয়ার প্রয়োজন ছিল এর উল্টো। কারণ, তুমি হলে তার বান্দা বা দাস। আর একজন বুদ্ধিমান বান্দা সর্বক্ষণ মালিকের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য তৎপর থাকবে এবং সে জেনে রাখবে, মালিকের জন্য বান্দার সকল কামনা-বাসনা পূরণ করা আবশ্যক নয়।

আমার এ কথায় নফস আগের চেয়ে আরও কিছুটা নরম হলো।

এরপর আবার বললাম, আমার নিকট আরও যুক্তি আছে। আর তা হলো, তুমি নিজেই এই দুআ কবুল হওয়াকে বিলম্বিত করেছ। গোনাহের মাধ্যমে দুআ কবুলের দরজা তুমি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছ। তুমি যদি এর দরজা খুলে রাখতে, তবে অনেক দ্রুতই দুআ কবুল হতো। তুমি কি জানো না, শান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম হলো তাকওয়ার পথে চলা? যেমন, আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইরশাদ করেন—

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন। এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে।

[সুরা তালাক : ২-৩]

এবং অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾

> যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার কাজ সহজে সমাধান করে দেন। [সুরা তালাক: ৪]

নফসকে বললাম, এবার কি বুঝতে পারছ– তোমার উল্টে যাওয়ার কারণে বিষয়টিও উল্টে গেছে? উদাসীনতার অচেতনতা কতটাই না শক্তিশালী হয়ে পড়েছে, তাই আজ শ্যামল বাগানে পানির উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেছে।

এ কথায় নফস বুঝতে পারে– হ্যাঁ, এটাই সত্য। সে বিষয়টা পুরোপুরি মেনে নেয়।

এরপরও আমি তাকে বললাম, দুআ কবুল না হওয়ার ক্ষেত্রে আমার নিকট চতুর্থ আরেকটি যুক্তি আছে। সেটা হলো– তুমি যা কামনা করছ, তার পরিণাম তুমি জানো না। এমনও হতে পারে– এর পরিণাম তোমার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন, কোনো অবুঝ শিশু এমন খাদ্য কামনা করে, যা আসলে তার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং যারা বুঝমান অভিভাবক, তারা বাচ্চার শত আবদার সত্ত্বেও সে খাবার তাকে প্রদান করে না। যেহেতু এটা পরিণামে ক্ষতিকর। ধ্বংসাত্মক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

> এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে করো, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মন্দ। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। [সুরা বাকারা : ২১৬]

এই উত্তরগুলোর মাধ্যমে নফসের নিকট যখন সঠিক বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে গেল, তখন সে পুরোপুরি তৃপ্ত হয়ে গেল।

এরপর আমি তাকে আরও বললাম, আমার নিকট আরও উত্তর আছে। সেটা হলো, তোমার এই কাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রদত্ত হলে তোমার প্রতিদান তো আরও

কম হবে। তোমার মর্যাদার আরও অবনতি হবে। কিন্তু এটার পরিবর্তে আল্লাহ যখন নিজে তোমাকে কিছু দেবেন, সেটা তিনি তার পছন্দমতোই দেবেন। সেটা কত মর্যাদাকর হবে, একবার ভেবে দেখেছ! আর তাছাড়া এটা যদি তোমার দ্বীনের জন্য হয়, তাতেও তো আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে প্রদান করাটাই তোমার জন্য কল্যাণকর।

আর এতক্ষণ আমি তোমাকে যা বোঝালাম, সেগুলো যদি তুমি বোঝো, তবে তোমার জন্যই কল্যাণকর।

তখন নফস আমাকে বলল, আমি এতক্ষণ তোমার বর্ণনার সুরভিত বাগানে বিচরণ করলাম। তুমি যদি বুঝে থাকো, তাহলে আমিও বুঝলাম।

আলেমের জন্য সম্পদ উপার্জন

আমরা একবার সম্পদশালীদের একটি দাওয়াতে উপস্থিত হয়েছিলাম। আলেমদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া হলো। আবার ফিরে এলাম।

এই ঘটনার মাধ্যমে একটা জিনিস আমি বুঝলাম, আলেমগণ আজ সম্পদশালীদের নিকট মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ের হয়ে আছেন। আলেমগণ তাদের সামনে বিনয়ে গদগদ। অপমানকর ভঙ্গি-ভাব নিয়ে আচরণ করেন। এটা কেন করেন? কারণ, তাদের মন পড়ে আছে এই সম্পদশালীদের সম্পদের দিকে। কিন্তু সম্পদশালীগণ তাদেরকে তেমন পাত্তাই দেন না। তাদের দিকে তেমন আগ্রহ ও যত্ন নিয়ে তাকানও না। কারণ, তারা জানে, এই আলেমদের তাদের নিকট প্রয়োজন আছে। তাদের সম্পদের দিকে এরা মুখাপেক্ষী।

আমি ভেবে দেখলাম, এই অবস্থাটি আলেম ও ধনবান– উভয় শ্রেণির জন্যই ক্ষতিকর। প্রথমত সম্পদশালী দুনিয়াদারদের জন্য ক্ষতিকর এই জন্য যে, তাদের উচিত ছিল– ইলম ও আলেমদের মর্যাদা প্রদান করা। কিন্তু ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তারা মর্যাদা দেয়নি। এদিকে নিজেরাও ইলমও অর্জন করেনি। তারা ইলম অর্জনের চেয়ে দুনিয়ার সম্পদ অর্জনকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এখন তারা সম্পদ ছাড়া আর কিছুকেই

সম্মান প্রদানের যোগ্য মনে করছে না। এই মূর্খতাকে ব্যাখ্যা করার কোনো ভাষা নেই। এটা তাদের নিজেদের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।

কিন্তু কথা হলো, তারা যেহেতু বাস্তবিকভাবে সম্পদকেই প্রাধান্য দেয় বা দিয়েছে, সুতরাং তারা যা জানে না, যার মর্যাদা তারা বোঝে না, তাদের থেকে তার সম্মান অন্বেষণ করে কোনো লাভ নেই। এটা উচিতও নয়। কিন্তু আলেমরা করলটা কী? নিজেদের আচরণের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের ইলমকে অপমানের স্থানে নিয়ে গেল।

আমি যখন আলেমদের এই দোষের বিষয়টি লক্ষ করি, তখন তাদেরকে তিরস্কার করা ছাড়া কোনো ভাষা পাই না। আমি তাদের বলি, আপনাদের উচিত– যে অন্তরকে আপনারা ইলমের সম্পদে সম্মানিত করেছেন, তাকে অপমানের হাত হতে রক্ষা করা। আপনারা যদি সম্পদশালীদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতেন, তাহলে ইলমহীনতার অপদস্থতা তাদের জন্যই প্রকাশিত হয়ে পড়ত। ইলমহীনতার লজ্জায় তারাই ম্রিয়মাণ থাকত। কিন্তু আপনারা তাদের নিকট ধরনা দেওয়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে এবং নিজেদের ইলমকে হেয় করে তুলেছেন। এটা জায়েয নয়। আর যদি আপনাদের সামান্য প্রয়োজন থাকে, জীবনধারণের জন্য স্বল্প রিজিকেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলেই বা কেন আপনারা এই সামান্য তুচ্ছ বস্তু অর্জনের জন্য নিজেদের অসম্মানিত করা থেকে বাঁচিয়ে রাখলেন না?

এরপর একটা জিনিস আমার খেয়ালে এলো, আজ আসলে অন্তরসমূহের স্বল্প রিজিকের ওপর ধৈর্যধারণ করা কমে এসেছে। অতিরিক্তের লোভ থেকে বিরত থাকা মানুষের সংখ্যাও কমে এসেছে। যদি কখনো কখনো এটি স্বল্প সময়ের জন্য সম্ভব হয়ও, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য আর কারও পক্ষে ধৈর্যধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এ কারণে আমার মতে, একজন আলেমের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি জীবিকার জন্য পরিশ্রম করবেন। এটি করতে গিয়ে যদি তার ইলমচর্চার সময় থেকে কিছুটা সময় নষ্টও হয়ে পড়ে, তবুও এটা তার করা উচিত। কারণ, এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে এবং তার ইলমকে হীন করার অবস্থা থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন।

হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. যাইতুনের ব্যবসা করতেন। মৃত্যুর সময় উত্তরাধিকারীদের জন্য অনেক সম্পদ রেখে গেছেন।

হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। এবং সম্পদকে সম্বোধন করে বলেছেন, لولاك لتمندلوا بي –তুমি যদি না থাকতে, তাহলে লোকেরা আমাকে রুমালের মতো ব্যবহার করে ছাড়ত!

আমার এ কিতাবেও অন্য জায়গায় সম্পদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সাহাবি এবং পরবর্তী আলেমগণের অনেকেই সম্পদ অর্জন করেছেন। এটাই ছিল তাদের সম্পদ অর্জনের লক্ষ্য।

এ কারণে আমি সব সময় 'তালিবুল ইলম' বা 'আলেমদেরকে' সম্পদ অর্জনের ওপর উদ্বুদ্ধ করে থাকি– যেমন আগেও বলেছি। কারণ, এখন অন্তর আর 'জীবনধারণের সামান্য প্রয়োজন পরিমাণ'-এর ওপর অটল থাকতে পারছে না। দীর্ঘ বা স্থায়ী 'জুহদ' এর ওপরও ধৈর্যধারণ করতে পারছে না।

অনেক বড় বড় শাইখ পর্যায়ের ব্যক্তিত্বকে দেখেছি, আখেরাতের অন্বেষণে তাদের কত মজবুত দৃঢ়তা ও কর্মতৎপরতা ছিল। এরপর হাতের সম্পদ যখন বের হয়ে গেছে, আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন তারাই অন্যদের থেকে নিকৃষ্টতম অপমানকর ভঙ্গিতে জীবিকা উপার্জনের জন্য অগ্রসর হয়েছে।

সুতরাং সকলের জন্যই উচিত হলো, যথাযথভাবে সম্পদ জমা করা। মানুষদের কাছে হাত পাতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। যাতে অন্তর থেকে অন্যের সম্পদের আশা বিদূরীত হয়ে যায় এবং ইলমি প্রচার যেন সব ধরনের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকে। দুনিয়াত্যাগী কিংবা মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বদের ঘটনাবলি যারা জানেন, তারা বোঝেন, এই পদ্ধতিটাই তারা গ্রহণ করেছিলেন—অল্পে তুষ্টি এবং নিজের সম্পদের মাধ্যমে অন্যের অনুগ্রহ থেকে বেঁচে থাকা।

কিন্তু জীবিকা উপার্জনের কষ্টের পথ বাদ দিয়ে অলসতা ও শৌখিনতার পথ তারাই অবলম্বন করেছে, যারা নিজেদের দ্বীন ও মান-সম্মান বিকিয়ে দিয়েছে। বিলাসিতায় জীবন অতিবাহিত করতে চেয়েছে। কিন্তু ভুলে গেছে যে, এটা আসলে কষ্টকর জীবন। যেমন, কিছু মূর্খ সুফি করেছে। তারা তাদের গচ্ছিত সকল সম্পদ খরচ করে নিঃস্ব হয়ে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের দাবি করছে।

কিন্তু তারা কি জানে না, সম্পদ উপার্জন কখনো তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়? তারা আসলে জীবিকা অর্জনের কষ্ট থেকে বেঁচে অলস ও বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায় আর মানুষের কাছে হাত পেতে খেতে চায়।

এই পদ্ধতিটা গ্রহণ করার দুটো কারণ।

১. নিজের আত্মসম্মানবোধে কমতি থাকা। ২. ইলমের কমতি থাকা।

অল্পেতুষ্টি

এটা ঠিক– ধনীদের অধিকাংশকেই আমি আলেমদের আর্থিক খেদমত করতে দেখি। এটাও ঠিক– তারা তাদের জাকাতের সামান্য যে পরিমাণ আলেমদের প্রদান করে, তারচেয়ে বেশি পরিমাণ তাদেরকে অসম্মানও করে। ধনীদের কারও যদি মৃত্যু হয়, তখন গণনা করা হয়– অমুক আসেনি.. তমুক আসেনি... আসল না কেন? আবার কেউ যদি অসুস্থ হয়, তখনও হিসাব নেওয়া হয়, সে তো বারবার আসছে না। দুআ করছে না। এমনভাবে প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র অনুগ্রহেরও যেন তারা সমপরিমাণ বদলা নেবার জন্য মুখিয়ে থাকে। এর অন্যথা হলেই অপমান ও অপদস্থ করে।

এদিকে আলেমগণও তাদের প্রয়োজনের কারণে সম্পদশালীদের এইসব অপমান ও উপেক্ষা সয়ে নিচ্ছেন। এর প্রতিই সন্তুষ্ট থাকছেন। আমি মনে করি, আলেম হিসেবে তাদের আবশ্যক কর্তব্যগুলো সম্পর্কে তাদের সীমাহীন অজ্ঞতার কারণেই তারা এগুলো করছেন।

এর থেকে পরিত্রাণের দুটো পদ্ধতি রয়েছে।

১. অল্পে তুষ্টি। জীবনযাপনে যতটুকু রিজিক না হলেই নয়, তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকা। যেমন বলা হয়,

من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد.

যে ব্যক্তি সিরকা ও সবজির প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাকে কোনো মানুষ গোলাম বানাতে পারে না।

২. ইলমের খেদমতে সময় প্রদানের সাথে সাথে দুনিয়ার জীবিকা উপার্জনের জন্যও কিছু সময় ব্যয় করা উচিত। এটা তার ইলমের সম্মান রক্ষা

করবে। জীবনের সকল সময় ইলমের মাঝে ব্যয় করা আর মানুষের কাছে হাত পাতার অসম্মানের চেয়ে এটি অনেকগুণে উত্তম।

আমার চিন্তার সাথে কেউ যদি একমত হয় এবং তার আত্মসম্মানবোধ থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই নিজের মূল্য বুঝবে এবং নিজের কাছে থাকা সম্পদকে সংরক্ষণ করবে। কিংবা অন্তত এমন পরিমাণ সম্পদ অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে– যা তার জন্য যথেষ্ট হয়।

কিন্তু এসকল বিষয়ে যার কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই, সে শুধু ইলমের বাহ্যিকতা অর্জন করেছে– কোনোদিন তার অর্থ ও মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়নি।

উদ্দেশ্য বোঝা আকলেরই কাজ

কোনো আদেশের মূল কেন্দ্রই হলো আকল বা বুদ্ধিমত্তা। যার যে ধরনের বুদ্ধি, তার সে ধরনের বুঝ। একারণে কারও যদি পরিপূর্ণ বুদ্ধি থাকে, তাহলে সে সর্বোচ্চ যুক্তি ও প্রমাণ অনুযায়ী আমল করবে। আর আকলের প্রমাণই হলো সম্বোধন বোঝা এবং আদেশের মৌলিক উদ্দেশ্য বুঝতে পারা।

যে ব্যক্তি মূল লক্ষ্য বুঝেছে এবং তার যুক্তি অনুযায়ী আমল করেছে, সে যেন তার গৃহ নির্মাণ করেছে এক শক্তিশালী ভিত্তির ওপর। কিন্তু আমি বহু মানুষকে দেখেছি, তারা প্রমাণিত যুক্তি বা আদর্শ অনুযায়ী আমল করে না। বরং এলোমেলোভাবে আমল করে। কখনো তাদের আদর্শ হয় অভ্যাস। কখনো প্রবৃত্তি। কখনো পরিবেশ। এটি খুবই খারাপ একটি পদ্ধতি।

আরও কিছু মানুষকে দেখি, যারা সুদৃঢ় প্রমাণসমূহের অনুসরণ করে না। যেমন, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা। কারণ, তারা তাদের আমলের ক্ষেত্রে অন্ধভাবে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করে। শরিয়তে সেটা হালাল কি হারাম– সেদিকে তারা লক্ষই করে না। মানুষকে তারা 'ইলাহ বা প্রভু' সাব্যস্ত করে। অথচ তার সত্তার ক্ষেত্রে কী কী জিনিস প্রয়োগ শুদ্ধ ও অশুদ্ধ– সেদিকে কোনো লক্ষ করে না। এ কারণে তারা প্রভুর দিকে 'সন্তান' সম্পর্কিত করে। এসকল লোক স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তার সত্তার সাথে কোনো গুণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক কোনো বিষয়ের দিকে লক্ষ করে না এবং নবুয়তের বিশুদ্ধতার ওপর যে সকল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারেও তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। এ

কারণে তাদের আমলগুলো বিনষ্ট হয়। এর উদাহরণ হলো বালুর ওপর নির্মিত এমন গৃহ, যার কোনো ভিত্তিমূল নেই।

এ-জাতীয় আরও কিছু লোক আছে, যারা ইবাদত করে, কৃচ্ছসাধন করে এবং অনর্থক শুধু অশুদ্ধ হাদিস জমা করে ইলমের মধ্যে শরীর ক্ষয় করে। অথচ যারা হাদিসগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবগত– তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করে না। আরও কিছু মানুষ আছে, যারা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে, কিন্তু দলিলটি কোন বিষয়ের ওপর ইঙ্গিত করছে, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝে না।

এ ধরনের অবুঝ আরও কিছু লোক আছে, যারা দুনিয়ার নিন্দা-মন্দের কথা শোনে। এরপর নিজেরাও দুনিয়া পরিত্যাগ করতে থাকে। কিন্তু দুনিয়াত্যাগের আসল উদ্দেশ্য বোঝে না। তারা ধারণা করে– দুনিয়ার যেকোনো উপভোগই নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য। এবং মানুষের জন্য উচিত হলো সব সময় নফসের বিরোধিতা করা।

এ ধারণায় চালিত হয়ে তারা নিজেদের নফসের ওপর এমন কঠিন কঠিন বিষয় চাপিয়ে নেয়, যেগুলো বহনের শক্তি নফসের নেই। তাকে বিভিন্ন ধরনের কষ্টে ফেলে রাখে। তার সকল অধিকার ও চাহিদা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমার নফসের তোমার ওপর অধিকার রয়েছে'—এ কথা তারা যেন ভুলে থাকে। এভাবে তাদের ক্রম দুর্বলতার কারণে ক্রমেই তারা ফরজ বা আবশ্যক আমলগুলোও করতে পারে না। শরীর ভেঙে পড়ে। শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে।

এগুলো হয়ে থাকে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝার অক্ষমতার কারণে।

যেমন দাউদ তাঈর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি একটি পাত্রে করে গরম মাটির নিচে পানি রেখে দিতেন। এরপর পানি প্রচণ্ড গরম হয়ে গেলে, সেই গরম পানি পান করতেন। এবং তিনি সুফিয়ান সাওরি রহ.-কে বলতেন, 'আপনি মজাদার সুস্বাদু খাবার খান, ঠান্ডা শীতল তৃপ্তিদায়ক পানি পান করেন, তাহলে কীভাবে বলা যায়, আপনি মৃত্যুকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ তাআলার দিকে রওনাকে ভালোবাসেন?'

এ ধরনের কাজ ও কথা আসলে আল্লাহ তাআলার আদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে সৃষ্টি হয়। নতুবা প্রচণ্ড গরম পানি পান করা তো শরীরের মধ্যে অনেক রোগের সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক থাকে না। তার থেকে কোনো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যায় না। অথচ কিছুতেই আমাদের এভাবে নফসকে কষ্ট দেওয়ার আদেশ করা হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলা সে সকল জিনিস বর্জনের আদেশ দিয়েছেন, যেগুলো সম্পর্কে তিনি নিষেধ করেছেন।

সুতরাং তোমার ক্ষেত্রে কর্তব্য হবে, তুমি আমাদের বর্ণিত বিজ্ঞ আলেমদের পদ্ধতি গ্রহণ করবে। যেমন দেখো, হজরত হাসান বসরি, সুফিয়ান সাওরি, ইমাম মালেক, আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল ও শাফেয়ি রহিমাহুমুল্লাহ—তারাই হলেন ইসলামের মৌলিক বিধানাবলির অনুসরণে আমাদের নিকটবর্তী আদর্শ।

কেউ যদি শক্তিশালী জাহেদও হয় আর তার ইলম হয় অল্প, তবে তুমি কিছুতেই তোমার দ্বীন তার সাথে লেপ্টে নিয়ো না। তার অনুসরণ করো না। তার বিষয়টি এভাবে নাও যে, তিনি নিজে তো এটা করতে সক্ষম- কিন্তু তাকে অনুসরণ করে সকলে তেমনটাই করতে হবে- তা কিছুতেই নয়। সকলের সক্ষমতা এক নয়।

তাছাড়া বিষয়টি শুধু আমাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। কারণ, নফস তো আমাদের কাছে একটি আমানত। এটির রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক পরিচালনার দায়িত্ব আমাদের ওপর।

আশা করি, আমার ব্যাখ্যা তুমি অপছন্দ করবে না। আর যদি করেই থাকো, তবে যাদেরকে এবং যাদের আচরণ অপছন্দ করি, তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে। এই বিভ্রান্তিগুলো শরিয়তের মূল লক্ষ্যকে জ্বালিয়ে দেয়। ধ্বংস করে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ।

আদর্শ ও যুক্তির অনুসরণ

বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হলো, তিনি নিজের জন্য একটি যুক্তি ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরবেন এবং এ জন্য তার ওপর যত কষ্ট ও দুঃখই আসুক, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

যেমন ধরো, বহু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার হিকমত এবং তার কর্তৃত্ব ও পরিচালনার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত। এরপর কোনো মানুষ যখন দেখে, একজন আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি রিজিক হতে বঞ্চিত– নিঃস্ব ও দরিদ্র। অন্যদিকে একজন অশিক্ষিত মূর্খ ব্যক্তি রিজিক ও ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। তখন আল্লাহর হিকমতকে সাব্যস্তকারী পূর্বোক্ত দলিল এটা মেনে নেওয়াকেই আবশ্যক করে। সে সেভাবেই মানবে এবং ভেবে নেবে, এগুলোর হিকমত বা রহস্য বোঝার অক্ষমতা তার নিজের। স্রষ্টার প্রতি তার কোনো অভিযোগ নেই।

কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি তাদের মূর্খতার কারণে এমনটি করে না। এমনটি ভাবে না। এমনটি মেনেও নিতে চায় না। তুমি কি তাদেরকে দেখেছ, এসকল ব্যাপারে তারা কী ধরনের মন্তব্য করে? এটা কি আল্লাহর ভুল পরিচালনা? তারা কি তাদের নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে বিষয়টা বিচার করতে চাচ্ছে না? কিংবা নিজেদের বুদ্ধি দিয়ে এটাকে অন্যায় ধার্য করছে না?

এবার তাহলে ভাবো একবার! একটি মানুষ, স্রষ্টার কোটি কোটি সৃষ্টির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ, সেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অবয়বটিই বিচার করতে চাচ্ছে সমস্ত জগতের স্রষ্টা, সকল জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর হিকমত ও তার পরিচালনার বিষয়! এমনকি ভুলও ধরতে চায়!

এমনই এক অভিশপ্ত ব্যক্তি হলো ইবনে রাওয়ান্দি। তার একটি ঘটনা আমার কানে এসেছে। সে একদিন দজলার ব্রিজের ওপর বসে তার হাতে থাকা শুকনো রুটি খাচ্ছিল। এ সময় ব্রিজ দিয়ে অনেক ঘোড়া ও সম্পদ পার করে নিয়ে যাওয়া হলো। সে এগুলো দেখে জানতে চাইল, এগুলো কার?

উত্তরে বলা হলো, অমুক খাদেমের।

এরপর আরও অনেক ঘোড়া ও সম্পদ নিয়ে যাওয়া হলো। এবারও সে জানতে চাইল– এগুলো কার?

উত্তরে বলা হলো, একই ব্যক্তি– অমুক খাদেমের।

এরপর যখন সেই খাদেমটি ব্রিজ পার হচ্ছিল, তখন সে দেখল, ব্রিজের উপর একটি বিরক্ত বৃদ্ধলোক বসে আছে এবং সে তার হাতে থাকা রুটিটা তার পাশে নিক্ষেপ করে নিজের দিকে ইশারা করে ক্ষুব্ধভাবে বলে উঠল, আর এটা হলো অমুকের জন্য! স্রষ্টার এ কী ধরনের বণ্টন!

এই অভিযোগকারী যদি কিছুটা চিন্তা করত, তবে তার কাছে অনেকগুলো বিষয় প্রকাশিত হতো। এর একটি বিষয় হলো, যাকে চেনার দাবি সে করছে, তার সম্পর্কে তার অজ্ঞতা এবং তার প্রতি যথার্থ সম্মানবোধ না থাকা। এ কারণে তার সেই অসচ্ছল জীবনযাপন তার কাছে কঠিন ও অন্যায় মনে হয়ে উঠছে। এভাবেই দীর্ঘদিনের ইবাদতকারী ইবলিস মাটি দ্বারা নতুন সৃষ্ট আদমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের বিষয়টি ভুল মনে করছিল!

মোটকথা, মানুষের জন্য উচিত একটি সুচিন্তিত ও প্রমাণিত যুক্তি ও আদর্শ গ্রহণ করা। এরপর তার চারদিক থেকে যত কষ্ট আর সন্দেহই আসুক– সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। এবং জেনে রাখা, ইলমই হলো মানুষের অর্জিত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

মূর্খদের একটি দল ধারণা করে, আলেমদের দুনিয়ার আনন্দ-খুশির অংশ বুঝি তেমন একটা নেই। তারা ইলমকেও ততটা মূল্য দেয় না। তারা বলে– এর মধ্যে কোনো কল্যাণ ও জীবিকা নেই।

তারা এটা বলে, ইলমের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার কারণে। কিন্তু সুদৃঢ় যুক্তির অনুসারী ব্যক্তি অন্যকোনো দিকে তাকাবে না। সে জানে, মানুষের কামনা ও বাসনার অপূর্ণতাই হলো দুনিয়ার পরীক্ষা। সত্যপথে থাকার তাওফিক হলে, আর কোনোদিকে তাকানোর দরকার নেই।

আমরা অকাট্যভাবেই আমাদের নবীর নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে জানি ও মানি। এরপরও তার দুনিয়া থেকে বিমুখ থাকা, দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনযাপন করা, সম্পদ গচ্ছিত না করা এবং উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছুই রেখে না যাওয়া– এগুলোই প্রমাণ করে তার সন্ধান ও লক্ষ্য ছিল অন্যকিছু– সেটা আখেরাত।

এরপরও কিছু মূর্খলোক ধারণা করে, আলেমগণ বুঝি সম্পদ অর্জন না করে ইলম অর্জনের মাধ্যমে ভুল করছেন। এসকল মূর্খ মানুষ ইলমকে হেয় জ্ঞান

করে। এটাকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে। এটা তাদের একটা বড় ভুল। কিন্তু অজ্ঞতার ওষুধ ইলম ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে!

কিন্তু বুদ্ধিমানের উচিত, আল্লাহকে ভয় করে চলা। বুদ্ধিমত্তার দাবি অনুযায়ী চলা। অর্থাৎ আল্লাহর অনুগত হওয়া। ইলম অনুযায়ী আমল করা। এবং জেনে রাখা, কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তির মাধ্যমেই আল্লাহ কষ্টের ওপর ধৈর্যের পরীক্ষা নেন।

সুতরাং তার জন্য উচিত হবে, একনিষ্ঠভাবে যুক্তি ও আদর্শকে অনুসরণ করা– এতে যত কষ্ট আসে আসুক। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা।

ধৈর্যের প্রতিফল

আমি একদিন সুরা ইউসুফ তেলাওয়াত করছিলাম। পড়তে পড়তে হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ধৈর্যের প্রশংসা নিয়ে আমি আশ্চর্য বোধ করতে থাকি। তিনি যা থেকে বিরত থেকেছেন, সেটা এখন মানুষের বর্ণনা এবং তার মর্যাদার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

আমি বিষয়টার রহস্য নিয়ে চিন্তা করলাম—তিনি কেন এত মর্যাদাশীল ও মানুষের জন্য এমন উত্তম চরিত্রের উদাহরণ হয়ে উঠলেন? আমার কাছে বিষয়টা প্রতিভাত হলো—এগুলোর কারণ হলো তাঁর অবৈধ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা।

আমি মনে মনে বললাম, কী আশ্চর্য কাণ্ড! তিনি যদি তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে অবৈধ আবেগের ডাকে সাড়া দিতেন, তাহলে আজ তার কোথায় স্থান হতো? কিন্তু তিনি যখন প্রবৃত্তির বিরোধিতা করলেন, তখন এটিই হয়ে উঠল তার মহান এক গুণ। আজ তার ধৈর্যের ঘটনা দিয়ে মানুষের জন্য উদাহরণ পেশ করা হয়। সকল মানুষের উপর তাঁর এই ধৈর্য ও কষ্টস্বীকার একটি গর্বের বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়।

এই সকল কিছু হতে পেরেছে মাত্র কয়েক মুহূর্তের ধৈর্যের কারণে। কত স্বল্প সময়ের ব্যাপার ছিল এটা! মুহূর্তের এই ধৈর্যধারণই হয়ে গেল তার সারাজীবনের বিশাল সম্মান ও মর্যাদার বিষয়। আর তিনি হয়ে উঠলেন অনাগত সকল মানুষের জন্য চারিত্রিক পবিত্রতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত!

সুতরাং হে সেই ব্যক্তি, যার কিছুটা সম্মান মর্যাদা ও গর্ব করার বিষয় আছে, নিজের এ ধরনের আবেগঘন মুহূর্তে ধৈর্যের পরিচয় দিয়ো। নিরাপদ নিরালায় নিজের প্রিয়তম কিংবা প্রিয়তমা– অথবা কোনো প্রিয়বস্তুর ক্ষেত্রে ধৈর্যহারা হয়ে যেয়ো না।

মুহূর্তের ধৈর্য কিংবা অধৈর্য তোমার পরবর্তী জীবনকে আমূল পাল্টে দিতে পারে!

সুতরাং যারা বুদ্ধিমান, তারা দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। বিষয় দুটো হলো, সাময়িক মিষ্টতা ও স্থায়ী তিক্ততা এবং সাময়িক তিক্ততা ও স্থায়ী মিষ্টতা।

দুনিয়ার মিষ্টতা কিংবা তিক্ততা– দুটোই সাময়িক। আর আখেরাতের মিষ্টতা কিংবা তিক্ততা– দুটোই স্থায়ী। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনোই সাময়িক মিষ্টতার বিনিময়ে স্থায়ী তিক্ততা গ্রহণ করতে চাইবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি তার হিসাবের খাতা গোনাহ থেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে নিজেকে ঝুঁকিয়ে না দেবে– সে তার জীবনের প্রতিটি ধৈর্যের ক্ষেত্রে বহুগুণ লাভ ও অর্জন দেখতে পাবে। আর প্রতিটি প্রবৃত্তির অনুসরণে দেখতে পাবে অনুশোচনার বিষয়।

এ বিষয়ে যতটুকু আলোচনা করা হলো, প্রবৃত্তির অবৈধ অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বুঝমানদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

সৎব্যক্তির সান্নিধ্য

আমি অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় একটি জিনিস বুঝেছি– ফিকহের অব্যাহত চর্চা এবং বিচার-বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন হাদিস শ্রবণ, এগুলো অন্তরের সংশোধনে যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন অন্তরকে রেকাকের [যে সকল আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে অন্তর ভীত হয়, বিগলিত হয়, নরম হয়, আখেরাতের প্রতি ধাবিত হয়– এমন আয়াত ও হাদিসসমূহ] সাথে সংমিশ্রণ করা এবং সালাফে সালেহিনের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করা। কারণ, তারা কোরআন ও হাদিসের মৌলিক উদ্দেশ্য ও খাজানা প্রাপ্ত হয়েছেন এবং এগুলোতে আদেশপ্রাপ্ত বিষয়ে আমলের বাহ্যিকতা থেকে বের হয়ে তার

প্রকৃত অর্থের মিষ্টতা ও উদ্দেশ্য চেখে দেখেছেন; অথচ কখনো শরিয়তের বাইরে যাননি।

আমি তোমাকে যে কথাগুলো বলছি, এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমেই বলছি। আমি অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও হাদিস শিক্ষার্থীদের দেখেছি– তারা সর্বদা হাদিস সংগ্রহ ও বিন্যাস-বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর অধিকাংশ ফিকাহবিদ বিভিন্ন মাসআলা এবং সেগুলো নিয়ে হরেক রকম তর্ক-বিতর্ক নিয়ে মশগুল থাকে।

এই সকল বিষয়ের সাথে ব্যস্ত থেকে হৃদয়ের কোমলতা ও বিগলন আসবে কীভাবে?

কিন্তু আমাদের সালাফে সালেহিন কোরআন-হাদিসের নস দ্বারা সার্বিকভাবে কোনো দিকে চিন্তা না করে শুধু তার অর্থ, উদ্দেশ্য ও হিদায়েতের দিকে লক্ষ করতেন। এগুলো একত্র করা, বিন্যাস করা, বিশ্লেষণ করা, তর্ক-বিতর্ক করা, নিজের মতের পক্ষে দলিল-প্রমাণ অন্বেষণ করা– এসবের দিকে তারা মন দিতেন না এবং এগুলো এভাবে লোকদের নিকট পৌছে দেওয়ার নিয়তও করতেন না। বরং এগুলো তারা তাদের জীবনে আমলে পরিণত করেছেন। তারা শুধু হিদায়েতকে খুঁজেছেন।

প্রথমে কোরআন ও হাদিসের এই বিষয়টা অনুধাবন করো। এরপর তার সাথে চর্চা করো ফিকাহ। এবং চর্চা করো সালাফে সালেহিনের জীবনী, দুনিয়াবিমুখ আবেদ ও জাহেদদের জীবন– যাতে এগুলো তোমার অন্তরের নম্রতা সৃষ্টির মাধ্যম হয়।

এ কারণে আমি আমাদের প্রসিদ্ধ শাইখদের জীবনী– তাদের ঘটনাবলি, আদব, আখলাক ও জীবনাচারগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছি। যেমন, হজরত হাসান বসরি, হজরত সুফিয়ান সাওরি, হজরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম, হজরত বিশর হাফি, হজরত আহমদ ইবনে হাম্বল, হজরত মারুফ কারখি রহিমাহুমুল্লাহসহ আরও অনেক আলেম ও জাহেদদের।

স্মরণ রাখা দরকার, ইলমের কমতির সাথে কখনো আমল বিশুদ্ধ হতে পারে না। তখন অবস্থা হবে এমন যে, একজন আগে টানবে– অন্যজন টানবে পেছনে– এর মাঝখানে বেচারার আত্মার অবস্থা হবে কাহিল। জীবনভর এই অগ্র ও পশ্চাতে টানাটানি চলতেই থাকবে, কিছুটা সামনে আবার কিছুটা পেছনে– এভাবে কখনো কাঙ্ক্ষিত মানজিলে পৌছা সম্ভব হবে না। তাই প্রথমে ইলমে পরিপক্কতা অর্জন করা একান্ত জরুরি।

তাকওয়াই সবচেয়ে উত্তম পথ

আমি একবার এমন একটি বিষয়ে শিথিলতা গ্রহণ করলাম– যা অন্য মাজহাব অনুযায়ী জায়েয ছিল। এরপর আমি আমার অন্তরের মধ্যে এক ধরনের অন্ধকার অনুভব করতে লাগলাম। আমি যেন স্রষ্টার দরবার হতে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা বোধ করতে লাগলাম। অন্ধকারের ওপর অন্ধকার যেন আমার অন্তর ছেয়ে ফেলতে লাগল।

আমার অন্তর বলে বসল, এটা কী শুরু হলো? আমি ফিকাহবিদদের মতের বাইরে তো কিছু করিনি– তাহলে এমন হচ্ছে কেন?

আমি তাকে বললাম, হে দুষ্ট নফস, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দু-ভাবে প্রদান করা যায়।

এক. তুমি নিজের জন্য এমন ব্যাখ্যা বেছে নিয়েছ, যা তুমি নিজেই বিশ্বাস করো না। তোমার নিকট কেউ যদি ফতোয়া জিজ্ঞাসা করত, তাহলে তুমি যা করেছ, তার বিপরীত ফতোয়াই তুমি দিতে।

নফস বলল, আমি যদি এটার জায়েযের বিষয় বিশ্বাস না করতাম, তবে তো আমি এটা করতামই না।

আমি বললাম, তাহলে অবশ্যই তোমার এই বিশ্বাসের ফতোয়া অন্যকে সন্তুষ্ট করত না। এটা তোমার নিজস্ব মত।

দুই. তুমি যে এই কাজটি করার পর তোমার অন্তরের মধ্যে অন্ধকার অনুভব করছ, এ জন্য তোমার খুশি হওয়া উচিত। কারণ, তোমার অন্তরের মধ্যে যদি আলো না থাকত, তাহলে তুমি এই অন্ধকার অনুভব করতে পারতে না।

নফস বলল, কিন্তু নতুন এই অন্ধকারের মাধ্যমে অন্তরের মধ্যে আমি তো স্রষ্টার ভালোবাসা ও নৈকট্য থেকে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করছি।

আমি বললাম, তাহলে এবার এ ধরনের কাজ আর না করার ওপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও এবং বুঝে নাও, তুমি যা বর্জন করেছ, সেটাই ছিল সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এবং এটা বর্জন করাকে তাকওয়া হিসেবে গণ্য করো। এবার নফস আমার কথা মেনে নিল।

কারও সাথে শত্রুতায় না যাওয়া

জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি যেটা বুঝেছি তা হলো, পারতপক্ষে কখনো কারও সাথে শত্রুতা সৃষ্টি করা উচিত নয়। কারণ, ব্যক্তি ও তার সামাজিক অবস্থান যেমনই হোক, হতে পারে তার নিকট কোনো ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজন পড়তে পারে। মানুষের কখনো কখনো এমনও হয়– যার ব্যাপারে কোনো সময় ধারণাই করা হয়নি– জীবনে তার সাহায্য কোনোদিন প্রয়োজন হবে, অথচ তার সাহায্যই একসময় প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। হয়তো কখনো তার দিকে কোনোদিন তাকিয়েও দেখা হয়নি কিংবা ভ্রুক্ষেপও করা হয়নি– এমন কত সামান্য ক্ষুদ্র মানুষের কাছেও কখনো প্রয়োজন পড়ে যায় মানুষের।

এমনকি কখনো তার থেকে কোনো উপকার প্রাপ্তির প্রয়োজন না হলেও, তার ক্ষতি থেকে বাঁচার প্রয়োজন হয়। আমার এই দীর্ঘ জীবনে এমন অনেক মানুষের উপকারের প্রয়োজন পড়েছে, অথচ কোনোদিন মনের কোণে সামান্যতম ধারণাও জাগেনি যে, তার উপকার আমার প্রয়োজন হতে পারে কিংবা তার সহানুভূতি আমার দরকার হতে পারে।

জেনে রেখো, অনর্থক শত্রুতা সৃষ্টি কখনো এমন দিক থেকে ক্ষতি ডেকে আনে, যা কল্পনাও করা যায় না। কারণ, শত্রুতার প্রকাশ তরবারির একটি আঘাতের মতো, যা করে ফেললে বিপরীত আঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কখনো কখনো এই আঘাত আসে খুবই গোপন জায়গা থেকে; নিজের অলক্ষ্যে।

সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুন্দরভাবে বসবাস করার ইচ্ছা রাখে, তার জন্য কখনো কারও সাথে শত্রুতার প্রকাশ না ঘটানোর চেষ্টা করা উচিত। কারণ, এই পৃথিবীতে একজন আরেকজনের নিকট প্রয়োজন পড়াটা খুবই স্বাভাবিক এবং সেই সাথে একজন আরেকজনের ক্ষতি করার বিষয়টিও সাধারণ।

শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ না করা– এটি এমন এক বিষয়– মানুষের জীবনে যত দিন যাবে, যত অভিজ্ঞতা বাড়বে, এর উপকারিতা সে ততই বুঝতে শিখবে।

ময়লাযুক্ত আনন্দ

আমি নিজের থেকেই বুঝতে পারি—নফস কখনো কখনো দুনিয়াদারদের অর্জিত বিত্ত-বৈভব ও বাহ্যিক আনন্দ-উল্লাসের দিকে কাতর নয়নে চেয়ে থাকে এবং ভুলে যায়—এগুলো অর্জনের পদ্ধতির কথা এবং অর্জনের পেছনে যেই বিপদ বিভ্রাট কিংবা পঙ্কিলতা বিরাজমান—সেগুলোর কথা।

এটা এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়—তুমি যখন কোনো সরকারি কিংবা বেসরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিত্তশালীকে দেখো, তখন তুমি তাদের এই কর্তৃত্ব নেতৃত্ব ও ঐশ্বর্যের পেছনে নিদারুণ কদর্যতার দেখা পাবে। হ্যাঁ, কারও যদি ভালো নিয়ত থাকে, নিজের চেষ্টা শ্রম ও সততার মাধ্যমেই এগুলো অর্জন করে, তবুও তার কিছু বাস্তব অসুবিধা ও বিভ্রাটের মধ্যে পড়তে হয়। সে তখন তার প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে ভীত সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত থাকে। ভয়ে ভয়ে থাকে– কোনো শত্রু তার ক্ষতি করতে পারে। তার চেয়ে উপরের মানুষ তাকে অধঃপতিত করতে পারে। সমশ্রেণিরা ষড়যন্ত্র করতে পারে। এবং সে যেই সুলতান মন্ত্রী বা শাসকের অধীনে আছে, জীবনের দীর্ঘ সময় তার সেবা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করতে হতে পারে। নিত্যদিন বিশাল সম্পদের হিসাব-নিকাশে সময় দিতে হবে। এবং এগুলো পরিচালনার মধ্যেও সময় দিতে হবে– যার মধ্যে কিছু কিছু অপ্রীতিকর বিষয় তো আছেই। যদি আরও লাভ হতে থাকে, তখন আবার এগুলো দিয়ে আরও সম্পদকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এ ব্যক্তির কোনো অবসর বা ক্ষান্তি নেই। এরপর এই বিশাল সম্পদের নষ্ট হওয়ার ভয়, ছিনতাই বা ডাকাতির ভয়; হিংসুক, লোভী ও শত্রুদের ভয় তো আছেই।

এছাড়া তুমি বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের দেখবে, যারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে গলদঘর্ম। ছুটে চলেছে শহর থেকে শহরে। দিনরাত খেটে চলেছে। তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য– অঢেল সম্পদ অর্জনে তখনই সক্ষম হয়, যখন তাদের বয়স যায় বেড়ে, আনন্দ-স্ফূর্তির যৌবন যায় ডুবে।

যেমন একটি ঘটনা আছে। বিত্তশালী এক নেতা। যৌবনে যার ছিল দারুণ অভাব অনটন। কিন্তু ভীষণ পরিশ্রম করে খেটেখুটে একসময় অনেক সম্পদের মালিক হয়। তুর্কিস্তান ও বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু গোলাম ক্রয় করে। রোম

থেকে ক্রয় করে অনেক সুন্দরী রূপসী সব দাসী। কিন্তু জীবনের সূর্য তো পড়ন্ত বেলায়। তিনি তার নিজের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে কবিতা বলেন–

ما كنت أرجوه إذ كنت ابن عشرينا ... ملكته بعد أن جاوزت سبعينا

يردن إحياء ميت لا حراك به ... وكيف يحيين ميتاً صار مدفونا

قالوا أنينك طول الليل يسهرنا ... فما الذي تشتكي قلت الثمانينا

আমি আজ আমার সত্তর অতিক্রম করে যে সম্পদের মালিক হয়েছি, আমার বিশ বছর বয়সে তার কল্পনাও করতে পারিনি।

এমনই লাস্যময়ী সুন্দরী রূপসী– তাদের স্পর্শে যেন জেগে ওঠে মৃত শরীর। কিন্তু যাকে করা হয়ে গেছে দাফন– তেমন মৃতকে তারা জাগাবে কেমন করে?

তারা বলে, দীর্ঘ রাত জেগে থাকব আমরা তোমার সঙ্গী হয়ে। তোমার অসুবিধা কোথায়? আমি বলি, অসুবিধা আমার বয়স– আশি।

অধিকাংশ বিত্তবানের ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটে। শ্রম সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষ যখন তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো অর্জনে সক্ষম হয়ে ওঠে, ততদিনে অক্ষম হয়ে পড়ে তার শরীর ও মন– ততদিনে শুভ্র কেশে মৃত্যুর বার্তা এসে দুয়ারে নাড়তে থাকে কড়া।

আর কেউ যদি কৈশোর বা যৌবনের শুরুতেই সম্পদের দেখা পায়, তবুও তার এই নতুন বয়সের অদক্ষতা সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না কিংবা মার্জিতভাবে উপভোগও করতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক ও পরিণত না হওয়ার আগে মানুষ তার সঠিক পথটি খুঁজেও পায় না। এরপর যখন বালেগ হয়ে পড়ে, বিয়ের জন্য উৎসুক ও তাড়িত হয়ে ওঠে। আর যখন বিয়ে হয়– এর কিছুদিন পরই সন্তান। এরপর আরও সন্তান। তখন আর ইচ্ছেমতো নিজের জীবন উপভোগ করতে পারে না। উপার্জনের চিন্তায় নিজেও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। এই করতে করতেই ত্রিশের কোটা অতিক্রম করে যায়। পৌঢ়ত্ব এসে দেখা দিতে থাকে। মনের স্ফূর্তি ভাবও কেটে যেতে থাকে। নিজেও আকর্ষণ হারাতে থাকে। কারণ, ইতিমধ্যে নারীরাও তার থেকে আকর্ষণ হারাতে চলেছে।

যেমন কবি ইবনুল মু'তায বলেন,

لقد أتعبت نفسي في مشيبي ... فكيف تحبني الغيد الكعاب

বার্ধক্যের জরা-খরায় আজ আমি এক ক্লান্তপ্রাণ– আমাকে তবে আর কীভাবে ভালোবাসবে লাস্যময়ী কোমল তন্বী রূপসী তরুণীগণ!

অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই তুমি এমনটি দেখতে পাবে। হৃদয়ের তপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কোনো সুন্দরীর স্পর্শের জন্য হয়তো কাতর– চোখে রঙিন স্বপ্ন, কিন্তু নিজের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে সে তার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে পারছে না। আবার যখন সে সম্পদ অর্জনের জন্য লেগে পড়ছে, শ্রম ও সাধনা করছে, ততদিনে তার সেই কাতরিত হৃদয়ের তপ্ত বাসনা নিভে গেছে। তারপর সম্পদ ও সুন্দরী– উভয়টিই যখন মিলল, বার্ধক্যের নিকৃষ্টতম শীতলতা ও অক্ষমতা এসে তখন ভর করল।

এছাড়া সম্পদশালী ব্যক্তি তার নিকট ও অধীনস্থ ব্যক্তিদের খরচের ব্যাপারেও ভয়ে ভয়ে থাকে। একটু কম খরচ করলেই কৃপণতার দায়ে কটাক্ষের তির এসে বিদ্ধ করে। অপচয় করলেও তারা মন্দ বলে। তার সন্তানেরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা নিয়ে ওত পেতে থাকে। চারদিক তার বৈরিতায় ছেয়ে যায়। অথচ একটি দীর্ঘ সময় সে ভীষণ কষ্টের মধ্যে থেকে এই সম্পদ অর্জন করেছে। তখন কোনো ভোগ-বিলাসের চিন্তা করেনি। আবার এখনো সক্ষম নয়– তবে তার জীবনে থাকলটা কি?

এছাড়া এটা যদি অবৈধ পথে হয়– তবে আখেরাতের শাস্তির বিষয় তো ধরাই রইল। কড়ায়-গণ্ডায় সকল হিসাব তাকেই আদায় করতে হবে।

এবার আমি নফসকে ডেকে বলি, তুমি তাদের এই বাহ্যিক ধন-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের দিকে তাকিয়ো না। তুমি শুধু দূর থেকে এগুলোকে সুখময় মনে করছ। কিন্তু তুমিও যদি এই স্থানে পৌঁছাও, তবে তুমি এটাকে অপছন্দই করবে।

তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই এগুলোর অর্জনের আড়ালে দুনিয়া ও আখেরাতের যেই ক্ষতি ও বিপদ লুকায়িত আছে, সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়। সুতরাং তুমি যথাসম্ভব অল্পেতুষ্ট থাকো। এর মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা।

এবার একটি ঘটনা বলি–

একবার এক জাহেদ ব্যক্তি এক জায়গায় বসে আছে। তার হাতে একটি শুকনো রুটি। তাকে একজন প্রশ্ন করল, এই সামান্য শুকনো রুটি– এটা খেতে আপনার চাহিদা হয়?

জাহেদ ব্যক্তি উত্তরে বলল, আমি রুটিকে রুটির জায়গায় রেখে দিই। ঠিক আমার যখন তার প্রতি চাহিদা হয়, তখনই শুধু আহার করি। চাহিদা না হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের আদর্শগ্রহণ

সবচেয়ে নিরাপদ ও শক্তিশালী পথ হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। কারণ, এটি এমন একটি পথ– যাতে কোনো ত্রুটি নেই। যাতে কোনো ভ্রান্তি নেই। যাতে কোনো বক্রতা নেই।

অথচ অনেক মানুষ দুনিয়াবিমুখতার পথ অবলম্বন করেছে এবং এটি করতে গিয়ে তারা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। খাদ্য-খাবারের প্রতি, নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে। অবশেষে যখন শেষ বয়সে হুঁশ হয়েছে, ততদিনে তো শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইলম অর্জন এবং এ-জাতীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার ছুটে গেছে।

আবার কিছু মানুষ ছুটেছে বাহ্যিক ইলমের দিকে এবং এ ক্ষেত্রেও তারা এতটাই নিমগ্ন ও বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা যেন এগুলোর ওপর আমল করারও সুযোগ পায়নি। শেষ সময়ে যখন হুঁশ হয়, ততদিনে সক্ষম সময়গুলো পেরিয়ে গেছে জীবন থেকে।

কিন্তু আমাদের নবীর জীবনাদর্শ হলো ইলম ও আমল– দুটোর প্রতিই এবং এর পাশাপাশি শরীরের প্রতিও যত্নবান হওয়া।

যেমন তিনি হজরত আমর ইবনুল আসকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

إن لنفسك عليك حقاً، ولزوجك عليك حقاً.

নিশ্চয় তোমার ওপর তোমার শরীরের হক রয়েছে এবং তোমার ওপর তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে।[৮২]

এটাই হলো মধ্যপন্থা এবং সঠিক কথা। আর শুধুই স্বেচ্ছার নির্বাসন ও কষ্ট-সাধন, সেগুলো হয়ে থাকে ইলম ও জ্ঞানের কমতির কারণে। নতুবা তার যদি ইলম থাকত, তবে তার আমলের মাধ্যমে সে আরও বেশি সওয়াব ও নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হতো।

একজন আলেমের দৃষ্টান্ত হলো একজন পথচেনা পথিকের মতো। আর একজন মূর্খ আবেদ হলো পথ-অচেনা পথিকের মতো। মূর্খ আবেদ যদি ফজর থেকে আসর পর্যন্ত এলোমেলো চলতে থাকে আর একজন আলেম যদি আসরের কিছু পূর্বেও চলতে শুরু করে, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই দুজন এক জায়গায় এসে মিলিত হবে। আলেম তার পরিচিতির কারণে খুব সহজে ও দ্রুত পথ চিনে চলে আসতে পেরেছে। কিন্তু মূর্খ আবেদ তার অচেনা পথে পদে পদে বিভ্রান্ত হয়েছে, খানা-খন্দরে পড়েছে, পথ হারিয়েছে। মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছে। এভাবে এলোমেলো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কোনোরকম এখানে এসে পৌঁছেছে।

এখন কেউ যদি বলে বসেন, বিষয়টি একটু স্পষ্ট করে বলুন তো!

আমি তাহলে বলব, দেখুন, ইবাদত একটি বাহ্যিকতা। এর আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর হুকুম মান্য করা। তার নিকট বিনয়ী হওয়া। তাকে সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার একক মালিক হিসেবে স্বীকার করা। ইবাদত হলো এগুলোরই বাহ্যিক একটি প্রকাশ। কিন্তু মূর্খ আবেদ কখনো কখনো এই বাহ্যিক ইবাদতের অর্থই বোঝে না। সে ইবাদত করে; কিন্তু আল্লাহ তাআলার হুকুম এবং তার উদ্দেশ্য বোঝে না।

এ কারণে কখনো কখনো তার এই ব্যাপক ইবাদতের কারণে নিজেকে সে অনেক সম্মানিত ভাবতে থাকে। অনেক মানুষ থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে থাকে। এমনকি সে তখন ভাবতে থাকে, বরকতের জন্য লোকজন এখন তার হাতে চুম্বন করার পর্যায়ে সে পৌঁছে গেছে। হাতে চুম্বনের জন্য সাগ্রহে সে হাত বাড়িয়ে দেয়।

---

[৮২]. সূত্র: পূর্বে চলে গেছে।

এই সবকিছুই হয়ে থাকে ইলমের কমতির কারণে। আর আমি 'ইলম' বলতে বোঝাতে চাচ্ছি, মৌলিক ইলম। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ইলম। অর্থাৎ অধিক বর্ণনা, মাসআলা-মাসাইল ও মতানৈক্যের ইলমের কথা বলছি না। এগুলো প্রাসঙ্গিক ইলম।

সুতরাং একজন আলেম যখন মৌলিক ইলমগুলো অধিকহারে অধ্যয়ন করে এবং আত্মস্থ করে, তখন সে এই সাধারণ আবেদকে ছাড়িয়ে যায় তার অমায়িক চরিত্রে, আচার-আচরণে, বিনয়ে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বানের মাধ্যমে। কিন্তু এই আবেদ ব্যক্তির জন্য এগুলোর সঠিক পন্থা অর্জন করা কঠিন। সে তো তার অজ্ঞতার আঁধারে নিমজ্জিত।

কোনো মূর্খ আবেদের ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, বিয়ে করেছে; কিন্তু এরপর আবার নিজেকে কৃচ্ছতাসাধনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। স্বল্প খাবার। বেশি ধ্যান। স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও নেই। তাহলে এ অবস্থায় সে তার স্ত্রীর অধিকার বা চাহিদাগুলো আদায় করছে না, আবার তালাকও দিচ্ছে না। তাহলে স্ত্রীর চাহিদাগুলো পূরণ হবে কোথা থেকে? এ অবস্থায় ব্যক্তির অবস্থান হলো সেই মহিলার মতো, যে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল, নিজেও তাকে খেতে দেয় না, আবার তাকে ছেড়েও দেয় না যে, বিড়ালটি নিজে নিজে খেয়ে বেড়াবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের দিকে তাকাবে, সকল দিক দিয়ে তাকে একজন পূর্ণ সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে– তিনি সকল প্রাপককেই তার যথার্থ প্রাপ্য প্রদান করেন। তিনি কখনো হাসি-মজাক করেন। বাচ্চাদের সাথে রসিকতা করেন। কবিতা শোনেন। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আবেদন-নিবেদন শোনেন। স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করেন। সক্ষমতা অনুযায়ী খাবার খান। হাদিয়া গ্রহণ করেন। সবচেয়ে সুস্বাদু জিনিসও আহার করেন– যেমন মধু। ঠান্ডা মিষ্টি পানি পান করেন। ছায়ায় বিছানা পাতা হয়– তিনি তাতে আসন গ্রহণ করেন। আদ্র তরমুজ খান। স্ত্রীকে চুমো দেন এবং তার সঙ্গে মেলামেশা করেন।

কিন্তু নবীর ইন্তেকালের পর মূর্খ সুফি ও জাহেদরা যা সৃষ্টি করেছে, তার কোনোকিছুই তাঁর থেকে পাওয়া যায় না। এরা আজ নফসের সকল চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। এভাবে শুধুই যবের শুকনো রুটি খাওয়া, শরীরের হক আদায় না করা শরীরকে নষ্ট করে দেয়। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই

এটাকে ভালো বলবে না। শরিয়তও এটার অনুমোদন করে না। হ্যাঁ, কেউ যদি সন্দেহমূলক খাবার থেকে বেঁচে থাকে, সেটা ভিন্ন কথা। সেটা ভালো কাজ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদতের হক আদায় করতেন। বান্দার হক আদায় করতেন। রাত জাগরণ করতেন। নামাজ পড়তেন। জিকির-আজকার করতেন।

সুতরাং তুমিও সেই পথ ও পদ্ধতিই অবলম্বন করো, যাতে কোনো ত্রুটি নেই। যাতে কোনো বক্রতা নেই। আর এ যুগের মূর্খ জাহেদদের কথা ছুড়ে ফেলে দাও। বেশির থেকে বেশি এগুলোকে তাদের 'ওজর-অক্ষমতা' হিসেবে ধরে নাও। যদি ওজর হিসেবে ধরা না যায়, তাহলে অবশ্যই তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বিপরীত কাজ করছে। এটা কখনোই গ্রহণীয় নয়। অনুসরণীয় তো নয়-ই।

তাদের কেউ কেউ এ ধরনের কাজের মাধ্যমে মুহাব্বত, ইশক ও ভালোবাসার দাবি করে। চিৎকার ও চিল্লা-পাল্লা করে। গায়ের জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। এভাবে তারা শরিয়তের গণ্ডি থেকে বের হয়ে পড়ে। তারা আসলে 'মাহবুব' বা আল্লাহকেই চিনতে পারেনি। তার হুকুমও বুঝতে সক্ষম হয়নি।

এদের মধ্যে কেউ আবার নিজেকে সব সময় ক্ষুধার্ত রাখে। অব্যাহত রোজা রাখে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে স্পষ্টভাবে বলেছেন, صم يوماً وأفطر يوماً –একদিন রোজা রাখো, আরেক দিন পানাহার করো।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বললেন, আমি এর চেয়ে আরও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি চাই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর চেয়ে আর কোনো শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নেই।[৮৩]

---

[৮৩]. ইমাম বোখারি রহ. 'কিতাবুস সওম' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন। ফাতহুল বারি– ৪/১৯৭২। এবং ইমাম মুসলিম 'কিতাবুস সিয়াম' অধ্যায়ে এটি বর্ণনা করেছেন–২/১৮১/৮১২পৃ./১১৫৯। সহিহ মুসলিমে পুরো হাদিসটি এসেছে এভাবে–

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

তাদের মধ্যে এমনও অনেকে আছে, যারা নির্জনতা অবলম্বন করে। তখন তারা সকল মানুষের সংশ্রব ও মেলামেশা থেকে বঞ্চিত থাকে। নিজেরাও উপকৃত হতে পারে না, আবার অন্যদেরও উপকার করতে পারে না।

কতক আছে, যারা নিজেদের কিতাবগুলো মাটিতে দাফন করে দিয়েছে। এরপর তারা শুধু নামাজ পড়ে, রোজা রাখে– অন্যান্য ইবাদতে মশগুল থাকে। কিন্তু জানতে পারে না, এভাবে কিতাবগুলো দাফন করে ফেলা কত বড় বিপর্যয়ের বিষয়। কারণ, নফস হলো অত্যাধিক গাফেল বস্তু। তাকে সর্বক্ষণ দ্বীনের কথা, আত্মশুদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে রাখতে হয়। আর কিতাবগুলো হলো সর্বোত্তম ও নিরাপদ স্মরণ প্রদানকারী।

ইবলিস এভাবেই তাদের মাঝে যথাসম্ভব প্রবেশ করেছে। এই কিতাব দাফন করে ফেলার ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানের প্রদীপগুলো নিভিয়ে ফেলা; যাতে ইবাদতকারীগণ অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। এতে বিভ্রান্ত করতে তার সহজ হয়।

প্রকৃত অর্থে এ ধরনের জাহেদগণ অনেকটা বাদুড়ের মতো। নিজেদের লুকিয়ে রাখে। মানুষদের উপকার করা থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখে। তবে এগুলোর সাথে সাথে যদি মানুষের উপকার করা থেকে বিরত না থাকে; জানাযায় যায়, অসুস্থকে দেখতে যায়– তাদের আচরণ অবশ্য কিছুটা ভালো বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত সাহসী ব্যক্তিরা হলেন তারাই, যারা মানুষের মধ্যে থেকে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যদের শিক্ষা প্রদান করে। আর নবীগণের কার্য-পদ্ধতিও ছিল এমনটাই।

তুমি কি দেখেছ, কোনো নতুন বিষয় যখন সংঘটিত হয়, তখন একজন মূর্খ আবেদ আর একজন আলেম-ফকিহের মাঝে কেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়?

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

সহিহ মুসলিম: ৬/১৯৬২, পৃষ্ঠা:৪০– মা. শামেলা।

মূর্খ আবেদ অতি সহজেই বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়– যদি না কোনো আলেম-ফকিহের শরণাপন্ন হয়।

আল্লাহর কসম! যদি একাধারে সকল মানুষ ইলম ছাড়া শুধু ইবাদতের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেত, তাহলে অনেক আগেই ইসলাম বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যেত। এ কারণে একজন আবেদ যদি ইলমের বুঝ পেত, তবে আর সে শুধু নামাজ-রোজার ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। এগুলো ছাড়াও ইবাদতের আরও বহু ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো মুসলমানের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়, সামান্য চেষ্টা করে, এটাই তার পুরো বছরের রোজা রাখার চেয়ে উত্তম ইবাদত।

শারীরিক কোনো কাজ করতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহার করতে হয়, আর ইলম দিয়ে কাজ করতে বুদ্ধি বিবেক চিন্তা ও প্রজ্ঞার মতো অভ্যন্তরীণ উপকরণগুলো ব্যবহার করতে হয়। এ কারণেই ইলম হলো সব সময় সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।

এখন তুমি যদি আমাকে বলো, তবে কি আপনি যারা খারাপ কর্ম থেকে নিজেদের বিরত রাখছে, তাদের নিন্দা করছেন এবং তাদের ইবাদতকে নাচক করে দিচ্ছেন?

উত্তরে আমি বলব, আমি কিছুতেই তাদের নিন্দা করছি না কিংবা তাদের ইবাদতকে অস্বীকারও করছি না। কিন্তু তাদের কারও ক্ষেত্রে যে সকল বাড়াবাড়ি সংঘটিত হচ্ছে, ইলমের অভাবের কারণেই এগুলো হয়েছে। তারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের ওপর এমন কষ্টের বিষয় চাপিয়ে নিয়েছে– যেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি যার বৈধতাও নেই।

তাদের কেউ কেউ মনে করে, যে কাজ নফসকে কষ্ট দেয়, সার্বিকভাবে সেগুলোই শ্রেষ্ঠ। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদের একজন একবার গোসলখানায় প্রবেশ করে ভাবল যে, এই সময়টা তো বৃথাই বিলাসে অপচয় হয়। এ কারণে সে প্রতিজ্ঞা করে নিল, এত সংখ্যক তাসবিহ না পড়ে সে গোসলখানা থেকে বের হবে না। এভাবে দীর্ঘদিন চলতে লাগল। একসময় এই ধারাবাহিকতার কারণে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল।

এই মূর্খ লোকটি নিজের ওপর এমন কষ্ট চাপিয়ে নিয়েছিল, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আবার কিছু সুফি রয়েছে, যারা বাহ্যিক পোশাকের মধ্যে তাকওয়া ও দ্বীনদারি অন্বেষণ করে। অথচ তাদের অভ্যন্তরে এমন মূর্খতা ও অজ্ঞতা বিরাজমান– যার বর্ণনা একটি কিতাবেও কুলাবে না।

আল্লাহ এদের থেকে এই জমিন পবিত্র করুন এবং তাদের ওপর আলেমদের সাহায্য করুন। কারণ, অধিকাংশ মূর্খ ব্যক্তিই এসকল মূর্খ সুফি ও জাহেদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো আলেম যখন এসব বিদআত ও শরিয়তহীনতার বিষয়ে কথা বলেন, প্রতিবাদ করেন, সাধারণ জনগণ তাদের সেই অসীম মূর্খতা ও অজ্ঞতাসহ আলেমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজকাল মূর্খতার এতই প্রসার ও শক্তি!

আমি এমন অনেক আবেদকে এমন তাসবিহও পড়তে দেখি, যা মুখে উচ্চারণ করাও উচিত নয়। কিংবা নামাজে এমন কিছু করে, শরিয়তে যার কোনো বর্ণনা ও দলিল নেই।

আমার একবার কিছু আবেদের সাথে দেখা হয়। দেখলাম, কয়েকজন মিলে জামাতের সাথে জোহরের নামাজ আদায় করছে। কিন্তু ইমাম সাহেব কিরাত জোরে পড়ছেন। নামাজ শেষে আমি তাদের বললাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, صلاة النهار عجماء –অর্থাৎ দিবসের নামাজে কিরাত পড়া হবে অনুচ্চ আওয়াজে।'[৮৪] অথচ তোমরা পড়ছ উচ্চ আওয়াজে! এ কেমন কথা!

এক জাহেদ আমার প্রতি রেগে উঠে বলল, এ লোকটি আমাদের আর কত দোষ-ত্রুটি ধরে বেড়াবে!

একে একে সবাই এসে তার কথার সমর্থন জোগাল। তারা বলল, আমরা কিরাত জোরে পড়ছি, যাতে আমাদের ঘুম না আসে। আমরা তো আর তোমার মতো ঘুমিয়ে রাত কাটাই না। ইবাদত করি। তাই দিবসে তন্দ্রা আসাই স্বাভাবিক।

আমি বললাম, কী আশ্চর্য ব্যাপার! রাতে তোমাদের ঘুমাতে কে নিষেধ করেছে? ইবনে আমর থেকে সহিহ হাদিসে কি বর্ণিত হয়নি যে, 'তুমি রাত জাগরণ করবে আবার ঘুমাবেও।'? আমাদের নবী সা. নিজেও রাতে

---

[৮৪]. ইমাম সুয়ুতি হাদিসটি তার গ্রন্থ 'আদদুরারুল মুনতাছিরাতু' এ উল্লেখ করেছেন–২৭৩। তবে ইমাম দারা কুতনি রহ. এবং ইমাম নববি রহ. বলেন, এটি অশুদ্ধ হাদিস। এর কোনো ভিত্তি নেই।

ঘুমাতেন। আর সম্ভবত তার জীবনে এমন কোনো রাত অতিবাহিত হয়নি, যে রাতে তিনি ঘুমাননি!

জামে মানসুরে এমন আরেক মূর্খ আবেদের সাথে আমার দেখা। আমি দেখতাম, সে দীর্ঘক্ষণ শুধু অনর্থক হাঁটাচলা করে। আমি একদিন তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বললাম, এভাবে হাঁটার কী কারণ?

লোকটি বলল, 'আমি এভাবে হাঁটি; যাতে ঘুম না আসে। ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না।'

এগুলোর সবই মূর্খতার প্রকাশ। ইলমের স্বল্পতার বিকার। কারণ, নফসকে যদি তার প্রাপ্য ঘুম প্রদান না করা হয়, তবে এটি আকলের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে পড়বে। এবং ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যই তখন রহিত হবে।

আমার এক সাথি আমাকে একজন লোকের ঘটনা শুনিয়েছে। লোকটির নাম কাসির। সে তাদের সাথেই মসজিদে প্রবেশ করে। এরপর বলে, আমি আল্লাহ তাআলার সাথে একটি ওয়াদা করেছিলাম। কিন্তু ওয়াদাটা পুরা করতে পারিনি। তাই আমি আমার নিজের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করলাম যে, আমি চল্লিশ দিন কিছু খাব না।'

এরপর থেকে শুধু কিছুটা পানি পান করে থাকে। এভাবে প্রথম দশদিন মোটামুটি চলে গেল। দ্বিতীয় দশদিনে লোকটি দুর্বল হয়ে পড়ল। তৃতীয় দশদিনে আরও দুর্বল হয়ে গেল। আর দাঁড়াতে পারে না। বসে বসে নামাজ পড়ে। শরীর ভীষণ দুর্বল। কিন্তু তবুও কিছু খাবে না। চতুর্থ দশদিনে একেবারে অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর তাকে প্রথমে কিছু তরল জাতীয় জিনিস খেতে দেওয়া হলো। কিন্তু এটি যেন তার গলার মধ্যে ঘড়াৎ ঘড়াৎ করতে লাগল। জীবনী শক্তি শেষ হয়ে আসতে লাগল। এর কিছুক্ষণ পরই লোকটি মারা গেল।

আমি বললাম, হায় আল্লাহ!

তোমরা দেখো, মূর্খতা কোনো মূর্খকে কতটা খারাপ অবস্থার মধ্যে ফেলে দিতে পারে! বাহ্যিকভাবে এ ব্যক্তি আত্মহত্যাকারী এবং জাহান্নামী। হ্যাঁ, আল্লাহ যদি ক্ষমা করেন, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু তার যদি ইলম থাকত কিংবা আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করত, এ অবস্থায় তার কী করা উচিত, তাহলে

অবশ্যই সে জানতে পারত, তার খাওয়াই উচিত ছিল। আর নিজের জন্য সে যা বেছে নিয়েছে, তা ছিল সম্পূর্ণ হারাম।

জেনে রাখা উচিত, সবচেয়ে বড় মূর্খতা হলো ইলমের ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি– হয়তো কোনো বিষয় নিজের জানা নেই কিংবা জানার ইচ্ছাও করে না– কিন্তু নিজের মতের ওপর জিদ ধরে থাকে। এই একগুঁয়েমি মানুষের মাঝে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। এরপর কারও কথার দ্বারাই সে ফিরে আসে না। আসতে চায় না। এই হলো মূর্খতার ওপর একগুঁয়েমি। এটা হলো মানুষের সবচেয়ে ক্ষতিকর অবস্থা।

ইসলামের প্রথম যুগে এগুলো ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম এসবের কিছু করেননি। তারা পানাহার করতেন। ঘুমাতেন। হ্যাঁ, তবে পূর্ণ তৃপ্তির চেয়ে একটু কম খেতেন। আবার যখন কিছু পেতেন না, তখন ধৈর্যধারণও করতেন।

সুতরাং কেউ যদি কোনো আদর্শ গ্রহণ করতে চায়, কোনো জীবনপদ্ধতি অবলম্বন করতে চায়, তবে অবশ্যই তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যেই রয়েছে নিরাপদ মুক্তি ও কাঙ্ক্ষিত সফলতা।

বিদআতের উৎস

ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে আমাদের দ্বীনের মধ্যে যে বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, আমি একদিন তার উৎস ও কারণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। এরপর অনুধাবন করলাম, এই বিদআত অনুপ্রবেশ করেছে দু-ভাবে এবং এটা এখন দ্বীনের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে আছে এবং মানুষজন সেগুলোর প্রতি ঝুঁকছে।

প্রথম বিষয় :

ইলম ও বিশ্বাসের মধ্যে বিদআতের প্রথম প্রবেশ ঘটেছে দর্শনের হাত ধরে। এটির কারণ হলো, আমাদের ধর্মের কিছু পণ্ডিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোরআন ও হাদিসের প্রতি সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত ছিলেন, তারা যেন শুধু এ দুটির ওপর সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত থাকতে পারছে না। সে কারণে তারা দার্শনিকদের বিভিন্ন যুক্তি দর্শন ও মতবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছে। যুক্তিশাস্ত্রের মধ্যে মনোনিবেশ করেছে– যা তাদেরকে খুবই তুচ্ছ ও নিম্নতম এক মতবাদের দিকে নিয়ে গেছে। এতে করে তাদের বিশ্বাস ও আকিদা হয়ে গেল নষ্ট ও বিনষ্ট। প্রবেশ করল নতুন ধরনের বিভিন্ন বিদআত।

দ্বিতীয় বিষয় :

আর আমলের ক্ষেত্রে যে বিদআতটি এলো, সেটি এলো খ্রিষ্টান রাহেবদের কৃচ্ছতাসাধনের বিশ্বাস থেকে। এ কারণে জাহেদগণ খ্রিষ্টানদের এই কৃচ্ছতাসাধনের পদ্ধতি অনুযায়ী নিজেদের বিভিন্ন কষ্টের মধ্যে ফেলতে লাগল। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের জীবনাদর্শের দিকে তারা দৃষ্টি দিলো না। জাহেদরা শুধু দুনিয়ার নিন্দার কথাই শুনল, কিন্তু এর উদ্দেশ্য অনুধাবন করল না। সুতরাং তারা ভুল উদ্দেশ্য নিয়ে শরিয়তের ইলম থেকে বহুদূরে ছিটকে পড়ল। এভাবেই সৃষ্টি হলো আমলের মধ্যে বিদআত।

এ ক্ষেত্রে ইবলিস প্রথম যে কাজটি করল তা হলো, তাদেরকে ইলম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার আদেশ করল। এ কারণে তারা তাদের কিতাবসমূহ দাফন করে দিলো। সেগুলো পানিতে মিশিয়ে ফেলল। এরপর নিজেদের উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইবাদতের মধ্যে লাগিয়ে দিলো। সাধারণ লোকজন নতুন এই

জিনিসে আমোদিত হয়ে উঠল। মূর্খ আবেদগুলোও আপ্লুত হলো। এভাবে তারা নিজেরাই নিজেদের নফসকে ইলাহ বা উপাস্য বানিয়ে নিল।

কিন্তু তারা যদি জানত, যখনই তারা তাদের কিতাব ও ইলম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তখনই তাদের অভ্যন্তরের প্রদীপসমূহ নিভে গেছে। এভাবে ইবলিস তার সূক্ষ্ম চাল চেলেছে।

ইলম দ্বারা পথের ভ্রান্তি চেনা যায় এবং সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া যায়। আল্লাহ তাআলার নিকট আকুল প্রার্থনা– তিনি যেন আমাদেরকে ইলম থেকে বঞ্চিত না করেন। কারণ, ইলম হলো অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রদীপ, একাকিত্বের সঙ্গী এবং বিপদে পরামর্শদানকারী।

অকর্মণ্য ব্যক্তিদের বিচ্যুতিগুলো

আমি সাধারণত অকেজো অকর্মণ্যদের সংশ্রব এড়িয়ে চলি। কারণ, আমি দেখেছি, অধিকাংশ মানুষ অনর্থক দেখা-সাক্ষাতে আসে। এবং তাদের এই বারবার আসাকে তারা একটা খেদমত ও সম্প্রীতি নাম দিয়ে থাকে। বসে বসে গল্প করতে থাকে। অনর্থক আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে; এমনকি গিবতও চলে আসে।

আমাদের সময়ে এই অন্যায় ও অযথা কাজটি অনেক মানুষও করছে। বরং তারা তো সব সময় একজন গল্পের লোক খুঁজতে থাকে। তার প্রতি আগ্রহ দেখায়। নতুবা একাকিত্ব বোধ করতে থাকে। বিশেষ করে অবসর সময়গুলোতে। কোনো উৎসব ও আনন্দের সময়গুলোতে। তারা তখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়। দেখা-সাক্ষাৎ করে। আর শুধু সামান্য স্বাগত-অভিবাদন ও সালামের মধ্যেই কথাকে সংক্ষিপ্ত রাখে না। কথার ফুলঝুরি ছুটতে থাকে। সেই সাথে চলতে থাকে গিবত ও অনর্থক আলোচনা।

আমি যেহেতু জেনেছি, সময় হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এবং তাকে ব্যয় করতে হবে সবচেয়ে ভালো কাজে, সে কারণে আমি তাদের সাথে এভাবে সময় নষ্ট করার কাজে যোগ দিতে পারি না। এ কারণে আমাকে তাদের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ রাখতে হয়।

এক. আমি যদি তাদের সাথে কিছুই সময় না দিই, তাহলে সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে পড়ে, বিভিন্ন খারাপ মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়।

দুই. আবার যদি তাদের সাথে একেবারে মিশে যাই, তাহলে আমার মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়। সুতরাং যতদূর সম্ভব তাদের সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। আর যখন এবং যেসব ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, তখন এবং সেসব ক্ষেত্রে কথা খুবই সংক্ষিপ্ত করি– যাতে দ্রুতই আগন্তুক চলে যায়। এবং এমন কিছু কাজ আমি প্রস্তুত করে রাখি, যার কারণে সাক্ষাতের সময় তেমন কথা জমে ওঠে না। আমার সময়ও অনর্থক নষ্ট হয় না। সুতরাং সেই সময়গুলোতে আমি বসে বসে আমার কাগজ কাটি, কলম চাঁছি, খাতা বাঁধাই করি ইত্যাদি। কারণ, এ কাজগুলো আমাকে কখনো না কখনো করতেই হয়। এগুলো করতে তেমন চিন্তা-ফিকির ও মনোযোগের দরকার পড়ে না। তাই সাক্ষাতের সময়গুলো আমি এগুলো করার সাথে সাথে সামান্য কথাও চালিয়ে যাই আগন্তুকের সাথে—যাতে আমার সময় একেবারে নষ্ট না হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়গুলোর মর্যাদা বোঝার তাওফিক দেন এবং সেগুলোকে যথার্থভাবে কাজে লাগানোর সক্ষমতা দেন।

অনেক মানুষকে দেখি, তারা যেন জীবনের অর্থই বোঝে না। কিছু মানুষ আছে, পারিবারিকভাবে গচ্ছিত সম্পদের কারণে উপার্জনের জন্য কর্ম করতে হয় না। সে কী করে? দিনের অধিকাংশ সময় বাজারে বসে থাকে। গল্প-গুজব করে। হাসি-মজাক করে। মানুষ দেখে। মানুষের আনাগোনা দেখে। এতে তো কত অপ্রীতিকর দৃশ্যও তার নজরে পড়ে। কেউ কেউ বসে বসে দাবা খেলে। কিংবা বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ, জিনিস-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি-হ্রাস নিয়ে অথবা অন্যকোনো অনর্থক কথাবার্তায় সময় নষ্ট করে।

এর দ্বারাই আমি বুঝতে পারি—জীবনের মর্যাদা এবং সময়ের মূল্যায়ন করার জ্ঞান আল্লাহ তাআলা সকলকে প্রদান করেন না। যাদেরকে প্রদান করেন, তারা যথাযথভাবে এগুলো কাজে লাগায় এবং গুরুত্ব দেয়।

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

আর এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয়, যারা সবর করে এবং এ গুণ কেবল তাদেরকেই দান করা হয় যারা মহাভাগ্যবান।

[সুরা হা-মীম সাজদা : ৩৫]

জীবনের সময়গুলোর মূল্যায়ন করো

আমি আমার সুচিন্তিত মত ও অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মুখোমুখি শিক্ষা প্রদানের চেয়ে কিতাবের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান অনেক বেশি উপকারী। কারণ, আমি আমার এ দীর্ঘ জীবনে সীমিত সংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দিতে পেরেছি, অথচ আমার লেখার মাধ্যমে অগণিত ছাত্রের নিকট পৌঁছুতে পেরেছি এবং অনাগত পাঠকের কথা তো হিসাব করাও সম্ভব নয়। আর এটার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছি। যেমন, আমাদের পূর্ববর্তী আলেমদের মাধ্যমে মুখোমুখি যতজন উপকৃত হয়েছে, এখন তাদের লিখিত কিতাব থেকে বহুগুণ বেশি উপকৃত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

সুতরাং একজন যোগ্য ও দূরদর্শী আলেমের জন্য উচিত হবে, সে যদি সুন্দরভাবে লিখতে পারে, তবে লেখার ক্ষেত্রেও তার মনোনিবেশ করা। কারণ, যারা লেখে, তাদের সকলেও তো ভালোভাবে লিখতে পারে না। সুতরাং যোগ্যতা থাকলে অবশ্যই সেটা প্রয়োগ করা উচিত।

আর এই লেখা দ্বারা নিছক কিছু বিষয় একত্র করা বা জমা করা উদ্দেশ্য নয়। এটা এমন কিছু অবর্ণনীয় বোধ ও বুদ্ধিমত্তা, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান শুধু তাকেই প্রদান করেন। তার কাছেই শুধু এই রহস্য-বোধ উন্মোচন করেন। তখন সে লেখক বিচ্ছিন্ন বিষয়গুলোকে একত্র করতে সক্ষম হন। বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে বিন্যাস করতে সক্ষম হন। অথবা অবহেলা অনাদরে ফেলে রাখা বিষয়গুলোকে সামনে আনেন এবং অধরা অভাবিত বিষয়গুলো প্রকাশ করেন– মানুষরা দেখতে পান এক নতুন বিন্যাস। চিন্তা ও প্রজ্ঞার সাথে হৃদয়ের গভীরতম কথা...।

এটাই হলো উপকারী লেখা।

আর লেখার ক্ষেত্রে বেছে নিতে হবে মধ্যবয়সকে। কারণ, জীবনের প্রথম ভাগ তো অতিবাহিত হবে নিজের ইলম অর্জনের পেছনে। আর শেষভাগে যেহেতু চলে আসে শারীরিক শিথিলতা ও দুর্বলতা। কখনো কখনো আবার বয়স বাড়ার অনুপাতে জ্ঞান বুদ্ধি ও বোধের মধ্যেও শিথিলতা ও বিভ্রম চলে আসে।

আর তাকদির বা ভাগ্য সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাপনেরই অনুকূলে হয়ে থাকে। আর সে যেহেতু গায়েব বা নিজের ভবিষ্যৎ জানে না, তাই স্বাভাবিক জীবন-পরিমাণকে বেছে নেওয়াই উত্তম। সে হিসেবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন, সংরক্ষণ, অনুধাবন ও বিশ্লেষণের মধ্যে অতিবাহিত করবে। এরপর চল্লিশ থেকে লেখালেখি ও তালিমের দিকে মনোনিবেশ করবে। নিজের জ্ঞান ও উপকরণের প্রাচুর্যে যারা চল্লিশের মধ্যে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারবে, তাদের জন্য এই কথা।

কিন্তু শিক্ষার উপকরণের অভাবে কিংবা প্রথম বয়সে শিক্ষার দুর্বলতার কারণে চল্লিশের মধ্যেই যাদের যোগ্যতা তৈরি হবে না, তারা লেখালেখিকে বিলম্বিত করবে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। এরপর পঞ্চাশ পূর্ণ হয়ে গেলে লেখালেখি এবং পাঠদানে লেগে যাবে। ষাটের পর পাঠদান, হাদিসের দরস প্রদান এবং ইলমের প্রচার-প্রসারের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেবে। নিজের রচিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখবে। এভাবে সত্তর পর্যন্ত চালাবে। এরপর যখন সত্তর অতিক্রম করবে, তখন সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে একনিষ্ঠভাবে আখেরাতের জন্য একান্ত প্রস্তুতি নিতে থাকবে।

তার শিক্ষা প্রদান হবে সওয়াবের উদ্দেশ্যে এবং লেখালেখিও হবে দ্বীনের ঠিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে। তাহলে এটাও তার আখেরাতের পথে যাত্রার প্রস্তুতি ও পাথেয় হিসেবেই গণ্য হবে।

নিজেকে সে সব সময় সকল প্রকার লোভ-লালসা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখবে। নিজের অভ্যন্তরকে পরিশুদ্ধ করবে। এবং নিজের বিচ্যুতিগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। এরপর যেভাবে সে আশা করেছিল তা যদি পূরণ না-ও হয়, তবুও তো মুমিনের নিয়তই তার কর্মের চেয়ে উত্তম। আর যদি পূরণ করতে সক্ষম হয়, তবে জীবনের প্রতিটি ধাপে তার প্রাপ্য সে তো পাবেই।

ইমাম সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়সে উপনীত হয়েছে, সে যেন নিজের জন্য একটা কাফন গ্রহণ করে রাখে। আলেমদের অনেকে সাতাত্তর বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়ু লাভ করেছেন। যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। যদি সে এই বয়সে উপনীত হয়, তাহলে তার জেনে রাখা উচিত যে, সে রয়েছে একেবারে কবরের প্রান্তে। এরপর যে দিনগুলো আসবে, তার প্রতিটি দিনই হবে উৎকৃষ্ট।

মানুষের অভ্যাস এবং তাদের অধার্মিকতা

আমি ভেবে দেখেছি, মানুষ তার শরিয়তের জ্ঞানের চেয়ে নিজের অভ্যাসকেই বেশি এগিয়ে রাখে। হয়তো তারা কিছু বিষয় অপছন্দ করে কিংবা কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকে– কিন্তু এই বিরত থাকা শরিয়তের নিষেধের কারণে নয়; এটা তাদের স্বভাব ও অভ্যাসের কারণে।

এমন কত লোক রয়েছে, যাদেরকে ভালো হিসেবেই ধারণা করা হয়– ব্যবসা-বাণিজ্য করে। তাদের নিকট কোনো খারাপ বা নিম্নমানের কোনো জিনিস আসে, সেটাকেও তারা ভালোর সাথে মিশিয়ে বিক্রয় করে দেয়। এ সম্পর্কে কোনো ইমামের মত গ্রহণ করে না। বরং নিজের পক্ষ থেকেই একটি সহজ পন্থা গ্রহণ করে নেয়। এটা করে থাকে তাদের অভ্যাসের বশে; শরিয়তের বিষয়টা জানতেও যেন তারা আগ্রহী নয়।

এমন কত মানুষকে দেখেছি, যারা খুব আগ্রহভরে নিজের ভালো লাগার নামাজগুলো পড়তে থাকে। কিন্তু অনেক ফরজ বিষয়েই সে অলসতা ও অবহেলা দেখায়।

আবার এমন অনেক ভালো মানুষকে দেখা যায়, যারা অন্যের ওপর জুলুম করে, আবার দরিদ্রদের প্রতি দানও করে। আবার কখনো জাকাত দিতে অবহেলা করে। বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও তাবিলের আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার যখন কোনো মজলিস, মাহফিল বা ওয়াজে উপস্থিত হয়, তখন আবার কেঁদে-কেটে নিজের দু-চোখ ভাসিয়ে দেয়; যেন কিছুটা লৌকিকতা করছে। তাদের অনেকেই জানে, তার মূল সম্পদ পুরোটাই হারাম। কিন্তু অভ্যাসের কারণে এটাকে হাতছাড়া করতেও কষ্ট হয়। কেউ আবার তালাকের কসম কেটেছে এবং ভঙ্গও করেছে। স্ত্রী হয়ে গেছে তালাক। কিন্তু এখন বিচ্ছিন্ন হতে কষ্ট হয়। হারামভাবেই জীবনযাপন করে।

কখনো কখনো তো নিজে নিজেই অজ্ঞভাবে ব্যাখ্যা করে নেয়। আবার কখনো শুধু আল্লাহ তাআলার রহম ও করমের ওপর নির্ভর করে অবহেলা করে। কখনো ভবিষ্যতে তাওবার ইচ্ছা করে চলতে থাকে।

যখন সে দেখে, শরিয়ত অনুযায়ী চলতে গেলে জীবন-জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। কিংবা যাদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করেছে, শরিয়ত অনুযায়ী চলতে

গেলে তাদের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হচ্ছে– তখন সে শরিয়তকেই পাশ কাটিয়ে যায়।

মূলকথা– মানুষের এই অভ্যাসগুলো খুবই ক্ষতিকারক এবং তার দাসত্ব করা অতি ধ্বংসাত্মক একটি ব্যাপার।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি–

একবার আমার নিকট এক বৃদ্ধলোক এলেন। বয়স আশির কাছাকাছি। তিনি তার একটি দোকান বিক্রয় করতে চাইলেন। আমি তার নিকট থেকে দোকানটি ক্রয় করে নিলাম। আমাদের চুক্তি পাকা হয়ে গেল। কিন্তু এর কিছুদিন পর বৃদ্ধ লোকটি আমার সাথে প্রতারণা করতে লাগলেন। তিনি দোকানটি অন্য একজনের নিকট বিক্রয় করে দিলেন।

আমি বললাম, 'চলেন, বিচারকের নিকট যাই।' তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু আমিই তাকে বিচারকের নিকট নিয়ে গেলাম। কিন্ত সেখানে তিনি মিথ্যাভাবে কসম করে বললেন, 'আমি দোকান বিক্রয় করিনি।' আমি তাকে বললাম, এভাবে কতদিন চলছে? একজনের নিকট দোকান বিক্রয় করে আবার আরেকজনের কাছে বিক্রয় করা! আমি আমার অধিকার ছাড়ব না।

এরপর তিনি একজনকে ঘুষ দিয়ে আমার ওপর জুলুম করতে লাগিয়ে দিলেন।

এর দ্বারা আমি বুঝলাম, সাধারণ মানুষ—তাদের ওপর অভ্যাসের প্রভাবই বেশি। তারা তাদের এই অভ্যাসের বিপক্ষে কোনো আলেম বা ফকিহের কথা শুনতেও রাজি নয়। বরং তারা নিজেরাই মুফতি হয়ে একেকজন একেক কথা বলতে লাগে। একজন বলল, যতই চুক্তি হোক, যেহেতু মূল্য গ্রহণ করা হয়নি, তাহলে এই বিক্রয় পূর্ণ হয় কীভাবে? আরেকজন বলল, তিনি যেহেতু আপনাকে দোকান দিতে চান না, তাহলে তার অসন্তুষ্টিতে আপনি দোকান গ্রহণ করবেন কীভাবে? আরেকজন বলল, আপনার ওপর আবশ্যক হলো, তাকে অন্যের কাছে বিক্রয়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া।

কী সব ফতোয়া!

তাদের এতসব কথার পরও আমি যখন দোকানের দাবি ছেড়ে দিলাম না, তখন সেই বৃদ্ধ এবং তার আত্মীয়স্বজন আমার সম্মান নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলো। তারা সুলতানের নিকট আমার নামে বিভিন্ন মন্দ-নিন্দা ও মিথ্যা

দোষারোপ করতে লাগল। আমি তো তাদের এসকল কর্মকাণ্ডে একেবারে হতভম্ব। এমনকি আমাকে শায়েস্তা করার জন্য কিছু জালেমকে ঘুষ প্রদান করল। গুণ্ডারা বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করল। কিন্তু তারাও সফলকাম হলো না। আল্লাহ তাআলা আমাকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন।

বিচারের সময় আমি বিচারকের নিকট আমার দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করলাম।

কিন্তু এক প্রভাবশালী দুনিয়াদার বিচারকের নিকট গিয়ে বলল, 'আপনি তার পক্ষে রায় দেবেন না। আপনার ক্ষতি হবে।'

এ কথায় সেই বিচারক তার নিকট সকল প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও রায় প্রদান করলেন না। এবার উপরের বিচারকের নিকটা যাওয়া হলো। তিনিও তার চাকরির ভয়ে বিচার করা থেকে বিরত থাকলেন।

আমার নিকট আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল যে, মানুষের অভ্যাসই হলো মূল প্রভাবক। আর শরিয়ত হলো তার নিকট অবহেলার বিষয়। কিন্তু তার কোনো অভ্যাস যদি শরিয়তের সাথে মিলে যায়, তবে ভালোই; কিন্তু যদি বিপরীত হয়, তখন শরিয়তকেই দূরে ছুড়ে ফেলে।

এটি মানুষজাতির অতি বিপর্যয়কর এক দিক। তুমি যদি কোনো মুসলমানকে চাবুক দিয়ে পেটাতে থাকো, তবুও রমজানের অভ্যাসগত রোজা সে ভাঙতে রাজি হবে না। অথচ তারই অভ্যাস হলো, জোর-জুলুম করে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা।

যেই বৃদ্ধ লোকটির কথা বলছিলাম– বহুদিন আমি তাকে অতি যত্নের সাথে নামাজ আদায় করতে দেখেছি। বিভিন্ন তাসবিহ-তাহলিল করতে দেখেছি। কিন্তু তিনিই যখন কিছু বাড়তি সম্পদ ছুটে যাওয়ার ভয় করলেন, তখনই শরিয়তের বিধানকে ছুড়ে ফেলে দিতে কোনোই দ্বিধা করলেন না।

একইভাবে এই সকল বিচারককে আমি কত ইবাদত করতে দেখেছি। নামাজ পড়তে দেখেছি। ইলম অন্বেষণ করতে দেখেছি। কিন্তু যখনই তারা নেতৃত্ব ও চাকরি হারানোর ভয় করলেন, তখনই তারা দ্বীনের বিধানকে পেছনে ছুড়ে ফেললেন!

অবশেষে এই বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে সাহায্য করলেন। একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক এসে প্রমাণ অনুযায়ী দোকানের সমাধান করে দিলেন। এরপর একবছর অতিবাহিত হলো। সেই বৃদ্ধ লোকটি খুবই দুরাবস্থা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।

শেষমেশ জীবনে কী থাকে! তবুও কেন আমরা এমনটা করি! আল্লাহ আমাদের শরিয়ত অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন। আমাদের অভ্যাস ও প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

আলেমের একাকিত্বে থাকার ফজিলত

আমি মনে করি, একজন আলেমের জন্য নির্ঝঞ্ঝাট একাকিত্বে থাকার চেয়ে বড় কোনো সুখ আনন্দ সম্মান মর্যাদা স্বস্তি ও নিরাপত্তা হতে পারে না। এর মাধ্যমে সে নিজের শরীর ও দ্বীন– উভয়টিই নিরাপদ রাখতে পারে এবং একই সাথে আল্লাহ ও তার বান্দাদের কাছে নিজের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়।

কারণ, মানুষের স্বভাব হলো এমন, যে ব্যক্তি তাদের সাথে বেশি মেলামেশা করে, তাকে তারা তেমন একটা মর্যাদা প্রদান করে না। তাদের সাথে মিলেমিশে থাকা ব্যক্তির কথাকেও তারা তেমন গুরুত্ব দেয় না।

এছাড়া যখন সাধারণ ব্যক্তিরা কোনো আলেমকে দ্বীনের কোনো বিষয়ে শিথিল অথচ বৈধ বিষয় গ্রহণ করতে দেখে, তাদের নিকট তার সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে না। এ কারণে একজন আলেমের জন্য উচিত– নিজের ইলমকে সংরক্ষণ করা এবং সাধারণ মানুষদের সাথে মেশার ক্ষেত্রে একটি সীমানা নির্ধারণ করে রাখা।

আমাদের এক সালাফ বলেছেন, 'আমরা আগে হাসি-মজাক করতাম, যেমন-তেমনভাবে চলাফেরা করতাম, কিন্তু যখন দেখলাম লোকেরা আমাদের অনুসরণ করা শুরু করেছে, তখন আমরা এগুলো বর্জন করে দিলাম।'

হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, 'তোমরা এই ইলম শিক্ষা করো এবং নিজেদের অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করো। এটাকে কখনো ঠাট্টা-তামাশার সাথে

মিশ্রণ ঘটিয়ো না, তাহলে মানুষের অন্তর তোমাদের ইলম বর্জন করা শুরু করবে।'

সুতরাং বোঝা যায়, মানুষের মানসিকতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্তব্যের বিষয়। এটাকে এড়িয়ে চলা উচিত নয়।

হাদিসে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ.

হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকে বললেন, তুমি তো জানো, তোমার সম্প্রদায় [মক্কার কোরাইশ বংশধর] যখন কাবা পুনর্নির্মাণ করে, তখন তারা হজরত ইবরাহিমের নির্মিত ভিত্তি থেকে কমিয়ে নির্মাণ করে।'

হজরত আয়েশা রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি তো এখন ইচ্ছা করলেই হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নির্মিত পরিমাণের ওপর ফিরিয়ে আনতে পারেন!

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি তোমার সম্প্রদায়ের কুফরির দিকে ধাবিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে আমি তা-ই করতাম।[৮৫]

হজরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. মাগরিবের আগে দু-রাকাত নামাজ পড়ার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'আমি যখন দেখলাম মানুষ এটাকে পছন্দ করছে না, তখন আমি এটা থেকে আমার মত ফিরিয়ে নিলাম।'

আবার জাহেলদের কথা শুনে মনে করো না যে, এগুলো হলো লোক দেখানো বিষয়। না, বরং এগুলো ইলমের মর্যাদা রক্ষা। যেমন দেখো, কোনো আলেম

---

[৮৫]. সহিহ বোখারি: ৭/২৩৬৮, পৃষ্ঠা: ২৬– মা. শামেলা।

যদি মানুষদের মাঝে খোলামাথায় চলাফেরা করে কিংবা হাতে কিছু নিয়ে খেয়ে বেড়ায়, তবে অবশ্যই মানুষদের নিকট তার মর্যাদা কমে যায়। অথচ এটা তো বৈধ বিষয়।

সুতরাং আলেমের জন্য উচিত হবে– সাধারণ ব্যক্তিদের থেকে কিছুটা সংরক্ষিত অবস্থা নিয়ে চলা। বৈধ কিন্তু সামাজিকভাবে দৃষ্টিকটু– এ ধরনের বিষয় একান্তে নির্জনে সম্পন্ন করা উচিত।

এই সামাজিকতাটুকু হজরত আবু উবাইদা রা. খেয়াল রেখেছিলেন। যখন হজরত উমর রা. শামে [সিরিয়ায়] এলেন, তখন তিনি একটি গাধার পিঠে চড়ে আসছিলেন। আর তার দু-পা গাধার এক পাশে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এটা হজরত আবু উবাইদা রা.-এর নিকট তার পরিবেশ অনুযায়ী কিছুটা দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল। সে কারণে তিনি হজরত উমর রা.-কে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার সাথে অনেক সম্মানিত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে আসছেন... যদি একটু...।

কী চমৎকার পরিবেশদর্শিতা!

হ্যাঁ, তবে হজরত উমর রা.-ও তাকে কিছু শেখাতে চাইলেন। সেটা হলো, ইসলামের মৌলিকতা। এ কারণে হজরত উমর রা. বললেন,

إن الله أعزكم بالإسلام فمهما طلبتم العز في غيره أذلكم.

> 'আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। এরপর যখনই তোমরা ইসলামের বাইরে সম্মান অন্বেষণ করবে, তখনই আল্লাহ তোমাদের লাঞ্ছিত করবেন।'

এর দ্বারা উদ্দেশ্য, তোমাদের উচিত হবে দ্বীন পালনের মাধ্যমে সম্মান অন্বেষণ করা– শুধু বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে নয়। যদিও বাহ্যিক বিষয়াবলিও ধর্তব্যের মধ্যে রাখতে হবে। যেমন, একজন মানুষ তার বাড়িতে একান্তে বস্ত্রহীনও হতে পারে। কিন্তু বাইরে মানুষের সামনে আসতে গেলে তাকে অবশ্যই পোশাক পরিধান করে আসতে হবে। সম্ভব হলে সবচেয়ে ভালো পোশাক পরে আসবে।

এটা কোনো লৌকিকতা নয় কিংবা অহংকারেরও বিষয় নয়। এটা হলো সামাজিক সৌন্দর্যবোধ। তবে হ্যাঁ, শরিয়তের বাইরে গিয়ে কোনো সামাজিকতাই পালন করা যাবে না।

যেমন, হজরত মালেক বিন আনাস রহ. গোসল করতেন, আতর লাগাতেন, সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন এবং খুব জাঁক-জমকের সাথে হাদিসের দরসে বসতেন।

সুতরাং হে আলেম, নিজেরমতো নিজের সৌন্দর্য সম্মান ও ইলম নিয়ে চলো। রাজা-বাদশাহদের দরবারে যে সকল আলেমগণ ধরনা দিচ্ছে, তাদের দিকে কখনো ঈর্ষার চোখে তাকিয়ো না। দরবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই আলেম ও ইলমের জন্য নিরাপদ। যারা দরবারে আসে, তারা বাহ্যিকভাবে যতটুকু প্রাপ্ত হয় কিংবা আশা করে, তার চেয়ে বহু বহু গুণ তারা নিজেদের সম্মান মর্যাদা ও ইলমের নূর থেকে বঞ্চিত হয়।

হাদিস ও ফিকহের সম্রাট হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ. কখনো রাজা-বাদশাহর দরবারে আগমন করেননি। তারাও তাকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। এটি খুবই দৃঢ় মনের মানুষের কাজ। এর জন্য সাহস ও হিম্মত লাগে।

সুতরাং হে আলেম, আপনি যদি সুখ শান্তি ও স্বস্তি চান, তবে আপনার ঘরের প্রান্তে বসে যান। নিজের কাজ-কর্ম করুন। আর নিজের স্ত্রী-পরিবারের সাথে সাক্ষাতের জন্য সময় নির্ধারণ করে রাখুন। আপনার বাড়িতে আপনার একটি নিজস্ব কামরা থাকবে। সেখানে একান্তে আপনি আপনার ইলম চর্চা করবেন। কিতাব নিয়ে আলোচনা করবেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন। এবং বাইরের সাধারণ মানুষদের সাক্ষাৎ ও আলোচনার জন্য সময় নির্বাচন করে রাখুন।

কিছুটা উপার্জনের চেষ্টা করুন, যাতে অন্যের সম্পদের আশা করতে না হয়। এটিই হলো দুনিয়াতে একজন আলেমের হৃদয়ভরা সুখ ও আনন্দের পরিবেশ।

একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.কে কিছু সাধারণ ব্যক্তি বলল, আপনার কী অসুবিধা হবে? আমাদের সাথে আরও কিছুক্ষণ বসে যান!

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বললেন, 'আমাকে এখনই যেতে হবে। সাহাবি ও তাবেয়িদের বিভিন্ন মজলিসে বসতে হবে।' তিনি এর দ্বারা উদ্দেশ্য

করেন কিতাবের পাতায় চোখ বোলানো, অধ্যয়ন করা– যেখানে সাহাবি ও তাবেয়িদের কথা রয়েছে।

আর যদি কোনো আলেমের সচ্ছলতা অর্জিত হয়। যার কারণে মানুষের ওপর আর নির্ভর করতে হয় না এবং নির্জনতাও লাভ হয়। সেই সাথে যদি কিতাব লেখার যোগ্যতাও থাকে– তবে তো তার সুখ ও আনন্দের ঝরনা বয়ে যাওয়ার কথা। আর এর সাথে যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। নির্জন মোনাজাত ও প্রার্থনায় আনন্দ অনুভব হয়– তবে তো মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই সে যেন জান্নাত প্রাপ্ত হয়ে যায়– জগতে এরচেয়ে আনন্দ ও খুশির কিছু থাকে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট আমাদের প্রার্থনা– তিনি যেন আমাদের পূর্ণতার হিম্মত প্রদান করেন এবং সৎকর্মের সক্ষমতা দান করেন। আমিন।

আত্মকথন

জীবনের বিভিন্ন অবস্থানে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাদের অবস্থা নিয়ে আমি একদিন চিন্তা করলাম। দেখলাম, অধিকাংশ মানুষই একটি সময়ে এসে আফসোস প্রকাশ করছেন।

এদের মধ্যে কেউ যৌবনে গোনাহের মধ্যে সময় কাটিয়েছে। কেউ ইলম অর্জনে অলসতা করেছে। কেউ অন্যায়ভাবে জীবন উপভোগ করেছে। এদের সকলেই বার্ধক্যে এসে আফসোস-অনুশোচনায় আক্রান্ত হয়েছে। আফসোসের কারণ– অতীতের সেই গোনাহের আস্বাদ এখন আর নেই। কিংবা সেই শক্তিও আজ রহিত। কিংবা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত না হওয়া। এখন তাই বার্ধক্যের সময়গুলো অনুশোচনা ও আফসোসের মধ্যে অতিবাহিত করছে।

শেষ বয়সে কোনো বৃদ্ধের যদি গোনাহের সম্পর্কে সচেতনতা আসে– তখন সে আফসোস করে– হায়! কত অপরাধই না করেছি। আর যদি তখনো গোনাহের প্রতি অনুশোচনা না আসে, তবুও তাকে আফসোস করতে হয়– হায়! সেই আস্বাদন ও মজা তো আর নেই। আর আসবেও না কখনো!

কিন্তু যে ব্যক্তি তার যৌবনকাল ইলম অর্জনের জন্য ব্যয় করেছে, বার্ধক্যে এসে সে তার আহৃত ইলমের ফল ভোগ করবে এবং সে যা অর্জন করেছে তা রচনা করার স্বাদ উপভোগ করবে। এবং ইলমের যে স্বাদ সে লাভ করেছে তার তুলনায় দেহের হারানো সুখ-সম্ভোগকে কিছুই মনে করবে না। সাথেসাথে তার মাঝে রয়েছে এমন একটি আগ্রহ ও আকর্ষণ– যার মাধ্যমে সে উদ্দিষ্ট ইলমের প্রত্যাশা করে। এই তলবের স্বাদ কখনো কখনো অর্জিত উদ্দিষ্টের চেয়েও উপভোগ্য হয়ে থাকে। যেমনটি কবি বলেছেন–

اهتز عند تمني وصلها طربا ... ورب أمنية أحلى من الظفر

> আমি আমার কাঙ্ক্ষিত জিনিসের আকাঙ্ক্ষাকালে আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছি বেশি। কারণ, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা তো তা লাভ করার চেয়েও অনেক বেশি স্বাদের ও উপভোগের।

আমি আমার ওই সকল আত্মীয়স্বজনের অবস্থার সাথে নিজের অবস্থাকে তুলনা করে দেখেছি, যারা তাদের জীবনকে দুনিয়ার উপার্জন ও অর্জনের জন্য

ব্যয় করেছে। আমি আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকে ইলম অন্বেষণের পেছনে ব্যয় করেছি। আমি দেখলাম তারা যা অর্জন করেছে তা আমার একেবারে হাত ছাড়া হয়ে যায়নি– তবে এমন জিনিস ব্যতীত যদি তা আমার অর্জিত হতো, তাহলে তার জন্য আমাকে আফসোসই করতে হতো।

এরপর আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করলাম। আমি দেখলাম, পৃথিবীতে আমার জীবনযাত্রা তাদের জীবনযাত্রার চেয়ে অনেক ভালো। মানুষের মাঝে আমার যশখ্যাতি তাদের যশখ্যাতির চেয়ে বেশি। আর আমি ইলমের গুণে যা অর্জন করেছি, তার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

এ সময় শয়তান আমাকে বলল, এর জন্য তুমি কি তোমার ক্লান্তি ও বিনিদ্র রজনীর কথা ভুলে গেছ?

আমি তাকে বললাম, হে মূর্খ, ইউসুফকে দেখার তুলনায় হাত কাটার কষ্ট তো কিছুই নয়। বন্ধুর বাড়ির পথ কখনো দীর্ঘ ও কষ্টকর হয় না।

আমি আমার ইলম তলবের স্বাদের মাঝে যে সকল কষ্ট ও কঠিনতার মুখোমুখি হয়েছি, সেগুলো আমার কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত বিষয়ের তুলনায় মধুর চেয়ে মিষ্টি মনে হতো।

শৈশবে আমি আমার সাথে কিছু শুকনো রুটি রাখতাম। এরপর হাদিসের অন্বেষণে বের হয়ে যেতাম। একসময় বাগদাদে ইসা নদীর তীরে এসে বসতাম। কারণ, রুটিগুলো এমনই শক্ত ও শুষ্ক হয়ে থাকত যে, আমি পানি ছাড়া রুটিগুলো খেতে পারতাম না। যখনই আমি একটি লোকমা খেতাম, তখনই এক ঢোক পানি পান করতাম। আমার আকাঙ্ক্ষা সব সময় ইলম অর্জনের স্বাদ উপভোগ করত। আমার মনে হয় সেই স্বাদ ও মনোবল আমার জীবনে এই ফল বয়ে এনেছে যে, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, হাদিসের বিভিন্ন বিষয় এবং সাহাবি ও তাবেয়িদের জীবনী সর্বাধিক শুনেছি বলে পরিচিতি লাভ করেছি। তার আদর্শ সম্পর্কে অবগতির ক্ষেত্রে ইবনে আযওয়াদের মতো পাণ্ডিত্য লাভ করেছি।

এগুলো আমার আচরণ ও আমলের ক্ষেত্রেও প্রভাব রেখেছে। আমি আজ স্মরণ করতে পারি– আমার সেই শৈশবে, তারুণ্যে ও কৌমার্য সময়ে এক পিপাসার্ত ব্যক্তি যেমন রক্ষিত ঠান্ডা পানির দিকে ধাবিত হয়, আমার নফসও তেমন বিভিন্ন দিকে ছুটতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজের ব্যাপক ইলমের ফলে

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি আমার যে সমীহ ও ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণে আমি এগুলো থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হই।

হ্যাঁ, মানুষ ভুল করে। ভুলের ঊর্ধ্বে সে নয়। আমিও আমার নিজের ক্ষেত্রে সেই বিভিন্ন ভুলে জড়িয়ে পড়ার ভয় করতাম। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানি– তিনি আমাকে সেই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি আমাকে ইলমের অভ্যন্তরীণ মারেফাত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এবং নির্জন নিরালায় ইলম অর্জনের বিপুল আস্বাদন দান করেছেন। এমনকি আমি তখন ইলমের মধ্যে এতটাই বেশি নিমগ্ন হয়ে থাকতাম যে, তখন যদি হজরত মারুফ কারখি রহ. এবং বিশর হাফি রহ.ও আমার সাথে দেখা করতে আসতেন, তবুও আমি হয়তো বিরক্তই হতাম। ইলম আমাকে পেয়ে বসেছিল। নিমজ্জিত করে রেখেছিল। এমনকি আমাকে বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। প্রতিফলে তখন আমি খুব কম মানুষকেই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম। কখনো ইলম আমাকে রাতের নামাজে এবং প্রভুর সাথে একান্ত প্রার্থনায় দাঁড় করিয়ে দিত। আবার কখনো শারীরিক পূর্ণ সুস্থতা সত্ত্বেও এটা থেকে বঞ্চিত রাখত। ইলমের মধ্যেই ডুবে থাকতাম।

আমি যদি আমার ইলমের প্রাজ্ঞতা দিয়ে না জানতাম যে, এটাই মানুষের প্রকৃতি। মানুষের অভ্যাস ও সংস্কৃতি। কখনো উত্থান, কখনো পতন। এটা না জানলে হয়তো আমি আমার রাত্রজাগরণ নিয়ে গর্ববোধ করতাম। কিংবা কখনো সেটা সম্ভব না হলে হতাশ হতাম। কিন্তু তার প্রতি আমার যেমন ভয় রয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণ আশাও রয়েছে। অবশ্য কখনো কখনো আমার আশার পাল্লাটাই বেশি ভারি হয়ে ওঠে। কেননা, আমি আমার শৈশব থেকেই আমার প্রতি তার দয়া ও অনুগ্রহের বহর দেখে আসছি। আমার অবুঝ বয়সেই আমার পিতা মারা যান। মা আমাদের প্রতি তেমন লক্ষ রাখতে পারতেন না। তখনই আল্লাহ আমার স্বভাবে ইলমের ভালোবাসা গেঁথে দেন। আমার যাত্রা শুরু ইলমের সাথে। ইলমের সুবাস মেখে মেখে।

আমার প্রতিপালক আমাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সজাগ করেছেন এবং আমাকে এমন বিষয়ে অবহিত করেছেন, যা আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। এভাবে ধীরে ধীরে তিনি আমাকে সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। কত শত্রু অনিষ্ট করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি সেগুলো সব প্রতিহত করে দিয়েছেন। এভাবে যখন একে একে আমার প্রতি তার

অনুগ্রহের কথাগুলো ভাবতে থাকি—তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন, রক্ষা করেছেন, নিরাপদ করেছেন, আলেমের মর্যাদা দিয়েছেন ও সম্মানিত করেছেন—তার এই অতীত অনুগ্রহগুলোই আমাকে ভবিষ্যতের দিকে একটু বেশি আশান্বিত করে তোলে।

ওয়াজের মজলিসে এ যাবৎ আমার হাতে দু-লাখের বেশি মানুষ তাওবা করেছে। আমার হাতে দু-শতেরও বেশি মানুষ মুসলমান হয়েছে। কত উদ্ধত অহংকারী মানুষের দু-চোখ আমার ওয়াজে অশ্রু ঝরিয়েছে।

এসকল নিয়ামত ও অনুগ্রহের মধুর প্রাপ্তিতে যার আঁচল ভরে আছে, প্রভু হে, সে আরও পূর্ণতার আশা তো করতেই পারে!

হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ভয়ের বিষয়টিও প্রবল হয়ে ওঠে। আমার যত ত্রুটি, কমতি অপরাধ ও গোনাহ– সেদিকে তাকালে শির আপনিই নত হয়ে আসে।

একবার এক মজলিসে বসে আছি। আমার চারপাশে প্রায় দশ হাজারের মতো মানুষ। ওয়াজের প্রভাবে তাদের প্রতিটি হৃদয় বিগলিত। প্রতিটি চোখ থেকে ঝরছে অশ্রু। হঠাৎ আমি আমার নফসের দিকে লক্ষ করে বললাম, এই যে এত মানুষ—সবাই রক্ষা পেয়ে গেল আর হয়তো তুমি ধরা খেয়ে গেলে—তখন তোমার কী অবস্থা হবে?

আমি আমার অস্তিত্বে প্রবল প্রকম্পন নিয়ে বলে উঠলাম, হে আমার প্রভু, আমার প্রতিপালক, আপনি যদি আমার প্রতি আজাবেরও ফয়সালা করে থাকেন, তবুও এই লোকদের আপনি তা কখনো জানতে দেবেন না। এটা আমার জন্য শুধু নয়, আপনার মহান মর্যাদা রক্ষার জন্যও। তাহলে লোকজন বলবে, যার প্রতি সে আহ্বান করে জীবন পার করল, তিনিই তাকে শাস্তি দিলেন!

প্রভু হে, আপনার নবীকে একবার বলা হয়েছিল, 'আপনি মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়ে দিন।' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'বাহ্যিকভাবে তো সে মুসলিম, তাকে হত্যা করা হলে লোকজন বলে বেড়াবে, মুহাম্মদ তার সাথিদের হত্যা করছে।'

প্রভু হে, আমার জীবনের কোনো আমলই যদি কবুল না হয়, তবু আপনি অনুগ্রহ করে আমার প্রতি মানুষের যে ভালো ধারণা– তা রক্ষা করুন। হে রাব্বুল আলামিন, সকল প্রশংসা আপনারই।

لا تبر عوداً أنت ريّشته ... حاشا لباني الجود أن ينقضا

لا تعطش الزرع الذي نبته ... بصوب إنعامك قد روضا

হৃদয়কাড়া এই পালকগুলো আপনিই দিয়েছেন তাকে, কেটে দিয়েন না। তার কত মহত্ব, বঞ্চনায় সক্ষম হয়েও যিনি করেছেন প্রদান!

সেই তৃণ-ফসলগুলোকে করবেন না বিমর্ষ বিরান, আপনার পরিচর্যা ও অনুগ্রহে হয়ে উঠেছে যা শোভিত মরুদ্যান।

কল্পিত সুখ ও বাস্তব সুখ

মানুষের কয়েকটি গোপন প্রকৃতি রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো, পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং পেয়ে হারানো।

বিষয়টি একটু গভীর ও সূক্ষ্ম। তাই এটার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছি। যেমন, কোনো পুরুষের নিকট যখন কোনো কাঙ্ক্ষিত বস্তু– যেমন নারী, না থাকে, তখন সে নিজেকে বঞ্চিত ভাবতে থাকে। একাকী মনে করতে থাকে। যদি কোনো এক মায়াবী নারী তার পাশে থাকত, জীবন যেন তার কানায় কানায় ভরে উঠত। কিন্তু বাস্তবে যখন সে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি পেয়ে যায়, তখন আর সেই কল্পিত সুখ সে বাস্তবে ঠিক সেভাবে অনুভব করে না।

অর্থাৎ মানুষ যখন তার কাঙ্ক্ষিত আরাধ্য বস্তু পেয়ে যায়, কিছুদিনের মধ্যেই সে তার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং অন্য আরেকটির দিকে ঝুঁকতে থাকে।

এর কারণ কী?

এটা কখনো এ কারণে হতে পারে– জিনিসটি কিংবা মানুষটি পাওয়ার আগে তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সে ছিল অনবহিত কিংবা বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্জিত। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নৈকট্যের কারণে এখন তার সকল দোষ-ত্রুটি ও অসৌন্দর্যগুলো তার কাছে প্রকাশিত, উদ্ভাসিত এবং রীতিমতো পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

আবার কখনো এই নিরাসক্তি আসে মানুষের প্রকৃতিগত কারণে। যেমন, মানুষ যখন বড় কোনো সংগ্রাম ও সাধনা করে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি প্রাপ্ত হয়ে যায়,
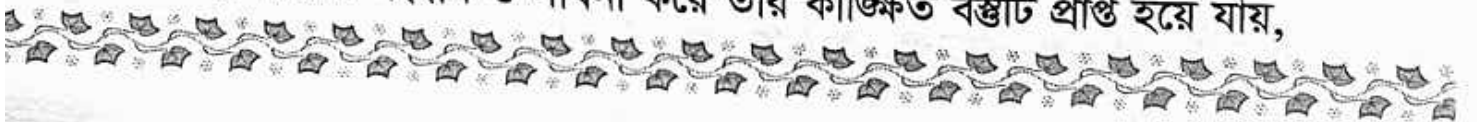
তখন তার প্রতি আকর্ষণও কমে যায়। মানুষ সব সময় তার আয়ত্বের বাইরের জিনিসের দিকে উৎসুক উন্মুখ হয়ে থাকে। এ কারণে কারও ক্ষেত্রে কখনো নিরবচ্ছিন্ন ভালোবাসা সম্ভব নয়।

তাহলে দীর্ঘস্থায়ী ভালোবাসা কীভাবে সম্ভব? এটা সম্ভব হবে মধ্যপন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে। অর্থাৎ মানুষ তার মন যেদিকে এবং যার দিকে আকর্ষিত হয়, তাকেই গ্রহণ করবে। কিন্তু এটাকে 'ইশক কিংবা পাগল-প্রণয়' এর দিকে নিয়ে যাবে না। বরং তার অবস্থা হবে– কিছুটা দূরত্ব। কিছুটা নৈকট্য। ভারসাম্য বজায় রাখবে। তাহলে আর পরিমাণে অধিক মিলনে বিরক্ত হবে না এবং কঠিন বিরহে কষ্টও পাবে না।

কিন্তু 'আশেক কিংবা পাগল-প্রণয়ী' সকল সময়ই কষ্ট পায়। বিরহে হয় ক্ষত-বিক্ষত আর মিলনে হয় স্বপ্নভঙ্গ।

যেমন কবি বলেন,

وما في الأرض أشقى من محب ... وإن وجد الهوى عذب المذاق

فتسخن عينه عند التداني ... وتسخن عينه عند الفراق

পৃথিবীতে প্রেমিকের মতো হতভাগা কেউ নন, বিরহ শেষের মিলন হলেও কষ্ট দেবে মনন। ঝরবে অশ্রু বিদায় বেলায়, আবার যখন মিলন।

মুমিনের নিয়ত তার কর্মের চেয়েও উত্তম

মানুষ তার উচ্চ মনোবলের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় কষ্টের মুখোমুখি হয়। কারণ, যার মনোবল উঁচু হয়, সে সবক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিষয় অর্জন করতে চায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সময় ও শরীর তাকে সঙ্গ দেয় না। এবং উপায়-উপকরণও তার সহায় হয় না। তখন সে কষ্টে আপতিত হয়।

ঠিক একইভাবে আমাকেও অতি উচ্চ মনোবল দেওয়া হয়েছে। আমি এটা নিয়ে বড় কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করি। অবশ্য আমি এটা বলি না যে, হায়, আমার যদি উচ্চ মনোবল না থাকত! কারণ, যদিও জ্ঞানহীনতার পরিমাণ অনুযায়ী নির্বোধ মানুষের জীবন আরামদায়ক হয়ে থাকে। তবুও একজন উচ্চ মনোবলসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞানহীনতার মাধ্যমে জীবনের নির্বিঘ্ন স্বাদ আস্বাদনের প্রত্যাশী নয়। বরং সে কষ্ট ও পরিশ্রম করতে ভালোবাসে। এতেই তার তৃপ্তি।

তাই যাকে উচ্চ মনোবল দান করা হয়েছে, তাকে তার মনোবলের উচ্চতা অনুযায়ী কষ্ট ভোগ করতে হবে। যেমনটি কবি বলেন,

وإذا كانت النفوس كبارا   تعبت فى مرادها الأجسام

মনোবল যখন উঁচু হয়, তখন তার উদ্দেশ্য অর্জনে দেহকে ক্লান্ত-শ্রান্ত হতে হয়।

আমি কিছু লোককে দেখেছি, তারা তাদের উচ্চ মনোবল ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করেছে। আমি তাদের বিষয় সন্ধান করে দেখলাম– তারা শুধু একটি শাস্ত্রের মাঝেই তাদের মনোবল সীমাবদ্ধ রেখেছে এবং তারা আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের জ্ঞানের স্বল্পতাকে পরোয়া করে না।

যেমন কবি রাজি বলেন,

ولكل جسم في النحول بلية ... وبلاء جسمي من تفاوت همتي

প্রত্যেক দেহের ক্ষয় প্রাপ্তি ও রুগ্নতার বিপদ রয়েছে। আমার দেহের বিপদ হচ্ছে আমার মনোবলের বৈচিত্র্য ও একাধিক্য।

আমার হিম্মতও তাই একইসাথে একাধিক বিষয়ের সর্বোচ্চতা কামনা করে। কিন্তু তাদেরটি তেমন নয়। তাদের হিম্মতের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে হয়তো দুনিয়ার সামান্য কর্তৃত্ব অর্জন করা। যেমন, আবু মুসলিম খোরাসানি যৌবন বয়সে ঘুমোতে চাইতেন না। তখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, স্বচ্ছ মেধা, উচ্চ মনোবল ও সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন নিয়ে জীবনযাপনের প্রত্যাশী মন আমাকে ঘুমোতে দেয় না।

তাকে বলা হলো, কিসে আপনার এই প্রচণ্ড পিপাসা নিবারণ হবে?

তিনি বললেন, রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে।

তাকে বলা হলো, তাহলে আপনি তার সন্ধান করুন।

তিনি বললেন, ভয়-ভীতি ছাড়া তা লাভ করা যায় না।

তখন তাকে বলা হলো, তাহলে আপনি ভয়-ভীতিকে মাড়িয়ে যান।

তিনি বললেন, জ্ঞান-বুদ্ধি বাধা সৃষ্টি করে।

এবার তাকে বলা হলো, তাহলে আপনি কী করতে চান?

তিনি বললেন, আমি আমার জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করব এবং তার মাধ্যমে এমন বিপদ অতিক্রম করব, যা মূর্খতাছাড়া অতিক্রম করা যায় না এবং জ্ঞান ও বুদ্ধির মাধ্যমে এমন কিছু অর্জন করব, যা জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়া রক্ষা করা যায় না। কারণ, মানুষের অখ্যাতি তার অস্তিত্বহীনতার নামান্তর।

আমি এই বেচারার প্রতি লক্ষ করলাম, দেখতে পেলাম, সে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আখেরাতকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভে তৎপর হয়েছে। সে কত হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। অবশেষে সে তার প্রত্যাশিত জীবনের কিছু সুখ-সম্ভোগ লাভ করেছে। কিন্তু সে আট বছরের বেশি সেই সুখ লাভ করতে পারেনি। তারপর তাকে অপহরণ করে হত্যা করা হলো এবং সে নিকৃষ্টতম অবস্থায় আখেরাতে পাড়ি জমাল।

আমি এই লোকটির বিষয়ে চিন্তা করে দেখলাম, তার সকল হিম্মত ও চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দুনিয়া অর্জন।

এরপর আমি আমার হিম্মত ও মনোবলের প্রতি লক্ষ করলাম। দেখলাম, তা খুবই বিস্ময়কর! সেটা হচ্ছে, আমি এই পরিমাণ ইলম অর্জন করতে চাই, আমি নিশ্চিত জানি যে, সে পরিমাণ জ্ঞান আমি অর্জন করতে পারব না। কারণ, আমি বিভিন্ন শাস্ত্রের সকল জ্ঞান অর্জন করতে চাই এবং প্রত্যেক

শাস্ত্রের পরিপূর্ণ ও সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করতে চাই। এটি এমন একটি বিষয়– যার কিয়দাংশ অর্জনও সম্ভব নয়। যদি আমার সামনে কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনে উচ্চ মনোবলের কাউকে দেখি যে, সে শাস্ত্রের সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করেছে, তাহলে দেখি যে, সে অন্য শাস্ত্রে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাই আমি তার মনোবলকে অসম্পূর্ণ মনে করি। যেমন, যিনি মুহাদ্দিস, তার ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন হয়নি এবং যিনি ফকিহ, তার ইলমুল হাদিসের জ্ঞান অর্জন হয়নি। আমার মনে হয়– মানুষের মনোবলহীনতার কারণেই হয়তো বিভিন্ন শাস্ত্রে জ্ঞানের স্বল্পতাকে মেনে নিতে হয়।

এরপর আমি ইলম অনুযায়ী পরিপূর্ণভাবে আমল করতে চাইলাম। তাই আমি বিশর হাফির পরহেজগারী ও তাকওয়া এবং মারুফ কারখি রহ.-এর নির্মোহতা ও সাধনা অবলম্বন করতে চাইলাম। কিন্তু গ্রন্থ রচনা, লোকদের পাঠদান, তাদের সাথে মেলামেশা ও সম্পর্ক বজায় রেখে তা অবলম্বন করা অসম্ভব বিষয়। এরপর আমি মানুষদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে চাইলাম, কিন্তু তাদের দান-দক্ষিণা এর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। আর অন্যদের থেকে দান-দক্ষিণা গ্রহণ করাকে উচ্চ মনোবল অপছন্দ করে।

তারপর আমি সন্তান-সন্ততি লাভ করতে চাইলাম, যেমন আমি গ্রন্থাদি রচনা করতে চাই। যাতে আমার মৃত্যুর পর উভয়টি আমার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু এগুলো অর্জন করতে হলে মনের একাকিত্ব ও নির্জনতাকে বেছে নিতে হয়।

এরপর আমি ভালো ও পছন্দনীয় জীবনোপকরণগুলো উপভোগ করতে চাইলাম। কিন্তু সম্পদের স্বল্পতা তাতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য যদি তা অর্জিতও হয়, তবুও তা মনোবলের দৃঢ়তাকে বিক্ষিপ্ত করে ফেলে। এভাবে আমি আমার দেহের জন্য উপকারী ও উপযোগী খাদ্য ও পানীয় চাই। কেননা, দেহ বিলাসিতা ও সৌন্দর্যের প্রত্যাশী। কিন্তু এখানেও বাধা হয়ে আছে সম্পদের স্বল্পতা। আর এই সবকিছু একত্র করার চেষ্টা হলো বিভিন্ন বিপরীত জিনিসের একত্রকরণের একটি ব্যর্থ চেষ্টা।

আমি তো চাই না, দুনিয়ার কোনো অর্জন আমার ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার আঁচড় কাটুক এবং আমার ইলম ও আমলে কোনো প্রকার প্রভাব ফেলুক। কিন্তু বাস্তবতা অতি নির্মম! একটির সাথে আরেকটির যেন সাংঘর্ষিক সম্পর্ক– যেমন, আমার ইলমের মাঝে নিমগ্নতা, গ্রন্থাদি রচনায় হৃদয়ের ব্যস্ততা এবং দেহের উপযোগী ও চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য-খাবার সংগ্রহের সাথে

রাতের নামাজ, পরহেজগারি ও তাকওয়া বাস্তবায়নের কষ্টকর সম্পর্ক রয়েছে। একদিকে মানুষের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদেরকে পাঠদান, অন্যদিকে হৃদয়ের পরিশুদ্ধির জন্য নির্জনে ছুটে যাওয়া। একদিকে মানুষের জন্য আমার দরদ, তাদেরকে উপকার করা, অন্যদিকে অধীনস্থ পরিবার-পরিজনের জন্য অপরিহার্য খোরাক সন্ধান– সবকিছু সমন্বয় করতে গিয়ে আমার পরহেজগারির এ কী দূরাবস্থা হয়ে দাঁড়ায়?

তবুও আমি আমার নিজেকে কষ্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। সম্ভবত নিজেকে কষ্ট দেওয়ার মাঝেই আমার আত্মার সংশোধন রয়েছে। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তো এই যে, আমি মহান সত্তার নৈকট্য অর্জনে সহায়ক সর্বোচ্চ সকল বিষয় অর্জন করার চেষ্টা করব। কেননা, কোনো কিছুর প্রতি ব্যাকুলতা অনেক সময় উদ্দেশ্যের দিকে পথ দেখায়। আমি আমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে অনর্থক নষ্ট হওয়া থেকে হেফাজত করি। আমার ইচ্ছা ও অভিলাষ যদি লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, তাহলে তো ভালো, অন্যথায় মুমিনের নিয়ত তো তার কর্মের চেয়েও উত্তম।

নফসের ভুলের ক্ষেত্রে সহানুভূতি দেখানো

পূর্বের এই অধ্যায়টি শেষ করার পর মনে হলো, নফসকে অবশ্যই তার পথ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা দরকার। আর সেটা হলো, তার প্রতি কোমল আচরণও করা উচিত। কারণ, এক মারহালা পরিমাণ সময়ে যে মুসাফির দুই মারহালা অতিক্রম করতে চায়, সে তো বাস্তবেই একসময় ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়। সে কারণে যথাসম্ভব সহনীয় আচরণের সাথে চলা– যাতে গতি অব্যাহত থাকে।

আমরা জানি, যখন বাহনের প্রাণীগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়ে, রাখাল তখন তাকে বিশ্রাম প্রদান করে। নতুন এই বিশ্রাম আবার বাহনগুলোর মাঝে নতুন উদ্যমের সৃষ্টি করে। মুক্তার খোঁজে সাগরের তলদেশে মুক্তা আহরণকারী ডুবুরীকেও অক্সিজেনের জন্য ওপরে আসতে হয়[৮৬]। নতুবা অব্যাহত যাত্রা মরুর জাহাজ শক্তিশালী উটকেও ক্লান্ত করে ফেলে। রাস্তা চলা তখন কঠিন হয়ে পড়ে।

[৮৬]. এটা সেলেন্ডারে অক্সিজেন নেওয়ার আগের কথা– অনুবাদক

নিজের নফসকে কীভাবে কতটুকু বিশ্রাম দেওয়া দরকার, সেটা যদি কেউ জানতে চায়, তবে সে সিরাত থেকেই তা জেনে নিতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো নফসের সাথে একটু নরমি আচরণ করতেন। হাসি-মজাক করতেন। স্ত্রীদের সাথে মিশতেন। চুমো খেতেন। শরবত খেতেন। প্রচণ্ড গরমে ঠান্ডা পানি পান করতেন। উপযুক্ত খাবার গ্রহণ করতেন। যেমন, পিঠের ও সিনার গোশত। মিষ্টান্ন খেতেন। এর সবকিছুই যেন শরীর নামক বাহনকে রাস্তা চলার সহজতার জন্য প্রস্তুত করা। কিন্তু যারা বাহনকে খাদ্য-খাবার না দিয়ে অব্যাহত চালানোর চেষ্টা করেন, চাবুক দিয়ে পেটালেও তা চলতে চাইবে না।

তাই নফসকে কঠোরভাবে যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, আবার বৈধতার মধ্যে মাঝেমধ্যে একটু সবুজ চারণভূমিতে ছাড়ও দিতে হবে। তবেই না সফর নির্বিঘ্ন হবে।

যেমন কবি আবু আলি ইবনে শাবিল বলেন,

يحفظ الجسم تبقى النفس فيه ... بقاء النار تحفظ بالوعاء

فباليأس الممض فلا تمتها ... ولا تمدد لها طول الرجاء

وعدها في شدائدها رخاء ... وذكرها الشدائد في الرخاء

يعد صلاحها هذا وهذا ... وبالتركيب منفعة الدواء

শরীরের বিদ্যমানতায় নফসের অবস্থান, পাত্রের রক্ষায় যেমন অবশিষ্ট থাকে আগুন। প্রবল হতাশায় তাকে মেরে ফেলো না, আবার আশার উচ্চতায় ছেড়ে দিয়ো না তার লাগাম। কষ্টের দিনগুলোতে শোনাও আশার বাণী, আর সুখের সময়ে স্মরণ করাও বিপদের সংঘটন। নরম ও গরমের এই যে পরিক্রমা, এতেই রয়েছে তার সমূহ কল্যাণ ও সংশোধন।

পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক থাকা

৫৭৫ হিজরি বছরের প্রথম দিকে বাগদাদে ভীষণ খাদ্যসংকট দেখা দিল। হু হু করে খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যেতে লাগল। যখনই বাইরে থেকে কোনো গম-যবের চালান আসে, লোকজনের মধ্যে তা কেনার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। লোকজন পাল্লা দিয়ে সেই খাদ্য কিনতে থাকে।

ঠিক এই সময়ে যারা আগে থেকেই সারা বছরের খোরাক মজুদ করে রেখেছিল, তারা রীতিমতো মানুষের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠল। তাদের তখন তৃপ্তিদায়ক গর্বিত উচ্চ শির। আবার এপ্রিলের প্রথম দিকে আগেই যারা খাদ্য কিনে রেখেছিল, তারা খুবই খুশি হলো। তারা দ্বিগুণ মূল্যে তাদের দ্রব্যগুলো বিক্রয় করতে সক্ষম হলো। আর যারা ছিল নিঃস্ব দরিদ্র– খাদ্যখাবার নেই, তারা তাদের বাড়ি-ঘরের সকল জিনিসপত্র বিক্রয় করে হলেও খাবার কিনতে লাগল। তবুও যেন কুলিয়ে উঠতে পারে না। মানুষের সামনে মানুষের লাঞ্ছনা অপদস্থতা ও হীনতা প্রকাশিত হয়ে পড়তে লাগল। অনেকেই যারা সম্মানিত ও মুখাপেক্ষীহীন ছিল, কিন্তু অসতর্ক এই পরিস্থিতিতে তারাও আর তাদের সম্মান টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হলো না। ক্ষুধা ও দরিদ্রতা যেন সবই কেড়ে নিতে লাগল।

আমি আমার নফসকে এ সময় একদিন ডেকে বললাম, হে নফস, এই পরিস্থিতি থেকে একটি শিক্ষা গ্রহণ করে রাখো। এমন একদিন আসবে, আগে থেকেই যার অধিক সৎকর্ম গচ্ছিত থাকবে, সে সেদিন অন্যদের ঈর্ষার কারণ হবে। সেদিন সে খুশি হবে, কঠিন সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে। আর সর্বদিক দিয়ে লাঞ্ছিত অপমানিত ও দুর্ভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি, যে এই পরিণাম সম্পর্কে অবহেলা ও উদাসীনতা দেখিয়েছে।

সুতরাং তুমি আজকেই সতর্ক হও। মানুষদের সতর্ক করো। এবং যতদিন শরীরে রুহ রয়েছে, এই অর্জনের মৌসুমে যা কিছু পারো অর্জন করে নাও। তোমার তো কোনো পাথেয়-খাদ্য নেই। অথচ জেনে রাখো, সেইদিনের সেই ভীষণ সময়ে নিজেদের তীব্র প্রয়োজনের কারণে কেউ কারও প্রয়োজনের দিকে ফিরেও তাকাবে না।

তাৎক্ষণিক স্ফূর্তি স্থায়ী মর্যাদাকে রহিত করে

আমি একবার আমাদের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো এবং খারাপ লোকদের বিষয়ে চিন্তা করলাম। তাদের মাঝে এই পার্থক্যের কারণ কী? কোন মৌলিকতার কারণে মানুষের মাঝে এই পার্থক্য সূচিত হয়?

আমি বুঝতে পারলাম, এর কারণ হলো বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি। যে মানুষের মৌলিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি ভালো, সে অপরিহার্যভাবেই ভালো পথে চলে এবং ভালো হয়। আর যার বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি বিনষ্ট ও বিভ্রান্ত, সে অনিবার্যভাবেই খারাপ পথে চলে এবং খারাপ হয়।

এই বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয় কীভাবে?

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন চিন্তা করে, তখন সে বুঝতে পারে– অবশ্যই এই বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন। এবং তার আনুগত্য করা অতি আবশ্যক। এরপর সে তার রাসুলের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা করে। এবং তার মুজিজা ও সিরাত দেখে বুঝতে পারে– তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল। এবং তাঁর অনুসরণ আমাদের জন্য আবশ্যক।

এরপর সে এমন কাজগুলোই করার চেষ্টা করে, যে কাজগুলো তার স্রষ্টার নৈকট্য অর্জনে সহায়ক হয়। অর্থাৎ স্রষ্টার পছন্দ অনুযায়ী আমল করে। ইলম অন্বেষণের বিষয়টি যদি তার কাছে কঠিনও মনে হয়, কিন্তু যখন সে এর প্রতিদান ও প্রতিফল নিয়ে চিন্তা করে, তখন এটি তার কাছে সহজ হয়ে যায়। রাতের নির্জন ইবাদতও যদি তার কাছে কখনো কষ্টকর হয়, তখনও এটি তার পুরস্কারের আশায় সহজ হয়ে যায়।

যখন সে কোনো লোভনীয় জিনিস দেখে, তাতে লিপ্ত হওয়ার আগে সে তার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে। এরপর যখন সে বুঝতে পারে এটি হারাম এবং এটি সম্পাদনের স্ফূর্তি ও স্বাদ তো দ্রুতই নিঃশেষ হবে, কিন্তু তার প্রভাব ও শাস্তি স্থায়ীভাবে রয়ে যাবে তখন সে এটিকে বর্জন করে। এবং এই সুচিন্তার কারণে এটা বর্জন করতে তার সহজ হয়। এভাবে যখন সে এমন ব্যক্তির থেকে প্রতিশোধ নিতে চায়, যে তাকে কষ্ট দিয়েছে, তখন সে ধৈর্যধারণের প্রতিদানের কথা চিন্তা করে এবং রাগান্বিত অবস্থায় কোনো মানুষের কাজের ওপর পরবর্তী আফসোসের কথা চিন্তা করে– তখন সে এই প্রতিশোধ থেকে

ফিরে আসে। এভাবে এই পার্থিব জীবনের সংক্ষিপ্ততা নিয়েও সে চিন্তা করে– সময় খুবই অল্প, সুতরাং সে এই অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সবচেয়ে ভালো কাজগুলো করে নেওয়ার চেষ্টা করে– যাতে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি গাফেল, নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন– সে শুধু তাৎক্ষণিক আনন্দ-স্ফূর্তির কথাই চিন্তা করে এবং সেগুলো নিয়েই মজে থাকে। তার কোনো দূরদর্শিতা নেই।

এদের মধ্যে কেউ কেউ এই বিশ্বজগৎ ও তার স্রষ্টা নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনাই করে না। সুতরাং তারা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে বসে এবং তার কোনো হুকুমের গুরুত্ব দেয় না। এভাবে তারা তাঁর রাসুলকেও অস্বীকার করে এবং তার আনীত বিধানকে স্বীকার করে না। তারা শুধু বর্তমান ও তাৎক্ষণিক বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়। এগুলোর সূচনা ও সমাপ্তি নিয়ে কোনো দৃষ্টিপাত করে না।[৮৭] সুতরাং তাদের নিকট খাদ্যদাতা নিয়ে কোনো জ্ঞান নেই—শুধু খাবারের দিকে তাদের দৃষ্টি। যদি তারা একবারও চিন্তা করত— তিনি তাদের কীভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করেছেন? কেন তিনি পৃথিবীতে মানুষের শরীর সংরক্ষণের এত এত উপাদান জড়ো করে দিয়েছেন? তাহলেই তারা সকল জিনিসের বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হতো।

আল্লাহ মানুষের জন্য যে সকল বিষয়ে আকর্ষণ ও আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছেন, এগুলোর প্রতিফল ও পরিণাম সম্পর্কেও তারা চিন্তা করে না। তারা শুধু তাৎক্ষণিক স্বাদ আস্বাদন করেই ক্ষান্ত থাকে।

দুনিয়াতেও এমন কত ব্যক্তি তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় কোনো অপরাধ করায় তার হয়তো হাতকাটা যায়, হদ আপতিত হয়, কিসাস নেওয়া হয় কিংবা অপমানিত হতে হয়। এভাবেই তাৎক্ষণিক আনন্দ-স্ফূর্তি অনেক সময়ই স্থায়ী মর্যাদাকে বিনষ্ট করে। করে লাঞ্ছিত।

এগুলোর কারণ হলো, পরিণামের দিকে দৃষ্টিপাত না করা। এর সূচনা হয় মস্তিষ্ক থেকে। সমাপ্তি হয় প্রবৃত্তির অনুসরণের মধ্য দিয়ে।

আল্লাহ তাআলার নিকট আকুল প্রার্থনা– তিনি যেন আমাদের এমন সচেতনতা প্রদান করেন, যার মাধ্যমে আমরা পরিণাম দেখতে পাই। এবং আমাদের কাছে কোনো জিনিসের শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা কদর্যতা প্রকাশিত হয়ে যায়। তিনি সকল বিষয়েই ক্ষমতাবান।

---

[৮৭]. আজকের দিনে আধুনিক গবেষণা শুরু হওয়ার আগের কথা এগুলো। যদিও অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি সেই আগের মতোই রয়ে গেছে– বস্তুতান্ত্রিক, একপেশে এবং প্রতারণাপূর্ণ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমাকে এমন এক উচ্চ হিম্মত প্রদান করা হয়েছে– যা তার শেষসীমায় পৌছতে চায়। কিন্তু সেই তুলনায় মানুষের জীবন খুবই ছোট। আমি যা চাই, তাতে এই সময়ে পৌছানো সম্ভব নয়। সুতরাং এ নিয়ে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করতে থাকি একটি অতি দীর্ঘ জীবনের, শারীরিক সুস্থতার এবং আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছবার।

কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি ও ব্যবস্থাদি এটার ক্ষেত্রে বাধ সেধে বলল, তুমি যা প্রার্থনা করছ, সাধারণভাবে এটা কখনো হওয়ার নয়।

আমি বললাম, আমি তো এমন সত্তার নিকটই প্রার্থনা করছি, যিনি এই সকল স্বাভাবিকতার বাইরেও ক্ষমতা রাখেন। অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।

একবার এক ব্যক্তির নিকট কিছুলোক এসে বলল, আমাদের সামান্য কিছু প্রয়োজন রয়েছে।

সেই ব্যক্তি বলল, অসুবিধা কী! আমি একটি আস্ত তেজি ঘোড়া প্রদান করে দিলাম।

আরেক ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা হলো, আমাদের খুবই সামান্য কিছু প্রয়োজন– আপনার যাতে কষ্ট না হয়।

সেই ব্যক্তি বললেন, অসুবিধা কী! তোমাদের সকলের জন্যই আমার দ্বার খোলা।

এখন কথা হলো, দুনিয়াবাসীর একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিই যদি কারও প্রার্থনার ক্ষেত্রে এমন উদারহস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে কেন আমরা এমন সত্তার নিকট আমাদের উচ্চ প্রার্থনার ক্ষেত্রে আশা রাখব না? অথচ তিনি অতি সম্মানিত এবং শক্তিমান।

আমি আল্লাহ তাআলার নিকট এই প্রার্থনা করেছিলাম ৫৭৫ হিজরির রবিউস সানি মাসে। এখন কথা হলো, যদি আমার জীবনসীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয় আর আমি যদি আমার সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারি তবে তো একদিন এই বিষয়ে আলোচনা করব। আমার অভিষ্ট লক্ষ্যের কথাও বলব। আর যদি কোনোটিই না হয়, তবে তো আমার প্রভুই কল্যাণের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত। তিনি অতি কৃপণকেও বঞ্চিত করেন না। তাকে ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

শরিয়তের প্রচারে ইলম একটি পদ্ধতি

আল্লাহর প্রশংসা– যিনি আলেম ও ফকিহদের মাধ্যমে এই উম্মাতের ওপর বড় অনুগ্রহ করেছেন। তারা আল্লাহ তাআলার আদেশের উদ্দেশ্য বোঝেন এবং তার লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হন। এভাবেই তারা দ্বীন ও শরিয়তের সংরক্ষণ করেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দেন।

শয়তান তাদের ব্যাপারে খুবই কঠোর আচরণ করে এবং তাদেরকে ভয়ও পায়। কারণ, এঁরা তাকে কষ্ট দিতে এবং তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। কিন্তু সে তাদেরকে কষ্ট দিতে এবং বিভ্রান্ত করতে সক্ষম নয়। শয়তান তার ষড়যন্ত্রের খেলায় বিজয়ী হয় শুধু মূর্খদের এবং যাদের বুঝ-বুদ্ধি কম, তাদের নিয়ে। এবং তার সবচেয়ে ভয়ংকর খেলা হলো, সে একটি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে ইলম বর্জন করাকে সুশোভিত করে তোলে। এমনকি তারা তখন এতেই শুধু ক্ষান্ত থাকে না– বরং যারা ইলমের চর্চায় নিমগ্ন রয়েছে, তাদেরকে নিন্দা-মন্দ করে। হায়, তারা যদি বুঝত, এর দ্বারা মূলত দ্বীন ও শরিয়তকেই নিন্দা-মন্দ করা হয়! কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে বলছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾

> 'হে রাসুল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি তা প্রচার করো।'

এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও উম্মতদের বলেছেন, بلغوا عنى ولو آية –তোমরা আমার পক্ষ থেকে প্রচার করো, যদি একটি আয়াতও শেখো।' এখন কথা হলো, তারা যদি ইলম চর্চায় নিমগ্নই না হয়, তাহলে মানুষদের নিকট তারা শরিয়ত পৌঁছাবে কীভাবে? দ্বীনের জ্ঞানই যদি তাদের অর্জিত না হয়, তাহলে তারা মানুষের কাছে পৌঁছাবেটা কী?

ঠিক এই বিভ্রান্তিমূলক কথা কিছু বড় জাহেদদের থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, বিশর হাফি রহ.। তিনি একদিন আব্বাস ইবনে আবদুল আজিমকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'তুমি হাদিস চর্চাকারীদের নিকট বসবে না।'

আরেক দিন ইসহাক ইবনে যাইফকেও তিনি বলেন, 'তুমি হলে একজন হাদিস চর্চাকারী, সুতরাং তুমি আমার নিকট আর আসবে না।' অবশ্য এ কথা বলার পর একটু সহজ করার জন্য বললেন,

إنما الحديث فتنة إلا لمن أراد الله به. وإذا لم يعمل به فتركه أفضل.

> 'হাদিস হলো মানুষের জন্য একটি ফিতনা– যদি না সে তার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়ার ইচ্ছা করে। আর যদি তার ওপর আমলই না করা হয়, তবে তার চর্চা বর্জন করাই ভালো।'

বিশর হাফি রহ. থেকে এটি এক আশ্চর্যজনক বক্তব্য! তিনি কীভাবে মনে করলেন যে, হাদিসের অধ্যয়নকারীরা এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে না? এবং তারা এর ওপর আমল করবে না?

হ্যাঁ, হাদিসের ক্ষেত্রে আমল দুই প্রকার।

এক. ওয়াজিব বা আবশ্যক আমল। এটা বর্জন করা কারও জন্য জায়েয নয়।

দুই. নফল বা ঐচ্ছিক আমল। যার ওপর আমল করা আবশ্যক নয়– এগুলো ঐচ্ছিক বিষয়। আর হাদিস নিয়ে চর্চা করা এই ধরনের নফল নামাজ ও রোজার চেয়েও অনেক উত্তম। আমার ধারণা, তিনি সম্ভবত তার কথা দিয়ে অব্যাহত রোজা, জিকির ও জুহুদকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু কথা হলো, এগুলো বর্জনকারীকে তো নিন্দা-মন্দ করার কিছু নেই। আর যদি তিনি বোঝাতে চান যে, এভাবে হাদিসের জ্ঞানের মধ্যে মগ্ন থাকা যাবে না– তাহলে তার কথা সম্পূর্ণই ভুল। কারণ, ইলমের এই সকল শাখাই প্রশংসনীয়।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, আলেমরা যদি এই হাদিস ও ফিকাহচর্চা ছেড়ে দেয়, তবে কি বিশর হাফি রহ. ফতোয়া দিয়ে বেড়াবে? মানুষকে মাসআলা-মাসাইল বলে বেড়াবে?

আল্লাহর ওয়াস্তে এমন কারও কথার দিকে দৃষ্টি দেবে না– যে ফকিহ নয়। এমনকি বিশর হাফি রহ.-এর মতো মহান ব্যক্তির নামও যেন তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে! আল্লাহ তাকে মাফ করুন। আমিন।

প্রথম প্রাধান্য হবে স্রষ্টা

যিনি বুদ্ধিমান, তিনি স্রষ্টার কথাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, যদিও এতে কোনো সৃষ্টি অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি রাগান্বিত হয় কিংবা অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রম, যে ব্যক্তি মানুষের কথাকে প্রাধান্য দিয়ে স্রষ্টার কথাকে দূরে সরিয়ে রাখে, আল্লাহ হয়তো একসময় যাকে সে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল, তাকেই তার ওপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন।

খলিফা মামুন একবার তার এক মন্ত্রীকে বলেছিলেন,

لا تعص الله بطاعتي فيسلطني عليك.

> 'আমার আনুগত্য করতে গিয়ে তুমি আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করো না। তাহলে হয়তো তিনি আমাকেই আবার তোমার ওপর চাপিয়ে দেবেন।'

তাহের ইবনে হুসাইনের কথা আমরা জানি। সে খলিফা মামুনের ভাই মুহাম্মদ আমিনকে হত্যা করেছিল এবং তার মাথা শূলে চড়িয়েছিল। যদিও সবকিছু করেছিল খলিফা মামুনের ইচ্ছাতেই। কিন্তু তবুও এই বিষয়টি বাদশাহর অন্তরের মধ্যে একটি ক্ষতের মতো জ্বলজ্বল করত। এ কারণে তিনি তাহেরকে মুখোমুখি দেখতে চাইতেন না।

একদিন তাহের ইবনে হুসাইন খলিফা মামুনের নিকট এলো। খলিফা তাকে দেখে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। তাহের তাকে বলল, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ আপনার চোখকে কাঁদাবেন না। আপনার এই বিশাল সাম্রাজ্য অর্জিত হয়েছে। আপনার এখন সুখ ও প্রতাপের দিন।

খলিফা বললেন, আমি কাঁদছি এমন এক বিষয়ের স্মরণে– যার উচ্চারণও লজ্জাজনক। যার অভ্যন্তরে রয়েছে দুঃখ। এবং যার কষ্ট থেকে কেউ রক্ষা পাবে না।'

এর কিছুক্ষণ পর তাহের খলিফার নিকট থেকে বের হয়ে এলো। সে ছিল খুবই ধুরন্ধর একলোক। সে বিপদের গন্ধ টের পায়। তৎক্ষণাৎ খলিফার খাদেম হুসাইনের হাতে দুই হাজার দিরহাম দিয়ে বলল, তুমি যেভাবেই হোক খবর সংগ্রহ করবে খলিফা কেন কাঁদলেন?

দুপুরে খলিফা মামুন খাবার খেতে বসেছেন। পাশে হুকুমের আশায় বসে আছে খাদেম হুসাইন। খলিফা পানি পান করতে চাইলেন। তিনি খাদেমকে বললেন, হে হুসাইন, পানি পান করাও।

খাদেম হুসাইন বলল, হে মহামান্য খলিফা, আমি অবশ্যই আপনাকে পানি পান করাব। কিন্তু তার আগে আপনাকে বলতে হবে, আপনি তখন কেন কাঁদলেন, যখন তাহের এসেছিল আপনার নিকট?

খলিফা বিস্মিত হয়ে বললেন, হে হুসাইন, তোমার এমন কি হলো যে, তুমি আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ?

খাদেম হুসাইন কাঁচুমাচু হয়ে বলল, হুজুর, তেমন কিছু না– তবে আপনার ক্রন্দনে আমিও ভীষণ ব্যথিত হয়েছি। এ জন্যই তার কারণ জানতে ইচ্ছে করছে।

খলিফা বললেন, হে হুসাইন, এটি এমন এক বিষয়, তুমি যদি কাউকে বলো, তাহলে তোমাকে হত্যা করে ফেলব।'

খাদেম হুসাইন এবারও বিনয়ে গদগদ হয়ে বলল, 'হে মহামান্য খলিফা, আমি কখনো আপনার কোনো গোপন বিষয় কোথাও প্রকাশ করেছি কি! এটা হতেই পারে না।'

খলিফা বললেন, আমার ভাই মুহাম্মদের কথা আমার স্মরণে এসেছিল। এবং তাকে যে লাঞ্ছনার সাথে হত্যা করা হয়েছিল– সে কথাও আমার খুব মনে পড়ছিল। দুঃখে কষ্টে আমার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। কান্নার মাধ্যমে যেন তার কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। অবশ্যই তাহেরকে আমার পক্ষ থেকে এর প্রতিকার পেতে হবে।'

এরপর হুসাইন যথারীতি এই কথা গোপনে তাহেরকে জানিয়ে দেয়। তাহের বিপদের গন্ধ টের পেল। তখনই সে ঘোড়া ছুটিয়ে আহমদ ইবনে আবি খালেদের নিকট চলে এলো। এবং তাকে ঘটনা বর্ণনা করে বলল, 'আমি আপনার কাজের প্রতিদান দেবো। আপনি আমাকে খলিফার চোখ থেকে দূরে সরিয়ে দিন।'

আহমদ বলল, 'অসুবিধা নেই, অচিরেই আমি তার ব্যবস্থা করছি।'

এরপর একদিন আহমদ খলিফা মামুনের নিকট এসে বলল, গতরাতে দুঃশ্চিন্তায় আমি একটুও ঘুমোতে পারিনি।

খলিফা বললেন, কেন, কিসের চিন্তা?

আহমদ বলল, আপনি গাসসান ইবনে আব্বাদকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। অথচ তার এবং তার সাথিদের মাথায় বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। আমি তুর্কিদের আক্রমণের ভয় করছি। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে ব্যাপক ধ্বংসের আশঙ্কা করছি।

খলিফা বললেন, তবে তুমি কাকে সেখানে নিযুক্ত করতে চাও?

আহমদ বলল, তাহের ইবনে হুসাইনকে।

খলিফা আহমদের কথা গ্রহণ করে নিলেন। এভাবেই আহমদ ইবনে আবি খালেদের সুপারিশে তাহেরকে খোরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। তাহের খোরাসানে এসে নিরাপদে শাসনকার্য চালাতে লাগল।

অনেক দিন অতিবাহিত হলো। এরপর একদিন তাহের জুমার দিন খুতবার সময় খলিফার নামে দোয়া করা বর্জন করল।

খলিফার গুপ্তচর এসে তাকে বলল, আপনি তো খলিফার নামে দুআ করেননি। আমি কি খলিফাকে এ কথা জানিয়ে দেবো?

তাহের বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে। আপনি লিখে দিয়েন না।

কিন্তু তাহের দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুমাতেও একই কাজ করল। খলিফার নামে দুআ পড়ল না।

এবার গুপ্তচর খলিফার কাছে বিষয়টা লিখে জানিয়ে দিলো। খবর শুনে খলিফা আগে আহমদ ইবনে আবি খালেদকে ডেকে আনলেন। এবং তাকে বললেন, 'তোমার কৌশলেই তাহের এখান থেকে পলায়ন করতে পেরেছে। আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, তুমি যেভাবে তাকে আমার আয়ত্ব থেকে বের করে নিয়ে গেছ, সেভাবে যদি তাকে আবার আমার নিকট ফিরিয়ে আনতে না পারো, তবে এর শাস্তি তোমাকেই ভোগ করতে হবে। এখন যাও। দ্রুত ব্যবস্থা করো।'

আহমদ খলিফার দরবার থেকে বের হয়ে এলো এবং নিজেই তার দলবল নিয়ে খোরাসানের দিকে রওনা করল। পথের মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তবুও

এই অসুস্থতা নিয়েই সে চলতে লাগল। অবশেষে যখন তারা রায় নামক স্থানে পৌছল, তখন সংবাদ এলো—তাহের মৃত্যুবরণ করেছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংবাদ নিয়ে জানা গেল আসলেও তা-ই। বেচারা মারা গেছে।

বন্ধুদের থেকে এই ঘটনা শোনার পর আমিও এ-জাতীয় একটি ঘটনা তাদের নিকট বর্ণনা করলাম। হারুনুর রশিদ একবার বাগদাদের বাইরে ভ্রমণে বের হলেন। এই সুযোগে লোকজন মুকতাফিকে শাসক নিযুক্ত করার ইচ্ছা করল। এবং কিছু লোক এসে সাক্ষ্য দিলো যে, হারুনুর রশিদ খলিফা হওয়ার উপযুক্ত নয়। সুতরাং লোকজন তাকে বাদ দিয়ে মুকতাফিকেই শাসক নিযুক্ত করে নিল।

এর কিছুদিন পর একদিন সেই সাক্ষ্যদাতাদের একজনের কথা মুকতাফির নিকট ওঠানো হলো। কিন্তু তিনি তার নিন্দা করে বললেন, এই লোক তো হারুনুর রশিদের বিপক্ষে আমাকে সাহায্য করেছিল। ব্যাটা সুবিধাবাদী!

এমনই হয়– আল্লাহকে সন্তুষ্ট না করে বান্দাকে সন্তুষ্ট করতে গেলে, আল্লাহ একসময় সেই ব্যক্তিকেই তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে তুলতে পারেন। এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, অন্তরের মালিক আল্লাহ।

আর এর বিপরীত– যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয় এবং সঠিক পথে থাকে, হয়তো একসময় আল্লাহ তাআলা সেই অসন্তুষ্ট ব্যক্তিকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন।

যেমন, মন্ত্রী ইবনে হুবাই আমাকে একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, 'খলিফার পুত্র আল মুসতানজিদ বিল্লাহ একবার আমার নিকট একটি চিঠি লিখে বললেন, আমি যেন তাকে তার বাবার গোপন বিষয়গুলো জানিয়ে দিই।' আমি তার বার্তাবাহককে বললাম, আল্লাহর কসম, আমার দ্বারা সেগুলো পড়াও সম্ভব নয়, আর কাউকে জানানোও সম্ভব নয়।'

আমার এ কথায় খলিফাপুত্র ভীষণ রাগান্বিত হলেন। এবং কিছুদিন পর খলিফার ইন্তেকাল হলে তিনি নিজেই তখন খলিফা নিযুক্ত হলেন। আমি তখন তার নিকট গিয়ে বললাম, আমার সততা ও একনিষ্ঠতার বড় প্রমাণ হলো যে, আমি সেদিন আপনাকে খলিফার গোপন বিষয় জানাতে রাজি হইনি।'

খলিফা মুসতানজিদ বিল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, মন্ত্রী সাহেব, আপনি সত্য বলেছেন। যতই আমি ক্রুদ্ধ হই, কিন্তু সেটাই ছিল আমানতদারি। আমারও তা-ই প্রয়োজন।

আমার একবন্ধু আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, একবার কিছুলোক রাজ্যের কোষাধ্যক্ষের নিকট এসে বলল, রাজ-ভান্ডার থেকে আপনি আমাদের জন্য কিছু ঋণের ব্যবস্থা করে দিন।

কোষাধ্যক্ষকে গভর্নর বললেন, আপনি তাদের ঋণের ব্যবস্থা করে দিন। আর তারা যতটুকু জামানত হিসেবে প্রদান করে, তা-ই রেখে দিন।

অনুমোদনের জন্য বিচারক ইবনে রুতাবির নিকট বিষয়টি পেশ করা হলো। তিনি বললেন, না, আমি কিছুতেই এটা অনুমোদন করব না। এটা একটি জুলুম। আমি এর হুকুম দিতে পারি না।

লোকেরা বলল, আপনার আগেই তো গভর্নর অনুমোদন করে দিয়েছেন। আপনি দেবেন না কেন?

তবুও ইবনে রুতাবি তার মতের ওপর অটল রইলেন। এরপর আরেকজন বিচারককে ডাকা হলো। তিনি এটাকে অনুমোদন করে দিলেন। কিন্তু বিষয়টা একসময় খলিফার কানে গেল। বিচার বসল খলিফার দরবারে। খলিফা ইবনে রুতাবির ক্ষেত্রে বললেন, তিনি অবশ্যই প্রশংসা পাওয়ার মতো কাজ করেছেন। কারণ, তিনি সত্যকথা বলেছেন। তার প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। এরপর তিনি অন্য বিচারককে বরখাস্ত করে দিলেন– যিনি অন্যায়ভাবে গভর্নরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল।

এছাড়াও আরেকটি ঘটনা আমি জানি। ঘটনাটি হলো, একবার এক সুলতান তার নিজের জন্য 'মালিকুল মুলুক– রাজাদের রাজা' উপাধিটি ব্যবহার করতে চাইলেন। এ ব্যাপারে তিনি ফকিহদের নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করলেন– জায়েয হবে কি না? সুবিধাবাদী সকল ফকিহ বললেন, জায়েয হবে। তাদের মধ্য থেকে একমাত্র হজরত মাওয়ারদি বললেন, জায়েয হবে না। জায়েয না হওয়ার কারণগুলোও তিনি বললেন। এতে সুলতান রাগান্বিত হওয়ার পরিবর্তে খুশিই হলেন। কারণ, তিনি সত্য জানতে সক্ষম হলেন। এ ঘটনায় সুলতানের নিকট মাওয়ারদির মর্যাদা অনেকগুণ বেড়ে গেল।

এমন আরও অনেক ঘটনা রয়েছে– বলতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে। এখানেই আপাতত থাক। তবে মূলকথা হলো, কোনো অকাট্য ফরজ বিধানের হুকুম পালনের ক্ষেত্রে কোনো মানুষ যদি অসন্তুষ্টও হয়, তবুও আনুগত্যের মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য প্রদান করাই উচিত হবে। কারণ, মানুষ তো

অতি তুচ্ছ, সে তো কখনো স্রষ্টাকে তোমার প্রতি রাগিয়ে তুলতে পারবে না। কিন্তু তুমি যদি স্রষ্টাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চাও কিংবা করো, তবে এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, একদিন স্রষ্টা তাকে তোমার প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলবেন। তখন তোমার উপায়টা হবে কী?

তীর তো আগেই হারিয়েছ– এবার খড়কুটোও হারাবে!

আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা

বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত হবে– কোনো মানুষের নীতি-নৈতিকতার দিকে লক্ষ করা। সেটা লেনদেন, ওঠাবসা, মেলামেশা ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে হতে পারে। হতে পারে বিয়ে করা বা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও। এরপর দৃষ্টি দেবে মানুষের বাহ্যিক আকার-গঠনের দিকে। বাহ্যিক গঠন ভালো হলে আশা করা যায় তার অভ্যন্তরও ভালো হবে।

কিন্তু মৌলিক নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি এমন যে, সকলেই এটা অনুযায়ী তার জীবনযাপন করে। সুতরাং যার মধ্যে নীতি-নৈতিকতার অভাব রয়েছে, তার ওপর কখনো ভালো কিছুর আস্থা রাখা যায় না।

কোনো নারী যতই সুন্দরী রূপসী হোক, সে যদি একটি নিম্ন বংশীয় পরিবার থেকে আসে, তবে তার সভ্য ভদ্র হওয়া খুবই দুর্লভ ব্যাপার। এই একই কথা নিজেদের সঙ্গী সাথি বন্ধু ও কারবারকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং তোমার চলাফেরা হওয়া উচিত ভদ্র পরিবারের ব্যক্তির সাথে। তাহলেই তুমি নিরাপদ থাকবে। তবে হ্যাঁ, ব্যতিক্রম সকল জায়গাতেই থাকে।

খলিফা হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. একবার এক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে পরামর্শের জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন দেখি, কো ধরনের ব্যক্তিদের আমি কাজে লাগাতে পারি?

লোকটি বলল, যারা দ্বীনদার, তারা তো আপনার নিকট কোনো পদ চাইতে আসবে না। আর যারা দুনিয়াদার আপনি তাদেরকে কোনো পদে বসাবেন না। তবে আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাজে লাগাতে পারেন। তারা কখনো এমন কাজ করবে না– যা তাদের মর্যাদা ও আভিজাত্যকে ক্ষুণ্ন করে।

হুসাইন ইবনে ইয়াহইয়া ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন। ইসহাক বলেন, একবার খলিফা মুতাসিম আমাকে প্রাসাদে ডেকে নিলেন। এরপর আমাকে একেবারে এক নির্জন কামরায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললেন, হে আবু ইসহাক, বহুদিন যাবৎ আমার অন্তরের মধ্যে একটি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। বিষয়টা সম্পর্কে আমি তোমার থেকে কিছু শুনতে চাই। বিষয়টা হলো, আমার ভাই মামুন এমন কিছু লোক তৈরি করে গেছেন, যারা খুবই উদার উন্নত ও আনুগত্যশীল। তার মতো আমিও কিছু লোক তৈরি করেছি, কিন্তু এরা আচরণে তাদের মতো নয়। ব্যাপারটা কী, বলো তো।

আমি বললাম, আপনার ভাই কাদেরকে নির্বাচন করেছিলেন?

খলিফা বললেন, যেমন তাহের, তার ছেলে ইসহাক। সাহলের পরিবার। তুমি দেখেছ, তারা কেমন ছিল। আমিও এভাবে নির্বাচন করেছি আশফিন– সে কোনো কাজের নয়। আসনাশকে নির্বাচন করেছি। তার মধ্যেও তেমন কিছু পাইনি। একইভাবে ইতাখ ও ওয়াসিফ।

আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনিন, এখন আমি একটি উত্তর দিতে পারি, তবে তার আগে আমার নিরাপত্তা দিতে হবে যে, আপনি রাগান্বিত হলেও আমাকে কিছু বলবেন না।

খলিফা বললেন, ঠিক আছে, তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো। কিছুই বলা হবে না।

আপনার ভাই উত্তম বীজের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, এ কারণে তা থেকে তৈরি শাখাগুলো অভিজাত ও ভদ্র হয়েছে। আর আপনি ব্যবহার করেছেন এমন শাখাকে– যার কোনো মূল নেই। এ কারণে তা থেকে উদ্গত শাখা-প্রশাখাতেও কোনো কল্যাণ নেই।

আমার এ কথা শুনে খলিফা বললেন, হে আবু ইসহাক, এ তুমি কী বললে! এতদিন– এই দীর্ঘ সময় আমি যে কষ্ট বয়ে চলেছিলাম, তোমার এই উত্তরের কাছে সে কষ্টও যেন তুচ্ছ হয়ে গেল।

অবশ্য বাহ্যিক গঠন-আকৃতিরও একটা প্রভাব থাকে মানুষের মাঝে। সে কারণে যার গঠন-আকৃতি সুন্দর, কোনো ক্রটি নেই, সাধারণত তার অভ্যন্তরও ভালো হয়ে থাকে। আচরণ ভালো হয়। আর বাহ্যিকতায় ক্রটি থাকলে, সাধারণত ভেতরগত আচরণও ভালো হয় না। একারণে বিকলাঙ্গ,

অন্ধ ও এ ধরনের শারীরিক ত্রুটিযুক্ত মানুষ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। তাদের অধিকাংশের অভ্যন্তরীণ আচরণ থাকে নিম্নমানের। নীচু মানসিকতাপূর্ণ।

তবে একটা কথা– কারও সাথে বন্ধুত্ব করা, মেলামেশা করা কিংবা লেনদেন করা– সকল ক্ষেত্রেই সকলকে যাচাই করে নেওয়া উচিত এবং যথাসম্ভব সতর্ক থাকা উচিত।

শত্রুর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া

বুদ্ধিমানের জন্য উচিত– পরিণামের দিকে খেয়াল করা এবং ভবিষ্যতে যা হতে পারে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকা। আর ভুল পদ্ধতি হলো, তাৎক্ষণিক যা উপকারী, যুৎসই ও শরীরের জন্য আরামদায়ক, পরিণামের কথা না ভেবে সেটাকেই গ্রহণ করা। কারণ, এটা তো তার সঙ্গে সব সময় সম-উপযুক্ত হবে না, তখন এগুলো ছাড়াই তাকে জীবনধারণ করতে হবে। এভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য একটা প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

এভাবে সেই তাৎক্ষণিক আনন্দ-স্ফূর্তির ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যার স্বাদ তো চলে যায়, কিন্তু প্রভাব ও শাস্তি অবশিষ্ট থেকে যায়। তাৎক্ষণিক আরামপ্রদ অবহেলা ও অলসতার ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকা চাই– কারণ, এটা তো তোমাকে স্থায়ী মূর্খতার দিকে ঠেলে দেবে। এবং যে-সকল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য খুবই সূক্ষ্ম কৌশলের প্রয়োজন হয়, সেগুলোর সম্পর্কেও সতর্ক থাকা উচিত। বিশেষ করে যদি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির থেকে কিছু অর্জন করতে হয়। কারণ, সে অল্পতেই তোমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবে। সুতরাং কেউ যদি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির ওপর বিজয়ী হতে চায়, তবে তাকে তার চেয়েও আরও সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

বুদ্ধি ও কৌশল অবলম্বনের বিভিন্ন কিতাবে এই ধরনের অনেক বিষয় ও কলাকৌশল উল্লেখিত রয়েছে—যেগুলো মস্তিষ্ককে আরও শান্তি ও ধারালো করে। আমি নিজেও 'كتاب الأذكياء' নামক কিতাবে এ বিষয়ে কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছি।[৮৮]

---

[৮৮]. আমার দুটি বই– 'বুদ্ধির গল্প'র অধিকাংশ এবং 'বুদ্ধির জয়'-এর অনেকগুলো গল্প এখান থেকেই উৎকলিত– অনুবাদক।

যেমন, এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কথা পাওয়া যায়। সে কারও পক্ষে দাঁড়াত না। কাউকে ভয়ও করত না। একবার এক মন্ত্রী তাকে নিজের পক্ষে টানার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকটি তাকে কোনো পাত্তাই দিলো না। তার পক্ষেও গেল না। এরপর একদিন সেই মন্ত্রী একলোককে বলল, তুমি অমুক লোককে গিয়ে বলো, আমি তার ব্যাপারে আমিরুল মুমিমিনের সাথে কথা বলেছি। তিনি তার জন্য এক হাজার দিরহাম প্রদান করেছেন। সুতরাং সে যেন এসে আমার থেকে দিরহামগুলো নিয়ে যায়।'

মন্ত্রীর কথামতো লোকটি সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট এসে সংবাদ পৌঁছে দিলো। সম্ভ্রান্ত লোকটি তখন বলল, আমিরুল মুমিনিন যদি আমার জন্য কোনোকিছু প্রদান করেই থাকে, তাহলে তিনি সেটা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেই হয়। আমাকে তার কাছে যেতে বলবেন কেন? আসলে তার উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে তার ওপর আমার সহানুভূতি তৈরি করে তার পক্ষে নেওয়া।'

এ কারণে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির সাথে কারবার করতে গেলে নিজেকেও ব্যাপক সতর্ক থাকতে হবে—যেমন কোনো দাবারু তার চালের ক্ষেত্রে চারপাশে সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

আবার কিছু বুদ্ধিমান লোক যখন আরেক বুদ্ধিমান লোকের থেকে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে অক্ষম হয়, তখন তাকে শিকার করার জন্য আরেক রকম কৌশল অবলম্বন করে। হাদিয়া প্রদান করে। সামনাসামনি খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখায়। লোকটি যদি সামান্য বুদ্ধির অধিকারী হয়ে থাকে, তবে সে এই কৌশলের জালে সহজেই আটকে যায়। আর বুদ্ধিতে যদি তার চেয়েও শক্তিশালী হয়, তবে সে বুঝতে পারে এই আচরণের আড়ালে লুকিয়ে আছে স্বার্থসিদ্ধির লোভাতুর বাসনা। তখন সে তার থেকে আরও বেশি সতর্কতা অবলম্বন করে।

খুব সতর্ক থাকা দরকার সেই ব্যক্তির থেকে, যাকে তুমি কোনোদিন কোনো ক্ষেত্রে কষ্ট দিয়েছ। নিশ্চয় তার অন্তরে তোমার প্রতি শত্রুতার বীজ বপন হয়ে গেছে। এখন সেই গাছের কাঁটা থেকে তুমি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারো না। তুমি কিছুতেই তার বাহ্যিক আনুগত্য ও হৃদ্যতা দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। তার সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সব সময় সতর্ক থাকবে। এখানে অসতর্ক হলেই

মরেছ। যেমনটি ঘটেছিল জুব্বাই-এর সাথে কুসাই-এর। ঘটনাটি খুবই প্রসিদ্ধ।[৮৯]

আর যদি তোমার কোনো শত্রুকে দেখ তোমাকে আর ঘাটাচ্ছে না, তাহলে তুমিও দ্বিতীয়বার তার সাথে শত্রুতা দেখিয়ো না। তার সাথে ভালো ব্যবহার করো। সে-ও তোমার শত্রুতা ভুলে যাবে। সে-ও ধারণা করবে না যে, তুমি তার খারাপ আচরণের জন্য গোপনে তার প্রতিশোধ নিতে চাও।

তবে মানুষের সবচেয়ে দুর্বলতা হলো, শত্রুর প্রতি তার শত্রুতা প্রকাশ করে ফেলা। উত্তম ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো, যথাসম্ভব শত্রুর প্রতিও সহানুভূতিশীল আচরণ করা। যাতে তার শত্রুতার ধার কমে আসে। এটা যদি পরিপূর্ণ কাজে না-ও লাগে, তবুও এটা তাদের অত্যাচার থেকে বিরত রাখবে। নিশ্চয় শত্রুদলের মাঝেও এমন কেউ থাকবে– যে তোমার এই ভালো আচরণে লজ্জাবোধ করবে। হয়তো তোমার প্রতি তার অন্তর পরিবর্তন হয়ে যাবে।

আমাদের সালাফে সালেহিনের মধ্যে কিছু মানুষ তো এমন ছিলেন, তাদের যদি কেউ গালি দিত, তবে তারা তার নিকট হাদিয়া পাঠিয়ে দিতেন। এর দ্বারা তারা হয়তো তাৎক্ষণিক ফায়দা পেয়ে যেতেন। কিংবা তার অন্তর পরিবর্তনের জন্য কোনো কৌশল অবলম্বন করতেন।

শেষকথা, এসকল ক্ষেত্রে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে হয়। এর জন্য পরিণাম সম্পর্কে দৃষ্টিপাতকারী এবং চিন্তাশীল একটি মস্তিষ্ক থাকাই যথেষ্ট। প্রতিটি সংকটেরই সম্ভাব্য একটি সমাধান রয়েছে। শুধু বের করার মতো একটি সজাগ মস্তিষ্ক প্রয়োজন।

---

[৮৯]. ঘটনাটি আমার 'বুদ্ধির জয়' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– অনুবাদক।

গোপন বিষয়ের গোপনীয়তা

আমি দেখেছি, অধিকাংশ মানুষই তাদের গোপন বিষয় গোপন রাখতে সক্ষম হয় না। বিশেষ করে যখন সেটা হয়ে থাকে কোনো অসুস্থতা, দুঃখ কিংবা সম্পদ ও ভালোবাসার বিষয়। এগুলো উল্লেখ করতে এক ধরনের সুখ অনুভব হয়।

কিন্তু মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচায়ক হলো, যে ক্ষেত্রে সে কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায়, তা গোপন করে রাখা। আর দুর্বলতার প্রকাশ হলো, তা অর্জনের আগেই প্রকাশ করে দেওয়া। তখন অনেক সময় তার এই প্রকাশের কারণে কাজটি আর অর্জিত করা সম্ভব হয় না। অন্যদের নিকট যে ব্যক্তি কথাটি প্রকাশ করে দিয়েছে, তার ওপরও কোনো ওজর-আপত্তি চলে না। কারণ, প্রথম প্রকাশক তো তুমি নিজেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত যখন কোনো গাজওয়া বা লড়াইয়ের জন্য বের হতেন, তখন তিনি তার সঠিক দিকের কথা উল্লেখ করতেন না।

এখন কেউ যদি বলে, আমি তো আমার খুব আস্থাভাজন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেছিলাম। এখানে আমার দোষ কী?

আমি তাকে বলি, যে কথাটি দ্বিতীয় ব্যক্তির কানে চলে যায়, সেটাই আসলে প্রকাশমান কথা হয়ে যায়। তোমার বন্ধু তো সর্বক্ষণ সে কথা গোপন রাখতে পারে না—তুমি নিজেই যেহেতু পারোনি।

এমন অনেক ঘটনার কথা শুনেছি, বাদশাহ হয়তো কাউকে পাকড়াও করবেন। এই কথা তার বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তির কাছে গোপনে প্রকাশ করেছেন। দেখা গেছে, সে কথা নির্দিষ্ট অপরাধীর কানেও পৌঁছে গেছে। তখন সে ব্যক্তি পলায়ন করেছে। বাদশাহ আর তাকে ধরতে সক্ষম হয়নি। কিংবা নিজের কোনো বিশেষ পরিকল্পনা বিনষ্ট হয়েছে এই কথা ছড়ানোর কারণে।

সন্তান বা স্ত্রীর নিকটও গোপন বিষয় উল্লেখ করা এক ধরনের দুর্বলতা। তাদের থেকে সম্পদের কথাও গোপন রাখা উচিত। সম্পদ যদি বেশি হয়,

তবে পরিচিতদের মনে হিংসার উদ্রেক করবে। কাউকে কষ্টে ফেলে দেবে। কেউ আবার উত্তরাধিকারীদের মৃত্যু কামনা করবে—এমনকি তোমারও।

কখনো আবার এটার কারণে ডাকাতি, ছিনতাই বা লুণ্ঠনের শিকার হতে পারে। আবার বিভিন্ন প্রার্থনাকারীরা বেশি সম্পদশালীদের নিকট সম্পদের পরিমাণ অনুপাতে বেশি বেশি প্রার্থনা করতে পারে। তাহলে দেখা যাবে, তাদের দিতে দিতেই তোমার সম্পদ নিঃশেষ হয়ে পড়বে।

একইভাবে বিপদাপদের কথাও গোপন রাখা উচিত। কারণ, এর প্রকাশ শত্রুকে ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে আনন্দিত করবে। আর প্রিয় ব্যক্তিদের ফেলবে কষ্টে।

এমনকি নিজের বয়সের বিষয়টিও গোপন রাখা উচিত। কারণ, বয়সটি যদি উপস্থিত ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি হয়, তবে তারা তোমাকে অথর্ব ও জরাগ্রস্ত ভেবে বসবে। আর যদি কম হয়, তবে তারা তোমাকে নিতান্তই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করবে।

যে বিষয়টিতে অনেকেই অবহেলা করে, তা হলো, নিজেদের আড্ডায় ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে আমির বা সুলতান সম্পর্কে এমন গোপন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, অবশেষে এটা তাদের কানে পৌঁছে যায় এবং এটা তখন কথকের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কখনো কখনো কাছের কোনো বন্ধু ব্যক্তির একনিষ্ঠতা, সততা, আমানতদারি ও গোপন আমলের কথাও মানুষের কাছে প্রচার করে দেয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ যখন তার গোপন বিষয় তার স্ত্রী কিংবা বন্ধুর কাছে প্রকাশ করে দেয়, তখন সে সেই স্ত্রী ও বন্ধুর কাছে বন্দি হয়ে পড়ে। স্ত্রীর গুরুতর কোনো অপরাধেও তখন সে সেই স্ত্রীকে তালাক দিতে সক্ষম হয় না। আবার সেই বন্ধুর অপরাধেও তাকে ত্যাগ করতে সাহস পায় না। কারণ, তাদের বিরোধিতা করতে গেলে তারা গোপন কথা প্রকাশ করে দেবে।

সুতরাং সুদৃঢ় মনোবলের মানুষ হলো সেই ব্যক্তি, যে মানুষদের সাথে বাহ্যিকতায় স্বাভাবিক আচরণ করে চলে। তাদের কাছে তার গোপন কথা প্রকাশ করে না। এ অবস্থায় তার কোনো স্ত্রী কিংবা বন্ধু কিংবা সেবকের সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলেও তাদের কেউ তার গোপন বিষয় প্রকাশ করতে সক্ষম হবে না।

সবচেয়ে বড় গোপন বিষয় হলো নিজের নির্জন ও একান্ত বিষয়গুলো। সুতরাং সুদৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তির জন্য উচিত হবে– তার এই নির্জনতার কোনো বিষয় যেন মানুষের কাছে প্রকাশ না পায়। তবে গোনাহের কাজ সে কোথাও করবে না। নির্জনে কিংবা প্রকাশ্যে।

তবে যে ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একটি মস্তিষ্ক রয়েছে, তাকে এগুলো বলার আগেই সে নিজের কাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকে।

কল্যাণকর নির্জনতা

মাঝেমধ্যে সকল মানুষ থেকে নির্জনতা অবলম্বন আমার কাছে খুবই উপকারী মনে হয়– বিশেষ করে আলেম ও জাহেদের জন্য। কারণ, সেখানে তুমি তোমার বিপদে আনন্দিত ব্যক্তিকে পাবে না। নিয়ামতে হিংসাকারী দেখবে না। কিংবা তোমার দোষ অন্বেষণকারী পাবে না।

নির্জনতা কতই না চমৎকার!

তুমি সেখানে গিবতের কদর্যতা থেকে মুক্ত থাকবে। মানুষের সৃষ্ট বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। কপটতাপূর্ণ অবস্থা থেকে রেহাই পাবে। তোমার সময় কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

এরপর অন্তর এই নির্জনতার মধ্যে কতই না চিন্তায় নিমগ্ন হবে। কারণ, চিন্তাশীল অন্তর মানুষের এত ভিড়ভাট্টার চেয়ে নির্জনতাকেই বেশি পছন্দ করে। সেখানেই তার শান্তি। তখন সে চিন্তায় মগ্ন হয় তার দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়াবলি সম্পর্কে। এ যেন সেই জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির মতো– যে নির্জনে তার উত্তাপ অনুভব করে, ধমনীর উঠানামা দেখতে থাকে। নিজের শরীরের মধ্যে যেন নিজেই তখন নিমজ্জিত হয়ে সকল কিছু পরখ করে দেখতে থাকে।

আর মানুষের সীমাহীন মিশ্রণ ব্যক্তিকে যে ভীষণ ক্ষতি করে– তার ভয়াবহতা বলে শেষ করার নয়। কারণ, মানুষ তখন সর্বক্ষণ তার বর্তমান অবস্থার দিকে চেয়ে থাকে কিংবা বর্তমান নিয়েই ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন মানুষের সাথে তার সাক্ষাৎ করতে হয়। তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে হয়। আসে বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের ব্যস্ততা। এসব করতে গিয়ে সে তখন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করারই যেন সুযোগ পায় না। তার অবস্থা হয়

সেই ব্যক্তির মতো, যে সফর করতে চায় এবং সময়ও অতি নিকটে এসে গেছে– এই সময় সে কিছু মানুষের সাথে গল্প করতে বসে গেছে। তাদের সাথে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা জুড়ে দিয়েছে। নানা রকম কথাবার্তায় সময় অতিবাহিত হয়েছে। এর মাঝেই জাহাজ ছাড়ার ভেঁপু বেজে উঠেছে; অথচ এদিকে তার এখনো সফরের কোনো পাথেয় জোগাড় হয়নি।

তাছাড়া নির্জনতায় কিছুই যদি অর্জিত না হয়, তাতে যদি শুধু আখেরাতের যাত্রার পাথেয় নিয়ে চিন্তা করা হয় এবং সংমিশ্রণের খারাবি থেকে বেঁচে থাকা যায়, এটাও কম প্রাপ্তি নয়। আর প্রকৃত নির্জনতা অর্জিত হতে পারে শুধু আলেম ও জাহেদের জন্যই। যদিও তাদের নির্জনতা নিছক আর নির্জনতা থাকে না। নির্জনতাগুলো ভরে ওঠে কত রকম ভাবনা ও নিমগ্নতায়।

প্রথমে আলেমের কথা ধরা যাক–

তার নির্জনতায় তার সঙ্গী হয়ে ওঠে তার ইলম। তার কিতাবগুলো হয়ে ওঠে তার কথক। সালাফদের বিভিন্ন ঘটনাবলি হয়ে ওঠে তার শক্তিদাতা। অতীতের বিভিন্ন ঘটনাবলি তার সাহস জোগায়। আর যদি সে আল্লাহ তাআলার মারেফাতের স্তরে পৌঁছে যায়, তার মুহাব্বতের দরিয়ার কিনারা পেয়ে যায়, তবে তো তার স্বাদ ও আস্বাদ বেড়ে যায় বহুগুণ। তখন সে এই মারেফাতের দৃষ্টি দিয়ে তাকাতে থাকে পুরো বিশ্বজগতের দিকে। তার মাঝের সকল বস্তুর দিকে। এভাবে সে যেন তার অতি বন্ধুর সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়। তার ইলম ও মারেফাতের চাহিদামাফিক আমলে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হয়।

এবার জাহেদের কথা বলি–

নির্জনতার সময় তার ইবাদতগুলোই যেন তার সঙ্গী ও সহচর হয়ে যায়। তার মাবুদই যেন তার সাথি। এরপর যদি তার মারেফাতের স্তর আরও উন্নত হয়ে তার দৃষ্টি সকল সৃষ্টি ও আসবাব থেকে সরে এসে স্রষ্টার প্রতি নিবদ্ধ হয়, তখন তো তার সমুখ থেকে সকল সৃষ্টি অদৃশ্য হয়ে যায়। সৃষ্টির কিছুই যেন তার সমুখে থাকে না। সকল দুঃখ, কষ্ট ও বেদনার উর্ধ্বে সে উঠে যায়। স্রষ্টার সান্নিধ্যে নিমগ্ন হয়। জগৎজোড়া মানুষের মাঝে থেকে সে যেন একাকী একক এক সত্তার সমুখে দণ্ডায়মান। আর যেন কোথাও কেউ নেই। কিছু নেই।

এই যে দু-ধরনের লোক—তারা নিজেরা মানুষদের কষ্ট দেওয়া থেকে মুক্ত। এবং মানুষরাও তাদের কষ্ট থেকে নিরাপদ। বরং তারা সকল আবেদের জন্য আদর্শ। সকল সালেকের জন্য নিদর্শন। শ্রোতা তাদের কথায় উপকৃত হয়। তাদের ওয়াজে চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। সমাজের মাঝে তাদের মর্যাদা ও গাম্ভীর্য সম্প্রচারিত হয়।

কেউ যদি তাদের মতো হতে চায়, তবে অবশ্যই তাকে নির্জনতা অবলম্বন করতে হবে—তা যত কষ্টকরই মনে হোক না কেন। তাহলে একদিন এই ধৈর্যের বেদনা মধু উৎপাদন করবে।

তবে আল্লাহর নিকট তেমন আলেম থেকে আশ্রয় চাই, যে সারা জগতের মানুষের সাথে মিশে বেড়ায়। বিশেষ করে দুনিয়াদার ও রাজা-বাদশাহর সাথে। তাদের সাথে দ্বীন ও সম্পদের লেনদেন করে। প্রতারণা করে এবং প্রতারিত হয়। অবশেষে দুনিয়াদারদের থেকে যতটুকু তার দুনিয়া অর্জন হয়, তার চেয়ে বহু বহু গুণ তার দ্বীন বিনষ্ট হয়।

এসব ফাসেকদের সেই আত্মসম্মানবোধ কোথায় থাকে? যে আলেম এই সম্মানবোধের তোয়াক্কা করে না, সে তো কখনো ইলমের স্বাদ চাখতে পারে না। ইলমের উদ্দেশ্যও সে বোঝে না। সে যেন বিশাল মরুভূমিতে মরীচিকার পানি দেখে দেখে সেখানেই জীবন নিঃশেষ করল।

এমনিভাবে যেই জাহেদ ব্যক্তি সর্ব জায়গায় মিশে চলে—তারও একই অবস্থা। তখন তার মধ্যে অহংকার কাজ করে। আচরণে লৌকিকতা ও মুনাফেকি দেখা দেয়। হরেক রকম পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকম ভান ধরে। এভাবে তার দু-কূলই হারায়। দুনিয়া এবং তার নগদ নিয়ামতও অর্জন হয় না। আবার আখেরাতও বিনষ্ট হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট আমাদের প্রার্থনা—তিনি যেন আমাদের সুমিষ্ট নির্জনতা প্রদান করেন। খারাবি থেকে বিরত থাকার মাঝে মিষ্টতা দান করেন। একান্তে তার নিকট প্রার্থনা ও নিমগ্নতার সৌভাগ্য দান করেন।

দুনিয়ার প্রকৃত সুখ

দুনিয়া প্রত্যাশীগণ দুনিয়ার সুখ আস্বাদনে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। এখানে প্রকৃত সুখ হলো ইলমি মর্যাদা, ক্ষমা, আত্মসম্মানবোধ ও অল্পতুষ্টিতে এবং এগুলোর মাধ্যমে সকল মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠ হওয়ার মধ্যে।

তাছাড়া খাদ্য-খাবারের আস্বাদন এবং যৌন রমণের তৃপ্তি– এগুলোতে শুধু মূর্খরাই লিপ্ত থাকে। এগুলোর স্থায়িত্ব কতটুকু? এগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এর দ্বারা নিজের কিছু অর্জিত হয় না। বরং কিছু গ্রহণ করা আর কিছু পরিত্যাগ করা হয়। সন্তান উৎপাদন হয়। এবং কত দ্রুতই না রমণের আস্বাদন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার প্রভাব থেকে যায়। শরীর দুর্বল হয়।

আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ জমা করার মধ্যেই বা কিসের সুখ? এর মাধ্যমে তো সে সম্পদের গোলামে পরিণত হয়। দিনরাত তার সংরক্ষণে সতর্ক থাকতে হয়। তখন সম্পদের স্বল্পতা আরও বৃদ্ধির দিকে প্রতিনিয়ত খোঁচাতে থাকে।

আর খাদ্য-খাবারে সুখই বা কতটুকু এবং কেমন? ক্ষুধার্ত অবস্থায় ভালো-মন্দ সব একই লাগে। খাওয়া একটু বেশি হয়ে গেলে, সেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তারপর একটা মানুষ আর কতটুকুই বা খেতে পারে? পেট পূর্ণ হওয়ার পর সবকিছুই বিস্বাদ ও অরুচি লাগে।

হজরত আলি রা. বলেন, তিনটি জিনিস মানুষকে বিপদে ফেলে—

১. নারী—তারা যেন শয়তানের পাতানো জ্বলন্ত ফাঁদ।

২. মদ—এটা যেন শয়তানের খোলা তরবারি।

৩. দিনার ও দিরহাম—এ দুটো যেন শয়তানের বিষ মেশানো তির।

যে ব্যক্তি নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, তার জীবনযাপন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি মদের প্রতি আসক্ত হয়, তার স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি রহিত হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি দিনার ও দিরহামের অর্থাৎ সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, সে আজীবন এই দুটোর দাস হয়ে জীবন কাটায়। সুতরাং প্রকৃত সুখ হলো ইলমি যোগ্যতায় এবং চারিত্রিক উৎকর্ষে।

মানুষের প্রকৃত জীবন

পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয় কিংবা প্রিয় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ আমাদের এক স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমরা চিন্তা করি না– মৃত্যুর মাধ্যমে কবরের মধ্যে শুধুমাত্র তার শরীরটা নষ্ট হলো। আর এ জন্যই আমরা দুঃখ করি।

এমন অনেক কিছুই আমাদের চারপাশে সংঘটিত হয়, যেগুলোর গভীর অর্থ নিয়ে আমরা কখনো চিন্তা-ভাবনা করি না। যেমন হাদিসের এই বাণী– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

﴿إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ﴾

নিশ্চয় মুমিনদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখিদের শরীরে প্রবেশ করে থাকে, যেগুলো জান্নাতের গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়।[৯০]

[সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮১]

তাহলে তো আমরা ভেবে দেখতে পাই, আমাদের দেহের মুসাফির আত্মা তো শান্তিতেই রয়েছে। আর মানুষের এই দুনিয়ার শরীর—এটা তো কিছু নয়। এটা নিছক একটি বাহন—যা নষ্ট হয়ে যায়। পচে গলে শেষ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন তাকে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়। সুতরাং এটার বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আমাদের দুঃখ করা উচিত নয়। বরং অন্তরের মধ্যে এই প্রশান্তি আনা উচিত যে, আত্মাসমূহ এখন একটি শান্তিময় জায়গায় অবস্থান করছে। কোনো দুঃখের বিষয় সেখানে নেই। আর অন্যদেরও তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় অতি নিকটেই।

হ্যাঁ, তারপরও মানুষের এই বাহ্যিক শরীরের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে এবং সেটা আমাদের চোখের সামনে থেকে তিরোহিত হওয়ার কারণে আফসোস হয় এবং কষ্ট লাগে। তাকে একসময় সুন্দর গঠন ও আকৃতিতে পৃথিবীতে হাঁটাচলা করতে দেখা গেছে। তার এই শোভিত শরীরটা বিনষ্ট হওয়ার কারণেই দুঃখ বেদনা ভর করছে। কিন্তু কথা হলো, শুধু এই শরীরটাই তো সেই মানুষ নয়। এটা তো নিছক তার বাহন। তার রুহ বা তার মৌলিক

---

৯০. সুনানে ইবনে মাজা: ৪/১৪৩৯, পৃষ্ঠা: ৩৮১– মা. শামেলা।

সত্তার তো কোনো ক্ষয় হয়নি। সেটাই আসল। সেটাই হলো সেই মানুষ। শরীর কিছু নয়।

তুমি এটি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝতে পারো। যেমন তোমার যখন দাঁত পড়ে গেছে। তখন তুমি সেটা হয়তো কোনো গর্তে ফেলে রেখে এসেছ। বাকি জীবনে তুমি কি আর কখনো সেটার খবর নিয়ে থাকো? নাকি তোমার প্রাত্যহিক জীবনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে? থাকে না।

ঠিক একইভাবে মানুষের এই বাহ্যিক শরীর ও গঠনটা ওই দাঁতের মতো। তার বদল ঘটে। মৌলিক আত্মার সাথে তখন আর তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং তোমার কোনো ব্যক্তির শুধু শরীর অপসারিত হওয়া এবং তা বিনষ্ট হওয়াতে তোমার দুঃখ করার কিছু নেই। বরং তুমি তার রুহ বা আত্মার স্বস্তি ও শান্তির বিষয়ে চিন্তা করো। নতুন বিষয়ের কথা ভাবো। আর অচিরেই তার সাথে তোমারও সাক্ষাতের কথা ভাবো।

ঠিক মৃত্যুর বিষয়টা যদি এভাবে চিন্তা করা যায় ও ভাবা যায়, তাহলে আমাদের অনেক দুঃখ লাঘব হবে। বিষয়টাকে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে। আল্লাহই তাওফিকদাতা।

মৃত্যুর এক অন্যরকম রহস্য

অনেক নির্বোধ ব্যক্তিকেই আমি তাকদির বা ভাগ্যের ওপর ক্রোধ বা ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখি। এদের মধ্যে কারও ঈমান হয়তো দুর্বল—তাই এ ধরনের অভিযোগ ও আপত্তি করে। আর কেউ আছে, কুফরির দিকেই ধাবিত হয়ে গেছে। জগতের সৃষ্টি হওয়া, ধ্বংস হওয়া এবং বর্তমানেও জগৎজুড়ে যা কিছু হচ্ছে ও চলছে—এই ব্যক্তির দৃষ্টিতে সবকিছুই অনর্থক। অকারণ। সে বলে বেড়ায়—সৃষ্টির পর এই ধ্বংসের মধ্যে কী কল্যাণ নিহিত? আমাদের কষ্টে যার কোনো লাভ নেই, তবু সেই কষ্ট ও শাস্তির মধ্যেই বা তার কী কল্যাণ নিহিত?

এ ধরনের কথার প্রতিনিধিত্ব করে, এমন একজনকে আমি একদিন ডেকে বললাম, তোমার যদি বুদ্ধি ও বিবেক থাকে, তবে আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। আর যদি তুমি অনর্থক দুনিয়ার বাহ্যিক ঘটনাবলি দেখে কোনো রকম চিন্তা ও যুক্তি ছাড়া এগুলো বলে বেড়াও, তাহলে তোমার সাথে কথা বলা অনর্থক হবে। অযথা সময় নষ্ট হবে।

লোকটি সম্মত হলে আমি তাকে বললাম, তাহলে বুদ্ধি ও বিবেক খাটিয়ে আমি যা বলি সেগুলো শোনো—

এটা কি সাব্যস্ত হয়ে যায়নি যে আল্লাহ তাআলা হলেন সকলের মালিক ও প্রতিপালক? আর মালিকের জন্য অধিকার রয়েছে তিনি যেভাবে চাইবেন সেভাবেই পরিচালনা করবেন? আর এটাও কি প্রমাণিত হয়ে যায়নি যে, তিনি হলেন হাকিম, প্রজ্ঞাবান; আর প্রজ্ঞাবান কখনো অনর্থক কাজ করেন না?

আমি বুঝতে পারছি, আমার এই কথার ক্ষেত্রে তোমার মনে কিছুটা আপত্তি হতে পারে। তুমি বলতে পারো—আমরা দার্শনিক 'জালিনুস' থেকে একটি বক্তব্য পাই। তিনি বলেন, 'তিনি [স্রষ্টা] আসলেই প্রজ্ঞাবান কি না, তা আমি নিশ্চিতভাবে জানি না।' তার এ কথা বলার কারণ হলো, তিনি সবকিছুতেই গড়ার পর ভাঙার উৎসব দেখেন। তিনি স্রষ্টার এই অবস্থাকে সৃষ্টির বিভিন্ন অবস্থার ওপর তুলনা করেন। অর্থাৎ কেউ যখন কোনো জিনিস তৈরি করে, আবার সেটা ভেঙে ফেলে, তাহলে নিশ্চয় সে প্রজ্ঞাবান নয়। স্রষ্টার বিষয়ও তিনি অনেকটা সেরকম মনে করেন।

দার্শনিক জালিনুস—তিনি যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে আমি তার এ কথার উত্তরে তাকেই বলতাম, কীভাবে আপনি দাবি করেন যে, গড়ার পর কিছু ভেঙে ফেলা প্রজ্ঞাপূর্ণ নয়? জগতেই এর অনেক উদাহরণ আছে। তাছাড়া আপনি যে আকল ও মস্তিষ্ক দিয়ে কথা বলছেন, এটা কি স্রষ্টাই আপনাকে প্রদান করেননি? তাহলে কীভাবে তিনি আপনাকে একটি পূর্ণ সম্পূর্ণ শক্তিশালী মেধা দিলেন আর তার নিজেরই পূর্ণ মেধা ও প্রজ্ঞা নেই?

এটা তো এক উদ্ভট দাবি!

ঠিক এ ধরনের পরীক্ষাতেই আক্রান্ত হয়েছিল ইবলিস। সে তার নিজের আকল-বুদ্ধি দিয়ে স্রষ্টার প্রাজ্ঞতার দোষ ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু চিন্তা করে দেখেনি– আকল-বুদ্ধির প্রদাতা আল্লাহ তাআলা সেই আকলের চেয়ে অনেক উর্ধ্বের। তার প্রজ্ঞা সকল জ্ঞানবানদের চেয়ে পূর্ণ ও সম্পূর্ণ। কারণ, তিনি তার সীমাহীন সম্পূর্ণ প্রজ্ঞার মাধ্যমেই মানুষের এই আকল-বুদ্ধি সৃষ্টি করেছেন। যদি সেই দার্শনিক লেখক এই বিষয়টি চিন্তা করতেন, তবে তার সন্দেহ দূর হয়ে যেত। আল্লাহ তাআলা মানুষের এই ধরনের অসম্পূর্ণ বিভ্রান্তির দিকে ইশারা করে বলেছেন—

﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ﴾

> তবে কি কন্যা সন্তান পড়ল আল্লাহর ভাগে আর পুত্র সন্তান তোমাদের ভাগে?
> [সুরা তুর : ৩৯]

অর্থাৎ তিনি কি নিজের জন্য রেখেছেন অস্পূর্ণতা আর তোমার জন্য দিয়েছেন সম্পূর্ণতা?!

একটু ভেবে বলো তো দেখি, তোমাদের এ কেমন দাবি!

সুতরাং যে সকল বিষয় আমাদের বোঝার বাইরে, সেগুলো আমাদের অক্ষমতার কারণেই হয়ে থাকে। অতএব আমরা বলব, এটা সর্বজ্ঞাত ও প্রজ্ঞাবান এক সত্তার কাজ। কিন্তু তিনি আমাদের জন্য তার সম্পূর্ণতা বর্ণনা করেননি। আর গড়ার পর ভাঙা—এ ধরনের বিষয় সংঘটিত হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। অস্বাভাবিকও নয়। যেমন, হজরত মুসা আলাইহিস সালামের নিকট ভালো নৌকাটি ভেঙে ফেলা এবং সুন্দর ছেলেটিকে হত্যা করার হিকমত বা রহস্য জানা ছিল না। তাই তিনি এগুলোকে অন্যায় ভাবছিলেন। কিন্তু যখন

হজরত খাজির আলাইহিস সালাম তাকে এর হিকমত জানিয়ে দিলেন, তখন তিনি মেনে নিলেন। স্রষ্টার সাথে আমাদের অবস্থাও অনেকটা খাজিরের সাথে মুসার অবস্থার মতো।

আমরা কি আমাদের দস্তরখানায় অনেক সুন্দর সুন্দর সজ্জিত খাবার পরিবেশিত হতে দেখি না? সেগুলো কাটা হয়, চূর্ণ করা হয়। আস্ত সবজি ও ফলগুলো কীভাবে টুকরো টুকরো করা হয়। আবার কিছু রান্না করা হয়। আরও অনেক কিছু হয়। কিন্তু এগুলো করতে আমরা বাধা দিই না। বলি না যে, এগুলো নষ্ট করা হচ্ছে। কারণ, আমরা জানি, এসব কাটা-চেরার মধ্যেই রয়েছে এর সর্বাধিক কল্যাণ ও সঠিক ব্যবস্থাপনা।

সুতরাং স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় থাকতেই পারে—যেগুলোর ভাঙা-গড়ার অভ্যন্তরীণ কল্যাণ তিনিই শুধু জানেন—আমরা এখনো জানি না।

সেই বান্দার চেয়ে মূর্খ ও নির্বোধ বান্দা কে আছে, যে তার প্রভুর গোপন বিষয় অবগত হতে চায়? বরং বান্দার কর্তব্য হলো আনুগত্য করা। মেনে নেওয়া। আপত্তি বা অভিযোগ না করা।

যুক্তি বা বিবেক বাহ্যিকভাবে যেগুলোকে মেনে নিতে চায় না, সেখানেই তো তার পরীক্ষা- নিঃশর্তভাবে মেনে নাও কি না? এখানে মানাটা যেমন কঠিন; আবার উৎরে গেলে পুরস্কারও তেমন অঢেল ও সীমাহীন।

আমি একটি নতুন বিষয় চিন্তা করলাম। হতে পারে মানুষের মৃত্যুর উদ্দেশ্য সেটাই। কথা হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের থেকে অদৃশ্যে রয়েছেন। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি দিয়ে তাকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এখন কথা হলো, আল্লাহ তাআলা যদি শারীরিক এই গঠনকে ভেঙে না দিতেন, তাহলে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা থাকত যে, সে কোনো স্রষ্টা ছাড়াই একটি সৃষ্টি। কিন্তু যখন তার মৃত্যু সংঘটিত হয়ে যায়, তখন নফস তার নিজেকে নিজরূপে দেখতে পায়- যা আগে শরীরের মধ্যে আড়াল হওয়ার কারণে নিজেকে আলাদাভাবে চিনতে পারত না। কিন্তু এভাবে মৃত্যুর পর আরও অনেক আশ্চর্য বিষয় সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এরপর আবার যখন তাকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, তখন সে অনিবার্যভাবেই বুঝতে পারে যে, সে নিছক একটি সৃষ্টি। যিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই

তার স্রষ্টা। তখন দুনিয়ার বিষয়াবলিও তার স্মরণে আসতে থাকে। কারণ, শরীর পুনর্বার গঠনের মতো মানুষের স্মৃতিশক্তিও আবার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তখন সে বলে উঠবে—

﴿إِنَّا كُنَّا قبلُ فِي أهلنا مُشْفِقِين﴾

> আমরা পূর্বে আমাদের পরিবারবর্গের মধ্যে (অর্থাৎ দুনিয়ায়) বড় ভয়ের ভেতর ছিলাম। [সুরা তুর : ২৬]

এমনিভাবে যখন সে আখেরাতের ওয়াদাকৃত সকল বিষয় দেখতে পাবে, তখন তার এমন ইয়াকিন ও বিশ্বাস সৃষ্টি হবে, যার মধ্যে সামান্যতমও সন্দেহ নেই। মৃত্যুর পর পুনর্বার তাকে সৃষ্টি করা ব্যতীত এটা কখনো তার বাস্তবে অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল না। নিজে এগুলো দেখার মাধ্যমেই তার এই ইয়াকিন অর্জিত হয়েছে। এই ইয়াকিন অর্জিত হওয়ার পর তার এমন শারীরিক গঠন প্রদান করা হবে, যা আর কখনো ধ্বংস হবে না। এই শরীরেই সে চিরদিন জান্নাতে বসবাস করবে। এবার নিষ্কলুষ নিঃশঙ্ক ইয়াকিনের মাধ্যকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে দেখতে সক্ষম হবে। কারণ, সে দুনিয়ায় থাকতেই স্রষ্টার পক্ষ থেকে যা কিছু ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোতে বিশ্বাস করেছিল। যে বিপদ ও কষ্ট এসেছিল– সেগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করেছিল। তাকদিরের ওপর বিশ্বাস করেছিল। কোনো আপত্তি ও অভিযোগ করেনি।

এভাবে সে দুনিয়াতে অন্যের মৃত্যু দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেছে আর আখেরাতে নিজেরটা দেখে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। আর এই অবস্থাতেই তাকে বলা হবে—

﴿ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ○ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ○ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

> তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে এবং আমার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে। [সুরা ফাজর : ২৮-৩০]

কিন্তু যারা ছিল সংশয়বাদী ও কাফের– তাদের জন্য ফায়সালা করা হবে জাহান্নামে প্রবেশের এবং চিরদিন সেখানেই তারা শাস্তি ভোগ করবে। কারণ, দুনিয়াতে তারা অনেক প্রমাণ দেখেছে; কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তারা বরং

প্রজ্ঞাবান আল্লাহর ব্যাপারে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। তার ওপর বিভিন্ন অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করেছিল। সুতরাং আখেরাতে তাদের সেই কুফরির কদর্যতা ফিরে আসবে। তাদের অন্তরগুলো অন্ধ করে দেবে। সুতরাং তাদের অন্তরগুলো আগের সেই কুফরির অবস্থায় বিরাজ করবে। যেহেতু দুনিয়াতে কোনো প্রমাণ তাদের উপকার করেনি, তাই আখেরাতের কোনো প্রমাণও তাদের উপকৃত করবে না। এমনকি তাদের পুনরায় দুনিয়াতে ফিরিয়ে দিলেও তারা বিশ্বাসী হবে না। তাদের অন্তরের এই কদর্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾

সত্যিই যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়, তবে পুনরায় তারা সে সবই করবে, যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা ঘোর মিথ্যাবাদী।

তারা বলেছিল, যা কিছু আছে তা কেবল আমাদের এই পার্থিব জীবনই। (মৃত্যুর পর) আমরা পুনর্জীবিত হওয়ারই নই।

তুমি যদি সেই সময় দেখতে পাও, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন, এটা (এই দ্বিতীয় জীবন) কি সত্য নয়? তারা বলবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই। আল্লাহ বলবেন, তবে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো। কারণ, তোমরা অস্বীকার করেছিলে।

[সুরা আনআম : ২৮-৩০]

আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের আকুল প্রার্থনা– তিনি যেন আমাদের একটি অনুগত বিবেক দেন; যেই বিবেক তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের ওপর কোনো অভিযোগ ও আপত্তি না করে।

আর আপত্তিকারীদের জন্যই দুর্ভোগ! সে কি তার আপত্তির মাধ্যমে তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে? এতে শুধু লাঞ্ছনা ও শাস্তিই বৃদ্ধি পাবে।

সকল প্রকার গোনাহই নিকৃষ্ট

মানুষের সকল প্রকার গোনাহই নিকৃষ্ট। তবে কিছু গোনাহ হলো নিকৃষ্টতম- বেশি বড়। যেমন জিনা হলো একটি নিকৃষ্টতম গোনাহ। এতে সেই নারীটি নষ্ট হয়। পুরুষটি নষ্ট হয়। সন্তান জন্ম নিলে পুরো বংশের মধ্যে বিঘ্ন ঘটে।

জিনা তো নিকৃষ্টতম- আর প্রতিবেশিনীর সাথে জিনা করা আরও নিকৃষ্টতম। বোখারি ও মুসলিমের হাদিসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনায় এসেছে- তিনি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, সবচেয়ে বড় গোনাহ কী?

উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার সাথে কোনো শরিক সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

এরপর সবচেয়ে বড় গোনাহ কী?

উত্তরে তিনি বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা—এই ভয়ে যে, সে তোমার সঙ্গী হয়ে খানা খাবে।

এরপর সবচেয়ে বড় গোনাহ কী?

উত্তরে তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জিনা করা।

এছাড়া ইমাম বোখারি রহ. মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা.-এর সূত্রে আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ ...لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ.

কোনো লোক অন্য দশজন নারীর সাথে জিনা করার চেয়েও তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জিনা করা অধিক নিকৃষ্টতর। কোনো লোক অন্য দশজনের বাড়িতে চুরি করার চেয়েও তার প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি করা অধিক নিকৃষ্টতর।[৯১]

---

[৯১]. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১/১৯৩/১০৩ । মুসনাদে আহমদ : ৬/৮। হাদিসটি বিশুদ্ধ এবং এর বর্ণনাকারীগণও ছিকা। তবে বর্ণনার ভিন্নতায় হাদিসের শব্দে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। মুসনাদে আহমাদের হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

এটা হওয়ার কারণ হলো, এটাতে আল্লাহ তাআলার হুকুমের অবাধ্যতার সাথে সাথে প্রতিবেশীরও হক নষ্ট করা হয়।

আরেকটি নিকৃষ্টতম গোনাহ হলো, বৃদ্ধ মানুষের জিনা করা। হাদিসে এসেছে, আল্লাহ বৃদ্ধ জিনাকারীকে খুবই অপছন্দ করেন। এর কারণ, এমনিতেই এই বয়সে শরীরের স্বাভাবিক শক্তি আর থাকে না। প্রবল কোনো চাহিদাও থাকে না। তবুও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করার জন্য যেন সে নিজের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তুলেছে এবং জিনা করেছে। সুতরাং তার গোনাহ হলো ঔদ্ধত্যপূর্ণ গোনাহ। এটা খুবই মারাত্মক।

আরেকটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ গোনাহ হলো, পুরুষের রেশমি পোশাক ও সোনা ব্যবহার করা। বিশেষ করে সোনার আংটি ব্যবহার করা।

আরও কিছু অপরাধ হলো, অহংকার করা, বিনয়ের ভান করা, মানুষের সামনে মিথ্যাভাবে নিজের বুজুর্গি প্রকাশ করা। এটা যেন মানুষের দৃষ্টিতে ইবাদত– অথচ প্রকৃতপক্ষে এগুলো আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা। এমনিভাবে স্পষ্ট সুদের কারবার করাও নিকৃষ্টতম গোনাহ—বিশেষ করে যে ব্যক্তি স্বচ্ছল, বহু সম্পদের মালিক।

আর মানুষের একটি নিকৃষ্টতম অবস্থা হলো, বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ অসুস্থতায় ভোগা সত্ত্বেও অতীত গোনাহ থেকে তাওবা না করা। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য প্রভুর দরবারে মিনতি না করা। ঋণগুলো পরিশোধ না করা। তার ওপর অর্পিত হকগুলোর প্রদানের ওসিয়ত না করা।

নামাজ ও জাকাতের ক্ষেত্রে অবহেলা করাও নিকৃষ্টতম গোনাহ– যা আর আদায় করা হয় না। সেইসাথে কেউ হয়তো চুরি করার পর তাওবা করল; কিন্তু চুরিকৃত বস্তু ফেরত দিলো না। কিংবা কোনো জালেম তার জুলুমের পর তাওবা করল; কিন্তু সে মাজলুমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল না– এটাও নিকৃষ্টতম গোনাহ।

سَمِعْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا قَالُوا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ قَالُوا حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَامٌ قَالَ لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ

মুসনাদে আহমদ : ৪৮/২২৭৩৪, পৃষ্ঠা : ৩৮০– মা. শামেলা।

আরেকটি নিকৃষ্টতম গোনাহ হলো, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর তালাকের ব্যাপারে কসম কেটে তা ভঙ্গ করল। অথচ সে তার স্ত্রীর সাথে বসবাস করতে থাকল।

আমি এখানে যেগুলো উল্লেখ করলাম, সেগুলোর সাথে তুমি অন্যগুলো তুলনা করে নাও। এছাড়াও আরও অনেক নিকৃষ্টতম গোনাহ রয়েছে। তবে কিছু গোনাহের সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের ঔদ্ধত্য। এতে মানুষ অভিশপ্ত হয় এবং স্থায়ী আজাবের মুখোমুখি হয়। যেমন, মদ পান। আমি যতটুকু জানি, এটা স্বাদযুক্ত নয়, সুঘ্রাণ নয় এবং সুখকরও নয়। এটা পান করার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার হুকুম মান্য না করার একধরনের বুনো উল্লাস ও ঔদ্ধত্য। তাই এর শাস্তিও হবে ভয়াবহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের এসকল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

অহংকার ও তার ক্ষতিসমূহ

আমি অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, অধিকাংশ আলেম ও জাহেদ নিজেদের অভ্যন্তরে অহংকার লালন করে।

এ অহংকারী আলেম বা জাহেদ সব সময় তার নিজের অবস্থানের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তার চেয়ে কেউ ওপরে উঠে যাচ্ছে কি না– সে বিষয়েও খেয়াল রাখে। সে কোনো দরিদ্র অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় না। নিজেকে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

এমনকি একটি শ্রেণিকে দেখেছি, যাদেরকে অনেকেই চেনে, তাদের মধ্যে একজন বলে, আমাকে দাফন করবে আহমদ ইবনে হাম্বল র.-এর কবরের নিকট। অর্থাৎ সে নিজেকে তার যোগ্য মনে করে। আরেকজন বলে বেড়ায়, আমাকে দাফন করবে আমার মসজিদের পাশে। সে ধারণা করে, তার মৃত্যুর পর তার কবরও হজরত মারুফ কারখি রহ.-এর মতো লোকজনের দর্শনীয় স্থানে পরিণত হবে।

এই সবগুলোই মারাত্মক ধ্বংসাত্মক স্বভাব ও মানসিকতা। কিন্তু তারা যেন তা জানে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر.

'যে ব্যক্তি ধারণা করল যে, সে অন্যের চেয়ে উত্তম সে অহংকার করল।'[৯২]

আমি দেখেছি, খুব কম মানুষই এমনটি করে না। বরং প্রায় সকলেই নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

কিন্তু তুমি কি জানো, সে নিজেকে নিয়ে এমনটি মনে করে কেন? সে যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে ইলমের কারণে, তবে তো তার আগেও অনেক শ্রেষ্ঠ আলেম অতিবাহিত হয়েছেন। ইবাদতের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই। আর যদি সম্পদের কারণে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তবে তো বলতে হয়, দ্বীনের ক্ষেত্রে সম্পদ দ্বারা কীভাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে?

---

[৯২]. এটার কোনো সূত্র খুঁজে এখনো পাওয়া যায়নি।

সে যদি দাবি করে, 'আমি যে ইলম অর্জন করেছি, আমার সময়ে তত ইলম কেউ অর্জন করেনি। তাই শ্রেষ্ঠত্বে আমার চেয়ে কেউ অগ্রগামী নয়।'

তাহলে আমরা তাকে বলব, হে কোরআনের হাফেজ, যে ব্যক্তি মাত্র অর্ধেক হিফজ করেছে, তার চেয়েও তুমি নিজেকে শ্রেষ্ঠ দাবি করতে পারো না। কিংবা হে আলেম ও ফকিহ, যে ব্যক্তি অন্ধ, তুমি তার চেয়েও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারো না। কিংবা সেই ব্যক্তি থেকেও নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারো না– যার ইলম তোমার চেয়ে কম। কারণ, শ্রেষ্ঠত্ব তো এই বাহ্যিক ইলম ও আমলের মাধ্যমে হয় না, দ্বীনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয় অভ্যন্তরীণ তাকওয়া ও আনুগত্যের মাধ্যমে। অথচ তোমার এই কথার মাধ্যমে অহংকার ও অবাধ্যতার আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

যে ব্যক্তি তার স্বভাব, চরিত্র ও গোনাহের দিকে লক্ষ করবে, সে তো তার নিজের গোনাহের পরিমাণ ও বিচ্যুতির কথা সবচেয়ে ভালো জানে। তার নিজের জানার মধ্যে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। কিন্তু অন্যের গোনাহ, তার পরিমাণ ও তাওবার বিষয়ে সে নিশ্চিত নয়। তাহলে কীভাবে সে নিজেকে নিয়ে অহংকার করে? তাহলে সে কীভাবে আখেরাতের বিষয়ে নিজেকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধারণা করে? মুমিন তো সব সময় নিজেকে ছোট ভাববে। বিনয়ী হবে।

একবার হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.কে বলা হলো, 'আপনি ইন্তেকাল করলে আমরা আপনাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরাতে দাফন করব।'

এর উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা শিরক ছাড়া সকল গোনাহ মাফ করবেন। আমার এটা চাই না। আমি নিজেকে কখনো তোমাদের এই প্রস্তাবের যোগ্যও মনে করি না।'

একটি বর্ণনা রয়েছে এমন—একবার এক সাধক ব্যক্তি তার স্বপ্নের মধ্যে একজনকে বলতে শুনল, 'অমুক মুচি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' হঠাৎ সাধক ব্যক্তির ঘুম ভেঙে গেল। সে তার ইবাদতগার থেকে নেমে মুচি লোকটির সন্ধানে বের হয়ে পড়ল। এরপর মুচিকে পেয়ে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে মুচি যা বলল, তাতে বড় ধরনের কোনো আমলের কথা পাওয়া গেল না।

সাধক লোকটি আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলো। রাতে আবার স্বপ্ন দেখল। তাকে নির্দেশ দেওয়া হলো, তুমি আবার তার কাছে যাও এবং জিজ্ঞাসা করো, তোমার চেহারা মলিন কেন?

সাধক লোকটি আবার সেই মুচির নিকট এসে তাকে প্রশ্ন করল। উত্তরে মুচি লোকটি বলল, 'কারণ, আমি যে মুসলমানকেই দেখি, তাকেই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি।'

এবার তাকে বলা হলো, হ্যাঁ, এই কারণেই তার এই উচ্চ মর্যাদা।

ক্রোধান্বিত ব্যক্তির সাথে আচরণ

তুমি যখন দেখো, তোমার কোনো সঙ্গী রেগে গিয়েছে এবং উল্টাপাল্টা অন্যায় কথা বলা শুরু করেছে, তখন তোমার উচিত হবে, তার বলা কথাগুলোকে তোমার কনিষ্ঠ আঙুল পরিমাণও বিশ্বাস না করা। এবং এ কারণে তাকে পাকড়াও না করা। কারণ, এখন তার অবস্থা হলো বেহুঁশি অবস্থা। কী বলছে, তা সে নিজেই জানে না। বরং তুমি তার আকস্মিক এই বিষয়টাতে ধৈর্যধারণ করো। তার ওপর কঠোর হয়ো না। কারণ, শয়তান এখন তার ওপর প্রভাব ফেলছে। তার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে। বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

এখন তুমি যদি তার এই আচরণের কারণে নিজের মনে কোনো বিদ্বেষ রাখো কিংবা তার অসৌজন্য আচরণের মোকাবিলায় তুমিও কঠোরতা অবলম্বন করো, তাহলে এটা তোমার উচিত হবে না। কারণ, এখন তুমি যেন এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক পাগলের মুখোমুখি হয়েছ। যেন সচেতন এক ব্যক্তি এক বেহুঁশ ব্যক্তির মুখোমুখি হয়েছ। সুতরাং এখন তোমার অসৌজন্যমূলক আচরণটাই অপরাধ হবে; তার নয় বরং এ সময় তুমি তাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতে থাকো। তার প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণ করতে থাকো। সদাচারণ করো।

জেনে রাখো, যখন তার রাগ পড়ে যাবে এবং সে স্বাভাবিক হবে, তখন তার আচরণের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং তোমার ধৈর্যের কথাও সে স্বীকার করবে। তোমার প্রতি তার ধারণা অনেক উচ্চ হবে। তোমার প্রতি তার হৃদয় কোমল

হবে। আর কিছুই যদি না হয়, তবুও তো এতটুকু তো সে বুঝতে পারবে, তার রাগের সময়ের কর্মকাণ্ডে তুমি তার প্রতি রূঢ় আচরণ করোনি।

মানুষের স্বভাবে রাগের এটি এমন এক অবস্থা, যেটাকে পাশের মানুষকে সয়ে নিতে হয়। পিতার রাগের সময় সন্তানকে। স্বামীর রাগের সময় স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর রাগের সময় স্বামীকে। এভাবে প্রতিটি পাশের মানুষকেই অন্যের রাগের সময় সয়ে নিতে হয়। যাতে রাগান্বিত ব্যক্তি তার কথাগুলো বলে স্বস্তি পায় ও শান্ত হয়। তার রাগ প্রশমিত হয়। এ সময় তুমি কিছুতেই তার ওপর চড়াও হবে না। তুমি কড়া কথা বলবে না। তাহলে দেখবে, রাগ প্রশমিত হলে সে নিজেই অনুতপ্ত হবে এবং তার বাড়াবাড়ির জন্য লজ্জিত হবে।

এভাবে যদি কারও ক্রোধান্বিত অবস্থার আচরণ ও কথাগুলো সয়ে যাওয়া হয়, তবে দেখবে কোথাও আর শত্রুতা থাকবে না। এবং তার রাগের অবস্থায় তার সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, স্বাভাবিক হয়ে সে এর সুন্দর বদলা প্রদানের চেষ্টা করবে।

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে না। বরং তারা যখন কাউকে রাগান্বিত হতে দেখে, তারা নিজেরাও রাগান্বিত হয়ে ওঠে। তার মোকাবিলা করে কঠোর কথা বলে ও আচরণ করে। এটা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ নয়। বরং প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ সেটাই, যা আমি এতক্ষণ বর্ণনা করলাম। তবে জ্ঞানীরাই শুধু এগুলো অনুধাবন করে ও কাজে পরিণত করে।

রাজা-বাদশাহর ওপর আলেমের মর্যাদা

দুনিয়ার স্বভাব হলো, দুনিয়াতে যে মানুষের যতটা উন্নতি ও প্রসিদ্ধি ঘটবে, আখেরাতের ক্ষেত্রে তার জন্য সে পরিমাণ মর্যাদার অবনতি হবে।

কথাটি আমি নিজের পক্ষ থেকে বলছি না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন।

তিনি বলেন,

> والله لا ينال أحد من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته عند الله، وإن كان عنده كريماً.

> আল্লাহর কসম করে বলছি, দুনিয়া থেকে যে ব্যক্তি যতটুকু গ্রহণ করবে, তার সে পরিমাণ মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নিকট কমে যাবে– যদিও সে তার নিকট সম্মানিতই হয়।

সুতরাং সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার পরিমিত পরিমাণের ওপর সন্তুষ্ট থাকে। কারণ, জীবনের সময়ের দাম এত বেশি যে, তা শুধু দুনিয়া অর্জনের পেছনে খরচ করা চলে না। যে খরচ করবে, সে অকাট নির্বোধ ছাড়া আর কিছু নয়। হ্যাঁ, নিজের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ অর্জনের জন্য, নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য, দ্বীনের কাজে সহযোগিতার জন্য এবং দরিদ্রদের ওপর দান-সদকা করার জন্য উপার্জনে সময় ব্যয় করা যায়। তাতে কেনো অসুবিধা নেই। এটি জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ।

কিন্তু প্রয়োজন পূরণের পরও আরও অতিরিক্ত অর্জনের জন্য কোনো আলেমের রাজা-বাদশাদের দরবারে ধরনা দেওয়া—এটা তো ক্ষতিকারক। এতে তার দ্বীন বিনষ্ট হয়। যদিও এক্ষেত্রে বাহ্যিক কিছু সম্পদ ও নিরাপত্তা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু পরিণাম তো খুবই ক্ষতিকর।

আবু মুহাম্মদ আত-তামিমি বলেন, আমি আমাদের যুগে অতি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন আবু জাফর আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ব্যতীত আর কারও প্রতি ঈর্ষাবোধ করি না। তিনি ছিলেন আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠাকারী। যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেন—তাকে গোসল দেওয়া হলো। মৃত্যুর আগে

তিনি তার জামার প্রান্ত গুছিয়ে নিজের জায়নামাজে এসে বসলেন। কারও দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। এদিকে আমরাই ভয়ে অস্থির হয়ে আছি, আমাদের ওপরও না-জানি কী বিপদ নেমে আসে। অথচ তিনি ছিলেন অটল অনড়। নির্বিকার। নিঃশঙ্কচিত্ত।

আমি আমার নিজের জীবনেও অনেক আলেমকে রাজা-বাদশাহর দরবারে যাতায়াত ও ওঠাবসা করতে দেখেছি। শেষমেশ তাদের অবস্থান ভালো থাকেনি। আমি স্বীকার করছি, তারা আসলে জীবনে কিছুটা স্বস্তি ও শান্তি অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা ভুল পথ অবলম্বন করেছিলেন। অন্তরের বেদনাকে কখনো খাদ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য প্রশমিত করতে পারে না। এটা তো শুধু দুনিয়ার কথা। আখেরাতের ব্যবস্থা আরও ভিন্ন। অতএব একজন আলেমের জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল জীবনযাপন হলো একাকী একপ্রান্তে নিজের কাজ করে যাওয়া, রাজা-বাদশাহর সাথে কোনো লেনদেনে না যাওয়া। খাওয়া-দাওয়া যেমনই হোক– তার তোয়াক্কা না করা। সামান্য যা কিছু আছে, তাতেই তো যথেষ্ট। কারও কোনো কটু কথা শোনা থেকে এটিই নিরাপদ অবস্থা। কারও সুদৃষ্টি ছিন্ন হওয়ার ভয় থেকে নিরাপদ। কোনো মানুষের অনুগ্রহের ক্লেশমুক্ত স্বাধীন জীবন। যেমন ছিল ইবনে আবু দাউদ রহ., ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম রহ. এবং আরও অনেক আলেম ও আবেদের জীবন। এটাই হলো আখেরাত নিরাপদ রেখে দুনিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য জীবন। এর চেয়ে সুখের জীবন আর কী হতে পারে! হজরত ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. কত সুন্দরই না বলেছেন,

> لوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف.
>
> যদি রাজা-বাদশাহ এবং দুনিয়াদারেরা জানত আমরা কী সুখের জীবনযাপন করি, তবে তারা এর প্রত্যাশায় আমাদের সাথে তরবারি নিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতো।

ইবনে আদহাম রহ. সত্যই বলেছেন। কারণ, কোনো বাদশাহ যখন কিছু পানাহার করে, ভয় থাকে এতে আবার কোনো বিষ আছে কি না? যখন ঘুমায়, ভয় থাকে, কেউ আবার গুপ্তহত্যা করে কি না? তাকে সব সময় নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়। বাইরের কত কত নয়নাভিরাম দৃশ্য– সেগুলো সে নির্ভাবনায় নিরালায় দেখতে সক্ষম হয় না। কখনো যদি বের হয়,

একেবারে কাছের মানুষের থেকেও অনেক সময় আক্রমণের ভয় থাকে। যে সকল বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সুখ ও আনন্দ পাওয়া সম্ভব হতো, সেগুলো তার কাছে নিরস হয়ে আসে। এমনকি খাবার ও রমণের সুখও আর অবশিষ্ট থাকে না।

কোনো খাবার যদি বেশি ভালো লাগে– বেশি খেয়ে ফেললে আবার পেটে সমস্যা হয়। ঘন ঘন সহবাসেও মূলত তার মজা কমে আসে। কারণ, রমণের মজা তখনই আস্বাদিত হয়, যখন দুই রমণের মাঝে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ঠিক খাবারের ক্ষেত্রেও একই কথা। একারণে বলা হয়, ক্ষুধা ছাড়া খাবারে এবং উত্তেজনা ছাড়া সহবাসে কখনো পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হয় না। অথচ সেই তৃপ্তি লাভ করে একজন রাস্তার ফকির– যখন সে খাবার পায় এবং স্ত্রী পায়। তাছাড়া একজন ফকির বা দরিদ্র ব্যক্তি রাতে নিশ্চিন্তে রাস্তায়ও ঘুমোতে পারে।

এদিকে আমির-উমারা কিংবা রাজা-বাদশাহদের নিরাপত্তা যেমন নেই, আবার তাদের আস্বাদনও অসম্পূর্ণ। কিন্তু আল্লাহর নিকট তাদের হিসাব অনেক বেশি।

আমি কসম করে বলতে পারি, উচ্চপর্যায়ের কোনো ব্যক্তি সেই পূর্ণ সুখ ও স্ফূর্ত আনন্দ উপভোগ করতে পারে না– যা অন্যরা পারে...।

তবে একনিষ্ঠ আলেমদের কথা ভিন্ন। যেমন হজরত হাসান বসরি রহ., আহমদ ইবনে হাম্বল রহ., সুফিয়ান সাওরি রহ. এবং সত্যনিষ্ঠ আবেদগণ, যেমন মারুফ কারখি রহ.। কারণ, ইলমের সুখ ও স্বাদ সকল সুখ ও স্বাদের উর্ধ্বে।

কিন্তু তারাও তো জীবনে বিভিন্ন সময় অভাব-অনটন ও নিরন্ন থাকার কষ্ট স্বীকার করেন কিংবা জালেমদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করেন– এগুলো তাদের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়।

এমনিভাবে তারা জীবন উপভোগ করেন নির্জন ইবাদত ও তাসবিহ-তাহলিলে। নিবিড় ধ্যান-মগ্নতায়। স্রষ্টার সাথে একান্ত প্রার্থনায়। এই সুখ ও আনন্দ অন্যরা পাবে কোথায়?

তাছাড়া এসব ব্যক্তিদের অনেকেই কবে সেই কতদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন, অথচ তাদের সংরক্ষিত ও বর্ণিত ইলম দ্বারা মানুষ এখনো উপকৃত হয়। এখনো তাদের কবরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মানুষ একটু দাঁড়ায়।

সুরা ইখলাস [قل هو الله أحد] পড়ে আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য দুআ করে। আর রাজা-বাদশাহ– তাদের কবরগুলো সাধারণত গোনাহগার ও নিকৃষ্ট মানুষেরা গিয়েই শুধু পরিদর্শন করে। তাদের পাপপূর্ণ বিলাসি জীবন নিয়ে আলোচনা করে।

এটা তো বলা হলো মৃত্যুর পরে দুনিয়ার উপরের অবস্থা। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর এসকল অনুগত প্রিয় বান্দাদের কী পুরস্কার ও সম্মান প্রদান করবেন– তা তো বলে শেষ করার মতো নয়।

কিন্ত যে সকল আলেম রাজা-বাদশাহ কিংবা ধনবান দুনিয়াদারদের সাথে মেলামেশার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কোনো না কোনোভাবে তাদের দ্বীনদারিতার মধ্যেও কদর্যতা এসে গেছে। এটা তাদের সকল আমলের মধ্যে বিরুপ প্রভাব ফেলেছে।

হজরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলেন, 'আমি একবার একজন আমিরের নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করেছিলাম, সেই থেকে আমার আগেকার সেই কোরআনের বুঝ ও প্রাজ্ঞতা উঠে গেছে।'

সুতরাং তাদের থেকে আলেমদের বিরত থাকা উচিত। ধৈর্যধারণ করা উচিত। যদিও এতে জীবনের একটি দিক সংকীর্ণ হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্য অনেক প্রাচুর্যের পথ খুলে যাবে।

হজরত আবুল হাসান আল কাযুনি রহ. শুধু নামাজের সময় ছাড়া তার ঘর থেকে বের হতেন না। কখনো কখনো বাদশাহ নিজে তাকে সালাম প্রদানের অপেক্ষায় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

অমুখাপেক্ষিতার শক্তি এমনই হয়। তবে শ্রোতা ও পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে বাড়াবাড়ি ভাবতে পারেন। কিন্তু আসল কথা তো তাই– যারা যার মধ্যে স্বাদ পেয়েছে, তারা তাতেই নিমগ্ন হয়েছে।

কামেল মানুষের সংখ্যা খুবই কম

কামালিয়াত বা পূর্ণাঙ্গতা কতই প্রিয় জিনিস। কিন্তু কামেল [সম্পূর্ণ] ব্যক্তির সংখ্যা কত কম!

কামালিয়াত অর্জনের জন্য কী কী দরকার হয়? এটার জন্য প্রয়োজন বাহ্যিক ও আত্মিক সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া। বাহ্যিক পূর্ণাঙ্গতা বলতে বোঝায়– শারীরিক গঠন-আকৃতির সৌকর্য। আর আত্মিক পূর্ণাঙ্গতা বলতে বোঝায়– স্বভাব-চরিত্রের উৎকর্ষ।

শারীরিক সৌন্দর্যের বিষয় হলো, যেমন শারীরিক গঠন সুন্দর হওয়া, কথাবার্তা সুন্দর হওয়া। উচ্চারণ স্পষ্ট হওয়া। নিজের মধ্যে বড় ধরনের কোনো খুঁত না থাকা।

আর আত্মিক সৌন্দর্য বলতে বোঝানো হচ্ছে, স্বভাব ও চরিত্র ভালো হওয়া। স্বভাবের কয়েকটি বিষয় আছে, যেমন চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সততা, জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ, নিকৃষ্ট বিষয় থেকে বিরত থাকা।

আবার চরিত্রগতও কয়েকটি বিষয় আছে। যেমন, সম্মানবোধ, নিঃস্বার্থতা, মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা, ভালো কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়া, মূর্খদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া।

যার মাঝে এই গুণগুলো পাওয়া যাবে, সেই শুধু মানবিক গুণাবলির পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছুতে পারবে এবং তার থেকে সবচেয়ে সুন্দর আচরণগুলো প্রকাশ পাবে। আর যার স্বভাব ও প্রকৃতিতে এগুলোর কমতি রয়েছে, তার জীবন অপূর্ণই রয়ে যাবে।

কাঙ্ক্ষিত জীবনযাপনে অসুবিধাগুলো

মানুষের বড় কষ্টগুলোর মধ্যে একটি হলো, নিজের উপযুক্ত স্থান বা কর্মে নিযুক্ত হতে না পারা।

যেমন, হয়তো একজন সৎ ব্যক্তিকে নিজের প্রয়োজনে কোনো জালেমকে তোষামোদ করতে হয়। তার কাছে বারবার গমন করতে হয়। কিংবা বাধ্য হয়ে কোনো অসৎ লোকের সাথে উঠাবসা করতে হয় এবং এমন কাজকর্মের সাথে যুক্ত হতে হয়– যেগুলো তার সাথে মানানসই নয়। কিংবা এমন বিষয়াবলির মধ্যে ব্যস্ত থাকতে হয়, যার কারণে তার মনের একান্ত কাঙ্ক্ষিত ও আকর্ষিত কাজগুলো সে করতে পারে না।

যেমন ধরো, কোনো আলেমকে নির্দেশ দেওয়া হলো, 'আপনি অমুক আমিরের সাথে বেশি বেশি যোগাযোগ রাখুন। তার নিকট যাওয়া-আসা করুন। নতুবা আমরা আপনার ওপর তার ক্রোধ ও অত্যাচারের ভয় করি।' এ কথায় আলেম সাহেব আমিরের নিকট যাওয়া-আসা শুরু করলেন; কিন্তু সেখানে তিনি এমন কিছুর মুখোমুখি হন, যা তার জন্য বিব্রতকর। তার মর্যাদার খেলাফ। অথচ তিনি সেগুলোকে প্রতিহত করে চলে আসতেও পারছেন না। খুবই জটিল অবস্থা!

কিংবা কোনো ব্যক্তির দুনিয়াবি কিছু জিনিসের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু শাসকের পক্ষ থেকে তার হক তাকে দেওয়া হচ্ছে না। বিষয়টা তার নিকট বর্ণনা করা দরকার। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার– যাতে সে তার অধিকারটা প্রাপ্ত হয়। এ জন্য আবার তাকে তোষামোদ করা দরকার– কিন্তু এটা তো তার জন্য কষ্টকর। অথচ জিনিসটার সীমাহীন প্রয়োজনীয়তা তার মনকে আরও সীমাহীন অস্থির ও বিক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

এভাবে হয়তো কোনো আলেম এমন কিছু বিষয়ে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছেন, যা তার জন্য যথোচিত নয়। যেমন তার উপার্জন করা দরকার। এ জন্য বাজারে বাজারে ঘুরতে হয়। জিনিসপত্র কিনতে হয় এবং বিক্রয় করতে হয়। এতে তার সকল সময় চলে যায়। কিংবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কারও অধীনে কাজ করতে হয়। ইলমচর্চার জন্য বাড়তি আর সময় থাকে না।

এই বিষয়গুলো একজন আল্লাহমুখী মানুষের ক্ষেত্রে বহন করা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ, এর অনেকগুলো বিষয়ের সাথে খারাবি ও কদর্যতা জড়িত। মনের সাথে কোনোভাবেই সমঞ্জস হয় না।

আরও আছে– যেমন ধরো, কারও পরিবার-পরিজন আছে। তাদের ভরণ-পোষণের জন্য তাকে এমন কিছু কাজে যুক্ত হতে হয়, যা তার জন্য খুবই কঠিন। আবার কখনো তার প্রিয় মানুষের মৃত্যু দ্বারা কষ্টে পতিত হতে হয় কিংবা নিজের শারীরিক অসুস্থতায় জর্জরিত হতে হয়। কিংবা নিজের কোনো কাজে ব্যর্থ হওয়া, উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া কিংবা এমন জালেমের অধীনে কাজ করার বিড়ম্বনা তাকে পোহাতে হয়– যে তাকে কষ্ট দেয়। কিংবা এমন ফাসেকের অধীনে তা করতে হয়– যে তার ওপর কঠোরতা করে।

বহু মানুষের এ ধরনের নানান সমস্যা, কষ্ট ও বেদনা রয়েছে। যার কারণে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। হৃদয়-মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে। এসকল বিষয়ে প্রতিকার করার কোনো শক্তিই তাদের নেই। মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। ভাগ্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া পরিত্রাণের কোনো পথ নেই।

ঠিক এই কঠিন সময়গুলোতেও একজন সুদৃঢ় মনের মুমিন ব্যক্তি সকল কষ্ট সয়ে যায়। তার অন্তর টলে যায় না। তার জিহ্বায় কোনো অভিযোগ ও আপত্তি উচ্চারিত হয় না। সে সইতে থাকে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট চাইতে থাকে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও কি এমন সমস্যার সম্মুখীন হননি? হয়েছেন। তিনি কি বলতে বাধ্য হননি 'আমাকে কে সাহায্য করবে? আমাকে কে সাহায্য করবে? তিনি কি একজন কাফেরের নিরাপত্তা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধ্য হননি? তার পিঠের ওপর কি উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়নি? তার সাহাবিদের হত্যা করা হয়েছে, আর তিনি মিনতি করেছেন, তাদেরকে হত্যা না করতে। নিজের তীব্র ক্ষুধার সময়ও তিনি অটল থেকেছেন– মনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এমন অটল তিনি কেন থাকতে পেরেছেন? কারণ, তিনি তো জেনেছেন, দুনিয়া হলো কষ্ট ও পরীক্ষার জায়গা। আল্লাহ তাআলা দেখতে চান, এসব কষ্টের মধ্যেও তোমরা এখানে কী ধরনের আমল ও আচরণ করো! পরবর্তী পুরস্কারের প্রত্যাশায় বান্দার তো এসকল বিষয় সহজভাবে গ্রহণ করার কথা। আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যও সেটাই। এখানে কষ্ট করলে সেখানে পাবে।

কৃপণদের জীবনযাপন

স্বীকার করি, মানুষের স্বভাবই হলো সম্পদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। কারণ, এটি শরীরকে টিকিয়ে রাখার একটি মাধ্যমও। কিন্তু কারও কারও অন্তরে সম্পদের ভালোবাসা এতটাই প্রকট যে, সম্পদই তার ভালোবাসার মূল কেন্দ্র হয়ে ওঠে– উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে আর গণ্য থাকে না। সুতরাং একজন কৃপণকে দেখবে, অবিরাম সে সম্পদ উপার্জন করছে; কিন্তু তা দ্বারা কিছুই উপভোগ করছে না। তার সকল আনন্দ উপভোগ নিহিত হয়ে আছে শুধু সম্পদ জমা করার মধ্যেই।

এই স্বভাবটি অনেক মানুষের মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে জাহেলদের মধ্যে থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারা যেন এর জন্যই বেঁচে থাকে। তবে একজন আলেম ঠিক তার প্রয়োজন অনুপাতেই সম্পদ উপার্জন ও গচ্ছিত করবে। নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মেটাবে। দ্বীনের জন্য খরচ করবে। দরিদ্রদের সাহায্য করবে।

কিন্তু সেই আলেমেরও যদি স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়– বিভিন্ন কদর্যপূর্ণ পন্থায় এবং সন্দেহমূলক পন্থায় সম্পদ গচ্ছিত করতে থাকে, সম্পদ অন্বেষণে আত্মসম্মানবোধ খুইয়ে ফেলে এবং স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও জাকাত গ্রহণ করতে থাকে, তাহলে সে তো মানুষের গুণাগুণ থেকে বের হয়ে চতুষ্পদ জন্তুর মতো হয়ে গেল। বরং চতুষ্পদ জন্তুর তো একটা যুক্তি আছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারও স্বভাবের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু এদের তো কোনো প্রশিক্ষণই কাজে লাগল না। তাহলে তাদের এই ইলম দ্বারা কী উপকার হলো?

কৃপণতার কিছু উদাহরণ–

আবুল হাসান বাসতামি ইসা নদীর কাছে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন ভীষণ কৃপণ। শীত বা গরম– উভয় সময় শুধু একটি পশমের পোশাক পরিধান করে বছর পার করে দিতেন। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার সময় চার হাজার দিনারের চেয়েও বেশি রেখে যান।

আমরা আরেকজন বৃদ্ধকে দেখেছি– তার কোনো স্ত্রী-সন্তান ছিল না। একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নিজের এক বন্ধুর কাছে থাকা শুরু করলেন। বন্ধুই সকল খরচাদি বহন করত। অথচ এই বৃদ্ধ যখন মারা গেলেন, তখন

তার গাট্টি থেকে বের হলো বহু বহু দিনার ও দিরহাম। বেঁচে থাকতে তিনি একটি দিরহামও খরচ করতে সম্মত হননি।

আমরা সাদাকাহ ইবনুল হুসাইন নাসিখকে দেখেছি– তিনি সর্বদা সময়কে গালাগাল করতেন। অন্যদেরও গালিগালাজ করতেন। মানুষদের নিকট ভিক্ষা করে বেড়াতেন এবং খুব বেশি পীড়াপীড়ি করতেন। মসজিদেই একাকী থাকতেন। একদিন মারা গেলেন। খুঁজে দেখা গেল ৩০০ দিনারেরও বেশি সম্পদ রেখে গেছেন।

সুফি আবু তালিব ইবনুল মুআইয়িদ তো আমাদের সাহচর্যেই থাকত। সে সম্পদ সঞ্চয় করত। একদা তার প্রায় ১০০ দিনার চুরি হয়ে গেল। সেই দুঃখে হায়-হাপিত্যেশ করতে করতে শেষাবধি সে মারাই গেল।

এমন অনেক ব্যক্তির কথা পাওয়া যায়, যারা নিজেরা নিসাবের মালিক হয়ে গেছে। অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে; কিন্তু মানুষের কাছ থেকে জাকাত নেওয়া বন্ধ করেনি। তারা শুধু সম্পদ গচ্ছিতই করে গেছে। এগুলো খুবই নিকৃষ্টতম পন্থা।

আবার অনেক সম্পদশালী ব্যক্তিও জাকাত প্রদানে ক্ষেত্রে গড়িমসি করে। হিসাব করে জাকাত প্রদান করে না। এটাও সম্পদের প্রতি অন্যায় লোভ ও লালসার প্রমাণ।

নবীর সিরাত থেকে শিক্ষা

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সকল কাজে সন্তুষ্ট থাকার বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে চায় এবং যে জানতে চায় কীভাবে সন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়, তাহলে সে যেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীর দিকে লক্ষ করে। স্রষ্টা সম্পর্কে যখন তার মারেফাত সম্পূর্ণ হবে, তখন সে বুঝতে সক্ষম হবে যে, এই স্রষ্টাই হলেন তার মালিক ও প্রতিপালক। এবং মালিকের জন্য তার বান্দার ব্যাপারে স্বাধীনভাবে যা-ইচ্ছা তাই করার অধিকার রয়েছে। তাকে এমন প্রজ্ঞাবান হিসেবে মেনে নিতে সক্ষম হবে, যিনি কোনো অনর্থক কাজ করেন না। তখন সে একজন বান্দা হিসেবে সকল ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান মালিকের কর্মকে মান্য করবে। এবং জীবনের কোনো অবস্থাতেই বলে উঠবে না– আহা, যদি এমন হতো! কেন এমন হলো? বরং সে কষ্ট ও বিপদের প্রবল ঝড়বায়ুর মধ্যেও তার তাকদিরের ওপর অটল পাহাড়ের মতো মজবুত থাকবে।

দেখো, তোমার কাছে বলছি এমন এক মনীষীর কথা, যিনি সর্বশেষ রাসুল ও নবী। যিনি সকল নবী ও রাসুলের নেতা। আশরাফুল আম্বিয়া। একজন সাধারণ নবীর মর্যাদাই যদি পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে অধিক হয়ে থাকে, তবে যিনি নবীদের শ্রেষ্ঠ, তার মর্যাদার কথা আর কী বলব! সেইসাথে তিনি আল্লাহর হাবিব– আমাদের রবের অতি প্রিয়।

তাকেই পাঠানো হলো এমন এক সময়, যখন পুরো বিশ্ব কুফর শিরক ও পাপাচারিতার অন্ধকারে ছেয়ে আছে। তাকে পাঠানো হলো এমন এক জায়গায়– যার চারপাশে শুধু শত্রু আর শত্রু। তিনি একা– একেবারে একা। শুরু হলো দ্বীনের দাওয়াত। এবং সেইসাথে শুরু হলো শত্রুদের অত্যাচার ও নির্যাতন। তিনি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে বেড়াতে লাগলেন। কোথাও কোনো ছোট খুপড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকেন– বের হলেই শত্রুরা আক্রমণ করবে। তাকে রক্তে রঞ্জিত করা হয়। তার পিঠের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় উটের নাড়িভুঁড়ি।

কিন্তু তিনি চুপ থাকেন। সকল কিছু সয়ে যান।

প্রতি মৌসুমে তাকে বলতে হয়, এ বছর কে আমাকে আশ্রয় দেবে, কে আমাকে সাহায্য করবে?

এরপর তিনি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করলেন। সেখানেও নির্যাতিত হলেন। এবার যে নিজের দেশ মক্কায় প্রবেশ করবেন, সে ক্ষেত্রেও পড়লেন কাফেরদের বাধার মুখে। অবশেষে তিনি কাফেরের নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন। তাকে পাগল, জাদুকর, জ্যোতিষী, জীনগ্রস্ত বলা হয়েছে। তার ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

এতসব ঘটনা নির্যাতন ও লাঞ্ছনার পরও তার মেজাজের মধ্যে কোনো বিরূপ ভাব আসে না। স্রষ্টার প্রতি তার অভ্যন্তরে কোনো অভিযোগ বা আপত্তির উদ্রেক হয় না। তিনি ছাড়া যদি অন্যকেউ হতেন, তাহলে হয়তো বলে বসতেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি সকল কিছুর সৃষ্টিকারী। সকলের ওপর ক্ষমতাবান। আপনি যেকোনো সময় সাহায্য করতে সক্ষম– তাহলে কেন আমাকে এভাবে এত অপমানিত ও অত্যাচারিত হতে দিচ্ছেন?

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যেমন বলেছিলেন হজরত উমর রা.। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই? তবে কেন আমরা এ ধরনের সন্ধির মাধ্যমে আমাদের দ্বীনের মধ্যে হীনতা প্রবেশ করতে দেবো?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরে বলেছিলেন,

إني عبد الله ولن يضيعني.

আমি আল্লাহর বান্দা। কিছুতেই তিনি আমাকে ব্যর্থ করবেন না।[৯৩]

---

[৯৩]. ইমাম বোখারি রহ. হাদিসটি 'কিতাবুল জিযয়া' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ফাতহুল বারি–৬/৩১৮২। এবং ইমাম মুসলিম রহ. বর্ণনা করেছেন 'কিতাবুল জিহাদ' এ– ৩/৯৪/১৪১১, ১৪১২। এটি হাদিসের একটি অংশ। পুরো হাদিসটি এমন–

حَدَّثَنِي أَبُو وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا أَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ

এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি মৌলিক কথা বলেছেন। একটি হলো, إني عبد الله –আমি আল্লাহর বান্দা। নিজের বন্দেগি বা দাসত্বকে স্বীকার করা। অর্থাৎ আমি একজন সামান্য বান্দা ও গোলাম। আমার মালিক ও প্রতিপালক আমার ক্ষেত্রে যা ইচ্ছা করতে পারেন। এতে অভিযোগের কোনো অধিকার আমার নেই।

দ্বিতীয় যে কথা তিনি বললেন, তা হলো, ‘ ولن يضيعني –কিছুতেই তিনি আমাকে ব্যর্থ করবেন না।’ এ কথাটি হলো আল্লাহ তাআলার হিকমতের প্রতি তার আস্থার বর্ণনা। অর্থাৎ তিনি কখনো অনর্থক কাজ করবেন না।

এছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে অনেকবার অভাব-অনটন ও ক্ষুধার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পেটে পাথর বেঁধেছেন। অথচ আল্লাহ তাআলার জন্যই আসমান ও জমিনের ধনভান্ডার! তবুও রাসুলের হৃদয়ের মধ্যে কোনো বিরূপতা আসেনি।

তাঁর সাহাবিদের হত্যা করা হয়েছে। তাঁর দাঁত শহিদ করা হয়েছে। চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। তার চাচাকে হত্যা করে কলিজা বের করে চিবানো হয়েছে। তাকে কয়েক জন পুত্র সন্তান দান করা হয়েছিল। আবার তাদের অল্প বয়সে উঠিয়েও নেওয়া হয়েছে। তার আদরের নাতি– হাসান ও হুসাইন রা.-এর ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা তাকে জানানো হয়েছে। হজরত আয়েশা রা.-এর মাধ্যমে কিছুটা স্থিতি লাভ করছিলেন, অথচ তার ব্যাপারে অপবাদ আরোপ করে তার জীবন দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছে। তবুও তিনি সবকিছু সয়ে গেছেন।

এছাড়া তিনি ভীষণ অসুখ দ্বারাও আক্রান্ত হয়েছেন। তার নবুয়ত যখন সব জায়গায় মেনে নেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, তখন উদ্ভব ঘটেছে মুসাইলামাতুল কাজ্জাব, আসওয়াদ আনসি এবং ইবনে সয়্যাদ। এরপর তার অসুস্থতা আরও তীব্র হলো। তার পবিত্র আত্মা আল্লাহর দরবারে হাজির হলো। মৃত্যুর সময় তিনি শুয়ে ছিলেন একটি জীর্ণ পোশাক ও একটি মোটা

أَبَدًا فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ.

সহিহ বোখারি : ১০/২৯৪৫, পৃষ্ঠা : ৪৫০– মা. শামেলা।

লুঙ্গির আবরণে। তখন তার নিকট এমন কিছুটা তেলও ছিল না, যা দ্বারা প্রদীপ জ্বালানো যায়। ঘরের মধ্যে সামান্যই কিছু আসবাব।

জীবনভর এগুলো ছিল এমনই কিছু বিষয়, হয়তো এগুলোর ওপর তার আগের আর কোনো নবী এমন ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হননি। কোনো ফেরেশতাকেও যদি এ ধরনের পরীক্ষায় ফেলা হতো, তবে সে ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হতো না।

যেমন, আদম আলাইহিস সালাম। জান্নাতে শুধু একটি গাছ ব্যতীত পুরো জান্নাত তার জন্য অবারিত ছিল। তবুও এ গাছটির ক্ষেত্রে তার ধৈর্যের অন্যথা হয়ে গেছে। অথচ আমাদের নবী বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রেও বলেছেন,

ما لي وللدنيا! –দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক![১৪]

একইভাবে হজরত নুহ আলাইহিস সালাম তার দীর্ঘ জীবনের দাওয়াতে উম্মতের ব্যবহারে ত্যক্ত বিরক্ত ও রাগান্বিত হয়ে বলেছেন,

﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾

> হে আমার প্রতিপালক, এই কাফেরদের মধ্য হতে কোনো বাসিন্দাকেই পৃথিবীতে বাকি রাখবেন না। [সুরা নুহ: ২৬]

আর এদিকে আমাদের নবী বলেছিলেন, হে আল্লাহ, আপনি আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করুন। তারা তো জানে না।

আর হজরত মুসা আলাইহিস সালামও রাগে থাপ্পড় মেরে 'মালাকুল মাউত' বা মৃত্যুর ফেরেশতার চোখ উপড়ে ফেলেছিলেন।

হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, হে আমার প্রভু, আপনি যদি কারও থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে রাখেন, তবে আমার থেকে তা সরিয়ে দিন।

কিন্তু আমাদের নবীকে যখন দুনিয়াতে থাকা এবং ইনতেকালের মাঝে যেকোনো একটি নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হলো, তখন তিনি মহান প্রভুর সান্নিধ্যে যাওয়াকেই প্রাধান্য দান করেছেন।

এদিকে হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম দুআ করেছেন, আমাকে এমন এক রাজত্ব দিন, যা আর কাউকে দেওয়া হবে না।

---

[১৪]. সহিহ বোখারি: ৯/২৪২১, পৃষ্ঠা:৭৭– মা. শামেলা।

আর আমাদের নবী বলেছেন, হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মদের পরিবারকে পরিমিত পরিমাণে রিজিক দান করুন।

হ্যাঁ, এমনই হওয়া উচিত সেই ব্যক্তির কাজ, যিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে চিনেছেন। যার নিজস্ব চাহিদাগুলো দমিত করেছেন। এ কারণে তার সকল আপত্তিগুলো নিশ্চুপ হয়ে গেছে। তার প্রবৃত্তি তার অনুগত হয়ে গেছে।

কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্নতা

স্রষ্টার প্রশংসা–তিনি সকল ব্যক্তিকে একেকটি কর্ম ও প্রবণতার মধ্যে মগ্ন রেখেছেন। হয়তো এই কর্ম ও প্রবণতা নিয়েই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে।

যেমন ইলমের ক্ষেত্রে কারও নিকট তিনি কোরআনের ইলমকে প্রিয় করে তুলেছেন। কারও নিকট হাদিসের ইলম। কারও নিকট ভাষা-সাহিত্যের ইলম...ইত্যাদি। এভাবে তিনি একেক জনের নিকট একেকটি বিষয় প্রিয় করে তুলেছেন। তারা তাদের নিজেদের আগ্রহ ও আকর্ষণের বিষয়ে চর্চা করে ও প্রচার করে।

যদি এমনটি করা না হতো, তবে তো সকল প্রকার ইলম সংরক্ষিত হতো না।

এভাবে দুনিয়ার অন্য কর্মগুলোর ক্ষেত্রেও একেক জনকে একেক বিষয়ে আকর্ষণ ও যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। কেউ হয়েছে রুটি প্রস্তুতকারক। কেউ পাথর খোদক। কেউ মরুভূমির কাঁটা পরিষ্কারক। কেউ চিকিৎসক। কেউ বিচারক। কেউ ব্যবসায়ী। কেউ সবজি ও গম উৎপাদনকারী ইত্যাদি।

আল্লাহ যদি এভাবে একেক জনের নিকট একেক বিষয় প্রিয় করে না তুলতেন, তাহলে অবস্থা কেমন হতো! যেমন ধরো, সবাই রুটি প্রস্তুতকারী হলো, তাহলে পৃথিবীভরতি শুধু রুটি আর রুটিই দেখা যেত। নষ্ট হতো। অপচয় হতো। কিংবা সবাই পাথরখোদক হলে সকল পাথর নিঃশেষ হতো। কিংবা সবাই ব্যবসায়ী হলে খাবার উৎপাদন করত কে?

বরং আল্লাহ তাআলা সকলকে পরিমাণমতো একেকটি কাজে ও কর্মে ব্যস্ত রেখেছেন। যাতে দুনিয়া ও আখেরাতের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়।

তবে এসকল কর্মের মধ্যে এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে, যারা নিজেদের বিষয়ে উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে মনোযোগী হয়। এমন লোকও খুব কম– যারা ইলম ও আমলের মধ্যে, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার মধ্যে সুসমন্বয় করতে

উদ্যোগী হয়। আত্মিক পরিশুদ্ধতার জন্য প্রস্তুত হয়। এরপরও আল্লাহ তাআলা এদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার বিশেষ কর্মের জন্য নির্বাচন করে নেন।

আল্লাহ আমাদেরকেও তার সন্তুষ্টিমূলক কাজ করার তাওফিক দান করুন।

প্রবৃত্তির অনুসরণ ও তার ভয়াবহতা

আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক ফাসেক বলে বেড়াত– আমি মনে করি, 'মানুষের নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করার মধ্যেই রয়েছে জীবনের প্রকৃত আনন্দ– তা ভুল হোক কিংবা সঠিক।'

আমি ভেবে দেখলাম, লোকটি এ ধরনের কথা বলে কীভাবে? পরে বুঝলাম, আসলে তার অন্তর মরে গিয়েছিল। জীবনের লক্ষ্যের ব্যাপারে তার কোনো নির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। লজ্জা ও আত্মসম্মানবোধের কোনো বালাই বোধ হয় তার ছিল না।

এই ধরনের মানুষ– মানুষ শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্তই নয়। কারণ, মানুষ হলো এমন জাতি, যে নিজেকে হত্যার দিকেও ঠেলে দিতে রাজি, যেন তাকে ভীরু না বলা হয়। বহু ভারি দায়িত্ব সে পালন করে– যাতে তাকে দায়িত্ববান বলা হয়। অর্থাৎ মানুষ তার নিজের অপমানকে ভয় করে। সকল বিপদ সহ্য করেও নিজের দারিদ্র্যের ওপর ধৈর্যধারণ করে এবং সেটাকে গোপন করতে চায়; যাতে সে অন্যদের চোখে ছোট না হয়ে যায়। এমনকি মূর্খকেও যদি বলা হয়, হে মূর্খ, তবে সে-ও রেগে যায়। একজন চোর বদমাইশ, তাকেও যদি কেউ বলে বসে, চুপ করো তোমার বোন তো নষ্টামি করে বেড়ায়। তবে তারও সম্মানবোধে বাধে। বোনকে হত্যা করে হলেও এর থেকে সে রেহাই পেতে চায়। এভাবে যারই কোনো হৃদয় আছে– সে কখনো কোনো অপবাদ সহ্য করতে চায় না; যাতে মানুষ ধারণা করে বসে– আসলেই সে দোষী। মানুষের সম্মানবোধ এতটাই তীক্ষ্ণ ও তীব্র।

কিন্তু যে লোক তাকে মাতাল অবস্থায় দেখতে পাওয়াকে পরোয়া করে না। মানুষদের মাঝে তার মাতলামির কথা ছড়িয়ে পড়ার ভয় করে না। তার কোনো দোষ নিয়ে মানুষদের আলোচনা তাকে ব্যথিত করে না– সে নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, চতুষ্পদ জন্তুই কেবল তার প্রবৃত্তির

অনুসরণ করে। কারও কোনো অপবাদ, দোষ বা তিরস্কারের পরোয়া করে না। তার জীবনে এমন কোনো লক্ষ্য নেই যে, সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। এই লোকটির অবস্থাও তা-ই। সুতরাং সে মানুষের আকৃতিতে একটি চতুষ্পদ জন্তু ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া একজন মদখোরের জীবন কিসের জীবন? কোথায় তার আনন্দ ও সুখ? মাতাল হওয়ার পর তাকে পাকড়াও করা হয়। প্রহার করা হয়। মানুষের মাঝে তার অপরাধ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর কারণে কি সে এর থেকে বিরত থাকে? থাকে না। বরং দ্বিগুণ আগ্রহে আবার সে মাতাল হয়ে মাতলামি করে।

এভাবে যে অলস আরামে ঘরে বসে আছে, অথচ তার আত্মীয় ও সাথিবৃন্দ ইলম ও সম্পদ অর্জনের জন্য বের হয়ে গেছে– তবে তার কিসের সুখ ও আনন্দ? কিংবা অন্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, আর সে আয়েশে সময় কাটাচ্ছে। পরিণামে দরিদ্র হচ্ছে। তাহলে তার কিসের আনন্দময় জীবন? এভাবে আর কতদিন? অলসতার বিলাস আর শান্তি কি কখনো একত্র হতে পারে? কিছুতেই পারে না।

জীবনের আরও বহু বহু ক্ষেত্রে মানুষ তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলতে পারে না। তার কর্মের ক্ষেত্রে, তার সামাজের ক্ষেত্রে, তার উপার্জনের ক্ষেত্রে। এমনকি রাস্তা দিয়ে হাঁটার ক্ষেত্রেও তার নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারে না। এসকল ক্ষেত্রে সে যে ইচ্ছামতো চলতে পারে না– এটাই তার মানুষ হওয়ার ও বুদ্ধিমান হওয়ার বড় প্রমাণ। অন্যথায় সে পাগল কিংবা মানুষের আকৃতিতে একটি আস্ত চতুষ্পদ জন্তু। মানুষ শ্রেণির কোনো বোধ তার মাঝে নেই।

এটা তো বলা হলো শুধু দুনিয়ার কথা, নতুবা প্রবৃত্তির অনুসারীর জন্য আখেরাতে রয়েছে কঠিন ও ভয়াবহ শাস্তি। মুমিনগণ এগুলোকে ভয় করে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের আত্মসম্মানবোধ দান করুন এবং খারাবি থেকে বেঁচে থাকার সক্ষমতা দান করুন। আমিন।

গোনাহের পর সওয়াবের দিকে ধাবিত হওয়া

কোনো গোনাহের পর শাস্তি অবশ্যই আসে; কিন্তু আল্লাহর সহানুভূতি কখনো এটাকে একটু বিলম্বিত করে। তবে তাওবা করলে মাফ পাওয়ার আশা করা যায়।

এ কারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনো গোনাহ করে ফেললে দ্রুত আবার তাওবা করে নেয়। কিন্তু অনেক গোনাহগারকে যে অবকাশ প্রদান করা হয়, তার দ্বারা বহু নির্বোধ ব্যক্তি ধোঁকায় পতিত হয়! ভাবে– গোনাহের বুঝি কোনো শাস্তি হয় না। কিন্তু শাস্তি হয়। অবশ্যই হয়। কারও ক্ষেত্রে দ্রুত। কারও ক্ষেত্রে একটু বিলম্বে।

খুব দ্রুত শাস্তি আসে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি নিষেধের কথা জেনেও গোনাহে লিপ্ত হয়। এটা যেন আল্লাহর সাথে ঔদ্ধত্য প্রকাশ। এ কারণে যে সকল গোনাহ আল্লাহ তাআলার সাথে বেআদবি কিংবা তার বড়ত্বের ক্ষেত্রে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, এ ধরনের গোনাহের শাস্তি অবশ্যই হয়ে থাকে। বিশেষ করে এটা যদি কোনো আরেফ বিল্লাহ [আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞাত] থেকে সংঘটিত হয়, সাধারণত তাকে অবকাশ দেওয়া হয় না। দ্রুতই তার শাস্তি এসে পড়ে।

আবদুল মাজিদ ইবনে আবদুল আজিজ রহ. একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন। আমাদের পরিচিত খোরাসানের একজন লোক ছিলেন। তিন দিনের মধ্যে পুরো কোরআন হাতে অনুলিখন করে দিতে পারতেন। একদিন তার সাথে এক নতুন গ্রাহক সাক্ষাৎ করে বলল, এটি আপনি কয়দিনের মধ্যে লিখে দিতে পারবেন?

লিপিকার লোকটি তার হাতের তিন আঙুল দেখিয়ে বলল, তিন দিন। এতে কখনো কোনো দোষ আসেনি। সবল হাতে তিন দিনের মধ্যে সমাপ্ত করে দেবো।'

কিন্তু এবার দোষ এলো। তার দেখানো তিনটি সবল আঙুলই কয়েক দিনের মধ্যে শুকিয়ে অবশ হয়ে গেল। এর দ্বারা পরে আর কোনো কাজ সে করতে পারেনি।

একবার এক সাহিত্যিকের মনে উদয় হলো, সে-ও হয়তো কোরআনের মতো কিছু রচনা করতে পারবে। সাথিদের সাথে আলোচনা করে নিজের কামরায় গিয়ে প্রবেশ করল 'কোরআন' রচনার জন্য এবং অন্যদের বলল, আমাকে তিন দিন সময় দাও। এর মধ্যেই আমি কোরআনের মতো কিছু রচনা করতে সক্ষম হব।

তিন দিন পর লোকেরা তার কামরায় প্রবেশ করে দেখল, সাহিত্যিক বেচারা টেবিলের ওপর মরে পড়ে আছে। তার হাতে তখনো কলম ধরা।

আবদুল মাজিদ রহ. বলেন, আমরা এমন একলোকের কথা জানি, যে তার স্ত্রীর সাথে হায়েজ অবস্থায়ও সহবাস করত। কোনো নিষেধের তোয়াক্কা করত না। হঠাৎ একদিন সে লোকেরও হায়েজ হওয়া শুরু হয়ে গেল। আর বন্ধ হয় না। সে বুঝতে পারল, এটা তার পাপেরই শাস্তি। খুব করে আল্লাহ তাআলার নিকট তার গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল। একসময় তাওবা কবুল হলো। হায়েজ বন্ধ হয়ে গেল।

মানুষের আরেকটি অপরাধ হলো, কোনো ব্যক্তিকে দোষারোপ করা কিংবা বিদ্রুপ করা। এবং সে যা নয়, তার প্রতি সম্বন্ধ করা। যেমন, কাউকে 'হে অন্ধ, হে দুশ্চরিত্র' ইত্যাদি বলা।

হজরত ইবনে সিরিন রহ. বলেন, আমি একবার একলোককে দারিদ্র্যের কারণে বিদ্রুপ করেছিলাম। ঠিক এরপর আমিই ভীষণ দারিদ্র্যে পতিত হলাম। ঋণে ঋণে জর্জরিত হয়ে উঠলাম।

কিছু কিছু গোনাহের শাস্তি অনেক বিলম্বিত হয়ে আসে। হয়তো একেবারে শেষ বয়সে। সুতরাং বয়স বাড়া সত্ত্বেও যারা যৌবনের গোনাহসমূহ থেকে তাওবা করে মাফ করে নাওনি, এখনই সতর্ক হও। যেকোনো মুহূর্তে শাস্তির ঘণ্টা বেজে উঠতে পারে। তাওবার মাধ্যমে তা মাফ করে নেওয়ার প্রতি দ্রুত ধাবিত হও।

কিছু গোনাহের শাস্তি তৎক্ষণাৎ এসে পড়ে। নতুবা সেগুলো জমা হয়ে হয়ে একদিন একবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাওবা ব্যতীত উপায় নেই। আর তিনি ছাড়া কোনো আশ্রয়ও নেই।

নিজের শক্তিকে সংরক্ষণ করো

জেনে রেখো, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক মহান কর্মের উদ্দেশ্যে– আর তা হলো, দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে তার প্রভুর মারেফাত অর্জন করা। সে এর জন্য শুধু অন্যের কথার ওপর নির্ভর করবে না। নিজেই চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাবে। ইলম অর্জন করবে। এর জন্য প্রথম শর্ত– ফরজ বিধানগুলো পালন করবে এবং নিষেধকৃত বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকবে।

এরপর ইলম অর্জনের জন্য যখন তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হবে, তখন তা অর্জনের জন্য অধিক পরিমাণে মনোযোগ প্রদান করবে। বিক্ষিপ্ত হলে হবে না। সুতরাং সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যার ঘরে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য রয়েছে। কোনো মানুষের অনুগ্রহ বা দানের ওপর তাকে নির্ভর করতে হয় না এবং সে সেই পরিমিত পরিমাণ সঞ্চয়ের ওপরই সন্তুষ্ট থাকে।

কিন্তু তার যদি যথাপরিমাণ খাদ্য-পাথেয় না থাকে, তাহলে ইলম অর্জনে যে মনোযোগ তার প্রয়োজন ছিল, তা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। তখন তাকে খাদ্য সন্ধানের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। ফলে তার জীবন অতিবাহিত হয়ে যাবে সেই শরীরের খাদ্য অর্জনের জন্য– যে শরীর অবশিষ্ট থাকলে অন্য বিষয়গুলো অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখন মূল শরীর ঠিক রাখতে গিয়ে, মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো অর্জন করা বাকি রয়ে যায়। এমনকি কখনো কখনো মানুষের কাছে ছোট হয়ে পড়তে হয়, হীন হতে হয়।

কবি বলেন,

حسبي من الدهر ما كفاني ... يصون عرضي عن الهوان

مخافة أن يقول قوم ... فضل فلان على فلان

আমার জন্য এতটুকু সময় হলেও যথেষ্ট, যার অর্জন আমাকে লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করবে।

আমি ভয় করি, লোকজন যেন বলা শুরু না করে, অমুক অনুগ্রহ করেছে অমুকের ওপর।

সুতরাং বুদ্ধিমানের জন্য উচিত হবে, নিজের সম্পদ ও সঞ্চয়কে সংরক্ষণ করা। অপচয় না করা। যাতে সে ইলম অর্জনে তার মনোযোগ স্থির করতে

পারে। এগুলো সংরক্ষণ করতে না পারলে জীবিকার প্রয়োজনে তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। আর নফস যখন তার খাদ্য-প্রাপ্তি নিশ্চত হয়, তখন সে তৃপ্ত ও নিশ্চিন্তে থাকে।

আর যদি তার যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-সম্পদ না থাকে, তাহলে সে তার পরিমাণমতো উপার্জন করবে। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি বা বেশি অর্জনের পেছনে পড়বে না। যাতে সে তার প্রয়োজন ও মনোযোগের মধ্যে একটি সমন্বয় করতে সক্ষম হয় এবং অল্পতে যেন সন্তুষ্ট থাকে। কারণ, সে যদি অধিক সম্পদ অর্জনের দিকে আকাঙ্ক্ষিত হয়, তাহলে মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটবেই ঘটবে। কারণ, মানুষের প্রথম অস্থিরতা ও বিক্ষিপ্ততা আসে এই অভাব-অনটন থেকে। এরপর আসে আরও বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে। অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের লোভ থেকে। তখন পুরো জীবন সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতার মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কবি বলেন,

ومن ينفق الأيام في حفظ ماله ... مخافة فقر فالذي فعل الفقر

> যে ব্যক্তি দারিদ্র্যের ভয়ে তার জীবনের সময়গুলো ক্ষয় করল শুধু সম্পদ সংরক্ষণের জন্য, সে তো প্রকৃত অর্থে একজন দরিদ্রের জীবনই অতিবাহিত করল।

হে হিম্মতওয়ালা প্রত্যয়ী প্রাণ, জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখো। তুমি যতক্ষণ না তোমার বাচ্চাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করছ, ততক্ষণ তারা তোমাকে বিক্ষিপ্ত করে রাখবে। আর তুমি সম্পদের মূল্যও বুঝতে শেখো, যা তোমার মনোযোগকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখবে। তোমাকে মানুষের নিকট হাতপাতা থেকে রক্ষা করবে।

হাদিসে এসেছে–

একবার একলোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো। লোকটির ওপর দারিদ্র্যের আলামত স্পষ্ট প্রকাশিত। লোকটি রাসুলের নিকট কিছু প্রার্থনা করল এবং তাকে কিছু প্রদান করা হলো।

এ সময় আরেকজন দরিদ্র লোক এসে উপস্থিত হলো। তখন প্রথম দরিদ্র লোকটি তাকে প্রদত্ত জিনিস থেকে দ্বিতীয় লোকটিকে কিছু প্রদান করল। তখন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা আবার তাকে ফিরিয়ে দিলেন এবং এমন করতে নিষেধ করলেন।

অল্পেতুষ্টি মানে যথাপরিমাণের ওপর সন্তুষ্ট থাকা এবং অতিরিক্ত অর্জনের উপর লোভ না করা। এটাই হলো মৌলিক নীতি।

তাছাড়া কোনো আলেম যখন অপমানের সাথে কারও থেকে কিছু গ্রহণ করা বর্জন করবে, তখন তার মনোযোগ স্থির হবে। হিম্মত উন্নত হবে। বিশেষ করে কোনো জালেম রাজা বা প্রশাসক থেকে। ধনাঢ্য কোনো খোঁটাদানকারী ব্যক্তি থেকে। এমনকি অনুগ্রহ উল্লেখকারী কোনো বন্ধু থেকে। কারণ, আত্মসম্মানবোধ হলো সকল সুখের বড় সুখ। জীবন যেভাবেই চলুক না কেন– কোনো ব্যক্তির দয়া ও অনুগ্রহের বলয় থেকে বের হয়ে আসার মতো আনন্দ আর পৃথিবীতে হয় না।

উচ্ছ্বাস প্রকাশে সতর্কতা

মানুষের স্বভাবই হলো তার সমশ্রেণির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চাওয়া। সকলেই অন্যের চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হতে ভালোবাসে। এভাবেই চলতে থাকে দিন।

কিন্তু তাদের মধ্যে কারও যদি কোনো বিপদ ঘটে, বিপাকে পড়ে এবং জানাজানি হয়ে যায়, তখন হঠাৎ করেই অন্যদের চেয়ে তার স্থান নিম্নস্তরে নেমে আসে। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত হবে, বিপদকে আড়াল করে নিজের কাজে অবিচল থাকা। যাতে করে তাকে কেউ নীচু চোখে না দেখে। সুন্দর স্বাভাবিক আচরণের মাধ্যমে অন্যদের সাথে ভব্যতা ও সভ্যতা বজায় রাখা। যাতে করে তাকে কেউ অনুগ্রহের চোখে না দেখে। নিজের অসুস্থতাকে প্রবলভাবে চেপে থাকবে। যাতে করে তাকে নিয়ে তার প্রতিপক্ষ হিংসুক সুস্থ ব্যক্তিরা আনন্দ অনুভব না করে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার সাহাবিদের নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন, অনেকেই ক্লান্ত ও জ্বরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি ভয় করছিলেন, তাওয়াফের সময় সাঈ করার ক্ষেত্রে সাহাবিদের দুর্বলতা দেখে কাফেররা আনন্দিত হবে। ঠাট্টা-মশকারা করবে।

সুতরাং তিনি বললেন,

رحم الله من أظهر من نفسه الجلد، فيرملوا

> আল্লাহ তার উপর রহম করবেন, যে ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে সাহসিকতা প্রদর্শন করে 'রমল' করবে।[৯৫]

রমল হলো, তাওয়াফের সময় শক্তিমত্তার সাথে জোরে দৌড়ানো। সেই শক্তিপ্রদর্শনের কারণ এখন আর নেই। তবুও হুকুম বহাল রয়ে গেছে। যাতে মানুষের অন্তরে কারণটির কথা মনে থাকে। এর থেকে শেখার বিষয় রয়েছে।

হজরত মুআবিয়া রা. তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এ সময় কিছুলোক তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করল। মুআবিয়া রা. পরিবারের লোকদের বললেন, 'আমাকে ধরে বসিয়ে দাও।'

তা-ই করা হলো। লোকেরা এলো। হজরত মুআবিয়া রা. তাদের সাথে বসে বসে কথা বললেন। সকল রকম অসুস্থতা চেপে রইলেন। সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো কথা বললেন। এরপর যখন তারা চলে গেল, তখন তিনি এই কবিতাটি পড়লেন–

وتجلدي للشامتين أريهم ... أني لريب الدهر لا أتضعضع

وإذا المنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تنفع

> আমার বিপদে আনন্দিত হতে চাওয়া ব্যক্তিদের আমি আমার অবিচলতা দেখাই। যুগের সন্দেহকে দূর করে বলি, আমি দুর্বল না।
>
> তবুও মৃত্যু যখন তার নির্দয় থাবাগুলোকে প্রসারিত করে ধরে, তখন অনুভব করি, কোনো রক্ষাকবচই আর কাজে আসছে না।

---

[৯৫]. ঠিক এই শব্দে হাদিসটি ইবনে হিশাম তার তার সিরাতগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– ৪/৬। ইমাম বোখারি রহ.ও তার 'সহিহ বোখারিতে উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে হাদিসটি এমন–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

সহিহ মুসলিম: ৬/২২২০, পৃষ্ঠা: ৩৪৮– মা. শামেলা।

এভাবে সকল প্রজ্ঞাবান দূরদর্শী আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তিই তাদের অবিচলতা প্রদর্শন করেন– বিপদের সময়, দারিদ্র্যের সময় এবং কষ্টের সময়। যাতে নিজের এই কষ্টগুলোর সাথে আবার শত্রুদের আনন্দিত মুখ দেখতে না হয়। এটা সকল কষ্টের চেয়ে বড় কষ্ট। এধরনের একজন দরিদ্র ব্যক্তিও নিজের মুখাপেক্ষিহীনতা প্রকাশ করেন। অসুস্থ ব্যক্তিও সুস্থতা প্রদর্শন করেন।

হ্যাঁ, এটাই হলো দৃঢ়মনের মানুষের কাজ!

এছাড়াও আরও কিছু বিষয় আছে– সেগুলোর ক্ষেত্রেও সংযম ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করা উচিত। যেমন, কখনো কখনো মানুষ অনর্থক তার অঢেল সম্পদ ও প্রাচুর্যের কথা প্রকাশ করে বেড়ায়। এতে নিশ্চয় কোনো শত্রুর চোখ লাগতে পারে। তখন তার এই গর্বের সুখ নিমিষেই উধাও হয়ে পড়বে। কোনো জিনিসকে যখন সুন্দর ও লোভনীয় মনে করা হয়, তখনই তার ওপর হিংসুকদের চোখ লাগে। চোখ লাগা সত্য। তাছাড়া অন্যরকম বিপদও আসতে পারে– ডাকাতি কিংবা ছিনতাই।

সুতরাং একজন দূরদর্শী ব্যক্তির উচিত হবে, এমন পরিমিত পরিমাণে নিজের নিয়ামতের কথা প্রকাশ করা, যার ওপর হিংসুকদের চোখ লাগা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আবার এটাও জানানো হয়ে যায় যে, সে আসলে দরিদ্রও নয়।

প্রতিযোগিতার দিবসের কথা স্মরণ করো

আমরা মানুষজাতি। আমাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে জান্নাতের চির অবস্থিতিতে স্রষ্টার সাথে তার মারেফাত, সান্নিধ্য ও দর্শনের মাধ্যমে সময় যাপনের জন্য। আর তিনি এর সূচনা করেছেন দুনিয়াতে আমাদের সৃষ্টি ও অবস্থানের মাধ্যমে। কারণ, এই দুনিয়া আমাদের জন্য একটি 'মকতব বা শিক্ষাগার'। এখানে আমরা 'হুকুম' পালনের পড়ালেখা শিক্ষা করব। আদব-আখলাক শিখব। যাতে সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের শিশুসুলভ আচরণগুলো সংশোধিত হয়ে যায় এবং আমরা আমাদের স্রষ্টার সাক্ষাতের যোগ্য হয়ে উঠি।

দুনিয়াতে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে একেক শিশুর একেক ধরন। যেমন,

১. কোনো শিশু আছে, যার কিচ্ছুটা মেধা-বুদ্ধি নেই। বুঝ নেই। সে দীর্ঘদিন 'শিক্ষালয়ে' অবস্থান করেও একসময় মূর্খ ও অবুঝ হয়েই শিক্ষালয় থেকে বের হয়।

এটা ওই ব্যক্তির উদাহরণ, যে দুনিয়াতে তার অবস্থিতির অর্থই বুঝল না এবং তার উদ্দেশ্যও অর্জন করতে সক্ষম হলো না।

২. আর কোনো শিশু আছে খুবই দুষ্টপ্রকৃতির। মেধা নেই। বুঝ-বুদ্ধিও কম। অন্যদের কষ্ট প্রদান না করার উচ্চ মানসিকতাও নেই। এ কারণে সে অন্য বাচ্চাদের কষ্ট দেয়। তাদের জিনিসপত্র চুরি করে। সকলেই তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আশ্রয় খোঁজে। সে সংশোধন হয় না। বুঝমান হয় না। খারাপ কাজ থেকে বিরতও থাকে না।

এটা জালেম এবং খারাপ চরিত্রের মানুষের উদাহরণ।

৩. আর কোনো শিশু আছে, লেখাপড়ার সাথে তার কিছু সম্পৃক্ততা ও আকর্ষণ রয়েছে। কিন্তু প্রকাশভঙ্গিতে দুর্বল। লেখার বাহ্যিক অবস্থাও খারাপ। সে-ও একসময় এই শিক্ষালয় থেকে বের হয়; কিন্তু নিজের আকর্ষিত বিষয়ে কিছু পারা ব্যতীত আর কোনো কর্মের যোগ্য হয় না।

এটা হলো সেই সকল ব্যক্তির উদাহরণ, যারা দুনিয়াতে কিছু বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করে; কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত থাকে।

৪. আর এমন কিছু শিশু আছে, যারা খুব সুন্দর করে লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য বোঝেনি। বাহ্যিক আচার-আচরণ খুব শিখেছে। কিন্তু অভ্যন্তর ঠিক হয়নি। এরা যেন সুলতানের হয়ে লেখাজোখা করে দিতে সক্ষম; কিন্তু আত্মিক অপরিশুদ্ধতার কারণে এদের থেকে খেয়ানতেরও ভয় রয়েছে।

এটা হলো ওই সব ব্যক্তির উদাহরণ, যারা ইলম শিখেছে। বাহ্যিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু এখনো আত্মিক পরিশুদ্ধি আসেনি। এ কারণে দ্বীনি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের খেয়ানতের ভয় থাকে।

৫. এমন কিছু শিশু আছে, যাদের হিম্মত অনেক উঁচু। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে বদ্ধপরিকর। মেধা, বুঝ-বুদ্ধিতেও অতুলনীয়। এমন শিশুই সেই শিক্ষাগারের সবচেয়ে অগ্রগামী। তাদের শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী। এমনকি কখনো তারা উচ্চ মনোবল ও চেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষকদেরও ছাড়িয়ে যায়। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আদব-আচরণেও হয়ে ওঠে সেরাদের সেরা।

দ্রুত ইলম অর্জনের জন্য সবসময় ভেতর থেকে একটি তাড়া ও উৎসাহ অনুভব করে। সকল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অগ্রগামী থাকে। কারণ, তাদের জানা আছে– এই শিক্ষাগার অবসরের জন্য নয়, শান্তির জন্যও নয়। এটি হলো জ্ঞান ও আদব শেখার জন্য। এটি পরবর্তী যোগ্যতার ময়দানে ও কর্মের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের সময়। আর তাই যোগ্যতা অর্জনের জন্য জীবনের প্রতিটি সময়কে এ শিশুরা কাজে লাগায়।

এটা হলো প্রকৃত মুমিনদের উদাহরণ। পুরস্কারের ময়দানে তারা সমসাময়িকদের সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। কিয়ামতের দিন সুন্দর হস্তাক্ষরে চমৎকার ফলকে তাদের আমলনামা তাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে। তখন তারা খুশিতে অন্যদের ডেকে বলবে–

﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ○ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ○ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ○ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ○ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾

হে লোকজন, এই যে আমার আমলনামা, তোমরা পড়ে দেখো। আমি আগেই বিশ্বাস করেছিলাম, আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে থাকবে মনঃপুত জীবনে। সেই সমুন্নত জান্নাতে– যার ফল থাকবে ঝুঁকে (নিকটবর্তী)। (বলা হবে,) তোমরা বিগত দিনগুলোতে যেসব কাজ করেছিলে, তার বিনিময়ে পানাহার করে যাও স্বাচ্ছন্দ্যে। [সুরা হাক্কা : ১৯-২৪]

ঠিক দুনিয়া ও তার অধিবাসীদের অবস্থাও ঠিক এমনই। কিছু মানুষ তো ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। স্রষ্টার বিশ্বাস ও ইবাদত থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। তারা হলো কাফের।

আর কিছু মানুষ রয়েছে দুর্বল ঈমানদার। গোনাহগার। তাদেরকে প্রথমে শাস্তি প্রদান করা হবে। আবার যেহেতু ঈমান আছে এবং কিছু সওয়াবও অর্জন করেছে। পরে তাই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

এদের মধ্যে কারও ঈমান দুর্বল; তবে গোনাহও কম। কারও ঈমান তো পূর্ণ; কিন্তু আমল কম। এ কারণে তার চেয়ে উচ্চের ব্যক্তি থেকে সে নিম্নস্তরের, আবার তার চেয়ে নিচু ব্যক্তির তুলনায় সে উচ্চস্তরের।

সুতরাং হে বুঝমান ব্যক্তিগণ, দ্রুত আমলের দিকে ধাবিত হও। দুনিয়া হলো স্থায়ী আবাসের দিকে গমনের মধ্যস্থল। আখেরাতে নিজেদের ঈমান ও আমলের তারতম্য অনুযায়ী জান্নাতে মর্যাদার অধিকারী হবে। স্রষ্টার নৈকট্য অর্জন করবে।

মানুষের হিম্মতের তারতম্য

একটি আশ্চর্য বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। বিষয়টি হলো, জান্নাতের যারা সাধারণ অধিবাসী হবে, উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের অবস্থান থেকে তুলনামূলক তাদের জায়গা হবে অনেক নিচে। তারা নিজেরাও উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের এই শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকবে। এখন তারা যে আরও উচ্চ শ্রেষ্ঠত্ব থেকে বঞ্চিত হলো, এটা নিয়ে তারা যদি চিন্তা করত, তবে তো তাদের মনের মধ্যে আফসোসের দানা বাঁধত; কিন্তু জান্নাতে এটা হবে না। এই চিন্তা তারা করবে না। তাদের নিজেদের অবস্থানস্থলের সৌন্দর্যের কারণে এবং সীমাহীন আনন্দ-উপকরণ থাকার কারণে। জান্নাতে তাদের কোনো দুঃখ বেদনা কিংবা অসম্পূর্ণতা থাকবে না। তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে, তা নিয়েই তারা সীমাহীন সন্তুষ্ট থাকবে।

এর পেছনে দুটো কারণ হতে পারে–

১. সে ধারণাই করতে পারবে না যে, সে যে নিয়ামত ও সুখের মধ্যে আছে, এর চেয়ে ওপরের কোনো নিয়ামত থাকতে পারে– যদিও অন্যের অবস্থান তার চেয়ে ওপরে। অর্থাৎ অবস্থার ভিন্নতা হলেও সুখ ও আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে সকলে সমান।

২. অন্যের এই উচ্চ মর্যাদা তার নিজের কাছেও প্রিয় হয়ে উঠবে। যেমন, দুনিয়াতে অনেক সময় কারও অপরিচিত সন্তানও একজনের দৃষ্টিতে প্রিয় হয়ে ওঠে। তাকে নিজের ওপর প্রাধান্য প্রদান করে। এমন একটি সহজ মানসিকতা সেখানে থাকবে। মনের মধ্যে কোনো খেদ থাকবে না। কারও প্রতি কোনো ঈর্ষা বা হিংসা হবে না।

তবে এই বক্তব্যের পেছনে একটি সূক্ষ্ম মানসিক বিষয় জড়িত। কারণ, দুনিয়াতেও তো এমন কিছু মানুষ থাকে, যাদের আসলে তেমন উচ্চাশা বা

উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। সে তার নিজের অবস্থান নিয়েই সন্তুষ্ট। কেউ আবার একটু ভিন্ন ধরনের। তাই শ্রেষ্ঠত্ব কামনার ক্ষেত্রেও মানুষের ভিন্নতা রয়েছে।

ধরা যাক, কেউ শুধু কোরআনের অর্ধেক মুখস্থের ওপরই সন্তুষ্ট। পূর্ণ মুখস্থ করে না। কেউ হাদিসের প্রতি আগ্রহী– পূর্ণ হাদিস সে অর্জন করতে চায়। কেউ ফিকহের অল্পজ্ঞানের ওপরই ক্ষান্ত দেয়। আবার কারও স্বভাবই এমন, সকল বিষয়ে সামান্য হলেই তার চলে যায়। এতেই সে সন্তুষ্ট। আমলের মধ্যে কেউ শুধু ফরজগুলো আদায় করে। আবার কেউ এগুলোর সাথে প্রতি রাতে তাহাজ্জুদও পড়ে।

তাদের সবার যদি উচ্চ হিম্মত থাকত, তবে তো সকল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্যই চেষ্টা করত। অসম্পূর্ণতার ওপর সীমাবদ্ধ থাকত না।

এর দ্বারাই মানুষের হিম্মতের তারতম্য বোঝা যায়। কেউ হয়তো সারারাত গল্প-গুজব শুনতে সক্ষম; কিন্তু রাত জেগে কোরআন শুনতে সক্ষম নয়। মানুষকে যখন পুনর্জীবন দান করা হবে, তখন তাকে তার এই সকল হিম্মতসহই ওঠানো হবে। সুতরাং নিজের হিম্মতের মাধ্যমে দুনিয়াতে সে যতটুকু অর্জন করেছে, আখেরাতে তাকে সেই পরিমাণই প্রদান করা হবে। দুনিয়াতে যদি পূর্ণতার ওপর হিম্মত না করে থাকে, আখেরাতেও সে পূর্ণ হিম্মত করবে না। এবং সে এই কমতির ওপর সন্তুষ্টও থাকবে।

এছাড়া মানুষ যেহেতু তার আকল দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, সুতরাং সে নিজেও বুঝতে পারবে, তাকে তার আমলের পরিমাণ অনুপাতেই প্রতিদান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দুই রাকাত আদায়কারী ব্যক্তি কখনো একহাজার রাকাত আদায়কারীর সমান প্রতিদানের আশা করবে না।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে বলেন, এটা কীভাবে সম্ভব! সে কি তার চেয়ে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মর্যাদা কামনা করবে না?

উত্তরে আমি বলব, তার মনে যদি কখনো আরও উচ্চ মর্যাদার কল্পনা আসত, তাহলেই শুধু এই অপ্রাপ্তি তাকে কষ্ট দিত। কিন্তু এটা যে তার কল্পনায়ই আসবে না। তুমি একজন অজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তির দিকে তাকাও– ফিকহের জ্ঞানে কমতি থেকে গেল বলে তাকে কি কখনো আফসোস করতে দেখো? দেখো না। কারণ, এটা যদি তাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হতো এবং অপ্রাপ্তিটা কষ্টের কারণ হতো, তাহলে তারা অবশ্যই এগুলো অর্জনের জন্য ব্যস্ত হতো। কষ্ট ও

পরিশ্রম করত। আসলে তাদের মনে এমন হিম্মতই নেই যে, তাদের আফসোস হবে। তারা বরং নিজেদের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে। জান্নাতেও তা-ই হবে।

যা বললাম, তা বোঝার চেষ্টা করো এবং আমলের প্রতি অগ্রগামী হও। কারণ, এটা একটি প্রতিযোগিতার ময়দান।

উপকারী ইলম নির্বাচন করা

বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ইলমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দুনিয়াতে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে একেকজন একেক বিষয়কে গ্রহণ করে। নিজেকে আকর্ষিত কোনো বিশেষ ইলমের মধ্যে নিয়োজিত রাখে।

কেউ তার জীবন ব্যয় করে ইলমে কিরাতের জন্য। মগ্ন থাকে কোরআনের পঠন-পাঠন, উচ্চারণ ও কায়দাকানুন নিয়ে। তবে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পথের দিকে ধাবিত না হয়ে প্রসিদ্ধ কিরাতের ওপর নির্ভর করা এবং সেটার চর্চা করাই উত্তম। কিন্তু কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে অনেক বাড়াবাড়ি করে। এটা উচিত নয়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কারী হলো, যাকে কোনো সহজ ফিকহি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো, আর সে বলল, আমি জানি না। এতটুকু ইলম কি তার শেখা উচিত ছিল না?

আর কেউ মগ্ন থাকেন নাহু বা আরবি ব্যাকরণ নিয়ে। আর কেউ থাকেন ভাষা-সাহিত্য নিয়ে। তারা এগুলোকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেন। কেউ শুধু হাদিস লেখেন। কিন্তু কী লেখেন, তা বোঝার চেষ্টা করেন না।

আমাদের এমন কিছু শাইখ মুহাদ্দিসকে দেখেছি, যাদেরকে হয়তো নামাজ সম্পর্কে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলো, আর সে বলল, আমি জানি না। কিংবা কী বলছেন, তা যেন নিজেই বুঝছেন না। অনেক কারী, ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদেরও এমনই অবস্থা।

ইবনে মানসুর বলেন, আমরা একদিন আবু মুহাম্মদ ইবনে খাশশাবের নিকট উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি ভাষা ও সাহিত্যে মানুষদের ইমাম বলা চলে। তখন মজলিসে ফিকহের আলোচনা শুরু হলো। এ সময় তিনি বললেন, আমাকে তোমাদের যা-ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করো।

একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, নামাজের মধ্যে রফউল ইয়াদাইন বা দু-হাত ওঠানোর বিধান কী, তখন আমরা কী উত্তর দেবো?

তিনি বললেন, বলবে এটা ফরজ!

তার এই কথায়– তার এই ফিকহের জ্ঞানের স্বল্পতায় গোটা মজলিস হতভম্ব হয়ে গেল। এত বড় একজন সাহিত্যিকের ফিকহ সম্পর্কে এত স্বল্প জ্ঞান!

এ কারণে বুদ্ধিমানের জন্য উচিত হবে, প্রত্যেক প্রয়োজনীয় ইলমের মৌলিক জ্ঞানগুলো আগে অর্জন করা। এরপর ফিকহের জ্ঞান অর্জন করবে। এরপর ইলমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দৃষ্টি দেবে। কারণ, সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর হুকুম মান্য করা, তার মারেফাত অর্জন করা এবং অন্তরে তার জন্য ভালোবাসা পোষণ করা।

এ কারণে একজন 'তালিবুল ইলম'-এর জন্য উচিত হবে—তার উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া। করণ, ইখলাস বা একনিষ্ঠতা না থাকলে কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হয় না। এ কারণে বেশি বেশি আলেমদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া উচিত। সেখানে প্রাজ্ঞদের বিভিন্ন কথাগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনবে। কিতাব সংগ্রহ করবে। কোনো কিতাবই উপকার থেকে মুক্ত নয়। এবং সেগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করবে। সেগুলো মুখস্থ হলে উপকারী বিষয়গুলো লিখে রাখবে। আর অবশ্যই রাজা-বাদশাহর সংশ্রব থেকে মুক্ত থাকবে।

সব সময় লক্ষ রাখবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত ও জীবনপদ্ধতির দিকে। সাহাবি ও তাবিঈদের পথ অনুসরণ করবে। আর সেভাবে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করবে এবং আমল ঠিক করবে। আল্লাহ যার প্রতি সদয় হন, তাকে তাওফিক দান করেন।

কাফেরদের অবাধ্যতা

দুনিয়াতে কিছু কিছু সম্প্রদায়ের আত্মসম্মানবোধ দেখে আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়েছি। অবশ্য তাদের এটা একধরনের প্রবল অহংকারও বলা চলে। বিশেষ করে আরব জাতি। তারা প্রথমে 'কালিমা' গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। তারা শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ করে বেড়াত। হত্যা ও লড়াইয়ের ওপরই সন্তুষ্ট থাকত। তবুও বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ দেখে তাদের একটি দল ইসলাম গ্রহণ করল। কিন্তু কেউ কেউ বলতে লাগল, আমরা কীভাবে রুকু ও সেজদা করতে পারি! এতে তো আমাদের নিতম্ব উঁচু করতে হয়– আমাদের সম্মানে বাধে!

তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود.

> যে ধর্মের মধ্যে কোনো রুকু ও সেজদা নেই, সে ধর্মে কোনো কল্যাণ নেই। অর্থাৎ রুকু ও সেজদা তো করতেই হবে।[৯৬]

এমনই ছিল তাদের আত্মসম্মানবোধ। কিন্তু ভেবে আশ্চর্য হই, তাদের এত আত্মসম্মানবোধ নিয়ে কীভাবে তারা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট জিনিসের প্রতি নত ও অবনত হতো! কেউ ইবাদত করছে পাথরের। কেউ গাছের। আবার একটি দল তো ঘোড়া এবং গরুরও ইবাদত করত। শিরকের মানসিকতা আসলে ইবলিসের মানসিকতার চেয়েও নিকৃষ্টতর মানসিকতা। ইবলিস তো অহংকার করে নিজেকে উত্তম দাবি করে তার চেয়ে নিম্নমানের কাউকে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং সে বলেছিল, أنا خير منه –আমি তার চেয়ে উত্তম। এমনকি ফিরআউনও নিজে কখনো এমন নিম্নমানের জিনিসের ইবাদতে অংশ নেয়নি।

---

[৯৬]. পুরো হাদিসটি এমন–

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَلَا يُجَبَّوْا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا وَلَا تُعْشَرُوا وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ

সুনানে আবু দাউদ: ৮/২৬৩১ পৃষ্ঠা: ২৬২– মা. শামেলা।

অথচ আশ্চর্যের কথা হলো, এই অহংকারী আত্মগর্বী আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন লোকেরাই গাছ-পাথরের প্রতি অবনত হয়েছে। অথচ উচিত ছিল, অসম্পূর্ণ অযোগ্য সত্তা সম্পূর্ণ ও যোগ্য সত্তার প্রতি নতশির হবে। কিন্তু এখানে হয়েছে উল্টো। আল্লাহ তাআলা মূর্তিগুলোর ত্রুটি উল্লেখ করে এদিকেই ইশারা করে বলেন–

﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾

নাকি তাদের কোনো পা আছে, যা দ্বারা তারা হাঁটতে পারে? নাকি তাদের কোনো হাত আছে, যেগুলো তারা প্রসারিত করতে পারে? নাকি তাদের চোখ রয়েছে, যেগুলো দ্বারা দেখতে পারে? নাকি তাদের কান রয়েছে, যেগুলো দিয়ে তারা শুনতে পারে?

[সুরা আরাফ : ১৯৫]

অর্থাৎ, তোমাদের তো এই সকল কার্যকর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে– অথচ মূর্তিগুলোরও তো তাও নেই। তাহলে কীভাবে একটি সম্পূর্ণ সত্তা একটি অসম্পূর্ণ সত্তার ইবাদত করতে পারে?

তারা আসলে অন্ধভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করেছে। তারা তাদের নিজেদের মনমতো যা চালু করে গিয়েছিল, সেগুলোকেই ভালো ও উপযুক্ত মনে করেছিল। এই অন্ধ অনুসরণ তাদের আকল ও বুঝ-বুদ্ধির ওপর আবরণ ফেলে দিয়েছিল। এ কারণে তাদের বুঝ-বুদ্ধি প্রকৃত বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি।

এছাড়া হিংসা, অহংকারও তাদের বুঝ-বুদ্ধির ওপর আবরণ ফেলে দিয়েছিল। এ কারণে তারা সঠিক ও সত্যকে জেনেও তা গ্রহণ করেনি। যেমন, উমাইয়া ইবনে আবুস সলত। সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতকে বিশ্বাস করত। ঈমান আনারও ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সে এই বলে ফিরে আসে–

لا أؤمن برسول ليس من ثقيف.

আমি এমন রাসুলের প্রতি ঈমান আনতে পারি না, যিনি বনু সাকিফ গোত্রের নয়!

আবু জাহেলও তার অহংকার ও সম্মানবোধের কারণেই ঈমান থেকে বিরত ছিল। সে বলেছিল,

> والله ما كذب محمد قط، ولكن إذا كانت السدانة والحجابة في بني هاشم ثم النبوة فما بقي لنا ؟
>
> আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলেনি। কিন্তু বনু হাশেমের মধ্যে রয়েছে নেতৃত্ব ও কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব, এখন নবুয়তও যদি তাদের মধ্য থেকে হয়, তবে আমাদের আর বাকি রইল কী?

আর আবু তালেব তো নবীর চাচা। তিনি সর্বক্ষণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনিও রাসুলকে বলেছেন, 'যদি কুরাইশের তিরস্কারের ভয় না করতাম, আমি অবশ্যই সে কথাই বলতাম, যার দ্বারা তোমার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যেত।'

আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় চাই এ ধরনের হিংসার অন্ধকার থেকে, অহংকারের কদর্যতা থেকে এবং প্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণ থেকে– যা বুঝ-বুদ্ধির আলোকে আবৃত করে ফেলে। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আলেম দুই প্রকার

আমি আলেমদের একটি অংশকে দেখেছি, তারা বিভিন্ন অন্যায়-অবাধ্যতায় অংশ নেয় আর ধারণা করে– তাদের ইলম তাদেরকে এগুলোর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু তারা কি জানে না, ইলম বরং তাদেরকে সাধারণের মধ্যে 'বিশেষ' করেছে? একজন আলেমের একটি অপরাধ ক্ষমা করার আগে একজন মূর্খের ৭০টি অপরাধ ক্ষমা করা হবে। এর কারণ হলো, একজন মূর্খ তো আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব মহত্ব কর্তৃত্ব ও অবস্থান সম্পর্কে ভালোভাবে জানে না। কিন্তু একজন আলেমের অপরাধ মানে– তার এই সবকিছু জেনেও আল্লাহ তাআলার হুকুমের অবাধ্য হওয়া। এ কারণে তার অপরাধ বেশি মারাত্মক; যেন কিছুটা উদ্ধত্যপূর্ণ।

আর কোনো আলেমকে এ-ও বলতে দেখেছি, আমি আমার দু-হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে খুবই সামান্য ঘুমিয়ে নিই। আরামে ঘুমাই না।' এটা বলে সে তার বুজুর্গি ও মুজাহাদার উচ্চতার কথা বোঝাতে চায়। অথচ সে এমন অনেক বিষয়ে অংশ নেয়, যেগুলো কোনোমতেই জায়েয নয়। তখন আমি চিন্তা করে বুঝলাম, যে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার মারেফাত অর্জন, পূর্ববর্তীদের জীবনপদ্ধতির অনুসরণ, জনতার সাথে সুন্দর আচরণ এবং স্রষ্টার পরিচয় ও সে অনুযায়ী আমল অর্জন, সেই ইলম আজ মানুষদের থেকে দূরে সরতে শুরু করেছে।

তাদের কাছে আছে কেবল কিছু শব্দের অর্থ– যার দ্বারা হালাল-হারাম জানা যায়। নিছক এটা তো সেই উপকারী ইলম নয়। প্রকৃত উপকারী ইলম হলো, মৌলিক রীতিনীতির বুঝ তৈরি হওয়া, স্রষ্টার পরিচয়, তার বড়ত্ব মহত্ব এবং তার উদ্দেশ্যসমূহের জ্ঞান লাভ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিদের জীবনাদর্শ গ্রহণ করা। তাদের পথে চলা। তাদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো অনুধাবন করা। এগুলোই হলো প্রকৃত ইলম। যে ইলম আজ অধিকাংশ আলেমই যেন বর্জন করেছে। তাই তারা আজ মূর্খদের চেয়েও মূর্খে পরিণত হয়েছে।

আমি একজনের কথা জানি, জীবনের একটা দীর্ঘ সময় ধরে সে ইবাদত-বন্দেগি করেছে। এরপর একদিন সে এই বলে ইবাদতে ক্ষান্তি দিল– আমি

এমন ইবাদত করেছি, যা আর কেউ কখনো করেনি। এখন আমি দুর্বল হয়ে গেছি। আমার এখন পুরস্কারের অপেক্ষার পালা।

আমি মনে মনে বলি, আমি তো ভয় পাই, তার এই কথাটিই তার সারাজীবনের আমলকে বিনষ্ট করে দেয় কি না? কারণ সে ভাবছে, অনেক তো আল্লাহর ইবাদত করা হলো, এবার সে শান্তি ও মর্যাদা প্রার্থনা করছে সেই আমলের মাধ্যমে।

এটা তো এখন সেই ব্যক্তির মতো হয়ে গেল, যে তার শ্রম ছেড়ে দিয়ে পারিশ্রমিকের আশায় বসে রইল।

তার এই অধিক আশার কারণ হলো বাস্তবতা সম্পর্কে তার অজ্ঞতা।

আমলদার সেই বড় বড় আলেম আজ কোথায় গেলেন? যাদের মধ্যে ছিলেন হজরত সিলাহ ইবনে আশিম। কোনো হিংস্র প্রাণীও যদি তাকে দেখতে পেত, ভয়ে পালিয়ে যেত। সারারাত ইবাদত করে সকাল উদিত হওয়ার সময় মুনাজাত করে বলতেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন। আমার মতো পাপী কি জান্নাত চাওয়ার অধিকার রাখে?

এর চেয়ে আরও বড় কথা– হজরত উমর রা. বলেন, আমার নাজাত পাওয়ার আশা খুবই ক্ষীণ– পেতেও পারি না-ও পারি।

হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ. তার মৃত্যুর আগ মুহূর্তে হাম্মাদ ইবনে সালামাকে বলেন, আপনি কি মনে করেন, আমার মতো ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে?

আল্লাহর প্রশংসা– যেসকল দোষ-ক্রটির কথা বললাম, আলেম নামধারী অধিক আশাকারী ব্যক্তিদের সেসকল অজ্ঞতা থেকে আমি মুক্ত, আবার অধিক নিরাশবাদী জুহদ থেকেও আমি মুক্ত। আমি স্রষ্টার মহত্ব সম্পর্কে অবগত এবং বিশুদ্ধ পথের পথিকদের জীবন-কর্ম সম্পর্কেও জ্ঞাত– তাই আমি শুধু আমার আমলের ব্যাপারে আশা করে বসে থাকি না। কীভাবেই বা আমি আমি আমার ভালো কাজগুলোর প্রতি অধিকার আরোপ করি; অথচ এগুলো তো আল্লাহ তাআলাই আমাকে দান করেছেন এবং অন্যের নিকট যা গোপন ছিল– আমার নিকট তিনি তা খুলে দিয়েছেন! তার অনুগ্রহ ছাড়া এগুলো অর্জন করা

কি সম্ভব হয়েছে? এমনকি তিনি যে আমাকে শোকর আদায়ের তাওফিক দিয়েছেন, তার শোকর করে কি আমি শেষ করতে পারি?

আর অতীতের এমন কোন আলেম অতিবাহিত হয়েছেন– যিনি তার নিজেকে ছোট মনে করেননি? নিজের ব্যাপারে আশঙ্কা করেননি?

তবে আল্লাহ তাআলা আশা করতেও বলেছেন। ভয় ও আশার মাঝখানেই ঈমানের অবস্থান। সে কারণে আল্লাহ তাআলার নিকট এমন মারেফাতের প্রার্থনা করি– যা অমাদের আশা ও আশঙ্কার সীমানা দেখিয়ে দেবে। আমাদের ছোট হতেও শেখাবে এবং আশারও আলো দেখাবে।

আমাদের চিরকালীন অবস্থানের জায়গা

দুনিয়াতে মানুষ তার উপভোগের উপকরণগুলোর অনুপস্থিতিতে নিজের জীবনকে বঞ্চিত ও কষ্টময় অনুভব করে।

কিন্তু ভেবে দেখে না, দুনিয়া তো সার্বক্ষণিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা নয়। হ্যাঁ, সেই আরেফ ব্যক্তি অবশ্য সর্বদা স্বাদ ও আস্বাদনের মধ্যে থাকে, যিনি সর্বদা তার প্রিয় প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত এবং তার সাথে সাক্ষাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহে মগ্ন। যখনই সে দুনিয়াতে কোনো স্বস্তি ও শান্তির উপকরণ প্রাপ্ত হয়, তা দিয়েই সে আখেরাত অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর যদি কোনো কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবুও সে ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আখেরাত অর্জন করে। সে তার সুখ-দঃখ—সর্ব অবস্থার প্রতিই সন্তুষ্ট থাকে। সে ভাবে, এটা তো তার প্রভুরই ফয়সালা এবং এটা তারই ইচ্ছায় হচ্ছে। তাহলে আর অসন্তুষ্টির কী আছে!

কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়াতেই তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্বেষণ করে, তার কথা ভিন্ন। দুনিয়ার কোনো সুখ হাতছাড়া হলেই সে দুঃখিত হয়। চিন্তিত হয়। নিজেকে বঞ্চিত ও অবাঞ্ছিত ভাবতে থাকে। যা সে চায়, তা তার আয়ত্বের বাইরে থাকায় মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করে। কিংবা কোনো প্রাপ্ত সুখ যদি হারিয়ে যায়, তবুও সে বেদনা পায়। পেরেশান হয়ে যায়। এসবের কারণ হলো, সে এখানেই তার উদ্দেশ্যগুলো সাধন করতে চায়। প্রবৃত্তির সকল

চাহিদা যেন সে এখানেই চরিতার্থ করতে চায়। তাকে কে বোঝাবে, সেটা তো এখানে সম্ভব নয়?

হজরত হাসরি কত সুন্দর কথাই না বলেছেন! আমার মাঝের কোন জিনিসই বা আমার নিজের? আর কোন জিনিসই বা আমাকে কষ্ট দেবে?

এটা হলো একজন আরেফের কথা। কারণ, সে মূল মালিকানার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। একজন দাস– তার ব্যাপারে তার মালিক যা-ইচ্ছা করতে পারেন। এখানে তার কোনো আপত্তি করার কিছু নেই। তার ইচ্ছার প্রতিফলন না ঘটলেও তার কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই।

আর মানুষ যদি নিজেকেই নিজের মালিক হওয়ার দাবি করে, তবে তো সেটা তার হাত থেকে সেদিনই বের হয়ে গেছে, যেদিন আল্লাহ তাআলা নিজে এটাকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে– এর বিনিময়ে।

[সুরা তাওবা: ১১১]

এখন কথা হলো, কোনো ক্রয়কারী যদি একটি বকরি কিনে জবাই করে, তবে কি বিক্রয়কারীর রাগান্বিত হওয়া উচিত হবে কিংবা কষ্ট পাওয়া? কিংবা অন্তরে বিরূপ ধারণা পোষণ করা?

আল্লাহ তাআলা তো জান্নাতের বিনিময়ে তোমার জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন, তবে কেন সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট এলে বিরূপ ধারণা আসে? তুমি কেন এটাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির সামনে বিলিয়ে দাও না?

এর চেয়ে আরও বড় কথা হলো, আল্লাহ তাআলা যদি বলতেন, 'আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি আমার অস্তিত্বের ওপর প্রমাণ হিসেবে। এখন সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে। এবার তোমাদের ধ্বংস করে দেবো । পুনরায় জীবন ও পুরস্কার প্রদান করব না।'

তাহলেও তো আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের বলা আবশ্যক হতো, 'হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন, তা সঠিক। আমরা মেনে নিলাম।'

এবার বলুন, আমাদের মাঝের কোন জিনিসটি আমাদের নিজের যে, আমরা কিছু বলার অধিকার রাখি? এরপরও আল্লাহ কত বড় মেহেরবান... কত বড় মেহেরবান... তিনি আমাদের চিরকালীন সুখ ও শান্তিময় পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন– যা কোনোদিন শেষ হবে না!

আর কী চাই!

তবে হ্যাঁ, সেই চিরকালীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নিকট পৌঁছুতে হলে দুনিয়ার জীবনে কষ্টগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করতে হবে। প্রবল প্রতাপ ঝঞ্ঝা বায়ুর মাঝেও পাহাড়ের মতো অটল থাকতে হবে। ধৈর্যধারণ করতে হবে ইবাদতের কষ্টের ওপর এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকার কষ্টের ওপর।

সুতরাং হে অগ্রগামী পথিক, ধৈর্য ধরো। আরও কিছুটা সবর করো। মানযিল নিকটবর্তী হচ্ছে। সুখের সুরাইয়া তারকা আকাশে উঁকি দিচ্ছে। সুতরাং হে আরেফিন, পরিপূর্ণ সুখ অতি সন্নিকটে। কষ্টের ঢোকটুকু গিলে নাও; অচিরেই তা সুমিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হবে। সময় হয়ে এলো বলে– প্রিয়দের সাথে সাক্ষাতের সেই সুখের কথা চিন্তা করে ধৈর্যটা ধরে যাও।

দুনিয়া সুখের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি

হজরত শীবান আর-রাঈ রহ. হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ.-কে যে কথাটি বলেছিলেন, একদিন আমি সেই কথা নিয়ে চিন্তা করলাম। কথাটি হলো,

> 'হে সুফিয়ান, তোমার প্রার্থিত যে নিয়ামত তোমাকে প্রদান করা হয় না, সেটাকেও তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত হিসেবেই গণ্য করে নিয়ো। এটা তিনি তোমাকে কৃপণতা করে বঞ্চিত করেছেন এমন নয়; বরং তিনি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেই এটা থেকে বঞ্চিত করেছেন।'

ভেবে দেখলাম, এটি এমন এক ব্যক্তির কথা, যিনি বস্তুসমূহের বাস্তবতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। যার বুঝ ও বোধের মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই। কারণ, মানুষ কখনো কখনো অনিন্দ্য সুন্দরী নারীদের প্রত্যাশায় বিবাগী হয়। কিন্তু তাকে পেতে সক্ষম হয় না। সে তাতে খুবই পেরেশান ও ব্যথিত হয়। কিন্তু কথা হলো, এই না পাওয়ার মধ্যেই আসলে তার কল্যাণ নিহিত ছিল।

যেমন, সে যদি নারীগুলোকে প্রাপ্ত হতো, তাহলে তার অন্তর সব সময় অস্থির হয়ে থাকত। তাদের আদর-যত্নে রাখার জন্য উপার্জন করতে হতো। তাদের

প্রতি তার প্রচণ্ড ইশক বা ভালোবাসা তার জীবনটাই যেন নষ্ট করে দিত। তাদের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সে আখেরাতের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকে অবহেলা করে বসত। এরপর যদি সেই নারীরা তাকে মন থেকে না চায়, তবে তো তার জন্য আরও বড় ধ্বংস। এরপর তারা তাদের ইচ্ছামতো খরচ-পত্র চাইবে, আর যদি সে দিতে সক্ষম না হতো, তাহলে তো এতে তার সম্মান বিনষ্ট হতো এবং উদ্দেশ্যগুলোও অধরা থাকত। তারা যদি ঘনঘন সহবাস কামনা করত আর সে যদি অক্ষম হয়ে পড়ত, তাহলে তারাই তাকে শেষ করে দিত কিংবা অবাধ্য হয়ে অন্যকোথাও চলে যেত। আর যদি তার প্রিয়তমা মারা যেত, তাহলেও সে আফসোসে আফসোসে নিজেকে নিঃশেষ করে দিত।

সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো অনিন্দ্য সুন্দরীর কামনা করে, সে যেন নিজেকে জবাই করার জন্য শান্তি ছুরি প্রার্থনা করে; কিন্তু সে এটা জানে না।

অধিক সম্পদের প্রার্থনার বিষয়টাও ঠিক এমন। বরং প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ থাকাই শ্রেষ্ঠতর। এটাই নিয়ামত। বেশি হয়ে পড়লে অনেক সময় সেটা 'গজব' হয়ে ওঠে।

সহিহ বোখারি ও মুসলিমের সংকলিত হাদিসের মধ্যে আছে– রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি মুহাম্মদের পরিবারকে পরিমিত প্রয়োজন পরিমাণ রিজিক দিয়ো।'

আর যখন বেশি সম্পদ হয়, তখন মনোযোগও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বুদ্ধিমান তো ওই ব্যক্তি, যে জেনেছে– দুনিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ উপভোগ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। সুতরাং সে অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকে।

শিক্ষার আলোয় চিন্তার জানালা খোলো

আমি কিছু লোককে দেখেছি, যারা তাকদির বা ভাগ্যকে দোষারোপ করে। তারা বলে, 'যদি জানতাম (ভাগ্যে ভালো আছে), তবে আমল করতাম।'

এটা খুবই দুর্বল এক যুক্তি। যেন হাত দিয়ে পাহাড় ঠেকানো। এ দ্বারা যেন সে সকল নবী ও শরিয়তকে প্রত্যাখ্যান করতে চায়। কোনো কাফের যদি রাসুলকে বলত, 'তিনি যদি আমাকে তাওফিক দেন, তবে আমি ইসলাম গ্রহণ করব।' তবে এর উত্তর শুধু তার ঘাড় মটকে দেওয়ার মাধ্যমেই দেওয়া উচিত হতো। কারণ, সে যেন বলতে চায়, আল্লাহই তার ইসলাম গ্রহণ ঠেকিয়ে রেখেছেন!

ঠিক এই ধরনের কথা লোকজন হজরত আলি রা.কে বলেছিল, তারা বলেছিল– 'আমরা আপনাকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করছি।'

উত্তরে হজরত আলি রা. বলেছিলেন, كلمة حق أريد بها باطل– কথাটি খুব সত্য– কিন্তু তার দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে খারাপ।'

ঠিক এইভাবে দান-সদকা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিরা দলিল প্রদান করে এই কথা বলে–

﴿أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾

> আমরা কি এমন ব্যক্তিকে খাওয়াতে যাব, আল্লাহ ইচ্ছা করলেই যাকে খাওয়াতে পারেন। [সুরা ইয়াসিন : ৪৭]

আমি কসম করে বলতে পারি, আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে 'তাওফিক' বা সক্ষমতা' প্রদান করাই হলো আসল বিষয়। এটা ছাড়া মানুষ বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত হতে পারে। এমনকি কোরআনের আয়াতের মাধ্যমেও।[৯৭] কিন্তু তাওফিক জিনিসটা একটি অদৃশ্য বিষয়। এটা আগে থেকে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ প্রদান– এটা স্পষ্ট বিষয়। হুকুম মান্য করার আবশ্যকতা একটি স্পষ্ট বিষয়। সুতরাং কোনো বুদ্ধিমানের জন্য উচিত হবে না, অস্পষ্ট বিষয়ের কথা বলে স্পষ্ট বিষয় থেকে বিরত থাকা।

---

[৯৭]. আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারায় (২/২৬) বলেন, 'কোরআনের দ্বারা তিনি অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সুপথে পরিচালিত করেন।'—সম্পাদক

পূর্বে উল্লেখিত বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের কথার উত্তর এভাবেও প্রদান করা যায় যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাকে এমন বিষয়েরই আদেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে তোমার অভ্যাস রয়েছে এবং সেটা করার ওপর তোমার সক্ষমতাও রয়েছে।

সেটা করার সক্ষমতা যদি তোমার না থাকত এবং সে ধরনের কাজের অভ্যাস যদি তোমার না থাকত, তবে আর তোমাকে এ ধরনের আদেশও দেওয়া হতো না এবং এ ধরনের দায়িত্বও প্রদান করা হতো না।

বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করো—তুমি যেহেতু তোমার দুনিয়ার উদ্দেশ্য ও চাহিদা পূরণের জন্য অভ্যস্ত কাজগুলো করে থাকো, তাহলে এবার তোমার ওপর অর্পিত কর্তব্য হিসেবে সেই কাজগুলো করো। কিন্তু এগুলো তখন তোমার নিকট কষ্টকর মনে হয়। যেমন, তুমি তোমার ব্যবসার লাভের জন্য বহু দূর-দূরান্তে সফর করো; কিন্তু তোমাকে হজের কথা বলা হলো, অথচ তুমি সেটা করছ না।

রাতে তোমার নামাজের জন্য জাগতে কষ্ট হয়, কিন্তু কোনো আনন্দ-উৎসবে দ্রুত বের হওয়ার জন্য গহীন রাতেও তুমি উঠতে পারো।

তুমি তোমার কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কিংবা অযথা তোমার বন্ধুর সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারো, কিন্তু নামাজের কথা আসলেই তোমার কষ্ট হয়, সময় থাকে না কিংবা তাড়াহুড়া বেঁধে যায়।

জীবনে এমন কত অনর্থক কাজেই না তুমি তোমার মূল্যবান সময়গুলো বিনষ্ট করছ। সুতরাং আজই... আজই এ ব্যাপারে সতর্ক হও। সময় তো চলে যায়। তোমার প্রাপ্তির অংশগুলো কমতে চলেছে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সতর্ক করছেন তোমারই জন্য। তিনি তোমাকে উৎসাহিত করছেন তোমারই কল্যাণের জন্য। দ্রুত প্রতিযোগিতায় নামো। এখানে তোমার অনেক প্রতিযোগী রয়েছে।

আগে থেকেই যারা প্রতিযোগিতায় রয়েছে, পরিশ্রম করে চলেছে, তাদের পুরস্কারের কথা একবার চিন্তা করো- সেগুলো তোমার থেকে ছুটে গেছে। এরপরও কি অলসতার মধ্যে তুমি ডুবে থাকবে?

যার মধ্যে সামান্যতমও আত্মসম্মানবোধ ও জীবনীশক্তি রয়েছে, তার জেগে ওঠার জন্য বঞ্চনার এই তিরস্কারটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু যার হিম্মত মরে গেছে— এমন মৃতের জন্য কোনো ওষুধ নেই।

তখন অবস্থাটা কেমন হবে, যখন তুমি তোমার কবর থেকে উত্থিত হবে আর দেখবে– আশপাশের সকলেই মুক্তি ও পুরস্কারের আনন্দে উদ্বেলিত আর তোমাকে দেওয়া হচ্ছে শাস্তি?

সৎকর্মশীলরা জোর পায়ে সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে আর উদ্দেশ্যহীনভাবে তুমি কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছ?

হায়! জেনে রেখো, বিভ্রান্তির এই সকল উচ্ছল আনন্দ কোথায় ছুটে টুটে যাবে; অবশিষ্ট থাকবে শুধু তোমার আফসোসের তিক্ত তীক্ষ্ম শাস্তি। বিবশ অলসতার গ্লাসভরা বিলাস কোথায় পড়বে উল্টে; পড়ে থাকবে শুধুই অনুশোচনা আর অনুতাপ!

আখেরাতের অনন্তকালের তুলনায় দুনিয়ার এই সামান্য অবস্থিতির কি কোনো তুলনা চলে? তাছাড়া এই দুনিয়ার জীবনই বা কেমন কাটে? অর্ধেক তো ঘুমে আর অর্ধেক গাফলতে! হে অলীক স্বপ্নবিলাসী, জান্নাতের হুরের প্রত্যাশা করো, অথচ দৃঢ়তার পয়সা অর্জন করো না।

অভিজ্ঞতার আলোয় চিন্তার জানালা এবার একবার খুলেই দেখো না! তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে—অথচ কোথায় তোমার উচিত ছিল দাঁড়ানো!

প্রকৃত সুখের জায়গা

প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ হজরত আলি ইবনুল হুসাইনকে আমি মেম্বারে বসে বলতে শুনেছি– 'আল্লাহর কসম, গতরাতে আমি আমার অবস্থা নিয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দন করেছি।'

অমি চিন্তা করতে লাগলাম এবং মনে মনে বলতে লাগলাম, তার এমন কী হলো যে, তিনি দীর্ঘরাত ক্রন্দন করলেন? তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যার কোনো অভাব নেই। অনেকগুলি তুর্কি দাসী আছে। এছাড়াও শুনেছি সুন্দরী রূপসী কয়েকজন স্ত্রীও আছে। ভালো ভালো খাবার খান। মুরগি। মিষ্টান্ন। ফল-ফলাদি। তার রয়েছে অনেক কৃতিত্ব ও অঢেল সম্পদ। অবারিত সম্মান ও মর্যাদা। বহু মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব। আবার অনেক ধরনের ইলম ও জ্ঞানও

তিনি অর্জন করেছেন। অনেক আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিকে তিনি নিজের কাছে পোষ্য করে রেখেছেন। তারা তাকে প্রশান্তি দান করে। তার প্রশংসা স্তুতি প্রকাশ করে। এত এত সুখ! এত এত সুখের উপকরণ! তবে আর কোন জিনিস তাকে এভাবে কাঁদাল? কিসের অভাব তার?

এটা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করার পর যে বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হলো, তা হলো, নফস কখনো একটি গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সে প্রতিনিয়ত এক আস্বাদন ও আনন্দ থেকে আরেকটির দিকে ধাবিত হতে থাকে। একের পর এক চলতেই থাকে। এর কোনো শেষ বা সীমা নেই। যখনই একটি নতুন আনন্দের সন্ধান পায়, কিছুক্ষণ বা কিছুদিন সেটা নিয়ে মেতে থাকে। এরপর আরেক নতুনের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে জীবনের সময় নিঃশেষ হতে থাকে। শরীর দুর্বল হয়ে আসে। বিভিন্ন অসুবিধা দেখা দিতে থাকে। সম্মান ও কর্তৃত্বও কমতে থাকে। আগের মতো নিজের যেকোনো কামনা ও বাসনা পূরণের সক্ষমতা আর থাকে না।

দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বোকা হলো সেই, যে ব্যক্তি এখানে তার পূর্ণ সুখ উপভোগ করতে চায়। কারণ, দুনিয়া তো প্রকৃত সুখের জায়গা নয়। এখানে শুধু কষ্ট ও বেদনার মাঝে ক্ষণিকের জন্য কিছু স্বস্তি ও আরাম অনুভব করা যায়। এখানে নিরবচ্ছিন্ন কোনো সুখ নেই এবং তা সম্ভবও নয়।

আমরা অনেক সময় ঈর্ষান্বিত হই এমন ব্যক্তিকে দেখে– যে কোনো নারীকে ভালোবেসেছে। নারীটিও তাকে ভালোবেসেছে। দুজন দুজনার একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, একজন অন্যজনের বিরহ একমুহূর্তও সইতে পারে না। প্রবল প্রতাপ ভালোবাসার এমনই শক্তি ও বন্ধন। একে অপরের প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টির বিনিময়। চোখে চোখে থাকা এবং চোখে চোখে রাখা।

কিন্তু কালের পরিক্রমায় একসময় এই রূপময় ভালোবাসার মাঝেও চিড় ধরে। চোখ আবার অন্যকোথাও পড়ে। নতুন কারও ওপর। মনের মধ্যে আবারও কেমন আনচান করে ওঠে। আর মানুষের স্বভাব হলো এই যে, যখন নতুন কোথাও দৃষ্টি যায়, পুরাতনকে তা দুর্বিষহ করে তোলে। তার সান্নিধ্যকে আকর্ষণহীন করে তোলে। কারণ, দূর অনুপস্থিতির কোনো দোষ-ত্রুটি তার দৃষ্টিগোচর নয়। তাই প্রবলভাবে মন তখন হঠাৎ দেখা অচেনা মানুষের দিকে ছুটতে থাকে এবং উপস্থিত নিকটবর্তী মানুষের সাথে বসবাসকে কদর্যময় করে

তোলে। এরপর দ্বিতীয়াকে পাওয়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে– যেমন একদিন ব্যাকুল হয়েছিল প্রথমার জন্য।

অবশেষে দ্বিতীয়াকে যদি পায়– একদিন তার সাথেও প্রথমার মতো বিষয়গুলো ঘটে। তখন সে তৃতীয়ার দিকে আকর্ষিত হতে থাকে। এরপর হয়তো অন্যকেউ... তারপর অন্যকেউ... কিংবা ততদিনে নিজেই হয়তো ফুরিয়ে যাবে। অক্ষম অথর্ব হয়ে পড়বে। নিজের থেকে আর কোনো উত্তেজনা অনুভব করবে না। মন নিরাশ হয়ে উঠবে। তখন কিছুই আর ভালো লাগবে না।

কেউ যদি এভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে থাকে, খুব দ্রুতই সে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। সেই তো দুর্ভাগা– যে ব্যক্তি পরিণতির কথা চিন্তা না করেই কোনো বিষয়ে নিজেকে ঠেলে দেয়। এবং নিজের দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করে।

দীর্ঘ উচ্চাশার প্রতারণা

সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হলো, বর্তমান সুস্থতা নিয়ে মানুষের ধোঁকায় পতিত হওয়া। সে আশা করে, পরেও বুঝি এভাবেই সুস্থ ও সবল থাকবে। এটি এমনই এক আশার বিষয়– যার কোনো শেষ নেই। এই প্রতারণারও কোনো সীমা নেই। যখনই সে সকাল করে কিংবা সন্ধ্যা– এই আশা সে করতে থাকে। প্রতারিত সময় যেতে থাকে, উচ্চাশাও দীর্ঘ হতে থাকে।

অথচ তোমার জন্য এর চেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় আর কী হতে পারে যে, তুমি তোমার অনেক সমবয়সীকে মরে যেতে দেখেছ। তোমার অনেক ভাই, অনেক আত্মীয় এবং অনেক প্রিয় ব্যক্তির কবরও আজ পুরোনো হয়ে গেছে। তুমি কি চিন্তা করে দেখো না, কিছুদিন পর তুমিও তাদের মতো হয়ে যাবে? এরপরও কেন অন্যকেউ তোমাকে সতর্ক করে না দিলে তুমি সতর্ক হও না? এটা তো খুবই নির্বোধের মতো কাজ। যার কোনো জ্ঞান ও বুদ্ধি রয়েছে, সে তো এমন অবহেলার পথ অনুসরণ করবে না।

হ্যাঁ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার সুস্থতার সময় অধিকহারে কাজ করে নেয়। সে এই সময়ে তার অথর্ব সময়ের জন্য গচ্ছিত করে রাখে। সক্ষমতার সময়ে পাথেয় সংগ্রহ করে অভাবের সময়ের চিন্তা করে। বিশেষ করে যে ব্যক্তি জেনে

নিয়েছে যে, আখেরাতের মর্যাদা প্রদান করা হবে দুনিয়াতে তার আমলের পরিমাণ অনুযায়ী। এটি এমন এক প্রতিযোগিতা, যা একবার ছুটে গেলে আর কখনো সুযোগ পাওয়া যায় না।

আচ্ছা, তুমি নিজেই ভেবে বলো তো দেখি, যে গোনাহগারকে সর্বশেষ ক্ষমা করা হবে, সে কি কখনো উচ্চ পর্যায়ের নিষ্কলুষ ব্যক্তিদের মর্যাদা প্রাপ্ত হবে? হবে না।

যে ব্যক্তি নিজের মনের মধ্যে সেই জান্নাতের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে– যার মধ্যে কোনো মৃত্যু নেই, নেই অসুস্থতা, ঘুম এবং কষ্ট। বরং সেখানে রয়েছে সার্বক্ষণিক আনন্দ সুখ ও উপভোগ– যার কোনো শেষ নেই। এবং সেখানকার সুখ ও আনন্দ বৃদ্ধি পাবে দুনিয়ার সময়গুলোর চেষ্টা ও পরিশ্রম করার পরিমাণ অনুপাতে। যে ব্যক্তি এই কথাগুলো ভাববে, সে তো এই জীবন নিয়ে আমলের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়বে। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ঘুমাবেও না। একটি মুহূর্তও সে নষ্ট করবে না। এমনটি হওয়াই উচিত নয় কি?

প্রকৃত জীবনযাপন তো জান্নাতে

আমি আমার নিজের ব্যাপারে চিন্তা করে দেখলাম– আমি তো একজন প্রকৃত নিঃস্ব মানুষ।

কারণ, আমি যদি আমার সুখের জন্য স্ত্রীর ওপর নির্ভর করি, তাহলে তাকে আমি যেমনটি চাই, তেমনটি কখনো পাব না। যদি চেহারা-সুরত সুন্দর হয়, তবে হয়তো আচার-আচরণ ভালো নয়। আবার যদি আচার-আচরণ ভালো হলো, কিন্তু সর্বক্ষণ সে তার উদ্দেশ্য পূরণেই ব্যস্ত– আমাদের দিকে কোনো খেয়ালই রাখল না। এমনও হতে পারে, সে বরং আমার ইনতেকালের অপেক্ষা করছে।

এরপর আমি যদি সন্তানের ওপর নির্ভর করি—সেও এমনই হবে। খাদেম এবং মুরিদ—তাদের বিষয়টিও এমন। আমার থেকে যদি তাদের কোনো উপকার না হয়, তাহলে তারা কখনো আমাকে চাইবে না।

এরপর বন্ধুর কথা যদি বলি, সে তো কিছুতেই নয়। আর যারা দ্বীনি ভাই, তারা তো পশ্চিমের রূপকথার পাখির মতো। আর পরিচিত ব্যক্তিরা দ্বীনি

ব্যক্তিদের গণ্যের মধ্যেই রাখে না। তাদের দৃষ্টিতে এরা যেন থেকেও কোথায় নেই।

এখন শুধু বাকি রইলাম আমি একা– একেবারে একা।

এপর আমি আমার নফসের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। দেখলাম আমার নফসও আমার অনুগামী সঙ্গী নয়। সে হয়তো ভালো সময়ে আমার প্রতি আক্রমণ করে না। কিন্তু দুর্বল সময়ে ক্ষতি করতে ছাড়ে না। সুতরাং সাহায্যের জন্য এখন শুধু বাকি থাকেন একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা।

এখন আমি যদি দুনিয়াতে সুখের জন্য তার নিয়ামতসমূহের ওপর নির্ভর করতে যাই, তবে এগুলো ধ্বংস হওয়া থেকে তো নিরাপদ নয়, স্থায়ী নয়। আর যদি শুধু তার ক্ষমার আশা করি, শাস্তির ক্ষেত্রেও তো পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারি না।

হায় আফসোস! এখানে কোনো স্থায়ী প্রশান্তি নেই। চিরকালীন অবস্থিতি নেই। আমার অস্থিরতার প্রশমন নেই। আর জ্বলনের কোনো নিরাময় নেই।

এবার তবে বুঝি– জান্নাত ছাড়া প্রকৃত কোনো জীবনযাপন নেই। সেখানে স্রষ্টার সন্তুষ্টির প্রতি ইয়াকিন আসবে। এবং বসবাস হবে এমন কারও সাথে, যে কখনো খিয়ানত করবে না। কখনো কষ্ট দেবে না। কিন্তু দুনিয়ার জীবন কখনো এমন হতে পারে না।

কাউকে পূর্ণ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সতর্কতা

যে ব্যক্তি কোনো রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে, তার জন্য উচিত হলো, নিজের ভেতর ও বাইরের অবস্থা বরাবর রাখা। কারণ, বাদশাহ কখনো কখনো এমন লোক লুকিয়ে রাখে, যে বাদশাহকে তার গোপন খবর বলে দেয়। তখন সে গোপন পরীক্ষায় ধরা খেয়ে অপমানিত ও অপদস্থ হয়। কোনো কোনো সুলতান বা বাদশাহ তার নিকট বন্ধুদের সাথে প্রাসাদের কোথাও একান্তে মিলিত হয়। সেখানে কোনো গোপন কথা থাকলে আলাপ করে। কিংবা আড্ডা, তামাশা ও মদ্যপান চলে। এই গোপন কক্ষের খবর সবাই জানে না। এদিকে অনুমতি ছাড়া কেউ আসার কল্পনাও করতে পারে না। বাদশাহ যখন কোনো গোপন কথা বলতে চান কিংবা সংবাদ নিতে চান, তখন তিনি তার একান্ত বন্ধুদের এখানে ডেকে নিয়ে আসেন। কারও ব্যাপারে

কোনো সন্দেহ হলে এখানে এই গোপন বৈঠকেই তার সমাধান করেন। অন্যরা এর খবর জানতে পারে না।

একবার পারস্যের এক বাদশাহ আবরুজ তার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির পরীক্ষা করার ইচ্ছা করেন– যার চরিত্র সম্পর্কে বাদশাহর নিকট অভিযোগ এসেছিল। বন্ধুটি বিশেষ কামরায় বসে আছে। এ সময় বাদশাহ একজন লাস্যময়ী দাসীকে তার নিকট প্রেরণ করেন। তবে তাকে বলে দেন, সে শুধু যাবে আর চলে আসবে। বসবে না। দাসী তা-ই করল। আর এই সামান্য দেখাতেই সেই বন্ধুর মাঝে ভাবান্তর পরিলক্ষিত হলো।

পরদিন বাদশাহ দাসীকে বলল, এবার প্রাথমিক কথার পর সামান্য কিছুক্ষণ বসবে। দাসী তা-ই করল। এবার তো সেই বন্ধুটি রূপসী দাসীকে চোখ ঘুরিয়ে লক্ষ করে দেখতে লাগল।

যথারীতি বাদশাহর নিকট খবর গেল। বাদশাহ এবার দাসীকে পাঠানোর সময় বললেন, তুমি এবার তার সাথে দীর্ঘক্ষণ বসবে এবং বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে থাকবে।

বাদশাহর কথামতো দাসীটি পরদিন দীর্ঘক্ষণ তার নিকট বসে রইল। বিভিন্ন কথাবার্তা ও হাসিমজাক করল। এবার তো সেই বন্ধুটি পুরোপুরি দাসীর প্রতি ঝুঁকে পড়ল। তাকে এসে ঝাঁপটে ধরল। এসময় দাসীটি বলল, ছাড়ুন, বাদশাহ হয়তো দেখে ফেলবেন কিংবা জেনে যাবেন। বরং এখনকার মতো আমাকে ছাড়ুন– আমি আমাদের গোপন অভিসারের জন্য একটি ব্যবস্থা করব।

দাসীটি বাদশাহর কাছে এসে সবই জানিয়ে দিল। বাদশাহ এবার ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি আরও নিশ্চিত হতে চাইলেন। এবার তিনি তার একান্ত বিশ্বস্ত এক দাসীকে পাঠালেন। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আগের দাসীটি কি সত্য বলেছে? বন্ধুর কি কোনো দোষ আছে?

দাসীটি খবর নিয়ে জানাল, বন্ধুর এতটাই দোষ যে, আগের দাসীটি তার অনেক কিছুই লুকিয়েছে। সে তো আপনার বন্ধুর দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে গেছে।

এ খবর শুনে বাদশাহর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য এবং হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়ার জন্য তার বিশ্বস্ত দাসীটিকে কাজে লাগালেন। এবার এই দাসীটিও প্রথম দাসীটির মতো ভাব করতে লাগল এবং

একদিন লোকটিকে বলল, বাদশাহ যখন তার বাগানবাড়িতে ভ্রমণ করতে যাবে, তখন আপনি এখানে অবস্থান করবেন। তিনি যদি আপনাকে তার সাথে নিয়ে যেতে চান, আপনি প্রকাশ করবেন যে, আপনি অসুস্থ। এরপর তিনি যদি আপনাকে আপনার পরিবারের নিকট গমন এবং এখানে অবস্থান—এ দুটোর মাঝে যেকোনো একটি নির্বাচন করে নেওয়ার স্বাধীনতা দেন, তবে আপনি এখানেই অবস্থানের বিষয়টি নির্বাচন করবেন এবং তাকে বললেন, আপনার নড়াচড়া করার ক্ষমতাও নেই। এরপর যখন আপনার কথায় সাড়া দিয়ে আপনাকে এখানে রেখে তিনি চলে যাবেন বাগানবাড়িতে, তখন আমি তার অনুপস্থিতে প্রতিরাতে আপনার নিকট আসব।

সেই বন্ধু দাসীর কথা মেনে নিল। সে এমনটিই করবে বলে আশ্বাস দিলো।

দাসী এসে বাদশাহকে সবকিছু বলে দিলো। এর তিনদিন পর বাদশাহ তার বন্ধুকে ডেকে পাঠালেন।

বন্ধু বলে পাঠাল, সে অসুস্থ।

সংবাদবাহক এসে এই খবর বাদশাহকে প্রদান করল। বাদশাহ খবর শুনে মুচকি হাসলেন এবং মনে মনে বললেন, এই তো প্রথম আলামত প্রকাশ পেল। এরপর তিনি তাকে নিয়ে আসার জন্য একটি পালকি পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন তাকে পালকিতে উঠিয়ে নিয়ে এলো। বাদশাহ দেখলেন, তার মাথায় পট্টি বাঁধা। এটা দেখেও তিনি মনে মনে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, এই তো দ্বিতীয় আলামত প্রকাশ পেল। এরপর বাদশাহ তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, তোমার অবস্থা তো খুবই সঙ্গীন। তাহলে কি এখন বাড়িতে স্ত্রীর কাছে যাবে নাকি আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করবে?

লোকটি বলল, আমার তো নড়াচড়া করতেও কষ্ট হয়। তাই এখানে অবস্থান করাই আমার জন্য উপযুক্ত হবে। এতে নড়াচড়া কম হবে।

এবার বাদশাহ মুচকি হেসে বললেন, কিন্তু আমি তো জানি, তোমাকে যদি এ অবস্থায় এখানে রেখে যাই, তাহলে তোমার বাড়িতে নড়াচড়ার চেয়ে এখানেই নড়াচড়া বেশি হবে।

এরপর বাদশাহ এমন একটি লাঠিখণ্ড আনতে বললেন, যা দিয়ে কোনো ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে দাগ দেওয়ার নিয়ম।

এটা দেখেই লোকটি যা বোঝার সব বুঝে গেল। সে একটি ফাঁদে পা দিয়ে ধরা খেয়ে গেছে। তার কুকীর্তি সব ফাঁস হয়ে গেছে। বাদশাহ এবার তাকে আদেশ দিলেন নিজ হাতে তার অপরাধের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখতে।

লোকটি বাদশাহর আদেশ অনুযায়ী নিজের অপরাধের বিবরণ লিখতে বাধ্য হলো। লোকজন জড় হলো। সবার সামনে বিবরণটি শোনানো হলো। এরপর তাকে দেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্বাসন দেওয়ার আদেশ করা হলো এবং সেই লিখিত বিবরণসহ ব্যভিচারের প্রতীক লাঠিখণ্ডটি একটি বর্শার মাথায় বেঁধে দেওয়া হলো। সে যেখানেই যাবে, এটা তার সাথেই থাকবে; যাতে অপরিচিত ব্যক্তিরাও এটা দেখে তার কীর্তির কথা জেনে যায়।

যখন আদেশ অনুযায়ী বাদশাহর লোকজন তাকে নিয়ে বের হলো, এ সময় আচমকা তাদের মাঝের একজনের কোমরে ঝুলানো তরবারি ছিনিয়ে নিয়ে নিজের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে বলল, যে ব্যক্তি এই ছোট একটি অঙ্গের অনুসরণ করে, তার বাকি সকল অঙ্গই বিনষ্ট হয়ে পড়ে। এর কিছুক্ষণ পরই লোকটি সেখানেই মারা গেল।

কখনো কখনো কিছু রাজা-বাদশাহ নিজেরাও ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রজাদের মাঝে আসেন। তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তখন কোনো ব্যক্তি যদি বিরূপ কিছু বলে ফেলে, তখন তাদেরকে পাকড়াও করা হয় এবং শাস্তি প্রদান করা হয়। তাছাড়া অধিকাংশ সময় শাসকগণ নিজেদের পক্ষ থেকে গোয়েন্দা প্রেরণ করে রাখেন। কেউ কোনো উল্টাপাল্টা কথা বললেই সেটা তাদের কানে চলে যায় এবং এর কথককে শাস্তি প্রদান করা হয়।

হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-এর খেলাফতের সময়ের একটি ঘটনা এখানে বলি– সকল জায়গায় তিনি ন্যায় ও ইনসাফের শাসন কায়েম করেছেন। রাষ্ট্রচালনার ক্ষেত্রে সত্যিকার যোগ্য ও দ্বীনদার ব্যক্তিরাই তাঁর নিকট সম্মান ও গুরুত্ব পাচ্ছে।

এ সময় হেলাল ইবনে আবি বুরদাহ নামের চতুর এক লোক খুব ইবাদতগোজার হয়ে উঠল। মনে তার এক গোপন ইচ্ছা। দীর্ঘদিন ধরে মসজিদের একটি নির্ধারিত স্থানে অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে নামাজ আদায় করল। কী চমৎকার ধীরস্থির তার রুকু ও সেজদা! কত ঈর্ষণীয় তার জিকির ও তেলাওয়াত! যে দেখবে, তারই চক্ষু তৃপ্ত হবে।

খলিফা হজরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. একদিন তার এই ইবাদত-বন্দেগি ও একনিষ্ঠতা দেখে বিমুগ্ধ হলেন। তিনি তার সঙ্গী আলা ইবনে মুগিরার কাছে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'লোকটি বড়ই দ্বীনদার মনে হচ্ছে! তার ইবাদতে বোধ হয় কোনো খুঁত বা লোক দেখানো কিছু নেই।'

আলা ইবনে মুগিরা বললেন, 'আমিরুল মুমিনীন, আপনি এত তাড়াতাড়ি কাউকে বিশ্বাস করবেন না। তার ইবাদতে একনিষ্ঠতা আছে কি না—তা আমি আজই বের করার ব্যবস্থা করছি।'

মাগরিবের পর মুসল্লিরা সুন্নত-নফল পড়ে যার যার বাড়ি চলে গেল। কিন্তু প্রতিদিনের মতো আজও হেলাল ইবনে আবি বুরদা একপাশে দীর্ঘ নফলে এখনো দণ্ডায়মান। আলা ইবনে মুগিরা ধীরপায়ে তার দিকে এগিয়ে এলেন। পাশে গিয়ে নিচু স্বরে বললেন, দুই রাকাত পড়ে তাড়াতাড়ি সালাম ফিরিয়ে নাও। তোমার সাথে কিছু জরুরি কথা আছে।

কথা শুনে হেলাল ইবনে বুরদা তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে নিল। সালাম ফিরিয়ে আলা ইবনে মুগিরার নিকটে এসে বসল।

আলা ইবনে মুগিরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনো গোপন কথা বলার মতো করে বললেন, 'তুমি তো জানোই, আমি আমীরুল মুমিনীনের কত ঘনিষ্ঠ লোক। আমি কোনো অনুরোধ করলে তিনি সাধারণত প্রত্যাখ্যান করেন না। আমি যদি সুপারিশ করে তোমাকে ইরাকের গভর্নর বানিয়ে দিই, তা হলে কেমন হয়?'

আহা, মুহূর্তে হেলালের কল্পনার চোখে ভেসে উঠল ইরাকের রাজপ্রাসাদ। সেবায় নিয়োজিত কত সেবক। শাহি খাবার। শাহি বিছানা। রাজকীয় বেতন। আরও কত কী!

হেলাল মুহূর্তে রাজি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, খুব ভালো হয়। আপনি যদি আমিরুল মুমিনীনের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেন, তা হলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনাকে ইরাকের গভর্নর বানিয়ে আমার কী লাভ? আমি কী পাব?'

'আপনি যদি আমাকে ইরাকের গভর্নর বানিয়ে দিতে পারেন, তবে আমি আমার পুরো এক বছরের বেতন ১ লক্ষ ২০ হাজার দিরহাম আপনাকে দিয়ে দেবো।'

'কিন্তু শুধু মুখের কথায় আজকাল কেউ বিশ্বাস করে না। দেখা যাবে তুমি গভর্নর হওয়ার পর আমাকে চিনতেও পারছ না। রাজি থাকলে লিখে দাও।'

হেলাল ক্ষমতার স্বপ্ন-নেশায় মত্ত হয়ে পড়েছে। ভালো-মন্দ চিন্তা করার তার যেন কোনো বুদ্ধি-বিবেক নেই। তাই তৎক্ষণাৎ কথাগুলো একটি কাগজে লিখে নিজের নাম দস্তখত করে দিলো।

আলা ইবনে মুগিরার কাজ অর্জন হয়ে গেছে। তিনি আর মোটেও দেরি করলেন না। কাগজটি এনে খলিফার সামনে মেলে ধরলেন। বললেন, 'আমিরুল মুমিনীন, আপনি যাকে খাঁটি মনে ইবাদতকারী মনে করছিলেন, তার আসল উদ্দেশ্য এবার নিজ চোখে দেখুন। তার এত লম্বা নামাজ, জিকির ও তেলাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যে এবার দেখুন...।'

এটা দেখে খলিফা আবদুল আজিজ ভীষণ বিস্মিত ও ব্যথিত হলেন। মানুষের মন এত ছোট হয়ে গেছে! সামান্য পার্থিব ক্ষমতার লোভে চিরস্থায়ী ইবাদতগুলোকে এভাবে তারা নষ্ট করে দিচ্ছে!

আমি আরও একটি ঘটনার কথা জানি। একবার এক লোক এক নারীর সাথে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতে লোকটি মেয়েটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাকে একটি খারাপ প্রস্তাব দেয়। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ তাতে সাড়া দিয়ে তাকে বাড়িতে আসার প্রস্তাব করে। লোকটি যখন মেয়েটির বাড়িতে এসে প্রবেশ করে, মেয়েটি লোকটিকে হত্যা করে ফেলে।

এছাড়া আরও অনেক ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো পুরুষ বা নারীর নিকট অসতর্ক হয়ে কোনো কথা বলা উচিত নয়–লোকটি বা নারীটি কোনো গোয়েন্দা হতে পারে। কিংবা এই খবর তোমার শত্রুর নিকট লাগিয়ে দিতে পারে। কিংবা কোনো অপরিচিত পরিবেশে লাগামহীন কথা বলাও উচিত নয়। সেখানে এমন কেউ থাকতে পারে, যে কথাটি শাসকের কানে পৌঁছে দেবে। কিংবা কথাটি এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা

হলো, যার কোনো নিকট আত্মীয় বা সমর্থক সেখানে রয়েছে। এতে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়।

মূলকথা, কোনো মানুষ সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হওয়া সমীচীন নয়। বিশেষ করে যাকে তুমি জীবনের কোনো একসময় কষ্ট দিয়েছ কিংবা অপমান করেছ। কিংবা তার কোনো প্রিয় ব্যক্তিকে কষ্ট দিয়েছ। এসকল ক্ষেত্রে গোপনে কেউ তোমার জন্য ফাঁদ পাতার পরিকল্পনা নিয়ে ঘুরতে পারে। যেমনটা ঘটেছিল সেই বিখ্যাত ঘটনায় 'জুব্বাই'-এর ক্ষেত্রে।

সহানুভূতি ও সহমর্মিতা

কোনো শত্রু বা হিংসুকের সাথে তর্কের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি একটি বোকামিপূর্ণ কাজ।

তুমি যদি তার অবস্থা সম্পর্কে জেনেই থাকো, তাহলে তার সাথে এমন কথা বলো, যা তোমাদের মাঝে শান্তি বজায় রাখতে সহায়ক হয়। সে যদি কোনো আপত্তি করে, সেটা গ্রহণ করো। সে যদি নিজের থেকে ঝগড়া করতে চায়, তুমি তা বর্জন করো এবং বোঝানোর চেষ্টা করো, দু-জনের অবস্থান খুবই কাছাকাছি।

এরপর তোমার কাজ হবে খুব বিচক্ষণতা ও গোপনীয়তার সাথে তার বিষয়ে সতর্ক থাকা এবং কোনো অবস্থায়ই তার ওপর আস্থা না রাখা। প্রকাশ্যে তার সঙ্গ ও সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেও ভেতরে ভেতরে তার সাক্ষাৎকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা।

এরপর তুমি যদি তাকে কষ্ট দিতে চাও, তবে তাকে তোমার প্রথম কষ্ট দেওয়া এই হবে যে, তুমি নিজেকে সংশোধন করে নেবে এবং যে সমস্যাগুলোর কথা সে তোমাকে বলেছে, সেগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করবে। এরপর তোমার সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ হবে– তাকে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে ক্ষমা করে দেবে। সে যত বেশি গালাগালি করবে, তুমি ততই তা বর্জন করে চলবে। আশা করা যায়, তাহলে জনসাধারণই তোমার পক্ষ হয়ে তার উত্তর দিয়ে দেবে। বিজ্ঞজনরা তোমার সহনশীলতার প্রশংসা করবে।

এছাড়া তুমি যদি তাকে প্রকাশ্যভাবে কষ্ট দাও কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণ করো, তবে এটা শুধু বাহ্যিকভাবেই একটি ক্ষত বা আঘাতের চিহ্ন রেখে যাবে। কিন্তু তুমি যদি আমার বর্ণিত পন্থায় উত্তম প্রতিশোধ নাও, সেটা তার অন্তরে বহুগুণ বড় আঘাত হয়ে জ্বলজ্বল করবে। এটা তোমার কোনো কথা দিয়ে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে বহুগুণে উত্তম। কারণ, তুমি যদি কথা দিয়ে তাকে কষ্ট দাও, তবে তুমি এর দ্বিগুণ কথা শুনতে বাধ্য থাকবে।

এছাড়া বেশি তর্কের মাধ্যমে এটা বেশি করে জানানো হবে যে, তুমি তার শত্রু। তখন সে তোমার থেকে সতর্ক থাকবে এবং বিভিন্ন কথা বলে বেড়াবে। আর বিতর্ক এড়িয়ে চলার মাধ্যমে সে তোমার অভ্যন্তর সম্পর্কে বেখবর থাকবে। তখন তুমি তার থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

কিন্তু দ্বীনের কোনো ক্ষতি করে তুমি যদি তাকে কষ্ট দাও, তবে তো সেই সবচেয়ে নিরাপদ ও নির্দোষ প্রমাণিত হবে। যার কাজের মধ্যে গোনাহ বিজয়ী হয়, সে নিজে কখনো বিজয়ী হতে পারে না। বরং বিজয় তো আসবে সুন্দর ধৈর্য ও বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে।

নির্দেশিত পন্থায় চলা তার জন্যই সহজ হবে, যে ব্যক্তি মনে করে– তার উপর মানুষের শত্রুতার এই কষ্ট চাপানো হচ্ছে তার নিজের কোনো গোনাহের কারণে কিংবা পরীক্ষার মাধ্যমে তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। তখন তো সে শুধু বিতর্ককারী শত্রুকেই দেখবে না, তখন সে অনুভব করবে স্রষ্টার কুদরত।

আখেরাতের বিনিময়

যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে জান্নাতের চিরন্তনতা নিয়ে এভাবে চিন্তা করবে– জান্নাতের স্বচ্ছ পবিত্রতার মধ্যে কোনো পঙ্কিলতা নেই। যেখানে আছে শুধু অন্তহীন আনন্দ ও সুখ। যেখানে আছে অন্তরের সকল চাহিদার বাস্তবায়ন। এবং আরও আরও বহু নিয়ামত– যা কোনো চোখ দেখেনি... যা কোনো কর্ণ শোনেনি... যা কোনো অন্তর কল্পনা করেনি। এর কোনো পরিবর্তন হবে না। নিঃশেষ হবে না। এটা এতই সীমাহীন যে, হাজার হাজার বছর বললেও কোনো কিনারা হবে না। লাখ লাখ বছর বললেও সীমা পাওয়া যাবে না। এমনকি যদি কোটি কোটি বছর বলো– তবুও এর সংখ্যার গণনা শেষ হবে না। কারণ, এ সংখ্যাগুলোর তবুও তো একটা সীমা ও সমাপ্তি

রয়েছে। কিন্তু আখেরাতের কোনো শেষ বা সমাপ্তি নেই। এমনই তার সীমাহীন নিয়ামত ও সুখ।

তবে এটাকে অর্জন করতে হবে দুনিয়ার এই সংক্ষিপ্ত জীবনের বিনিময়ে। আচ্ছা, একজনের সাধারণ প্রলম্বিত জীবন কতটুকু হয়– ধরি, একশ বছর। এর প্রাথমিক পনেরো বছর তো শৈশব ও অবুঝ অবস্থার মধ্যে চলে যায়। এরপর সত্তরের পর বাকি ত্রিশ বছর নানাবিধ দুর্বলতা ও অক্ষমতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। আর মাঝের যে শক্তিমত্তার বছরগুলো– এর তো প্রায় অর্ধেক যায় ঘুমের মধ্যে। কিছু যায় পানাহারে। আর যায় খাদ্য-খাবার উপার্জনে। আর বাকিটুকু সাধারণ বিভিন্ন অভ্যাস ও অবহেলায়।

তাহলে মূল জীবনের সময় কতটুকু? কতই না স্বল্প! এই স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত জীবনের বিনিময়ে সেই সীমাহীন অনন্ত সুখের জীবন কি সে কিনতে রাজি হবে না? জীবনের এই এত লাভজনক ক্রয় ও বিক্রয় থেকে দূরে থাকার অর্থ হলো সবচেয়ে বড় বোকামির পরিচয় দেওয়া। বুদ্ধিহীনতার প্রকাশ ঘটানো। এবং আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে বিশ্বাসের মধ্যে বড় ত্রুটি থাকার প্রকাশ করা।

আর কীভাবে এটা ক্রয়-বিক্রয় করতে হয়, তা জানা যাবে ইলমের মাধ্যমে। ইলমই পথ দেখায় এক্ষেত্রে কোনটি করা চাই আর কোনগুলো থেকে বিরত থাকা চাই।

কিন্তু ইবলিস এক্ষেত্রে একটা বড় ষড়যন্ত্র পাকিয়ে বসে আছে– যাতে বনি আদম এই অনন্ত সুখের জান্নাতে যেতে না পারে। সে কিছু জাহেদের অন্তরে এমন কিছু বিষয় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে, যার কারণে তারা ইলম থেকে দূরে সরতে শুরু করেছে। যেন ইবলিস ইলমের প্রদীপ নিভিয়ে দিতে চায়। যাতে সে অন্ধকারে শিকার করতে পারে। এ কারণে সে আলেমদের একটি বড় অংশকে এমন কাজে ব্যস্ত রেখেছে– যেন তারা ইলম থেকে দূরে সরে যায়।

আবু আহমাদ আত-তওসি নিজের ক্ষেত্রে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন– যা তার বিভিন্ন লেখায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'আমি একবার এমন একজন সুফির নিকট পরামর্শ চাইতে গেলাম, যিনি সুফিদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধ অগ্রগণ্য এবং অনেকের দ্বারা অনুসৃত। আমি তাকে কোরআন তেলাওয়াতের

বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তেলাওয়াত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বললেন,

'সঠিক পথ হলো, তুমি দুনিয়ার সাথে সকল সম্পৃক্ততা ছিন্ন করে ফেলবে। তোমার অন্তর যেন লেপ্টে না থাকে তোমার স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি। সম্পদ ও ইলমের প্রতি। বরং তোমার অবস্থা এমন হবে যে, এগুলোর অস্তিত্ব থাকা ও না-থাকা তোমার নিকট সমান মনে হবে। এরপর তুমি জমিনের কোনো একপ্রান্তে একেবারে মুক্ত অন্তর নিয়ে বসে যাবে। শুধু ফরজ ও নির্দিষ্ট ওজিফার উপর সীমাবদ্ধ থাকবে। এরপর অন্তর সবকিছু থেকে মুক্ত করে বসে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবে। জিকির করতেই থাকবে। এমন অবস্থা হবে যে, তুমি যদি জিকির বন্ধ করেও দাও, তবুও যেন তোমার জিহ্বায় আপনিই জিকির জারি হয়ে যায়। এরপর অপেক্ষা করো– নবী ও আওলিয়াদের ক্ষেত্রে যেই অবস্থা খুলে যায়, তোমার জন্যও সেই পথ খুলে যাবে।'

এক্ষেত্রে আমি বলি, এটি তেমন আশ্চর্যের বিষয় নয়। আমাকেও অনেকে এ ধরনের কথা বলেছে। কিন্তু আমি তাদের বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করি, যারা জেনে-বুঝেও এ ধরনের পথ অনুসরণ করে। কোরআন তেলাওয়াতকে উপেক্ষা করে কি সঠিক পথে চলা সম্ভব? নবীদের জন্য যা উন্মোচিত হয়েছে, তা কি তাদের চেষ্টা ও সাধনার কারণে হয়েছে? এই পথ ও পদ্ধতির কথা যে বলে, তার কথার ওপর কি আস্থা রাখা যায়? যায় না।

এরপর কথা হলো, এই সাধনার কারণে তার সামনে কী খুলে যাবে? তার জন্য অদৃশ্যের দরজা খুলে যাবে নাকি ওহির দরজা? এই সবকিছু হলো শয়তানের খেল-তামাশা। মানুষকে বিপথগামী করার ষড়যন্ত্রের খেলা। ক্ষুধার্ত অপুষ্ট নির্ঘুম বিশ্রামহীন নির্জন মানুষের নিকট অনেক বিষয়ই 'দৃষ্টিবিভ্রম' হয়। চোখে উল্টাপাল্টা দেখে। ভীষণ দুর্বলতায় চোখে আলোর ঝলকানি দেখে। কিংবা শয়তান নিজে বিভিন্ন বিষয় দেখায়। আর এতেই তারা মনে করে কী না কী অদৃশ্যের দরজা খুলে গেল! এই তো কারামত!

কিন্তু তোমার কাজ হবে ইলম অর্জন করা। সালাফে সালেহিনের জীবনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। তাদের কেউ কি কখনো এগুলো করেছেন, না এর আদেশ দিয়ে গেছেন?

সুতরাং তারা যদি এগুলো না করে কোরআন নিয়ে বসত। হাদিসের ইলম অর্জন করত। এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবিদের জীবনাদর্শের দিকে দৃষ্টি দিত– তাহলে এগুলোই তাদের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে কার্যকর ভূমিকা রাখত। তখন আর এভাবে তারা বিপথগামী হতো না।

ভালোবাসা ও ক্রোধকে লুকিয়ে রাখা

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কাউকে নিজের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচন করতে চায়, তার জানা থাকা উচিত– কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি দুই ধরনের হতে পারে–

১. স্ত্রী– যেখানে সাধারণত রূপসী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হয়।

২. বন্ধু– যেখানে অভ্যন্তরীণ আচরণ ভালো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হয়।

এখন কোনো নারীর বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্য যদি তোমাকে মুগ্ধ করে, তাহলে পুরোপুরি তার দিকে ঝুঁকে পড়ার আগে তুমি তার অভ্যন্তরীণ স্বভাব ও আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে নাও। খোঁজ-খবর নাও। এরপর তুমি যেমনটা ভালোবাসো, তাকে যদি তেমনটা পাও– আর এই প্রাধান্য দানের মূল বিষয় যদি দ্বীন হয়, যেমন হাদিসে এসেছে– তোমরা বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনের বিষয়টাকেই প্রাধান্য দাও– তাহলে তুমি তার দিকে অগ্রসর হতে পারো এবং বিয়ে করে সংসার শুরু করতে পারো।

তবে লক্ষ রাখার বিষয় হলো, তুমি তোমার এই ঝুঁকে পড়ার বিষয়ে পরিমিতিবোধ রক্ষা করে চলবে। নতুবা তুমি যদি তোমার প্রিয়তমার জন্য তোমার সকল ভালোবাসা উজাড় করে দেখিয়ে ফেলো, এটা হীতে বিপরীত হবে। এটা তোমার গলার কাঁটা হয়ে দেখা দেবে। তোমার এই দুর্বলতার সুযোগ সে নেব। তখন তুমি তোমার প্রিয়তমার থেকে শুধু কষ্টই পাবে। পাবে অবহেলা, অনাসক্তি ও অহংকার। তোমার থেকে সে শুধু বেশি বেশি সম্পদ নিতে থাকবে। তাই ভালোবাসার ঢেউয়ে মনের দু-কূল যদি উপচেও পড়ে, তবুও সম্পূর্ণটা প্রকাশ না করা উচিত।

তবে এর সাথে আরেকটি কথাও বলে রাখি– নতুবা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। খুবই সূক্ষ্ম কথা। সূক্ষ্মতম বোধ ও অনুভূতির কথা। কখনো কখনো অবশ্য মনের অবস্থা অনুযায়ী ভালোবাসার আচরণও করবে। সবটুকু ভালোবাসা দেখিয়ে

ফেলবে। নতুবা সেও তোমার ভালোবাসা নিয়ে সন্দেহে পতিত হয়ে যাবে। তুমি যে তাকে ভালোবাসো– তখন আর তাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না।

তবে এই ভালোবাসা প্রকাশ করবে খুবই অল্প সময়ের জন্য। এরপর আবার নিজের স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসবে। তাহলেই তোমার প্রিয়তমা তোমার বশীভূত ও অনুগত হয়ে থাকবে।

এভাবে তুমি তোমার সন্তানের ক্ষেত্রেও সব সময় পূর্ণ ভালোবাসা প্রকাশ করবে না। তাহলে সে তোমার ওপর বাড়াবাড়ি করবে। তোমার সম্পদ নষ্ট করবে। বেশি দম্ভ-বাহাদুরি দেখাবে। শিক্ষা ও আদব-কায়দা থেকে বঞ্চিত হবে।

বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একই কথা। তুমি তোমার পূর্ণ আগ্রহ ও ঝোঁক তাকে দেখিয়ে ফেলো না। বরং পরিমিত সৌন্দর্যের সাথে চলতে থাকো। যার যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা, তা আপনিই প্রকাশ পেয়ে যাবে। যেমন গাছ– ফল দেখেই তার পরিচয় লাভ করা যায়। অনর্থক মুখে বাগাড়ম্বর করে লাভ কী?

এরপর কোনো মানুষের খারাপ আচরণের কারণে তুমি যদি তার প্রতি রাগান্বিত হও, সেটা তার কাছে কিছুতেই প্রকাশ করো না। এমনটি করলে– তুমি তো তাকে আগেই তোমার ব্যাপারে সতর্ক সজাগ করে দেবে। বরং তাকে প্রকাশ্যে আলোচনার জন্য আহ্বান করো। বিষয়টা সমাধান করার চেষ্টা করো। সে যদি তোমার সাথে বাড়াবাড়ি করতে চায় কিংবা কোনো অনৈতিক কৌশল অবলম্বন করতে চায়, যতদূর সম্ভব তুমি ভালো আচরণ করো। যতটুকু সম্ভব তুমি এমন মার্জিত আচরণ করো, যাতে লজ্জায় তার শত্রুতার ধার কমে আসে।

আর যদি রাগ একেবারে দমন করে রাখতে সক্ষম না হও, তবে কথা বলো সুন্দরভাবে। তাকে কষ্ট দেয়– এমন কথা বলো না। তোমাকে যদি তার থেকে কোনো কঠিন কঠোর বা নোংরা কথাও শুনতে হয়, তবুও তুমি তার সাথে সুন্দর ও মার্জিত ভাষায় কথা বলো। তোমার এই সুন্দর আচরণই তার উদ্ধত মাথা ও কথাকে অবনমিত করতে পারে। এখন না হলেও পরে তো অবশ্যই, যদি তার বিবেক থাকে। একেবারে বিবেকশূন্য মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে।

জালেমের সহযোগিতাও জুলুম

আমার খুবই আশ্চর্য লাগে– যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তার প্রতিদানের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে ব্যক্তি কীভাবে এমন সুলতানের সেবাকে প্রাধান্য দেয়– যে জালেম ও পাপাচার?

এটা সে কেন করে? সে যদি দুনিয়া পাবার আশায় এটা করে থাকে, তবে তো এটা সঠিক পথ নয়। তাকে বাদশাহর সামনে বিনয়াবনত হয়ে বসে থাকতে হয়। কিন্তু এটাকেই সে গর্বের বিষয় মনে করে। বিভিন্ন মজলিসে দর্শকদের দিকে ঘাড় উঁচু করে সে তাকায়– কারণ, বাদশাহর সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে। সে হারাম সম্পদ গ্রহণ করে। অথচ সে জানে, এগুলো কোথা থেকে আসে। বাদশাহর সাথে সম্পৃক্ততার সুবাদে কখনো কখনো বিভিন্ন মানুষ থেকে ঘুষও গ্রহণ করে। আর এসব কারণে ইলম ও বেলায়েতের যে মিষ্টতার আস্বাদন তার মাঝে ছিল, তা ধীরে ধীরে সব বের হয়ে যায়। সেখানে অন্ধকার বাসা বাঁধতে থাকে।

কিন্তু এসব করেও তার প্রয়োজন পূরণের তৃপ্তি মেটে না। তার আরও সম্পদের দরকার হয়। কিন্তু সে তা প্রাপ্ত হয় না। তখন দেখা যায়, এতদিন যার প্রশংসা করে এসেছে, তার বদনাম করতে শুরু করে।

এমন যদি অবস্থা না-ও হয়, তবুও তো তাকে সব সময় সুলতানের মেজাজ-মর্জির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। সতর্ক থাকতে হয় নিজের কাজ ও কথা নিয়ে। তার অবস্থা যেন নৌকায় সাগর পাড়ি দেওয়ার মতো। শরীর অক্ষত থাকলেও অন্তর সব সময় ডুবে যাওয়ার ভয়ে থাকে শঙ্কিত।

আর যদি তার সাথে সম্পর্ক রাখে দ্বীনের জন্য, তবুও তো সে জানে, সুলতানরা অধিকাংশ সময়ই তাদেরকে দ্বীনের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে দেয় না। কারণ, তারা কখনো তাকে এমন কোনো কাজ বর্জন করতে আদেশ করে– যা ফরজ। আবার কখনো এমন কাজ করতে আদেশ করে– যা নাজায়েয। তখন তো নগদ তার দ্বীন ধ্বংস হলো। আর পরিণামে আখেরাতের শাস্তি আরও ভয়াবহ।

সদাচার দিয়েই শুধু স্বাধীনতা কেনা সম্ভব

যে ব্যক্তি লাঞ্ছনাকে অপছন্দ করে, সে কীভাবে একটি রুটির অপ্রাপ্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে পারে না? লাঞ্ছনাকর অনুগ্রহ থেকে নিজেকে কেন বিরত রাখতে পারে না? পৌরুষদীপ্ত কোনো হৃদয় কি তবে আর অবশিষ্ট নেই তার? সে যদি কোনো কৃপণের নিকট প্রার্থনা করে, তবে সে তাকে কিছুই দেবে না। আর যদি দেয়ও, খুবই অল্প দেবে। অথচ এই এতটুকু দান গ্রহণকারীকে সারাজীবনের জন্য দাস করে রাখবে। এই স্বল্প দানটুকু খুব দ্রুতই খরচ হয়ে যাবে। কিন্তু এই অনুগ্রহ, এই লাঞ্ছনা এবং নিজেকে তুচ্ছ করে দেখার হীনতা আজীবন রয়েই যাবে। কারণ, হাত পেতে গ্রহণকারীকে কখনো সম্মানের চোখে দেখা হয় না।

তাছাড়া এই সামান্য দানটুকু দাতার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা থেকে তাকে চুপ করিয়ে দেবে। তার কোনো হুকুম পালনে তাড়িত করবে। তার আকাঙ্ক্ষা মতো সেবা প্রদানে বাধিত করবে।

তাহলে কেন সে এই দানটুকু গ্রহণ করতে যাবে? এই হলো আশ্চর্য কথা!

তবে এর থেকেও আশ্চর্যের কথা হলো, এই সামান্য দানের মাধ্যমে যে ব্যক্তি স্বাধীনদের ক্রয় করতে সক্ষম, অথচ সে তা করে না! স্বাধীনকে শুধু অনুগ্রহ ও ইহসানের মাধ্যমেই ক্রয় করা যায়। কবি বলেন–

تفضل على من شئت واعن بأمره .. فأنت ولو كان الأمير أميره

وكن ذا غنى عن من تشاء من الورى .. ولو كان سلطاناً فأنت نظيره

ومن كنت محتاجاً إليه وواقفاً ... على طمع منه فأنت أسيره

তুমি যাকে চাও, তার ওপর অনুগ্রহ করো এবং তার কাজে সাহায্য করো। আমির যদি থেকেও থাকে, তবু তুমিই হবে তার আমির।

সৃষ্টির সকল থেকে মুখাপেক্ষিহীন হও, দেশে যদি বাদশাহ থেকেও থাকে, তুমি হবে তার সমকক্ষ।

আর তুমি যদি কারও নিকট মুখাপেক্ষী হও এবং তার আকাঙ্ক্ষা মতো চলো, তবে তুমি হবে তার বন্দি।

তরুণদের প্রতি আহ্বান

একটি কিশোর যখন সাবালক হয়, তখন তার জন্য উচিত হবে অধিক সহবাস ও বীর্যচ্যুতি [অর্থাৎ বিবাহিত বৈধ সহবাস বা যেকোনো উপায়ে বীর্যপাত] থেকে বেঁচে থাকা; যাতে তার শারীরিক গঠনের মূল কাঠামো শক্তিশালী থাকে। তাহলে এটা তার বার্ধক্যে উপকার করবে। কারণ, তার তো একটি দীর্ঘ বয়সের সম্ভাবনা রয়েছে। আর যার সম্ভাবনা রয়েছে, সে সম্পর্কে সতর্ক থাকাই উচিত– তাহলে সে কেন সতর্ক হবে না?

যেমন, শীত আসার আগেই তার প্রস্তুতি নিতে হয়। যে ব্যক্তি তার উপার্জনের সক্ষমতার সময় সকল সম্পদ খরচ করে ফেলে, অক্ষমতার সময় তাকে দারিদ্র্যের কষ্ট সহ্য করতে হয়।

যারা দ্বীনদার ও বুঝমান তারা বোঝেন, এ ক্ষেত্রে যেসকল বিষয় সহবাসের দিকে নিয়ে যায় সেগুলো থেকে তার বিরত থাকা উচিত। যেমন, দেখা করা। নিকটে আসা।[৯৮] আর এটাও জানা থাকা উচিত, অধিক সহবাস ভালোবাসাকে কমিয়ে দেয়। প্রকৃত আস্বাদনকে রহিত করে দেয়।

প্রাচীন আরবে তারা একে অপরকে ভালোবাসত; কিন্তু সহবাস করত না। প্রেমাস্পদের সাথে সহবাসকে তারা পছন্দ করত না। এ কারণে তাদের প্রবাদের মধ্যে আছে, إن نكح الحب فسد –ভালোবাসার মানুষের সাথে সহবাস করলে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়।

তাছাড়া ভালোবাসাহীন নিছক শুধু শারীরিক সহবাস– এটা তো চতুষ্পদ জন্তুদের অভ্যাস।

---

[৯৮]. বর্তমানে আরও যে সকল গোনাহের উপকরণ ও মাধ্যম রয়েছে সেগুলো থেকেও সতর্ক থাকা উচিত। যেমন মোবাইল, টিভি ও নেট। এগুলোর অশ্লীল বা খারাপ অপশন ও সাইটগুলো থেকে নিজেকে কঠিনভাবে বিরত রাখা উচিত। কারণ, এই অবারিত সুলভ অশ্লীলতা ও গোনাহপূর্ণ অবস্থান থেকে নিজেকে বিরত রাখতে না পারলে নিজের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না। দুনিয়া ও আখেরাত– উভয়টিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরসাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম– যেমন ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদি খুবই প্রয়োজন হলে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা। এর প্রতি আসক্ত হয়ে না পড়া। সময় নষ্ট না করা। চোখের হেফাজত করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।– অনুবাদক।

আমি সহবাসের উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করে একটি আশ্চর্য বিষয় অনুধাবন করেছি। বিষয়টি অনেক মানুষই অনুভব করে না। বিষয়টা হলো, কোনো ব্যক্তি যখন আরেকজনের প্রেমে পড়ে, তখন সে তার নৈকট্য অর্জনকে ভালোবাসে। তার সান্নিধ্য ও পরস্পর একত্র হওয়াকে ভালোবাসে। কারণ, এটিই হলো নৈকট্যের শেষ সীমা। এরপর তারা আরও নিকট হতে চায়, তখন গালে চুমো খায়। এরপর আত্মার আরও নৈকট্য চায়। তখন মুখে চুমো খায়। কারণ, এটাই আত্মার বের হওয়ার স্থান। এরপর আরও নিকটবর্তী হতে চায়, তখন প্রিয়তম বা প্রিয়তমার জিহ্বা লেহন করে। এরপর নফস যখন আরও নিকটবর্তী হতে চায়, তখন তারা সহবাসের দিকে অগ্রসর হয়।

এটা হলো হৃদয়ের খুবই সূক্ষ্ম ও অনুভবনীয় এক বিষয়। তবে এর থেকে শারীরিক সুখও অনুভূত হয়।

রহমতের আশা

মানুষের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করে এক আশ্চর্য বিষয় পরিলক্ষিত হলো। বিষয়টি মাথা এলোমেলো করে দেওয়ার মতো। আর তা হলো, মানুষ যখন ওয়াজ-নসিহত শোনে এবং তাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখন সে কথকের কথা বিশ্বাস করে, ক্রন্দন করে এবং নিজের অপরাধ ও অবহেলার জন্য অনুতপ্ত হয়। ভবিষ্যতে অটলভাবে আমলের ওপর প্রতিজ্ঞা করে।

কিন্তু এরপর যার যার বাড়ি চলে গেলে আবার সেই আগেরই অবস্থা ফিরে আসে। ওয়াজের সময় যেই প্রতিজ্ঞা আর ইচ্ছা করেছিল, সে অনুযায়ী আমল করতে গড়িমসি করে। তখন যদি তাকে বলা হয়, তবে কি তুমি আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করো?

উত্তরে বলে, না, কিছুতেই না।

যদি বলা হয়, তাহলে ঠিকভাবে আমল করো।

সে আবার আমলের নিয়ত করে। কিন্তু আবারও অলসতা শুরু হয়। আমল থমকে থাকে। বরং কখনো কখনো তো হারাম আস্বাদনের মধ্যে প্রবেশ করে। অথচ সে জানে, এটা সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে।

এ ধরনের মানুষের অবস্থা হলো হাদিসের বিলম্বিত সেই তিন সাহাবির (কাব ইবনে মালেক, হেলাল ইবনে উমাইয়া, মুরারা ইবনে রাবিয়া রা.) অবস্থার মতো। তাদের যেমন কোনো ওজর নেই। আবার তারা বিলম্ব করার খারাপি সম্পর্কেও অবগত। প্রত্যেক পাপী ও অবহেলাকারীর অবস্থাও এমনই। তখন আমি এই অবস্থা নিয়ে চিন্তা করলাম যে, বিশ্বাস ও আকিদা তো বিশুদ্ধ; কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে এই যে অবহেলা ও গড়িমসি– এগুলোর কারণ কি? আমার মনে হয় এর পেছনে রয়েছে তিনটা কারণ–

১. তাৎক্ষণিক আনন্দ ও আস্বাদন। মানুষের চারপাশে এইগুলো অনেকটা যেন ওত পেতে রয়েছে। তাই খুব সহজেই মানুষ যা অনেক পরে ও দূরে রয়েছে, তার পরিবর্তে বর্তমান ও তাৎক্ষণিক আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলে।

২. পরে কখনো তাওবা করে নেওয়ার ইচ্ছা। অর্থাৎ এখন গোনাহ হয়ে গেলেও পরে তাওবা করে ক্ষমা চেয়ে নেব– এমন ইচ্ছার বশবর্তী হয়েও অনেকে গোনাহে লিপ্ত হয়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কথা হলো, সে যদি আকল দিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করত, তবে বিলম্বে তাওবার সমস্যাগুলো নিয়ে সে সতর্ক থাকত। কারণ, মৃত্যু তো অনেকসময় আকস্মিক এসে যায়। তাওবা করার কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না।

আরও ভয়াবহ বিষয় হলো, এমন ব্যক্তি—যেকোনো মুহূর্তে যার প্রাণবায়ু বের হয়ে যেতে পারে—তবুও সে দৃঢ়তার ওপর আমল করে না। তাওবা করে না। বরং নফস তাকে আরও দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায়। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, صل صلاة مودع –নামাজ পড়ো জীবনের শেষ নামাজ পড়ার মতো।[৯৯]

---

৯৯. সুনানে ইবনে মাজা: ১২/৪১৬১, পৃষ্ঠা: ২০৭ এবং মুসনাদে আহমদ: ৪৭/২২৪০০, পৃষ্ঠা: ৪৯৫– মা. শামেলা। পুরো হাদিসটি এমন–

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِي وَأَوْجِزْ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاجْمَعْ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدَيْ النَّاسِ.

এ ধরনের রোগীর জন্য এটিই হলো শ্রেষ্ঠ ওষুধ। কারণ, যে ব্যক্তি ভাববে, এই নামাজের পর সে আরেকটি নামাজের সময় পর্যন্ত জীবিত থাকবে না, সে তো এই নামাজ খুব যত্ন ও খুজু-খুশুর সাথে আদায় করবে।

৩. আল্লাহর রহমতের আশা করা।

আল্লাহর রহমতের আশা তো করতেই পারে মানুষ। কিন্তু তাই বলে অব্যাহত গোনাহ করবে, তাওবা করবে না এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে না– অথচ তার রহমতের আশা করে বসে থাকবে, তবে তো সে তার রহমত পাবে না।

সে মনে মনে ভাবছে, আল্লাহ তাআলা তো রহিম দয়ালু দয়াময়; কিন্তু সে কেন ভুলে থাকছে যে, আল্লাহ তাআলা কঠিন শাস্তিদাতাও। তার জানা উচিত আল্লাহর রহমত এত সহজ নয়। যদি তা-ই হতো, তবে তো পৃথিবীতে একটি চড়ুইও জবাই হতো না। কোনো শিশুকেই কষ্টে আপতিত হতে হতো না। তার শাস্তি থেকে সবাই নিরাপদও নয়। নতুবা তিনি চুরির বিনিময়ে হাতকাটার নির্দেশ দিতেন না। ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ দিতেন না।

আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের প্রার্থনা– তিনি যেন আমাদের কল্যাণকর কাজের ওপর সক্ষমতা ও অটলতা দান করেন। আমিন।

অক্ষুণ্ন মনোযোগের কৌশল

দুনিয়ার কারবারের মাঝে ইলম ও উৎকর্ষের ক্ষেত্রে নিজের মনোযোগ অক্ষুণ্ন রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে একজন দরিদ্র যুবকের জন্য। এই অবস্থায় সে যদি বিয়ে করে, তবে তো তার উপার্জনের চিন্তাতেই বেহাল দশা হয়ে পড়বে কিংবা তাকে মানুষের নিকট চেয়ে বেড়াতে হবে– এতে কিছুতেই তার মনোযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে না। এরপর যখন তার সন্তান-সন্ততি হবে, তখন তো চাহিদা আরও বেড়ে যাবে। উপার্জনের চিন্তায় চোখে-মুখে কিছুই দেখতে পাবে না। তখন হয়তো হালাল-হারামের বাছবিচার করার অবস্থাও তার থাকবে না। আর যদি বেঁচে চলতে চায়, তখন তার ও তার পরিবারের খাদ্যের কী অবস্থা হবে– আল্লাহই মালুম। আর যদি স্ত্রী তার এই জীর্ণ ভরণ-পোষণের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে—অথচ এর অধিক তার বর্তমানে সক্ষমতাও নেই—তখন কি আর তার মনোযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে? কীভাবেই বা সে নিশ্চিন্তে নিজের কাজ করতে সক্ষম হবে?

কিছুতেই সম্ভব নয়।

সেই অবস্থায় স্থিরচিত্তের আশা করা যায় কীভাবে– যখন চোখ চেয়ে থাকে মানুষের দয়ার দিকে, কান শুনতে থাকে তাদের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত কথা। ভাষা তাদেরকে সম্বোধন করে বিভিন্ন তোষামোদি শব্দে– আর এর মাঝেই অন্তর বিচলিত থাকে নিজের অপরিহার্য উপার্জনের চিন্তায়?

কেউ যদি প্রশ্ন করে, এ অবস্থায় তবে আমার কী করা উচিত?

আমি উত্তরে বলব, দুনিয়াতে যদি সাধারণভাবে তোমার চলার মতো কোনো উপার্জন থাকে– যতই সামান্য হোক, যদি তা যথেষ্ট হয়ে যায়, তবে তুমি তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকো। যতদূর সম্ভব দুনিয়াদার মানুষের সংশ্রব থেকে দূরে অবস্থান করো। আর যদি বিয়ের প্রয়োজন হয়, তাহলে দরিদ্র দেখে বিয়ে করো– তাহলে সে স্বল্প ভরণ-পোষণের ওপরই সন্তুষ্ট থাকবে। আর তুমিও তার দারিদ্র্যের প্রতি সবর করবে। যদি অসুন্দরও হয়– তুমি তার এই কিছুটা অসৌন্দর্যের ওপরও ধৈর্যধারণ করবে। কিছুতেই এমন কাউকে বিয়ে করার দিকে ঝুঁকবে না– যার চাহিদা বেশি। বেশি ভরণ-পোষণের প্রতি আগ্রহী এবং আহ্লাদী।

এভাবে তোমার যদি একটি সৎ ও ধৈর্যশীলা স্ত্রী মেলে, তবেই শুধু তোমার মনোযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে। আর যদি তেমন কাউকে না পাও, তবে তোমার বিপদের মধ্যে পড়ার চেয়ে ধৈর্যধারণ করাই উত্তম।

আর অধিক সুন্দরী ও সৌখিনতা থেকে সব সময় নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবে। কারণ, সৌন্দর্যে বিমোহিত মানুষ তাদের প্রতি মূর্তিপূজারীদের মতো হয়ে পড়ে।

আর তোমার হাতে যদি কিছু উপার্জন হয়, তুমি তার কিছু খরচ করবে আর কিছু অবশিষ্ট রাখবে। এটাই তোমার মনোযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়ক হবে।

এই যুগ ও এই যুগের মানুষের থেকে খুবই সতর্ক থাকবে। এখন আর কোনো নিঃস্বার্থ উপকারী ও অন্যকে প্রাধান্য দানকারী সহানুভূতিশীল ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। প্রকৃত বন্ধুত্বও উধাও হতে চলেছে। এখন কারও নিকট চাইলে সামান্য দেবে; কিন্তু ব্যাপক বিরক্ত হবে। একটু অনুগ্রহ করবে; কিন্তু তাতেই যেন সারাজীবন দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে চাইবে। যখনই দেখা হবে, তখনই যেন অন্যভাবে অবহেলা দেখাবে। কিংবা এটার খোঁটা দেবে বা প্রতিদান চাইবে। অথবা এর কারণে তার কাছে বারবার যেতে বাধ্য করবে।

কিন্তু অতীতকালে ছিলেন আবু আমর ইবনে নাজিদের মতো ব্যক্তিত্বগণ। হজরত আবু উসমান আল মাগরিবি একদিন মিম্বারে আলোচনার মাঝে বললেন, আমার ওপর একহাজার দিনার ঋণ রয়েছে। এতে আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছি।

এইদিন রাতেই আবু আমর ইবনে নাজিদ তার নিকট আগমন করলেন। এবং পূর্ণ একহাজার দিনারের একটি থলে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা দিয়ে আপনি আপনার ঋণ পরিশোধ করুন।

পরের বার তিনি মিম্বারে বসে বললেন, আমি আল্লাহর নিকট আবু আমরের শোকর আদায় করছি। তিনি আমার অন্তরকে স্বস্তিময় করেছেন। আমার ঋণ পরিশোধ করেছেন।

সেখানেই হঠাৎ আবু আমর দাঁড়িয়ে বললেন, এই সম্পদটি ছিল আমার মায়ের। তার এটা দিতে খুবই কষ্ট হয়েছে। আপনি যদি এটি তাকে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন, তবে ফিরিয়ে দিলেই ভালো হয়।'

কিন্তু যখন রাত্র হলো, আবু আমের আবার আবু উসমানের নিকট এসে অভিযোগ করে বললেন, আপনি কেন মানুষের মাঝে আমার নাম প্রকাশ করে দিলেন? আমি তো এটা তাদের জন্য করিনি। আপনি এটা আপনার জন্যই রাখেন। আর আমার কথা কাউকে বলবেন না।

আহা, এমনই ছিল তাদের মহিমান্বিত দান ও নিঃস্বার্থতা! সেগুলো আজ কোথায়! এই ব্যাপারটির দিকে ইঙ্গিত করে জনৈক কবি বলেন,

ماتوا وغيب في التراب شخوصهم ... والنشر مسك والعظام رميم

তারা তো সবাই ইন্তেকাল করেছে। আর সেই সাথে মাটির মধ্যে নিহিত হয়ে গেছে তাদের ব্যক্তিত্ব।

আজও তাদের মাটি হতে মহত্বের সুগন্ধি ঝরে। জীর্ণ হাড়ও প্রকাশ করে হৃদয়ের উদার উজ্জ্বলতা।

সুতরাং হে ভাই, যার অন্তর জুড়ে রয়েছে দুনিয়ার আয়-উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তুমি তার থেকে বহুদূরে অবস্থান করো। তার সাথে মিশে যতটা না অর্জন করতে সক্ষম হবে, তারচেয়ে অনেক বেশি দুনিয়ার প্রতি প্রভাবিত হবে। নিজের স্বল্পতুষ্টির শান্তি বিনষ্ট হবে। তুমি তাকে বাহ্যিকভাবে বন্ধু ভাবলেও গোপনে সে তোমার শত্রু। তোমার কষ্টে ও বিপদে আনন্দিত। তোমার কল্যাণের ওপর ঈর্ষান্বিত। তুমি তার থেকে নির্জনতা ক্রয় করে নাও। একজন মানুষ—যার অন্তর ও বোধ রয়েছে—সে যখন বাজার থেকে ঘুরে তার বাড়িতে আসে, তার অন্তর আগের মতো আর থাকে না। বাজার তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দেয়। তার মাঝে বঞ্চনার হাহাকার তৈরি করে দেয়। তাহলে সর্বক্ষণ কেউ যদি দুনিয়ার আসবাব ও বিলাসের উপকরণের মধ্যে থাকে– তার অন্তর বিক্ষিপ্ত না হয়ে যায় কোথায়!

আবারও বলি—এ ধরনের মানুষের থেকে নির্জনতা অবলম্বন করে নিজের মনোযোগকে নিজের কাজে একান্ত করার চেষ্টা করো। যাতে অন্তর পরপারের অবস্থান নিয়ে চিন্তা করতে পারে। পথ-যাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করতে পারে।

ধ্বংসশীলদের বৈশিষ্ট্য

অধিকাংশ মানুষের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য খারাপ ধরনের। কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ ও পরিচর্যার মাধ্যমেও এগুলো সংশোধন হতে চায় না। জীবন সম্পর্কে তাদের যেন কোনো প্রশ্ন নেই। তাদের কেন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের থেকে কী কামনা করা হয়– সে সম্পর্কে তারা যেন কিছুই জানে না এবং জানতে চায়ও না।

তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো, পার্থিব সুখের উপকরণ অর্জন করা। আর তা অর্জনে যে রয়েছে কদর্যতা ও দ্বীনের ক্ষতি– সেদিকে তারা কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। সাময়িক আনন্দ ও স্ফূর্তিকেই প্রাধান্য প্রদান করে; কিন্তু এর পরিবর্তে দীর্ঘ শাস্তি ও আজাবের প্রতি লক্ষ করে না। ব্যবসার ক্ষেত্রে মানুষকে ধোঁকা প্রদান করে। মানুষকে প্রতারিত করার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে। আস্থা রাখার মতো পোশাক পরিধান করে। প্রকৃত অবস্থাকে আড়াল করে রাখে। যা অর্জন করে, তা সন্দেহপূর্ণ। যা ভক্ষণ করে, তা তার যৌনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। রাতভর নিদ্রা যায়– যদিও এক অর্থে দিবসজুড়েও তারা ঘুমায়। এটা বাহ্যিক ঘুম নয়– এটা হলো নিজের জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীনতা। এরপর যখন সকাল হয়, তখন আবার তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় অর্জনের জন্য ছুটতে থাকে– শূকরের লোভ নিয়ে, কুকুরের তোষামোদ নিয়ে, সিংহের হিংস্রতা নিয়ে, নেকড়ের আক্রমণ নিয়ে এবং শিয়ালের প্রতারণা নিয়ে।

আর মৃত্যুর সময় আফসোস করে এই জীবনের উপভোগ্যতার সমাপ্তি নিয়ে; তাকওয়া ও আমলের নিঃসম্বলতা নিয়ে নয়। এই হলো তাদের সকল চাহিদা ও কামনার শীর্ষদেশ।

সেই ব্যক্তি কীভাবে সফলকাম হতে পারে, যে বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝে তার ওপর চোখ দিয়ে যা দেখে, সেটাকেই প্রাধান্য প্রদান করে? অভিজ্ঞতা দিয়ে যা অনুধাবন করে তার ওপর চোখ দিয়ে যা অবলোকন করে, সেটাকেই প্রাধান্য প্রদান করে? তারা যদি তাদের অন্তর-কান খুলে রাখত, তাহলে শুনতে পেত– দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে সফরের সঙ্গী ডেকে ডেকে বলছে—সকলেই সতর্ক হও, যাত্রার পাথেয় ও সামানের জন্য প্রস্তুতি নাও।

কিন্তু মূর্খতার বেহুঁশি তাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে। তারা তো জেগে উঠবে না– অন্তিম শাস্তির কড়াঘাত ব্যতীত।

একনিষ্ঠতার আবশ্যকতা

আমি সেই ব্যক্তির বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করি, যে মানুষের সামনে জুহুদ ও দুনিয়াবিমুখতার ভান করে এবং আশা করে, এর মাধ্যমে সে মানুষের অন্তরে প্রিয় হয়ে উঠবে। কিন্তু সে কেন ভুলে যায়– মানুষের অন্তরসমূহ আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে।

সে যদি একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তাআলার জন্য আমল করত এবং তিনি তার আমলের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন, তবে মানুষের অন্তর আপনিই তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। কিন্তু যখন সে মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করে এবং এতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, তখন পরিণামে মানুষের অন্তরও একসময় তার থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে।

এভাবে কেউ যখন নিজের আমল দ্বারা মানুষের অন্তর তার দিকে ঝুঁকিয়ে নিতে চায়, তখন তার শরিক হয়ে পড়ে অনেক। সে সময় তাদের সকলের মর্জি ও বাসনার অনুসরণ করতে গিয়ে তার আর বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকে না। তাদের মর্জি মতো তার কাজেরও ধরন পাল্টাতে থাকে এবং সে পাল্টাতে বাধ্য হতে থাকে।

কিন্তু একনিষ্ঠতা কী?

একনিষ্ঠতার জন্য আবশ্যক হলো, আমলকারী মানুষের অন্তর তার দিকে ঝোঁকার ইচ্ছা করবে না। বরং মানুষের কোনো ইচ্ছাই সে করবে না। কারণ, এখানে বিষয়টা এমনই এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, মানুষকে আকৃষ্ট করার ইচ্ছার দ্বারা কখনো তারা আকৃষ্ট হবে না; এটাকে অপছন্দ করলেই বরং তারা আকৃষ্ট হবে!

যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করে, এক সময় না একসময় সেটা প্রকাশিত হয়েই পড়ে। মানুষের অন্তরও কেন যেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তখন তার সকল কিছুই বৃথা ও ব্যর্থ হয়। কারণ, তার আমলগুলো আল্লাহর নিকটও যেমন কবুল হয় না, মানুষের কাছেও কোনো মূল্য পায় না। তাদের

অন্তর তার থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। এভাবেই তার পুরো আমল নষ্ট হয়। গোটা জীবনটাই বিনষ্ট হয়। হাদিসে এসেছে—

> عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :... ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس عليه باب ولا كوة ، لخرج ما غيبه للناس كائنا ما كان.
>
> হজরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এমন শক্ত কঠিন পাথরের মধ্যে বসেও যদি একনিষ্ঠভাবে আমল করত, যার মধ্যে কোনো দরজা-জানালা নেই, তবুও কোনো না কোনোভাবে মানুষের চোখের আড়ালে রাখা তার এ আমল প্রকাশিত হয়ে পড়বেই পড়বে।[১০০]

সুতরাং বান্দার শুধু আল্লাহ তাআলাকেই ভয় করা উচিত। এবং আমলের ক্ষেত্রে তাকেই সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা করা উচিত, যিনি তাকে উপকার করবেন। এবং কিছুতেই তাদের সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হবে না— যারা নিজেরাই বিপদে আক্রান্ত হয়।

মানার মধ্যেই নিরাপত্তা ও কামিয়াবি

যে ব্যক্তি আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, নিশ্চয় বিস্ময়ে তার মাথা চক্কর দিয়ে ওঠে। এক ধরনের চাপ তাকে স্বীকার করতে হয়। কারণ, তাকে এমন এক সত্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হয়, যার কোনো সূচনা নেই। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। এটি এমন এক বিষয়— যা সাধারণ ইন্দ্রিয়শক্তি আয়ত্ব করতে সক্ষম নয়। মাথা-মস্তিষ্ক খাটিয়ে এটাকে স্বীকার করতে হয়। তবুও এই স্বীকারোক্তির পরও সে বিভিন্ন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। কিন্তু সে চারপাশে স্রষ্টার এত এত নিদর্শন দেখতে পায় এবং তার এত কাজ দেখতে পায়, যেগুলো তার অস্তিত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করে। তবে আবার তার ভাগ্যে

---

[১০০]. মুসনাদে আহমদ: ২২/ ১০৭৯৮, পৃষ্ঠা: ৩৪৩ এবং মুসতাদরাকে হাকেম: ১৮/৮৯৯০, পৃষ্ঠা: ২৪৮– মা. শামেলা।

এমন অনেক ব্যাপার ঘটতে থাকে, যখন মনে হয়, তার অস্তিত্বের ওপর যদি এত প্রমাণ না থাকত, তবে তো সে অস্বীকার করেই বসত।

আল্লাহ হলেন সেই মহান সত্তা, যিনি বনি ইসরাইলের জন্য সমুদ্র বিদীর্ণ করে রাস্তা করেছেন। এটি এমন এক বিষয়, যা কখনো স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না। তিনি লাঠিকে সাপে রূপান্তরিত করেছেন, সেই সাপ জাদুকরদের সকল সাপকে ভক্ষণ করে ফেলেছে। এরপর তাকে আবার লাঠিতে রূপান্তরিত করেছেন। এগুলোর পরও কি আর কোনো প্রমাণ দরকার হয় তার অস্তিত্ব ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে?

কিন্তু কথা হলো, যখন জাদুকররা ঈমান আনল, তিনি তাদেরকে ফিরআউনের কবলেই রেখে দিলেন। ফিরআউন তাদেরকে হত্যা করল। শূলে চড়াল। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। এভাবে আরও কত নবী ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছেন। যেমন, হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। হজরত ইয়াহইয়া আলাইসি সালামকেও হত্যা করা হয়েছে। আরও অনেক নবীকেও নির্যাতন-নিপীড়ন, কষ্টক্লেশ, হাসি-ঠাট্টা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মাঝে নিপতিত হতে হয়েছে। আমাদের নবীকেও অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। মক্কায় থাকার সময় তাকে অনেকবার বলতে হয়েছে– কে আমাকে সাহায্য করবে? কে আমাকে সাহায্য করবে?

অবস্থা ছিল এতটাই ভয়াবহ!

এক্ষেত্রে স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে যারা মূর্খ, তারা বলতে চায়, তিনি যদি থাকতেনই তবে তিনি তার প্রিয় ব্যক্তিদের সাহায্য করতেন। তাদেরকে এভাবে কষ্ট সহ্য করতে দিতেন না। নির্যাতন ও হত্যার শিকার হতে দিতেন না!

এটা খুবই মূর্খতাসুলভ কথা ও যুক্তি। স্রষ্টাকে যদি স্রষ্টাই মানি, তবে তার কাজের ক্ষেত্রে আপত্তি আসে কীভাবে? যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত, তার জন্য উচিত হবে কিছুতেই স্রষ্টার কার্যাবলির ক্ষেত্রে আপত্তি না করা। তার কোনো কাজের জন্য কারণ অন্বেষণ না করা। কারণ, তার নিকট যেহেতু প্রমাণিত হয়েই আছে তিনি স্রষ্টা মালিক এবং প্রজ্ঞাময়– তবে আর তাঁর কোনো কাজের ক্ষেত্রে আপত্তি আসবে কেন?

কিন্তু কথা হলো, তাঁর কোনো কাজের রহস্য, মূল কারণ কিংবা কল্যাণকামিতা যদি আমাদের নিকট অস্পষ্ট ও অধরা থাকে, না বুঝে আসে– তবে নিশ্চয় সেটা আমাদের বুঝের অভাবের কারণে। আমাদেরই অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কারণে। দুনিয়ার পরীক্ষাগারে এটা এমনই থাকতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে কিছু কিছু তিনি দুনিয়াতেই আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু তার সবকিছু আমরা বুঝতে সক্ষম নই। এটা সম্ভবও নয়।

আমরা হজরত মুসা আলাইহিস সালামের ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখি। তিনি তো প্রথমে নৌকা বিদীর্ণ করা এবং ছোট বাচ্চাটাকে হত্যা করার রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি। এতে তিনি কোনো কল্যাণ দেখতে পাননি। বরং এটাকে তার মনে হয়েছে অন্যায় ও জুলুম। কিন্তু যখন তার নিকট মূল বিষয়টি প্রকাশ করা হলো, তখন তিনিই স্বীকার করলেন– হ্যাঁ, এর মধ্যেই কল্যাণ ও ইনসাফ ছিল।

ঠিক একইভাবে স্রষ্টার কার্যাবলির ক্ষেত্রে যখন আমাদের নিকট কল্যাণটা অস্পষ্ট থাকে, তখনই আমাদের মস্তিষ্ক অস্বীকার করে বসে। এ বড় তাড়াহুড়াপ্রবণ কাজ। মূর্খের মতো আচরণ। বরং যখন তুমি মস্তিষ্ককে বলতে শুনবে– আমি কেন চুপ করে থাকব?

তখন তুমি তাকে বলো, হে মূর্খের মূর্খ, তুমি তো তোমার নিজের বাস্তবতা সম্পর্কেই কিছু জানো না। তবে আর কোন মুখে স্রষ্টা ও মালিকের কাজের ওপর আপত্তি তোলো?

আবার কখনো কখনো ঘুমন্ত বিবেক মাথা তুলে বলে ওঠে, মানুষদের এত কষ্টের মধ্যে আপতিত করে স্রষ্টার কী লাভ! তিনি তো কোনো ধরনের কষ্ট ছাড়াও তাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি দিতে সক্ষম? জাহান্নামিদের শাস্তি প্রদানের মধ্যেই বা তার কী উদ্দেশ্য লুকায়িত?

তখন তুমি তাকে বলো, তার হিকমত ও প্রজ্ঞা তোমার সকল অবস্থান থেকে বহু উর্ধ্বে। সুতরাং যে সম্পর্কে তুমি জানো না, তা স্বীকার করে নাও। কারণ, সর্বপ্রথম যে নিজের যুক্তি দিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল, সে হলো ইবলিস। সে মাটির ওপর আগুনের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যুক্তি দেখিয়েছিল। তাই সে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল।

আমরা এমন অনেককে দেখেছি এবং আরও অনেকের কথা শুনেছি– যারা স্রষ্টার হিকমতকে স্বীকার করতে চায় না। তারা নিজেদের বুদ্ধি বিবেক ও যুক্তির দাবি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তারা ভুলে যায়– স্রষ্টার হিকমত তাদের যুক্তি-বুদ্ধির কত ঊর্ধ্বে! তিনিই হলেন এসকল যুক্তি বুদ্ধি ও বিবেকের স্রষ্টা!

সুতরাং তোমার এই সামান্য বুদ্ধি ও ভঙ্গুর যুক্তি নিয়ে স্রষ্টার ভুল ধরতে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকো। তাঁর কোনো কাজে আপত্তির উত্তর অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকো। তুমি তোমার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বলো, سلم تسلم - মেনে নাও, নিরাপদ থাকবে। কারণ, তুমি তো তার জ্ঞানের সাগরের অতলে পৌঁছুতে পারবে না, বৃথাই শুধু তার আগেই ডুবে মরবে।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এটিই হলো মূলনীতি। যে মানুষ এটার অনুসরণ করে না, সে আপত্তি করতে করতে কুফরির দিকে ধাবিত হয় এবং ধ্বংস হয়।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির কোনো উদাসীনতা থাকে না

জ্ঞান ও বুদ্ধি যখন পরিপক্ক হয়, দুনিয়ার আস্বাদন তখন বিদূরীত হয়ে যায়। শরীর ভেঙে পড়ে। অসুস্থতা বাড়তে থাকে। চিন্তা-কষ্ট তীব্র থেকে তীব্র হতে থাকে।

কারণ, জ্ঞান ও বুদ্ধি যখন সবকিছুর পরিণামের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সে দুনিয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন সে তার সুদূর স্থায়িত্বের দিকে ধাবিত হয়। তখন তার কাছে আর তাৎক্ষণিক স্বাদ-আহ্লাদের কোনো মূল্য থাকে না।

দুনিয়ার আনন্দ-স্ফূর্তি নিয়ে তারাই মেতে থাকে, যারা আখেরাতের চিন্তা থেকে গাফেল ও উদাসীন। যারা আসন্ন ভয়াবহতা সম্পর্কে অসতর্ক। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধি যার পরিপক্ক হয়েছে এবং দৃষ্টিতে দূরদর্শিতা এসেছে, সে তো আর উদাসীন ও অসতর্ক থাকতে পারে না। এ কারণেই হয়তো সে অন্যদের মতো সকল মানুষের সাথে নির্বিবাদে মিশতে পারে না। অবুঝ মানুষদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। তারাও যেন তার শ্রেণির নয়। সেও যেন তাদের শ্রেণির নয়।

যেমন জনৈক কবি বলেন,

ما في الديار أخو وجد نطارحه ... حديث نجد ولا خلٌ نجاريه

ঘরে নেই ব্যথার সাথি, যার সাথে কিছু সন্তুষ্টচিত্ত কথা বলতে পারি।
নেই কোনো এমন বন্ধু, আপন বলে যাকে কাছে টানতে পারি।

সকল কাজে সতর্কতা অবলম্বন করা

বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত সকল কাজেই যথাসম্ভব সর্বোচ্চ পরিমাণে সতর্কতা অবলম্বন করা। সতর্কতা সত্ত্বেও যদি ভাগ্যের কিছু ঘটে যায়, তবে সেটা কষ্ট দেবে না।

ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সকল বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত এবং সে জন্য প্রস্তুত থাকাও প্রয়োজন। এটা সকল অবস্থার জন্যই প্রযোজ্য।
একবার একলোক তার নখ কাটছিল। অসতর্কতায় আঙুলের কিছু অংশ কেটে গেল। এতে একসময় তার হাতটিই পচে গেল। অবশেষে এতে করে লোকটি মারাই গেল।

আমাদের উস্তাদ শায়খ আহমদ আল হারাবি রহ. একবার বাহনে সাওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তা ছিল খুবই সংকীর্ণ। বাধ্য হয়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে হয়েছিল। এতে তার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে উঠল। ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাতেই ইন্তেকাল করলেন।

ইয়াহইয়া ইবনে নিযার নামে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রায় আমার মজলিসে আগমন করতেন। একদিন তার কান ভারি ভারি লাগছিল। যেন কানের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি বাজছে। কানে জোরে একটি থাপ্পড় দিলেন। মগজ থেকে কিছু একটা বের হয়ে এল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্কতার বিষয়টি লক্ষ করে দেখো—তিনি একবার এক হেলে পড়া দেয়ালের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত রাস্তা পার হলেন। এছাড়া তার জীবনের অন্যান্য কাজেও সতর্কতা ছিল সব সময়। কত আগেই না হিজরত সম্পর্কে আবু বকর রা.-কে সজাগ করে দিয়েছিলেন!

একজন মানুষের জন্য কর্তব্য হবে– সে তার যৌবনের উপার্জনে সতর্কতার সাথে বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে। জীবনের কোনো কারবার বা লেনদেনের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত আস্থাবান না হলে কারও ওপর আস্থা করে বসবে না। কখন মৃত্যু এসে যায় ঠিক নেই, কিছু ওসিয়ত করতে হলে আগেই করে রাখবে। শত্রুর ক্ষেত্রে যেমন সতর্ক থাকবে, বন্ধুর ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকবে এবং জীবনে কখনো কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার হৃদ্যতার ব্যাপারেও সতর্ক থাকবে। কারণ, তার অন্তরের ক্রোধ বা ক্ষোভ হয়তো এখনো ধিকিধিকি জ্বলছে। সুযোগ পেলে যেকোনো সময় ক্ষতি করতে পারে।

মুসতারশিদের খেলাফতের সময় কবি ইবনে আফলাহ গোপনে তার নেতার সাথে চিঠি আদান-প্রদান করত। এই ঘটনা জানত তার দারোয়ান। ঘটনাক্রমে একসময় তিনি তার দারোয়ানকে বাদ দিয়ে দিলেন। দারোয়ান ক্ষুব্ধ হয়ে কবির গোপন চিঠি আদান-প্রদানের কথা ফাঁস করে দিলো। পরিণামে বাদশাহর বাহিনী এসে কবির বাড়ি-ঘর সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল।

এখানে মাত্র অল্পকিছু উদাহরণ উপস্থাপন করা হলো। এমন অসতর্কতার ভয়াবহ পরিণতির ঘটনা ছড়িয়ে আছে আরও অনেক। মোটকথা সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে সতর্ক থাকতে হবে কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি প্রদানের ক্ষেত্রে, প্রকৃত তাওবার ক্ষেত্রে– তাকে মৃত্যু আক্রমণ করার আগেই।

আর বিশেষভাবে সতর্ক থাকবে অলসতার চোর থেকে। কারণ, সে মানুষের সময় চুরি করার ক্ষেত্রে ভয়াবহ রকমের দক্ষ।

ইন্দ্রিয়জাত সুখ

আমি একবার চিন্তা করলাম রাজা-বাদশাহর পারস্পরিক লড়াই নিয়ে, ব্যবসায়ীদের লোভ নিয়ে, জাহেদদের কপটতা নিয়ে এবং মানুষের হিংসা ও শত্রুতা নিয়ে। তাদের অব্যাহত সীমাহীন গিবত, প্রতিশোধ ও অন্যায় নিয়ে।

অবশেষে বুঝলাম, এগুলোর অধিকাংশই করা হয় বাহ্যিক ইন্দ্রিয়জাত আনন্দ ও সুখ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে।

কিন্তু কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি একটু ভেবে দেখে, তবে সে জানতে পারবে– ইন্দ্রিয়জাত সুখ খুবই দ্রুত অপসারিত ও অবসাদিত হয়ে পড়ে। এখানে কখনোই সর্বোচ্চ বা সীমাহীন সুখ ও তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব নয়। বরং কেউ যদি এক্ষেত্রে বেশি বাড়াবাড়ি করে– অতি বেশি রকমের সুখ আস্বাদন করতে চায়, তবে তো সে যতটুকু সুখ পাবে, তার চেয়ে বহুগুণ কষ্টের মধ্যে নিজেকে আপতিত করবে।

একজন মানুষ কতই আর খেতে পারে এবং কতই আর সহবাস করতে পারে! বাড়াবাড়ি করলে নিজেকেই কষ্ট ও ধ্বংসের মধ্যে আপতিত করে ছাড়ে।

কিন্তু সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি– যিনি তার দ্বীনের সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করেন। দ্বীনকে প্রাধান্য দেন এবং দুনিয়া থেকে তার পরিমাণমতো গ্রহণ করেন– হালালভাবে।

আহা, কে বুঝবে, এটি এমন এক পোশাক, যে ব্যক্তি তা পরিমিতভাবে পরিধান করবে, পোশাক তার খেদমত করবে। আর যে ব্যক্তি অনেক বাড়িয়ে লম্বা করে বানাবে, তাকে নিজেকেই পোশাকের খেদমতে লাগতে হবে। আর যদি কোনো অহংকারী পোশাকবিলাসী তার নিজের পোশাকের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করে, তবে আল্লাহ তখন তার দিকে আর তাকাবেন না!

সহিহ হাদিসে রয়েছে, একদা এক ব্যক্তি তার পরিধেয় চাদর নিয়ে অহমিকা দেখাচ্ছিল, এমতাবস্থায় সে ভূমিতে ধ্বসে গেল।

কারও পানাহার যদি হারাম হয়, তবে সে তার আস্বাদনের বহুগুণ বেশি শাস্তি প্রাপ্ত হবে। আর ধর্ষকের শরয়ি দণ্ড ছাড়াও সামাজিকভাবে তার ভিন্ন রকম মানসিক শাস্তি রয়েছে।

তুমি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর বিষয়ে চিন্তা করে দেখো, তারা কত মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। কত হারাম কাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এগুলো করার দ্বারা তারা কী অর্জন করেছে? দুনিয়ার সামান্য কিছু ইন্দ্রিয়জাত সুখ ও আনন্দ। কিন্তু ভালো কাজ না করার আফসোস এবং মন্দের শাস্তি ভোগ তাদের উজ্জ্বল জীবনের ওপর কলঙ্কের ছায়া ফেলে দিয়েছে।

সুতরাং হে পাঠক, নিরালায় মহৎ ইলমচর্চাকারী আলেমের চেয়ে সুখী ও আনন্দদায়ক জীবন পৃথিবীতে আর কারও নেই। ইলমই তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ও সাথি। যতটুকু হালাল উপার্জনে নিজের দ্বীনকে রক্ষা করা সম্ভব, ততটুকুতেই সে সন্তুষ্ট। তার কোনো লোক দেখানো লৌকিকতার প্রয়োজন হয় না। এর জন্য নিজের দ্বীনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে হয় না। সে দুনিয়া ও তার অধিবাসীদের লাঞ্ছনা থেকে বহুদূরে সম্মানের চাদর পরিধান করে আছে। অঢেল সচ্ছলতা যদি তার না-ও থাকে, তবুও সে অল্পতেই সন্তুষ্টির পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে আছে। আর এতেই সে তার দ্বীন ও দুনিয়া রক্ষা করার সহজ পথটি পেয়ে যায়।

ইলমের মধ্যে মগ্ন থাকা তাকে বহু শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান প্রদান করে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিভিন্ন উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়ে আনে। এটাই তাকে শয়তান থেকে, সুলতান থেকে এবং মানুষের ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিরাপদ রাখে। কিন্তু এই অবস্থাটি শুধু একজন আলেমের জন্যই সমুচিত। কারণ, কোনো মূর্খ যদি এমন নির্জনতা অবলম্বন করতে যায়, তবে তো সে ইলম থেকে বঞ্চিত হবে এবং বিপথগামী হয়ে পড়বে।

পূর্ণতা একমাত্র স্রষ্টার

আমাকে একবার একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন,

من لم يحترز بعقله هلك بعقله.

> যে ব্যক্তি নিজের মেধা সম্পর্কে সতর্ক থাকে না, সে তার মেধার কারণেই ধ্বংস হয়।

এ কথাটির ব্যাখ্যা কী?

আমি তাৎক্ষণিকভাবে এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। এমনকি এরপর আরও দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলো, তবুও আমি এর সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম না। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে অবশেষে একদিন বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্ট হলো। বিষয়টি হলো এই–

যখন মেধা ও বুদ্ধির মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের ইচ্ছা করা হয়, তখন আকল ইন্দ্রিয়শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। সুতরাং তখন তার নিকট বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। তখন এ ধরনের আকলের ব্যাপারে আকল দিয়েই সতর্ক থাকা উচিত অর্থাৎ গভীর দৃষ্টিতে মাথা খাটিয়ে ভাবা উচিত। তখন বুঝে আসবে– স্রষ্টা কখনো শরীরজাতীয় হবেন না এবং তিনি কোনো জিনিসের সদৃশও হবেন না।

কোনো বুদ্ধিমান যখন আল্লাহ তাআলার কার্যাবলির দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সে এমন অনেক বিষয় দেখতে পায়, যা তার আকলে বুঝে আসে না। আকলের নিকট অসামঞ্জস্য মনে হয়। যেমন, সৃষ্টিজীবকে দুঃখকষ্ট দেওয়া, প্রাণীদের হত্যা করা, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ওপর শত্রুদের বিজয়ী করা– অথচ তিনি চাইলে এগুলো রোধ করতে পারেন।

এছাড়া সৎ ব্যক্তিদের ক্ষুধা-দারিদ্র্যের মধ্যে আপতিত করা, জীবন ও জগতের বহুদিনের অতিবাহনের পর বহু পুরোনো কোনো গোনাহের কারণে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা। এমন আরও অনেক বিষয়, যেগুলোর সংঘটনের ক্ষেত্রে আকল আপত্তির পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায়। তখন সে এগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের প্রজ্ঞা, দয়া ও ইনসাফের প্রকাশ দেখতে পায় না।

তখন সে বেঁকে বসতে চায়।

এখন আকল দিয়ে আকল থেকে সতর্ক থাকার পদ্ধতি হলো, তাকে বলা হবে, আমার নিকট কি প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত নয় যে, তিনি স্রষ্টা, মালিক এবং প্রজ্ঞাময়? তিনি কোনো কিছুই তার প্রজ্ঞার বাইরে করেন না?

তখন সে বলবে, হ্যাঁ, আমি এটা মানি।

তাহলে এবার তাকে বলা হবে, যেহেতু তোমার নিকট প্রথম বিষয়টি প্রমাণিত, তাহলে আমরা তোমার এই দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ অভিযোগ থেকে সতর্ক থাকতে চাই। প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ তাঁর 'প্রজ্ঞাময়' হওয়ার বিষয়টি যেহেতু প্রমাণিত, তাহলে এখন তাঁর কর্মের প্রাজ্ঞতার বিষয়ে অস্পষ্টতা এসেছে তোমারই কমতি ও অক্ষমতার কারণে। সুতরাং এখন মেনে নেওয়া ছাড়া আর তো কোনো কথা থাকতে পারে না।

এভাবে আকলের মাধ্যমে আকলকে বোঝালে সে নত হবে এবং মেনে নেবে।

কিন্তু অনেক মানুষ প্রথমেই আকলের চাহিদার নিকট সমর্পিত হয়ে স্রষ্টার কার্যাবলি নিয়ে বোকার মতো আপত্তি ও অভিযোগ তুলতে থাকে। নিজের নিকট যেকোনো অপছন্দীয় বিষয় ও ঘটনা নিয়ে বলতে থাকে, কেন এমনটা হলো? কেন এমনটা হবে? দুর্ভাগা মূর্খের মতো বলে বসে, কেন আমার এমন খারাপ পরিণতি হলো? কেন আমাকে দরিদ্র করা হলো? কেন এভাবে আমাকে হাজারও বিপদে আপতিত করা হলো?... এভাবে নানান প্রশ্ন ও অভিযোগ সে করতে থাকে।

কিন্তু সে যদি একটি বিষয় লক্ষ করে দেখত– তিনি হলেন স্রষ্টা মালিক এবং প্রজ্ঞাময়। সবকিছুর ভালোমন্দ তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন এবং সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা নেন, তাহলে তার নিকট অস্পষ্ট বিষয়ে তার মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো পথ থাকে না। এবং নিজের মুক্তি ও পরকালিন শান্তির জন্য এটাই তো হওয়া উচিত।

কিন্তু জগতের অনেকেই শুধু আকলের বাহ্যিক যুক্তির দিকটাই ধরে থেকেছে। এদের মধ্যে প্রথম হলো ইবলিস। তার যুক্তিতে মাটির ওপর আগুনের শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে। সুতরাং সে অবনত হতে অস্বীকার করেছে। আর আমরা দেখেছি, অনেক ব্যক্তি—যাদেরকে পণ্ডিত মনে করা হয়—তারাও এই বাহ্যিক যুক্তির পেছনে পড়েছে এবং অনিবার্যভাবে তারাও স্রষ্টার কার্যাবলির বিভিন্ন বিষয়ে

আপত্তি ও অভিযোগ তুলতে শুরু করেছে। তারা ঘোষণা করতে চেয়েছে যে, স্রষ্টার অনেক কাজের পেছনেই কোনো প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা বা ন্যায্যতা নেই।

এই সকল ব্যক্তিরও সেই একই সমস্যা। তারা তাদের আকল নিয়ে ধ্বংস হতে বসেছে। কিন্তু তারা যদি আরেকটু আকল খাটিয়ে স্রষ্টার প্রজ্ঞাবান হওয়ার বিষয়টা আগে লক্ষ করে নিত, তবে আর এই বিভ্রান্তিতে আপতিত হতে হতো না। কিন্তু তারা সেটা না করে নির্ভর করেছে নিজেদের আকলের বাহ্যিক যুক্তি, নিজেদের অভ্যাস এবং সৃষ্টির কাজের ওপর স্রষ্টার কার্যাবলিকে তুলনা করার ওপর। এটাই তাদের বিভ্রান্তির মৌলিক কারণ।

কিন্তু তারা যদি আকলের গভীরতায় লক্ষ করত, তাহলে তারা বুঝত– তিনি আসলে এমনই প্রজ্ঞাবান, যিনি কখনো কোনো অনর্থক কাজ করেন না। তার কোনো কাজই কল্যাণ ও হিকমতের বাইরে না। তাহলে যেগুলো আকল দিয়ে বুঝতে অসুবিধা, তার সে কাজগুলোও মেনে নিতে আর কোনো বাধা থাকত না।

এই বিষয়টি হজরত মুসা ও খাজির আলাইহিমাস সালামের ঘটনার মাধ্যমে বুঝে নেওয়া যায়। হজরত খাজির আলাইহিস সালাম যখন এমন কাজ করতে লাগলেন, যা আকলে ধরে না। বাহ্যিক যুক্তির বিচারে যা অন্যায় ও অপরাধ। তখন হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এগুলোকে অপছন্দ করলেন এবং আপত্তি করতে লাগলেন এবং তিনি যে অভিযোগ না করার ওয়াদা করেছিলেন, সেটাও ভুলে গেলেন। কিন্তু অবশেষে যখন এর হিকমত ও লুকায়িত কল্যাণের বিষয়টি তাকে জানানো হলো, তখন তিনি নির্দ্বিধায় তা মেনে নিলেন।

এখান থেকে শিক্ষণীয় বিষয় হলো, একজন বান্দার সাথেই যদি কল্যাণকর পরিণামের কথা হজরত মুসা আলাইহিস সালামের মতো নবীর নিকট অস্পষ্ট থেকে যায়, তবে তো আমাদের নিকট অবশ্যই মহান স্রষ্টা প্রজ্ঞাময় রবের হিকমত ও কল্যাণের বিষয়টি অজানা থাকা আরও বেশি স্বাভাবিক।

এটি হলো এমন এক মূলনীতি, এটি যদি কারও বোধে না থাকে, তবে সে আপত্তি-অভিযোগ করতে করতে কুফরির দিকে ধাবিত হয়ে যেতে পারে। আর যদি এটি কারও বোধে ও বিশ্বাসে থাকে, তবে সে প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে স্বস্তি ও নিরাপত্তা বোধ করতে পারে।

সম্পদের লোভ সবচেয়ে জঘন্য ব্যাধি

অধিকাংশ মানুষই একটি প্রান্তে অবস্থান করে– হয়তো বাড়াবাড়ি নয়তো ছাড়াছাড়ি। সমাজে মধ্যপন্থার মানুষ একেবারেই বিরল।

কিছু মানুষের স্বভাব এমনই কঠোর কঠিন ও রুক্ষ যে, ক্ষণে ক্ষণে রাগান্বিত হয়ে যায়, মারামারি বা হত্যাকাণ্ডও ঘটিয়ে ফেলে। আবার কিছু মানুষ রয়েছে এমন শীতল ও সহনশীল– গাল ভরে গালি দিলেও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না। কিছু মানুষ আছে এমনই লোভী ভোগী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী যে, যা মনে আসে তা-ই পেতে চায়। সকল উপভোগ্যতাকে উপভোগ করতে চায়। আবার উল্টো দিকে কিছু মানুষ আছে এমন কৃচ্ছতা ও নিরাসক্ততার অধিকারী যে, চাহিদা কম, খাওয়া-দাওয়া কম। এমনকি নফসের স্বাভাবিক চাহিদাগুলোও পূরণ করতে চায় না।

এমনকি ভালো কাজের ক্ষেত্রেও মানুষের এই প্রান্তিকতা বিদ্যমান। কিছু কিছু দানকারী আছে, যা পায় সব দান করে দেয়। এটা আসলে তার অপচয়। আবার এমন জবর অকাট কৃপণ মানুষও আছে, সম্পদ লুকিয়ে রাখে। নিজের কোনো উপকারেই সেগুলো ব্যবহার করে না। নিছক শুধু টাকা-সম্পদ গচ্ছিত করতে থাকে। অথচ জানা বিষয়– টাকা-সম্পদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো তা দ্বারা উপকার লাভ করা। প্রয়োজন পূরণ করা। কিন্তু কৃপণ মানুষের যেন সেসবের কোনো বালাই নেই।

মানুষ যখন তার সম্পদ অবিবেচকের মতো অপচয় করে, তখন সে ধীরে ধীরে তার মান সম্মান ও দ্বীনকেও ধ্বংস করতে থাকে। পরিণতি হয় খুবই খারাপ। তখন সে কৃপণদের সম্পদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে এবং কৃপণের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এটা তো ঠিক নয়। বরং বন্ধুর কাছে হাত পাতার চেয়ে প্রয়োজনে শত্রুর জন্যও সম্পদ রেখে যাওয়া ভালো। জীবনের এই প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টি অনেকেই গুরুত্ব দেয় না। পরিণামে তাদেরকে এক সময় ভীষণ পস্তাতে হয়। বহু লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। এ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

তবে মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনই কৃপণ ও বখিল যে, কৃপণতায় তারা একজন একেকটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। তারা যেন টাকা-সম্পদের প্রেমিক হয়ে ওঠে। প্রচুর দুর্বলতা ও অসুস্থতার মধ্যেও তারা তাদের সম্পদ খরচ করতে চায় না। অবশেষে একসময় এভাবেই মারা যায় এবং তাদের সম্পদগুলো উপভোগ করে অন্যরা।

এ ব্যাপারে আমার নিকট এমন কিছু ঘটনা রয়েছে– যার কোনো তুলনা হয় না। আমি সেগুলোর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি– যাতে এর দ্বারা আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

১. আমাদের উস্তাদ ফযল ইবনে নাসের রহ. তাঁর উস্তাদ আবদুল মুহসিন সুরী থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আবদুল মুহসিন বলেন, সুর এলাকায় একজন ব্যবসায়ী একাকী তার ঘরে অবস্থান করত। প্রতিদিন রাতের খাবারের জন্য সে দোকান থেকে শুধু দুটো রুটি ও একটি আখরোট ক্রয় করত। এগুলো নিয়ে সন্ধ্যার পর সে তার কামরায় ফিরে আসত। হালকা আগুনে আখরোটটি গরম করত। এরপর সেই গরম আখরোটের সাথে রুটি দুটো ছুঁইয়ে খেয়ে নিত।

এভাবেই দীর্ঘদিন সে তার প্রতিদিনের রাতের একমাত্র খাবার সম্পন্ন করত। অবশেষে একদিন সে মারা গেল। তখন তার নিকট থেকে ৩০ হাজার দিরহাম বের হলো। সুরের বাদশাহ সবকিছু নিজে নিয়ে নিলেন।

২. আমি একজন বড় আলেমের ব্যাপারে জানি। আমি নিজেও তাকে দেখেছি। একবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন তার এক বন্ধুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করলেন। অথচ সেই বন্ধুটির তখন কোনো খাদেম-চাকর ছিল না, যে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে। সে সময় কোনো খাদেম রেখে দেবে—এমন আর্থিক সংগতিও ছিল না। বাধ্য হয়ে নিজেই সবকিছু করল। দীর্ঘ কষ্ট ও পরিশ্রম করল এবং যথাসাধ্য যা আছে তা নিয়ে ওষুধ-পথ্য জোগাড় করল।

অবশেষে এই দীর্ঘ অসুস্থতার পর একদিন সেই আলেম মারা গেলেন। এরপর তার কিতাবপত্রের মধ্য থেকে ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা বের হলো! এর কথা তিনি কাউকে বলে যাননি এবং তার থেকে একটি মুদ্রাও এই ভীষণ অসুস্থতার সময়ও খরচ করতে চাননি!

৩. আবুল হাসান রানদিসি আমাকে একটা ঘটনা বলেছেন। তিনি বলেন, আমাদের এক প্রতিবেশী একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। আমাদের খবর দেওয়া হলো। আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। তখন সে জানাল, 'আমার সকল সম্পদের ওপর বিচারক সিলগালা করে দিয়েছে। আমি তো সেগুলো নিতেও পারি না, খরচ করতেও পারি না।'

আমি বললাম, আপনি যদি চান, তবে আমি উদ্যোগ নিয়ে এটা ছুটিয়ে দিতে পারি। আমি উকিল ধরব এবং পুরো সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আপনাকে দেবো। আপনি সেটা ভাগ করে নেবেন এবং আপনার অংশ নিয়ে তখন ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবেন।'

লোকটি তখন বলে উঠল, আল্লাহর কসম, আমি কখনো এই সম্পদ বিছিন্ন করব না। বরং আমার সম্পদ আমার নিকট এভাবেই থাকুক– অক্ষুণ্ন।'

আমি বললাম, তারা আপনাকে সামান্য কিছুও দেবে না। আপনি এ জীবনে তাদের থেকে কিছুই পাবেন না। কিন্তু আমি তো আপনাকে এক তৃতীয়াংশ আপনার স্বাধীনভাবে খরচ করার জন্য দিতে চাচ্ছি– তবুও দেবেন না?

লোকটি বলল, না, আমি সেটা দিতে পারি না।

এর কিছুদিন পরই লোকটি বিনা চিকিৎসায় মারা গেল এবং বিচারকের মাধ্যমে সরকার তার সকল সম্পদ নিয়ে নিল।

৪. আবুল হাসান রানদিসি আমাকে আরেকটি অতি আশ্চর্য রকম ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি ঘটনাটি শুনেছেন মূল ব্যক্তি থেকে। লোকটি তাকে জানিয়েছে, একবার আমার শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন তিনি আমাকে একদিন বললেন, আমার জন্য তুমি কিছু 'খাবিছ' [ঘি ও খেজুর মিশিয়ে তৈরি একপ্রকার মিষ্টান্ত] কিনে আনো। আমি ভাবলাম, নিশ্চয় তার এটা খেতে ইচ্ছা করেছে। তাই কথামতো তার জন্য আমি খাবিছ কিনে আনলাম।

তিনি এক কামরায় থাকতেন আর আমরা ভিন্ন কামরায়। হঠাৎ পরদিন আমার ছোট ছেলে হন্তদন্ত হয়ে এসে আমাকে খবর দিলো– বাবা, তোমার শাশুড়ি স্বর্ণ গিলে খাচ্ছে। অবস্থা খুবই খারাপ তুমি দ্রুত এসো।'

আমি দ্রুত তার নিকট ছুটে গেলাম। দেখলাম ছেলের কথা সত্য। তিনি গতকাল আমার কিনে আনা ঘি মিশ্রিত তৈলাক্ত খাবিছের সাথে মাখিয়ে

মাখিয়ে স্বর্ণমুদ্রা গিলছেন। আমি দ্রুত গিয়ে তার হাত ধরে এটা থেকে নিবৃত করলাম। ব্যস্ত হয়ে বললাম, আপনি এটা করছেন কেন?

তিনি বললেন, আমি ভয় করছি, তুমি বোধ হয় আমার মেয়ে রেখে আরেকজনকে বিয়ে করে বসবে। তাই যতটুকু পারি...।

আমি বললাম, আমি কখনো এমন করব না।

তিনি বললেন, আমার নিকট শপথ করো।

আমি শপথ করলাম। এরপর তিনি তার হাতের অবশিষ্ট স্বর্ণগুলো আমার নিকট অর্পণ করলেন। এর কিছুদিন পরই তিনি মারা গেলেন। তাকে যথাযথ মর্যাদার সাথে পাশের কবরস্থানে দাফন করে এলাম।

এই ঘটনার অনেক দিন পর আমাদের একটি ছোট শিশু মারা গেল। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী গোরস্থানের জায়গার স্বল্পতার কারণে শিশুটিকে আমার শাশুড়ির কবরেই দাফন করা হলো। এ সময় সাধারণত আগের কবরের হাড়-গোড় উঠিয়ে ফেলা হয়। হঠাৎ বহু আগের সেই ঘটনা মনে পড়ায় আমি সঙ্গে করে একটি সুতির কাপড়খণ্ড নিয়ে গিয়েছিলাম। কবরখোদককে বললাম, হাড়গুলো আপনি এই কাপড়খণ্ডের মধ্যে তুলে দিন। সে আমার কথা অনুযায়ী কাজ করল।

আমি সেগুলো নিয়ে বাড়িতে এসে একটি ছিদ্র গামলার মধ্যে রাখলাম। এরপর তার উপর কয়েক পাত্র পানি ঢেলে দিলাম। এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো তা থেকে প্রায় আশি-নব্বইটা স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে এলো। এই সবগুলো আমার শাশুড়ি গিলে খেয়েছিলেন।

৫. আমাদের একবন্ধু বলেন, একবার একটা লোক মারা গেল। ঘরের মধ্যেই তাকে দাফন করা হলো। এরপর এক প্রয়োজনে তাকে সেখান থেকে বের করে আনার জন্য কবর খনন করা হলো। তখন তার মাথার নিচে আলকাতরায় প্রলেপ দেওয়া একটি ইট পাওয়া গেল। তার পরিবারকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো।

তখন তারা বলল, 'তিনি এই ইটটি আলকাতরা দিয়ে প্রলেপ দিয়েছিলেন এবং আমাদের ওসিয়ত করেছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার কবরে যেন এটা তার মাথার নিচে রাখা হয়। সে কারণেই এমনটি করা হয়েছে।'

লোকজন বলল, ইট তো দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এই আলকাতরাগুলো নষ্ট হবে না। তারা ইটটিকে উঠিয়ে দেখল তা খুবই ভারি। এরপর তারা কৌতূহলী হয়ে সেটাকে ভেঙে ফেলল এবং তখন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করল– সেখানে প্রায় ৯০০ স্বর্ণমুদ্রা লুকায়িত রয়েছে।

৬. এক ব্যক্তির কথা শুনেছি, লোকটি মসজিদ ঝাড়ু দিত। মসজিদের ঝাড়ু দেওয়া ধূলি-বালি একত্র করে সে সাইজমতো ইট বানাত। তাকে একবার প্রশ্ন করা হলো, এটা করার কী কারণ?

লোকটি বলল, এটা তো বরকতময় মাটি। আমি এ দ্বারা ইট বানিয়ে রাখছি। আমার মৃত্যুর পর তোমরা এই ইটগুলো আমার কবরে সাজিয়ে দেবে।

অনেক দিন পর লোকটি যখন মারা গেল, তখন তার কথামতো কবরের মধ্যে এগুলো সাজিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু কিছু ইট অতিরিক্ত থেকে গেল। সেগুলো বাড়িতে এনে এক জায়গায় রেখে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর মুষল ধারায় বৃষ্টি শুরু হলো। ইটগুলো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সেগুলোর মাটি গলে গেল। তখন একটি অবাক কাণ্ড দেখা গেল– প্রতিটি ইট হতে অনেক স্বর্ণমুদ্রা বেরিয়ে আসতে লাগল!

এরপর তারা আবার কবরের নিকট গেল এবং কবর খনন করে ইটগুলো বের করে আনল। দেখা গেল– এগুলোরও প্রতিটির মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা লুকানো ছিল।

৭. একবার আমাদের এক বন্ধু বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। আমি জানতাম তার অনেক সম্পদ আছে। কিন্তু সেগুলো সে তার চিকিৎসায় খরচ করেনি। ঘটনা হলো, একবার সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং অসুস্থতা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হতে লাগল। তবুও সে তার সম্পদ সম্পর্কে কাউকে কিছু জানাল না। আমি বুঝতে পারছিলাম, এই অসুস্থতা থেকে আর হয়তো রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সে তখনো আশা করে যাচ্ছিল, এভাবেই এমনিতেই সেরে যাবে। সে নিজের টাকা থেকে চিকিৎসার জন্য খরচ তো করতই না, এমনকি তার গচ্ছিত পুঁতে রাখা সম্পদ সম্পর্কে কাউকে জানাতেও চাচ্ছিল না। সে ভয় করছিল, তার জীবদ্দশায় অন্যকেউ তার সম্পদ নিয়ে নেবে। কিন্তু একদিন সে মারাই গেল। তার সম্পদ অন্যদের হস্তগত হলো।

মানুষের জীবনে এর চেয়ে লাঞ্ছনার আর কী হতে পারে।

৮. আমাদের এক বন্ধু এ ব্যাপারে খুবই মজার ও করুণ একটি ঘটনা আমাকে শুনিয়েছে। একটি লোকের ছিল তিনটা সন্তান। দুটো ছেলে আর একটি মেয়ে। তার অনেক স্বর্ণমুদ্রা একটি গোপন জায়গায় সংরক্ষিত ছিল। একদিন এই লোকটি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। পরিবারের সকলে তার চারপাশ ঘিরে থাকল– কখন কী বলে। কিন্তু কারও নিকটেই কিছু বলল না। শুধু গোপনে তার এক ছেলেকে ইশারা করে রাখল, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরবে না।

একসময় সুযোগ পেয়ে সেই ছেলেকে একাকী কাছে ডেকে লোকটি বলল, 'তোমার ভাই পাখির খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর তোমার বোন বিয়ে করেছে এক তুর্কি ছেলেকে। আমার সম্পদ যদি তাদের হাতে পড়ে, তবে তারা তা নষ্ট করে ফেলবে। আর তুমি পেয়েছ আমার স্বভাব ও চরিত্র। তুমিই শুধু আমার সম্পদ রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তোমার প্রতি আমার ভরসা রয়েছে। অমুক জায়গায় একজাহার স্বর্ণমুদ্রা গোপন করে রাখা আছে। আমি যখন মারা যাব, তখন তুমি সেটা একাই নিয়ে নেবে। কাউকে জানাবে না।'

এর মধ্যে লোকটির অসুস্থতা ভীষণ আকার ধারণ করল। তখন ছেলেটি বাবার জানিয়ে দেওয়া নির্দিষ্ট স্থান থেকে সম্পদ হস্তগত করে নিল। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। তখন সে ছেলের নিকট ধরনা দিতে লাগল—সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ছেলে যেহেতু বাবারই স্বভাব পেয়েছে। তাই সে সম্পদ হাতছাড়া করবে কেন? সে আর বাবার কাছে সম্পদ ফিরিয়ে দেয় না। সে-ও তা গোপন জায়গায় লুকিয়ে ফেলেছে। যতই বাবার পক্ষ থেকে চাওয়াচাওয়ি, মিনতি করা হোক– ছেলেটি আর সম্পদ ফিরিয়ে দেয় না। লোকটি ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়ে গেল। আসলেই ছেলেটি হুবহু তার স্বভাব পেয়েছে– নাকি একধাপ বেশি!

এরমাঝে একদিন ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। এবার পিতা ছেলের কাছে অনুনয়-কাকুতি করে বলতে লাগল, এ তোমার কেমন আচরণ! আমি অন্যদের না দিয়ে শুধু তোমাকেই সম্পদগুলো দিয়েছিলাম; যাতে তুমি সেটা সংরক্ষণ করতে পারো। এখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ। যদি সম্পদের কথা না বলে মারা যাও, তবে তো সম্পদ নষ্টই হয়ে যাবে। এই জন্যই কি আমি তোমার কাছে সম্পদ দিয়েছিলাম। এ তোমার কেমন সংরক্ষণ! খবরদার, এমনটি করো না... এমনটি করো না... সব নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এভাবে সেই বাবা বহু অনুনয় বিনয় অনুরোধ তিরস্কার ভর্ৎসনা– সবই করতে লাগল। অবশেষে নিরাশ হয়ে ছেলে বাবার নিকট সম্পদের কথা জানিয়ে দিল।

এর কয়েক দিন পর ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠল। দিন যেতে থাকল। এরপর আবার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভীষণ অসুস্থ। সেরে ওঠার আর তেমন আশা করা যায় না। এবার আবার ছেলেটি এসে বাবার নিকট ধরনা দিতে লাগল– সম্পদটা কোথায় রেখেছ, বলে যাও বাবা। তুমি যদি এভাবে মারা যাও, তবে তো নষ্ট হয়ে যাবে। একটু অনুগ্রহ করো। একটু বলে যাও।

কিন্তু কিছুতেই আর এবার বাবার মন গলল না। সে কাউকেই আর সম্পদের কথা বলল না। কিছুদিন পর এভাবেই সে মারা গেল। কিন্তু সম্পদের কথা আর কারও জানা হলো না। তা সকলের নিকট অজানা এবং অধরাই থেকে গেল।

এতক্ষণ যাদের কথা বলা হলো– এদেরকে কি কখনো জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলা যায়– যদিও জ্ঞান ও বুদ্ধি থাকে? এদেরকে কি কখনো ধনী ও সম্পদশালী বলা যায়– যদিও ধন ও সম্পদ থাকে?

জীবনযাপনের ক্ষেত্রে– এরাই হলো প্রকৃত জাহেল ও মূর্খ। এরাই হলো প্রকৃত ফকির ও দরিদ্র।

আল্লাহ তাআলা হয়তো এ ধরনের লোকদের ক্ষেত্রে ইরশাদ করেন–

﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾

> তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মতো। বরং তারা তার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট। [সুরা ফুরকান : ৪৪]

হারানো ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব

এক সময় কিছু ব্যক্তিকে আমি আমার বন্ধু ও সঙ্গী ধারণা করতাম। কিন্তু পরবর্তীতে দেখলাম তাদের কেউ কেউ রূঢ় ব্যবহার করে, হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের শর্তের সাথে যা সমঞ্জস নয়। তাদেরকে তখন তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে শুরু করলাম। কিছুদিন পর হঠাৎ আমার নিজে নিজেই বোধোদয় হলো– এটা তো ঠিক হচ্ছে না। মনে মনে বললাম, এর মাধ্যমে উপকারটা কী? তারা যদি বন্ধু ও সঙ্গীর উপযুক্ত হয়েই থাকে, তবে তো তাদের তিরস্কার বা ভর্ৎসনা করা চলে না। আর যদি উপযুক্ত না হয়, তবে একেবারে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়াই উত্তম।

এর কিছুদিন পর দুনিয়ার জীবনযাপন বিষয়ে একটি আশ্চর্য চিন্তা আমার মাথায় এলো। আমি ভেবে দেখলাম– যাদের সাথে আমার চলাচল তাদের সাথে আমার সম্পর্ক তিন ধরনের :

১. নিছক পরিচিত মুখ– দেখা হলে সালাম বিনিময়। এর পাশাপাশি অল্পস্বল্প দু-একটা কথাবার্তা কখনো হয়– কখনো হয় না।

২. বাহ্যিকভাবে বন্ধু– প্রকাশ্যভাবে যাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ কথা ও আচরণ চলে।

৩. আন্তরিক একনিষ্ঠ সঙ্গী– যাদের সাথে কোনো ধরনের কৃত্রিমতা ছাড়াই আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে।

এবার আমি চিন্তা করলাম, মানুষের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে লাভ কী– তারচেয়ে বরং যাদেরকে আন্তরিক মনে হবে না, তাদেরকে মনে মনে 'আন্তরিক সঙ্গী'-এর তালিকা থেকে বের করে 'বাহ্য বন্ধু'র তালিকায় এনে রাখলেই হয়। আর যদি এটারও যোগ্য তারা না হয়, তবে তাদেরকে নিছক 'পরিচিত' ব্যক্তির কাতারে রেখে দিতে হবে। তাদের সাথে আচরণ হবে নিছক একজন পরিচিত ব্যক্তির মতোই– কোনো মাখামাখি নয় আবার বিরোধিতাও নয়।

অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্ন না করে যার যার অবস্থান মতো তাকে সেখানে রেখে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর অযথা তিরস্কার করে বা অভিযোগ তুলে বন্ধুত্ব ঝালাই করতে চাওয়াটা হবে নিতান্তই বোকামি।

হজরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রহ. বলেন, সেই ভাই বা সঙ্গীর চেয়ে খারাপ ভাই বা সঙ্গী আর কে আছে, যাকে তোমার বলতে হবে, 'তোমার দুআর মধ্যে আমাকে স্মরণ রেখো।'

আজকের দিনে অধিকাংশ মানুষই একে অপরের পরিচিত। এদের মধ্যে বাহ্যিক বন্ধুর সংখ্যাও অনেক কম। আর আন্তরিক বন্ধু বা সঙ্গীর বিষয়টা এখন এতটাই দুর্লভ যে, তার আশা না করাই ভালো। হ্যাঁ, আত্মীয়তার মাধ্যমে কিছু সম্পর্ক—যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান, স্ত্রীর সঙ্গে থাকা সম্পর্ক—এগুলোর কথা ভিন্ন। অবশ্য এখানেও আন্তরিকতা থাকতে পারে, না-ও পারে। অতএব সবার থেকেই নিজেকে একটু আলাদা স্থানে রেখে সবার সাথেই নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিদের মতো ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে চলা উচিত। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আজ হৃদ্যতা বা সম্প্রীতি প্রকাশ করছে, তুমি তাতে ধোঁকায় পতিত হয়ো না। সময় যেতে দাও। সময় ও পরিস্থিতিই একদিন বলে দেবে– তার এই হৃদ্যতা আন্তরিক নাকি ভান। কারণ, অনেক সময়ই সুবিধাবাদী মানুষ অকারণে হৃদ্যতা প্রকাশ করে– যাতে তোমার মন গলিয়ে তোমার থেকে তার স্বার্থ হাসিল করতে পারে।

হজরত ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রহ. বলেন, 'তুমি যখন কাউকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করতে চাও, তখন তুমি তাকে কোনো বিষয়ে হঠাৎ রাগিয়ে দাও। সে যদি তার এই রাগান্বিত অবস্থায়ও তোমার প্রতি 'ইনসাফ' বা ভালো ব্যবহার বজায় রাখে, তাহলে তুমি তাকে নিশ্চিন্তে একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারো।'

অবশ্য আজকের দিনে এই পরীক্ষা করাটাও আশঙ্কাজনক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, এখন মানুষের আচরণ এতটাই তীব্র ও তপ্ত যে, তুমি যদি কাউকে রাগিয়ে দাও, সে হয়তো তাৎক্ষণিক তোমার শত্রুতে পরিণত হয়ে তোমার ক্ষতি করে বসবে!

মানুষের আচরণের এই অধঃপতনের কারণ হলো, আজ আমাদের মধ্য থেকে আন্তরিকতা দূর হয়ে যাচ্ছে। আমরা দিন দিন খুবই স্বার্থবাদী হয়ে পড়ছি। অথচ আমাদের 'সালাফে সালেহিন'-এর মূল লক্ষ্যই ছিল আখেরাত। একারণে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের মধ্যে তাদের নিয়ত ছিল বিশুদ্ধ, ভোরের বাতাসের মতো নির্মল। তাদের লক্ষ্য ছিল দ্বীন ও আখেরাত; দুনিয়া নয়। আর আজ আমাদের সকলের অন্তরের ওপর প্রভাব খাটাচ্ছে দুনিয়ার

ভালোবাসা এবং দুনিয়া প্রাপ্তির লালসা। তাই আমাদের আচরণে এত কৃত্রিমতা।

তবুও বলি, শুধু দ্বীনের জন্য বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা রাখে—এমন কাউকে যদি পাও, তবে তাকে সাদরে গ্রহণ করে নাও। আজকের যুগে এ বড় দুর্লভ বিষয়।

বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে

মানুষের যখন ইলমে পূর্ণতা আসে, তখন সে বুঝতে পারে, বস্তুত তার আমল কোনো মূল্যই রাখে না। এটাকে বড় করে দেখার কিছু নেই। কারণ, মহান দয়াশীল প্রভুর তাওফিক প্রদানের কারণেই এই আমলগুলো সে করতে সক্ষম হয়েছে; নতুবা তার দ্বারা কখনো এটা সম্ভব হতো না। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন এই চিন্তা করে তখন আর সে নিজের কোনো আমল নিয়ে বড়াই করে না, অহংকার করার দুঃসাহস দেখায় না।

আমল নিয়ে বড়াই বা অহংকার না করার কয়েকটি কারণ রয়েছে–

১. যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَـٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ . فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন এবং তাকে তোমাদের অন্তরে করে দিয়েছেন আকর্ষণীয়। আর তোমাদের কাছে কুফর, গোনাহ ও অবাধ্যতাকে ঘৃণ্য বানিয়ে দিয়েছেন। এরূপ লোকেরাই সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়েছে– আল্লাহর পক্ষ থেকে দান ও অনুগ্রহস্বরূপ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

[সুরা হুজুরাত: ৭-৮]

২. ব্যক্তি যখন রবের সীমাহীন নিয়ামতের মাঝে নিজের এই এতটুকু ইবাদত ও আনুগত্যকে তুলনা করে দেখে, তখন সে নিজেই বুঝতে পারে–

এগুলো তেমন কিছুই নয়। কোটি ভাগের এক ভাগও নয়। অহংকার করা তো দূরের কথা; এ তো উল্লেখ করার মতোও না।

৩. দয়াময় মহান প্রভুর বড়ত্ব ও মহত্বের বিষয় সম্পর্কে যখন চিন্তা করা হয়, তখন জীবনের সকল জ্ঞান ও ইবাদতই অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হয়। কত সামান্য আমাদের নিবেদন!

তবুও তো ধরা হচ্ছে এটা সেই ইবাদত– যার মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি ও কদর্যতা নেই। শিরকের মিশ্রণ নেই। যা অন্য সকল কিছুর কামনা থেকে একেবারেই শুধু তার জন্যই নিবেদিত। আর যখন ইবাদতগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অবহেলা, কৃত্রিমতা, লৌকিকতা ও অজ্ঞতা ভর করে সে ক্ষেত্রে সেই ইবাদত নিয়ে তাঁর সামনে কোন মুখে দাঁড়ানো সম্ভব!

এ কারণে সব সময় নিজের আমলের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ, সেটা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। ত্রুটি ও বিচ্যুতির কারণে শাস্তিও আপতিত হতে পারে।

এভাবে যদি ভাবা যায়, তখন আর নিজের চোখ আমলের দিকে থাকবে না। সেটা নিয়ে অহংকার ও বড়াই করার মতো বড় ও বিশাল মনে হবে না।

আমলের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমানদের অবস্থাগুলো একটু চিন্তা করে দেখো– ফেরেশতাগণ দিনরাত আল্লাহর তাসবিহ পড়ে। এ ক্ষেত্রে তারা সামান্য সময়ের জন্যও অলসতা বা কমতি করে না। তারপরও তারা বলেন, হে আমাদের প্রভু, আমরা আপনার যথার্থভাবে ইবাদত করতে পারিনি।

হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কথা চিন্তা করে দেখো– আগুনে নিক্ষেপের সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির ওপর তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন, নিজের স্ত্রী-পুত্রকে নির্জন নিঃসহায় জায়গায় রেখে এসেছেন এবং প্রিয় পুত্রটিকে আবার প্রভুর নির্দেশে জবাই করতে গিয়েছেন... আরও কত পরীক্ষা। সকল পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। এরপরও তিনি বলছেন,

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾

দয়াময় প্রভু সেই সত্তা, যার নিকট আশা করি কিয়ামতের দিন তিনি আমার ত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন। [সুরা শুয়ারাঃ ৮২]

আর আমাদের নবী– সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী! তাঁর কষ্ট ও ইবাদতের কথা বলে কি শেষ করা যাবে! সেই নবীই একদিন সাহাবিদের বললেন,

ما منكم من ينجيه عمله قالوا ولا أنت قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.

তোমাদের মধ্যে কাউকে তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবিগণ আকুল বিস্ময়ে জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর নবী, আপনাকেও না! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এমনকি আমাকেও না– তবে আল্লাহ তাআলা আমাকে তার রহমত দিয়ে বেষ্টন করে রাখবেন।[১০১]

আর হজরত আবু বকর রা. বলতেন,

وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله

হে আল্লাহর রাসুল, আমি এবং আমার যাবতীয় সম্পদ– সবই তো আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমার বলতে আর কীই-বা আছে!

হজরত উমর রা. বলতেন,

لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر.

আমার যদি অনেকগুলো উঁচু ও দামি জমি থাকত, আর সর্বশেষ আমার ভাগ্যে কী কল্যাণ রয়েছে তা জানার আগে আমার সামনে যে ভয়াবহতা রয়েছে, তার বিনিময়ে আমি আমার সেই জমিগুলো বিনিময় করে নিতাম।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলতেন,

ليتني إذا مت لا أبعث.

হায়, আমি মারা যাবার পর আমাকে যদি আর পুনর্জীবিত না করা হতো!

হজরত আয়েশা রা. বলতেন,

ليتني كنت نسياً منسياً.

হায়, আমি যদি মৃত্যুর পর একেবারে বিস্মৃত অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারতাম!

---

[১০১]. মুসনাদে আহমদ: ১৯/৯৪৫৫, পৃষ্ঠা: ৪৯৮– মা. শামেলা।

আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি, এ বিষয়ে বনি ইসরাইলদের মধ্যে এমন কিছু সৎ ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা দ্বারা তাদের বুঝ ও বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতাই প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, তারা তাদের আমলের ওপর নির্ভর করেছিল। এ কারণে তারা তাদের আমলের দিকে ইঙ্গিত করেছে। তাদের মধ্যে একজন হলো সেই ব্যক্তি, যে একটি নির্জন দ্বীপে ৫০০ বছর ধরে ইবাদত করেছে। তাকে প্রতিদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আনার প্রদান করা হতো। এবং সে আল্লাহর তাআলার নিকট প্রার্থনা করেছিল– নামাজের সেজদার মধ্যে যেন তার মৃত্যু হয়।

তার প্রার্থনা কবুল করা হয়েছিল। তার মৃত্যু হয়েছিল নামাজে সেজদারত অবস্থায়।

এরপর হাশরের দিন যখন তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে, তুমি আমার রহমত-অনুগ্রহের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করো।

তখন সে বলবে, আমি বরং আমার আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করছি।

এ সময় তার সারাজীবনের সকল আমল আল্লাহ তাআলার মাত্র একটি নিয়ামতের সাথে পরিমাণ করা হবে, তখন তার এই সকল আমলও সেই একটি নিয়ামতের সমতুল্য হবে না।

এবার সেই লোকটি আকুল পেরেশানির সাথে বলে উঠবে, হে আমার প্রভু, হ্যাঁ, তোমার রহমত ও অনুগ্রহেই শুধু জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি; আমার কোনো আমলের কারণে নয়।

এভাবে সেই গুহাবাসীদের অবস্থাও তা-ই, যাদের গুহার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে তো একজন তার এমন আমলের কথাও উল্লেখ করেছিল, যার কথা উল্লেখ করাও ছিল লজ্জাজনক। অর্থাৎ সে একবার এক নারীর সাথে জিনার ইচ্ছা করেছিল। অনেক দূর অগ্রসরও হয়েছিল। কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয়ে তা থেকে ফিরে এসেছিল।

এর দ্বারা আমি তো এটাই বুঝি, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শাস্তির ভয়ে তা থেকে ফিরে এসেছে, এটার উল্লেখ তো শাস্তিরই আশঙ্কা সৃষ্টি করে। যদি এমন হতো যে, সে কোনো বৈধ কাজ করতে গিয়ে ফিরে এসেছে, তাহলেও না একটি কথা ছিল। কিন্তু এখানে সে কী করতে গিয়েছিল? গোনাহের কাজ।

যা করতে তাকে তো নিষেধই করা হয়েছে। যা থেকে তার ফিরে থাকাই তো উচিত? সেটা করতে অগ্রসর হওয়াই তো বরং একটি অপরাধ। সে যদি বিষয়টা বুঝত, তাহলে আল্লাহর সহানুভূতি পাওয়ার ক্ষেত্রে এটা উল্লেখ করতে সে লজ্জাবোধ করত।

হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যেমন বলেছেন,

﴿وما أُبَرِّئُ نفسي﴾

আমি আমার নফসকে নির্দোষ বলছি না। [সুরা ইউসুফ : ৫৩]

আর অন্যদের অবস্থা এমন যে, বাচ্চাদের ফজরের নামাজে দ্রুত ওঠার প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দেওয়া হলো। আর বলা হলো, যারা যারা দ্রুত উঠে ফজরের নামাজ আদায় করবে, পিতা-মাতা তাদের দুধ পান করাবেন। এখানে যেমন বাচ্চাদের কিছুটা কষ্ট করতে হয়, কিন্তু এর মাঝে প্রতিদানের আশা লুকিয়ে আছে।

একই রকম মানুষদের অবস্থা। তাদের ধারণায় তারা যখন ভালো কাজ করে, অবস্থাই বলে দেয়, তারা যা চায়, তা তাদেরকে প্রদান করা হবে। কারণ, তারা যা করেছে, এখন তারা তার প্রতিদান চায়। প্রাপ্যটা যেন তারা নিজের শক্তিতে অধিকার করে নিয়েছে।

আমলের মধ্যে এই কৃতিত্বের ধারণা থাকার কারণে একজন আমলকারী অন্যদের ওপর অহংকার প্রকাশ করে। নতুবা প্রতিটি সক্ষম আমলকারী ব্যক্তি তার আমলের তুচ্ছতা নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকত। কারণ, তাঁর ওপর প্রভুর পক্ষ থেকে যে অঢেল নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে, সেই তুলনায় এই আমল ও শুকরিয়া তো বিশাল ময়দানের মধ্যে সামান্য শস্যদানাতুল্যও নয়। এ যে খুবই অল্প। খুবই সামান্য। আরও বড় বিষয় হলো, এই আমলের সক্ষমতাটুকুও তো প্রভুর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত!

এই বিষয়টির বুঝ আমল নিয়ে অহংকারকারী যেকোনো ব্যক্তির মাথাকে নুইয়ে দেবে। তার তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতাকে তুলে ধরবে। প্রতিটি মানুষের জন্য এই বোধ ও বুঝটি খুবই জরুরি।

তোমার কথাই এখানে সব নয়

আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হুকুম ও বিধান এসেছে– মানুষ তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ থেকেছে। মানুষের কর্তব্য কী? এটার উত্তর লুকিয়ে আছে মানুষের ইচ্ছার বিপরীত কোনো বিষয় সংঘটনের মধ্যে। কারণ, ইচ্ছাধীন কর্ম সবাই করে। এটাই তার স্বভাব। কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিপরীত কর্মে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখা এবং তার হুকুম মান্য করাই হলো মানুষের আসল কর্তব্য।

এ কারণে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত হবে– তার অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় ও ঘটনাবলির ক্ষেত্রেও নিজের ধৈর্য ও সন্তুষ্টির প্রকাশ করা। সে যদি দুআ করে এবং নিজের কোনো কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করে, তাহলে সে এই দুআ ও প্রার্থনার মাধ্যমেও আল্লাহর ইবাদত করল। এরপর যদি তার প্রার্থিত বিষয় প্রদান করা হয়, তাহলে সে শুকরিয়া আদায় করবে। আর যদি সে তার প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্ত না হয়, তাহলে তার উচিত হবে– প্রার্থনার মধ্যে বেশি বাড়াবাড়ি না করা। কারণ, দুনিয়া তো সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণের জায়গা নয়। বরং এ সময় মনকে এটা বলে বোঝাতে হবে–

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

> এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে করো, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। [সুরা বাকারা : ২১৬]

আরেকটি বড় মূর্খতা হলো, নিজের উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়ার কারণে মনে মনে অসন্তুষ্ট হওয়া। কখনো আবার মনে মনে অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করা। মনে মনে বলে, আমার উদ্দেশ্য পূরণ হলে কী ক্ষতি ছিল? আমার প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া হলো না কেন? আমার ক্ষেত্রে এমনটি কেন হলো?...

এ কথাগুলো নিজের মূর্খতা, ঈমানের স্বল্পতা এবং স্রষ্টার হিকমতকে মেনে না নেওয়ার ওপর ইঙ্গিত করে।

মানুষ কেন বুঝতে চায় না– দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য পূরণ হবে আর তাতে কোনো কদর্যতা মিশ্রণ হবে না– এমন কি কখনো হয়? তাই বারবার প্রার্থনার মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূরণে বাড়াবাড়ি করার কী প্রয়োজন? দুনিয়া বরং কষ্ট স্বীকারেরই জায়গা, পরীক্ষার জায়গা।

নবী ও রাসুলগণ ছিলেন আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। দুনিয়ার নিয়মে তাদেরকেও কষ্টে আপতিত হতে হয়েছে। এখানে তাদেরও সকল উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। হজরত নুহ আলাইহিস সালাম তার সন্তানের ক্ষেত্রে প্রার্থনা করেছিলেন; কিন্তু তা গ্রহণ করা হয়নি। আল্লাহর খলিল হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা করা হয়েছে জবাইয়ের ক্ষেত্রে। হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে পরীক্ষা করা হয়েছে তার সন্তান হারানোর মাধ্যমে। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামও অনেক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন—প্রবৃত্তির সাথে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। হজরত আইয়ুব আলাইহিস সালামকে অনেক রকম কষ্ট দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। হজরত দাউদ ও সোলাইমান আলাইহিমাস সালামকে 'ফিতনা' দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যও পূরণ হয়নি। এভাবে সকল নবীকেই কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে।

এরপর আমাদের নবীকেও জীবনভর যে কষ্ট, ক্ষুধা-দারিদ্র্য সহ্য করতে হয়েছে—তা তো সবারই জানা। কারণ, দুনিয়াকে বানানোই হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। এ কারণে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য উচিত হবে, নিজেকে ধৈর্যের সাথে সইয়ে নেওয়া। এবং এ কথা জেনে রাখা যে, চাওয়া ছাড়াই যতটুকু উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, এর ওপরই সন্তুষ্ট থাকা উত্তম। আর যেগুলো অর্জিত হয়নি—এটাই তো দুনিয়ার মানুষের স্বাভাবিক প্রাপ্তি এবং এটাই হলো দুনিয়ার নিয়ম ও স্বভাব।

জনৈক কবি বলেন,

طبعت على كدر وأنت تريدها ... صفوا من الأقذاء والأكدار

ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار

যার স্বভাব ও সৃষ্টিই হলো পঙ্কিলতা দিয়ে, তুমি তাকে পেতে চাও সকল কদর্যতা ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্তভাবে।

যুগের স্বভাবের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে যে চায়, সে যেন পানির সরোবরের মাঝে আগুনের ফুলকি খোঁজে।

কষ্ট ও কামনার এই বিপরীত জায়গাটিতে এসেই প্রকাশ পায় মানুষের ঈমানের শক্তি কিংবা তার দুর্বলতা। এ রোগের নিরাময়ে মুমিন ব্যক্তির জন্য উচিত হলো, প্রভুর নিকট নিজের নফসকে সঁপে দেওয়া। তার হিকমতকে মেনে নেওয়া। এবং নিজের নফসকে সেই কথা বলা– যা বলা হয়েছিল নবীকেও–

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾

তোমার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই।

[সুরা আলে ইমরান : ১২৮]

এরপর অন্তরকে সান্ত্বনা দাও– এই না পাওয়া কোনো বঞ্চনা নয়। বরং নিশ্চয় এটা এমন কোনো কল্যাণের কারণেই করা হয়েছে, যা তুমি জান না। আর যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্যগুলো অপূরণের ওপর ধৈর্যধারণ করে, তাকে অবশ্যই প্রতিদান দেওয়া হয়। যারা আল্লাহ তাআলার এই নির্বাচনকে মেনে নেয় এবং তাঁর সিদ্ধান্তের ওপরই সন্তুষ্ট থাকে– আল্লাহ তাদেরকে জানেন এবং দেখেন।

জেনে রেখো, এই কষ্ট ও পরীক্ষা খুবই সীমিত সময়ের জন্য। তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা জমা করে রাখা হচ্ছে, অচিরেই এগুলো তোমাকে প্রদান করা হবে। দুনিয়ার এই কষ্ট যেন একটি অন্ধকার– অচিরেই তা কেটে যাবে। এটা যেন একটি রাত– অচিরেই উদ্ভাসিত হবে সকাল।

এভাবে যখন নিজের বুঝ ও চিন্তাকে উন্নত করবে, তখন বুঝে আসবে– নিজের জন্য যা হচ্ছে এটা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। তখন ঈমানের দাবি হলো, তাঁর চাওয়ার সাথেই নিজের চাওয়াকে মিলিয়ে নেওয়া এবং তিনি যা নির্ধারণ করেছেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। কারণ, এমনটি যদি না করা হয়, তবে এটা প্রকৃত অর্থে তার দাসত্ব স্বীকার করা হয় না। তার ইবাদতও করা হয় না।

এই বুঝ ও বোধটি এমনই একটি মৌলিক বিষয়, যার সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করা দরকার এবং প্রতিটি বিপদ বা পরীক্ষার মুহূর্তে সে অনুযায়ী আমল করা দরকার।

জালেমদের সহযোগী হয়ো না

তুমি অনেক আলেম ও বক্তাকে দেখতে পাবে– তারা তাদের পার্থিব অসচ্ছলতার কারণে সুলতানদের তোষামোদ করে বেড়ায়; যাতে করে তারা তাদের থেকে সম্পদ প্রাপ্ত হতে পারে। অথচ তারা জানে, সুলতানরা সাধারণত বৈধভাবে সম্পদ অর্জন করে না। এবং অর্জিত সম্পদও যথাযথ জায়গায় খরচ করে না। তাদের অধিকাংশেরই অভ্যাস এমন—রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে খারাজ (ভূমিকর) ও সম্পদ আহৃত হয়, যেগুলো সঠিক ও কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা উচিত ছিল—তারা হয়তো একেবারেই নিজের খেয়ালের বশে কোনো কবিকে দিয়ে দিলো। কোনো চাটুকারকে দিয়ে দিলো। নিজের বিলাসিতায় খরচ করল। কিংবা তার সাথে যে সৈনিকবাহিনী থাকে, তাদের মাসিক বেতন হয়তো দশ দিনার। কিন্তু হঠাৎ কারও প্রতি খুশিতে দশ হাজার দিনার দিয়ে দিলো। কখনো কখনো লড়াইয়েও তারা অবতীর্ণ হয়—সেখান থেকে যে সম্পদ অর্জন হয়, তা সৈনিকদের মাঝে বণ্টন না করে হয়তো নিজের জন্যই রেখে দিলো।

আর বাস্তব কার্যাবলির ক্ষেত্রে যে সকল জুলুম ও অনিয়ম সংঘটিত হয়—তার ফিরিস্তি তো অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত।

এ কারণে একজন আলেম যখন এ ধরনের সুলতানদের সান্নিধ্যে আসে—তখন সে তার ইলমকে বিসর্জন দিয়েই আসে। তার জ্ঞাত ইলমের ওপর তখন সে আর আমল করতে সক্ষম হয় না। যেমন, একবার এক সৎ ব্যক্তি একজন আলেমকে ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বারমাকির এর প্রাসাদ থেকে বের হতে দেখে বললেন, হায়, আল্লাহর নিকট এমন ইলম থেকে আশ্রয় চাই– যে ইলম কার্যক্ষেত্রে কোনো উপকার করে না।

এমন আলেমের জন্য সেখানে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যেমন, সে অনেক অপছন্দনীয় জিনিস ও অবৈধ বিষয় দেখে, কিন্তু নিষেধ করতে পারে না। আর তাদের সাধারণ হারাম খাবারের মাধ্যমে অন্তরে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়। আলো চলে যায়। তখন আর আল্লাহ তাআলার সাথে একান্তে ইবাদতের মজা ও স্বাদ থাকে না। তার দ্বারা কারও হেদায়েত নসিব হয় না।

বরং উল্টো তার এই আচরণ মানুষের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। লোকজন তাদের অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে সে নিজের ক্ষতি করে। সুলতানকেও সুযোগ করে দেয়। সুলতান তখন বলতে সুযোগ পায়– আমি যদি সঠিকতার ওপর না থাকতাম, তবে অমুক আলেম আমার সান্নিধ্যে আসত না। আমার কোনো কাজে তো সে অপছন্দনীয়তা প্রকাশ করে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর আর্থিক অসচ্ছলতা ছিল। কুড়ানো দ্রব্য দিয়েও তিনি অনেক সময় আহার সমাধা করেছেন। কিন্তু কখনো কোনো সুলতানের প্রদান করা টাকা তিনি গ্রহণ করেননি। হজরত ইবরাহিম আল হারবি রহ. সামান্য লতাপাতা-শাক সবজি খেয়ে জীবনধারণ করেছেন। তবুও তিনি খলিফা মুতাসিমের হাজার দিনার ফিরিয়ে দিয়েছেন। হজরত বিশর হাফি রহ. একবার প্রচণ্ড ক্ষুধায় আক্রান্ত হলেন। কেউ একজন তাকে বলল, আপনার জন্য কি হালকা কোনো ঝোল তরকারি এনে দেবো? তিনি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমি ভয় পাই– আল্লাহ যদি আমাকে কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করেন, এই সুস্বাদু পাতলা ঝোল তোমার কোথা থেকে এলো, যাচাই করেছ কি?

এভাবে বহু প্রত্যয়ী, সুদৃঢ় চরিত্রের পূর্বসূরির ঘটনা আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে। তাদের নিকট ধৈর্যধারণ ছিল নিতান্তই ঘুমের মতো– অপরিহার্য। এটাকে তারা মোটেও কষ্টকর মনে করতেন না। বরং কষ্টকর মনে করতেন হারাম ভক্ষণকে।

কিন্তু যারা হারাম ও বাছবিচারহীনতার মধ্যে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়– অবশেষে একসময় তাদেরও তো আস্বাদনের সময় শেষ হয়। শরীর বিনষ্ট হয়। কবরেই যেতে হয় অবশেষে। কিন্তু মাঝখান থেকে নিজের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কত বড় প্রতারক জীবনের এই ব্যবসা!

যার মধ্যে সামান্যতম বোধ ও বুঝ রয়েছে– তাকে এবার বলি, ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টির সাথে জীবন ধারণ করো। কারও পার্থিব সচ্ছলতা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে। কারণ, তুমি যখন এই বিশাল সচ্ছলতা সম্পর্কে চিন্তা করবে, দেখবে, সেখানে আখেরাতের দরজা সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। তাই অন্তরকে কোনোভাবেই কোনো ব্যাখ্যার পেছনে ফেলো না। দুনিয়ায় তোমার জীবনের মেয়াদ কতই না অল্প স্বল্প এবং ক্ষণস্থায়ী! একটু সয়ে নাও না!

জনৈক কবি বলেন,

وسواء إذا انقضى يوم كسرى ... في سرور ويوم صابر كسره

> যেদিন নিঃশেষ হয় সম্রাটের আনন্দের দিনগুলো এবং এদিকে শেষ হয় ধৈর্যশীলের কষ্টের দিনগুলো– তখন সকলেই সমান।

কিন্তু ধৈর্যের স্বল্পতার কারণে নফস যখন অস্থির হয়ে ওঠে, তখন তুমি তাকে দুনিয়াত্যাগী বিভিন্ন ব্যক্তির ঘটনাবলি শোনাও। তার মধ্যে যদি সামান্যতম বোধ, চিন্তা ও জাগরণ থাকে, তবে সে অবশ্যই এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করবে। হারামের দিকে হাত বাড়াতে লজ্জাবোধ করবে এবং অবনত হবে।

একবার চিন্তা করে দেখো সেই বিখ্যাত ঘটনার কথা– আলি ইবনে মাদিনি নিজেকে সহজতার মধ্যে ফেলে ইবনে আবু দাউদের থেকে সম্পদ গ্রহণ করলেন আর হজরত আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. গ্রহণ করলেন ধৈর্য ও দীনতা। আজ এতদিন পরও তাদের বিষয়টা চিন্তা করে দেখো– তাদেরকে আজ কীভাবে স্মরণ করা হয়। সমসাময়িক দু-জন ব্যক্তির একজন কোথায় উঠে গেছেন আর অপরজন কোথায় নেমে গেছেন! একজন ধৈর্যধারণ করেছেন– অন্যজন সহজতা গ্রহণ করেছেন। শীঘ্রই ইবনুল মাদিনি লজ্জিত হবেন, যখন ইমাম আহমদ রহ. বলবেন, 'আমার জন্য আমার দ্বীন নিরাপদ হয়েছিল'।

তাকওয়া সচ্ছলতার চাবিকাঠি

কারও যদি অনেক সন্তান থাকে আর উপার্জন হয় অল্প, তাহলে তার জন্য নিজের দ্বীন হেফাজত করা খুবই কষ্টকর। এই ব্যক্তির অবস্থা হয় সেই স্রোতধর পানির মতো, যার মুখ আটকে দেওয়া হয়েছে। পানি তখন ভেতরে ভেতরে ফুলতে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে যখন আর আটকে থাকতে পারে না, তখন প্রবল বেগে সব ভেঙেচুরে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

অল্প আয়– কিন্তু বড় পরিবারের ব্যক্তির অবস্থা ঠিক এমন। চারদিক থেকে যখন অর্থের চাহিদা আসতে থাকে, তখন সে ভেতরে ভেতরে বিভিন্ন ধরনের পথ, পদ্ধতি ও কৌশল খুঁজতে থাকে। প্রয়োজন বাড়তেই থাকে। হালাল বিষয়ের ওপর যখন আর সম্ভব হয় না, তখন সে সন্দেহপূর্ণ উপার্জনের দিকে ধাবিত হয়। আর যদি নিজের দ্বীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা না থাকে, তখন সে শরিয়তের বিধানাবলি সব ছেড়েছুড়ে সরাসরি হারামের মধ্যেই প্রবেশ করে যায়।

কিন্তু একজন মুমিন যখন তার উপার্জনের স্বল্পতা সম্পর্কে অবহিত থাকে, তখন সে বিয়ে থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। আর যদি বিবাহিত হয় এবং সন্তান থাকে, তখন সে স্বল্প খরচ করার চেষ্টা করে। অল্পে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করে। এভাবেই সে তার দ্বীনের হেফাজত করে।

কিন্তু যে সকল ব্যক্তির বাহ্যিক কোনো উপার্জনের মাধ্যম নেই– যেমন আলেম ও জাহেদগণ– তাদের দ্বীনের হেফাজত করা খুবই কঠিন। কারণ, হয়তো সুলতানরা তাদের থেকে বিমুখ হতে পারে। কিংবা সাধারণ ধনবান ব্যক্তিরাও তাদের প্রতি লক্ষ না-ও রাখতে পারে। এই অবস্থায় যদি তাদের অনেক বড় সংসার থাকে, তাহলে একজন মূর্খ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে অকল্যাণের ভয় করা হয়, তার ক্ষেত্রেও সেই ভয় থেকে নিরাপদ থাকা যায় না। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যদি কেউ লেখালেখি, অনুলিপি, প্রতিলিপি কিংবা নিজেদের সাথে উপযুক্ত কোনো কাজের মাধ্যমে উপার্জন করতে সক্ষম হয়– তাহলে সে যেন তা-ই করে এবং স্বল্প খরচ এবং অল্প উপার্জনে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করে। নতুবা কেউ যদি নিজেকে ঢিল দিয়ে রাখে, বিলাসিতা করতে চায়– তাহলে নিশ্চিত সে

হারামের মধ্যে আপতিত হয়ে পড়বে। তার এই ইলম ও জুহুদের পোশাক দেখিয়ে সে হারাম ও অন্ধকার ভক্ষণ করতে থাকবে।

তাদের মধ্যে কারও যদি কোনো সম্পদ থাকে, তাহলে সে যেন তা বাড়ানোর চেষ্টা করে এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে। কারণ, এখন আর কোনো সহানুভূতিশীল ব্যক্তিত্ব নেই। সুন্দরভাবে করজ দেবে– এমন ব্যক্তিও নেই। আজ অধিকাংশ মানুষ– বরং প্রতিটি মানুষই যেন সম্পদের পূজারী হয়ে উঠেছে। আজকের অবস্থা এই যে– যে ব্যক্তি তার নিজের সম্পদ হেফাজত করবে, সে তার দ্বীনকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে। সে যেন সেই মূর্খদের কথায় কান না দেয়, যারা মানুষের সকল সম্পদ খরচ করে ফেলার নির্দেশ দেয়। এটা সেই সময় নয়। জেনে রেখো, মন যদি স্থির না থাকে, তাহলে ইলম, আমল কিছুই হতে চায় না। এমনকি আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ব নিয়ে নীরবে চিন্তায় নিমগ্ন হওয়ারও ফুরসত হয় না। তাই আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে স্থির মন থাকা অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়।

আমাদের পূর্বে যারা ছিলেন, তাদের মন স্থির থাকার কয়েকটি মাধ্যম ছিল। যেমন, তাদের অধিকাংশ 'বাইতুল মাল' বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বাৎসরিক ভাতা পেতেন। এগুলো দিয়ে তাদের চলে যেত– এমনকি বেঁচে যেত। তারা খুবই অল্প খরচ করতেন।

আর কারও নিজস্ব ব্যবসা ছিল– ব্যবসার মাধ্যমে নিজের প্রয়োজন মেটাতেন। যেমন হজরত সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ., সুফিয়ান সাওরি রহ., আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.।

হজরত সুফিয়ান সাওরি সম্পদের দিকে লক্ষ করে বলতেন,

لولاك لتمندلوا بي !!

> তুমি যদি আমার কাছে না থাকতে, তাহলে মানুষরা আমাকে রুমালের মতো ব্যবহার করে ছাড়ত!

একবার হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. এর কিছু সম্পদ হারিয়ে গেল। তিনি কান্না শুরু করলেন। লোকেরা বলল, এটা নিয়ে আপনার মতো একজন মানুষ কান্না করছেন! তিনি উত্তরে বললেন,

هو قوام ديني.

এটা ছিল আমার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখার মাধ্যম।

আর একটি বিষয় হলো, তখন এমন অনেক অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, যারা তাদের পরিচিত আলেম-জাহেদদের আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। কখনো খোঁটা দিতেন না। তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারেরও চেষ্টা করতেন না। এটা হতো একেবারেই নিছক আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহর জন্য ভালোবাসার কারণে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. নিজেও ফুজাইল ইবনে ইয়াজ এবং অন্যদের আর্থিকভাবে সাহায্য করতেন। হজরত লাইস ইবনে সাদ রহ. বড়দেরকে খুঁজে খুঁজে অর্থ প্রদান করতেন। তিনি মালেক রহ.-কে প্রতি বছর একহাজার দিনার দিতেন। ইবনে লাহিয়া রহ.-কে দিতেন আরও একহাজার দিনার। মানসুর ইবনে আম্মার রহ.ও একহাজার দিনার করে দান করতেন। এমন আরও অনেকেই ছিল সে সময়ে।

সময় এভাবেই চলছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বিষয়টা দুনিয়া থেকে যেন বিলুপ্তই হতে বসেছে। এখন সুলতানরাও কম প্রদান করে। সাধারণ মানুষদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ সাহায্য করার লোক কমে গেছে। তবুও এভাবেও কিছুদিন চলেছে।

এরপর এসেছে আমাদের যুগ। এ যুগে তো মানুষের হাত একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি সাধারণ তো দূরের কথা, অপরিহার্য জাকাত প্রদানের মানুষও কমে গেছে। তাহলে এখন আলেম ও জাহেদদের যদি বিভিন্ন প্রকার উপার্জনের জন্য সময় ব্যয় করতে হয়, তাহলে তারা নিজেদের ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে মনস্থির ও একাগ্র রাখবে কীভাবে? যেকোনো ধরনের শ্রমও তো তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। এটা তারা পারবেও না। হয়তো এই বিষয়টির কারণে অনেক আলেম এখন সুলতানদের তোষামোদ করতে শুরু করেছে। তাদের জন্য যা সমুচিত নয়, তেমন বিষয়গুলোর দিকে নিজেদের ঠেলে দিয়েছে। আর জাহেদ ব্যক্তিরাও দুনিয়া অর্জনের বিভিন্ন ধরনের লৌকিকতার আশ্রয় নিয়েছে। লোকদেখানো কৌশল অবলম্বন শুরু করেছে।

হে ওই ব্যক্তি যে নিজের দ্বীনকে সংরক্ষণ করতে চাও, এগুলো থেকে বিরত থাকো। এ কথাটি আমি বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। উপার্জন থেকে বিমুখ হয়ে খুব বেশি দুনিয়াবিমুখতা দেখাতে যেয়ো না। আর যথাসম্ভব অন্যদের সংশ্রব থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। তোমার হাতে যদি একটি দিরহামও আসে, সেটা তুমি তোমার প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষণ করো। জেনে রেখো, এটা তোমার দ্বীন।

যে কথাগুলো বললাম, সেগুলো বোঝার চেষ্টা করো। আর নফস যদি খুব বেশি অস্থিরতা প্রকাশ করে, তবে তাকে বলো, যদি তোমার নিকট সামান্যতমও ঈমান থাকে, তাহলে তুমি ধৈর্যধারণ করো। আর যদি তুমি এমন জিনিস অর্জন করতে চাও, যা তোমার দ্বীনকে ধ্বংস করে দেবে, তাহলে আর তোমাকে উপকার করার ক্ষমতা রাখে কে?

যে সকল আলেম ও জাহেদ অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করে, আমার ধারণায় তাদের দ্বীন এবং দুনিয়া দুটোই বিনষ্ট হয়। আর যারা সত্য ও সততার পথে অটল থাকে—তাদের দ্বীন সংরক্ষিত থাকে এবং যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে যায়, তবুও তাদের সুনাম ও সুখ্যাতির কথা টিকে থাকে। অবশেষে আমরা আল্লাহ তাআলার এই মহান বাণীর কথা স্মরণ করতে পারি- তিনি ইরশাদ করেন—

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾

যে-কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য সংকট থেকে উত্তরণের কোনো পথ তৈরি করে দেবেন। এবং তাকে এমন স্থান থেকে রিজিক দান করবেন, যা তার ধারণার বাইরে। যে-কেউ আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহই তার (কর্ম সম্পাদনের) জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ পূরণ করেই থাকেন।

[সুরা তালাক : ২-৩]

আর জেনে রেখো, বিপদ-আপদের ওপর ধৈর্যধারণ না করার কারণে কখনো কখনো রিজিক সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু সুন্দর ও যথার্থ ধৈর্যধারণের পরিণাম সুন্দর ও যথেষ্টই হয়ে থাকে।

জীবনযাপনের সঠিক পদ্ধতি

একবার একলোক আমার নিকট তার কিছু সমস্যার কথা বলল। সে বলল, আমি আমার স্ত্রীকে খুবই অপছন্দ করি। তবে কয়েকটি কারণে তার থেকে আলাদাও হয়ে যেতে পারছি না। কারণ, আমার ওপর তার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। অনেক কল্যাণ সে আমার করে। কিন্তু আমার ধৈর্য খুবই কম। বিভিন্ন কষ্টদায়ক অনুচিত কথা আমার মুখ থেকে বের হয়ে যায়। এসব কথা দ্বারা তার প্রতি আমার অপছন্দের কথাও সে বুঝতে পারে। কিন্তু আমি কী করব? আমি যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না! তাকে তো সহ্যই করতে পারি না!

আমি তাকে বললাম, এমন করে তো কোনো লাভ হবে না। আসল কাজ করতে হবে। সেটা হলো, তুমি একান্তে বসে নিজে নিজে চিন্তা করে দেখো– তাহলে বুঝবে, তাকে হয়তো তোমার কোনো গোনাহের কারণে তোমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তুমি বেশি বেশি আল্লাহর নিকট আকুতি-মিনতি করো এবং তাওবা করো। স্ত্রীর প্রতি অনীহা, ক্রোধ দেখানো কিংবা তাকে কষ্ট প্রদানের মধ্যে কোনো কল্যাণ হবে না। আগে নিজের গোনাহের কথা ভাবো।

যেমন হজরত হাসান ইবনে হাজ্জাজ রহ. বলেন,

عقوبة من الله لكم فلا تقابلوا عقوبته بالسيف وقابلوها بالاستغفار.

এটা হলো তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি। তাই আল্লাহর শাস্তিকে তরবারি দিয়ে প্রতিহত করতে যেয়ো না। তাকে বরং তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে দূর করো।

জেনে রেখো, তুমি একটি পরীক্ষার মধ্যে আছ। এখানে যদি তুমি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে এর সওয়াব তুমি নিশ্চয়ই পাবে। এর মধ্যেই তোমার কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইরশাদ করেন–

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে অপছন্দ করো, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক। [সুরা বাকারা: ২১৬]

তাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা সংঘটিত হয়েছে, তুমি তার ওপর ধৈর্যধারণ করো এবং মানসিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার নিকট দুআ করতে থাকো।

এভাবে তুমি যদি আল্লাহর নিকট নিজের গোনাহের জন্য তাওবা করো, আপতিত বিষয়ের ওপর ধৈর্যধারণ করো এবং তা থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করো– তাহলে তোমার এতে তিন প্রকারের ইবাদত সম্পন্ন হবে। এবং এর প্রতিটির জন্য তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। সুতরাং তুমি অযথা এমন বিষয়ে কালক্ষেপণ করো না– যা তোমার কোনো উপকার করবে না। তাছাড়া তিনি তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন, তুমি তা নিজে প্রতিহত করতে পারবে– এমনটি ধারণা করাও জায়েয নয়।

এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা নিজে ইরশাদ করছেন–

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾

আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দান করেন, তবে স্বয়ং তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। [সুরা আনআম: ১৭]

একবার এক সৈনিক আবু ইয়াজিদ রহ.-এর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সৈনিকটির হাবভাব ভালো নয়। আবু ইয়াজিদ রহ. ঘর থেকে বের হয়ে এটা দেখলেন। তিনি দ্রুত একলোককে ডেকে বললেন, তুমি দ্রুত অমুক স্থানে যাও এবং সেখানকার মাটি লেপে মুছে দাও। এই মাটির ক্ষেত্রে আমার কিছুটা সন্দেহ আছে।

আমি এবার লোকটিকে বললাম, সুতরাং তোমার ক্ষেত্রেও তা-ই। মেয়েটির তো কোনো দোষ নেই। তাকে কষ্ট দিয়েও কোনো লাভ নেই। তাকে বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার কর্মের কারণে তোমার ওপর আপতিত করা হয়েছে। সুতরাং সমস্যা যেখানে– সমাধান করতে হবে সেখানে।

আমাদের পূর্বসূরিদের একব্যক্তি থেকে বর্ণনা রয়েছে। একবার একলোক তাকে গালি দিলো। তিনি ঘরে এসে নিজের গাল মাটির ওপর রেখে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআলার নিকট বলতে লাগলেন–

اللَّهُمَّ اغفر لي الذنب الذي سلطت هذا به علي.

–হে আল্লাহ, তুমি আমার যে গোনাহের কারণে এ লোককে আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছ, তুমি আমার সে গোনাহ মাফ করে দাও।

লোকটি আমাকে আরও বলল, আমার এই স্ত্রী আমাকে সীমাহীন ভালোবাসে। আমার অনেক খেদমত করে। আমার প্রতি প্রচুর যত্ন নেয়। কিন্তু তার প্রতি আমার অপছন্দনীয়তা যেন আমার স্বভাবের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। কিছুতেই আমি তাকে ভালোবেসে উঠতে পারি না।'

আমি তাকে বললাম, এখানে হয়তো আল্লাহর ইচ্ছা হলো, তার ক্ষেত্রে তুমি ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই তোমাকে এর জন্য সওয়াব দেওয়া হবে। একটি ঘটনা বলি শোনো– একবার আবু উসমান নিশাপুরী রহ.-কে বলা হলো, আপনি যে এত আমল করেন, আপনার নিকট সবচেয়ে আশাপ্রদ আমল কোনটি মনে হয়?

আবু উসমান নিশাপুরী রহ. বললেন, আমার একটি আমলের উত্তম পুরস্কারের আশা আমি করি। সেটা হলো, আমার তখন অল্প বয়স। তারুণ্য জেগে উঠছে মাত্র। পরিবার থেকে প্রায় তাগাদা আসছে, আমি যেন বিয়ে করি। কিন্তু আমি তাতে রাজি হই না। আমার ইচ্ছা দেখেশুনে একটি সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করব।

এরমধ্যে একদিন একটি পর্দাবৃতা মেয়ে আমার নিকট এসে বলল, 'হে আবু উসমান, আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করছি। আমার প্রার্থনা– আল্লাহর দিকে চেয়ে আপনি আমাকে বিয়ে করে নেবেন।'

আমি মেয়েটির কথায় রাজি হয়ে গেলাম। তার বাবাকে উপস্থিত করলাম। তিনি ছিলেন খুবই দরিদ্র একজন ব্যক্তি। তিনি তার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিলেন। আমার বিয়ে করাতে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন এবং খুব খুশিও হলেন।

বিয়ের পর মেয়েটি যখন পর্দা ছাড়া আমার ঘরে এলো, আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার একটি চোখ অন্ধ, একটি পা খোঁড়া এবং দেখতে মোটেও সুন্দর নয়। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। মনে হলো, আমি তখনই সেখান থেকে বের হয়ে আসি। কিন্তু মেয়েটির প্রচণ্ড ভালোবাসার কথা স্মরণ করে আমি তা করলাম না। আমি তার অন্তরকে

ভেঙে না পড়ার জন্যে বসেই থাকলাম। কোনোভাবেই তার নিকট আমি আমার অপছন্দের কথা প্রকাশ করলাম না। অথচ ভেতরে ভেতরে আমি রাগে ক্ষোভে অপছন্দে একটি শক্ত পাথরের মতো হয়ে ছিলাম।

জীবন চলতে থাকল। আমি আমার থেকে যথাসাধ্য তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করে গেছি। এভাবেই দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর একদিন মেয়েটি মারা গেল। আমি আমার জীবনের তেমন কোনো আমলের কথা না বললেও আমি মেয়েটির অন্তরকে তুষ্ট রাখার জন্য যেভাবে চেষ্টা করে গেছি, ধৈর্যধারণ করেছি– এটাই আমি আমার নাজাতের জন্য সবচেয়ে আশাপূর্ণ আমল হিসেবে মনে করি।'

আমি ঘটনাটি উল্লেখ করে লোকটিকে বললাম, এই হলো প্রকৃত পুরুষদের কাজ। সুদৃঢ় চরিত্রের মহান নিদর্শন। আর তাছাড়া সমস্যাকবলিত ব্যক্তির অযথা ক্রোধ ও অপছন্দনীয়তা প্রকাশ করেই বা কী লাভ! তাতে কোনো কল্যাণ নেই। কল্যাণ তাতেই, যা আমি উল্লেখ করলাম– নিজের গোনাহের জন্য তাওবা করতে হবে, উদ্ভূত পরিস্থিতির ওপর ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং এর থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করতে হবে। এরপর যদি অবস্থা স্বাভাবিক হয় তাহলে তো হলোই– নতুবা তোমার এই ধৈর্যধারণ এবং প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

আর তোমার কর্তব্য হবে, অন্তরে তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে যেমন অবস্থাই হোক, প্রকাশ্যে তার জন্য ভালোবাসা দেখিয়ে চলা। কারণ, সে তো তোমার গোনাহের কারণে তোমার ওপর অবতারিত। সুতরাং তাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। বরং ঠিক যে কারণে এটা হয়েছে, সেই অবস্থা সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টা করো। এটাই শেষকথা। আল্লাহ তোমাকে ভালো রাখুন।

সময়কে গালি দেওয়া

আমার চোখ মানুষের ওপর যতগুলো মসিবত আপতিত হতে দেখেছে, তার মধ্যে প্রধানতম মসিবত হলো, মানুষের সময়কে গালি দেওয়া, সময়ের ওপর দোষ চাপানো।

জাহেলি যুগে মানুষ এগুলো করত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতে নিষেধ করে বলেন,

لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر.

তোমরা সময়কে গালি দিয়ো না। কারণ, সময় তো আল্লাহরই সৃষ্টি।[১০২]

অর্থাৎ তোমরা হয়তো তাকে গালি দাও এই ভেবে যে, সময় তোমাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করেছে। তোমাদের আত্মীয়-পরিজনের প্রাণ সংহার করেছে। আর এটাকে তোমরা সময়ের দিকে সম্বন্ধ করে থাকো। অথচ আল্লাহ তাআলাই এটা করে থাকেন। এখন সময়কে গালি দেওয়ার অর্থ আল্লাহ তাআলাকেই গালি দেওয়া!

কিন্তু আজকের অনেক ধর্মহীন ব্যক্তিও জাহেলি যুগের মানুষদের মতো এই কথাটি ব্যবহার করে। এমনকি– অনেক অভিজাত শিক্ষিত সাহিত্যিক ও মেধাবীরাও এটা করে থাকে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়—যুগ বা সময়কে গালি দেওয়া ছাড়া তাদের কোনো ভালো অভিব্যক্তিই নেই। কিছু বলার নেই।

আবার কখনো কখনো তারা আল্লাহকেই দুনিয়া [প্রকৃতি] বানিয়ে নেয়। তখন তারা এভাবে বলে যে, প্রকৃতি এটি করেছে– প্রকৃতি এটি সৃষ্টি করেছে। প্রকৃতি এটি পছন্দ করে না। প্রকৃতির নিয়মই এমন... ইত্যাদি।

এমনকি যারা দাবি করে, তারা আলেম, প্রাজ্ঞ ফকিহ ও বুদ্ধিজীবী– তারাও দেখি এটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক হয় না!

এখন কথা হলো– 'সময়' বলে তাদের উদ্দেশ্য কী?

---

[১০২]. সহিহ মুসলিম: ১১/৪১৬৯, পৃষ্ঠা: ৩১৩ এবং মুসনাদে আহমদ: ১৮/৮৭৭৪, পৃষ্ঠা: ৩১৬– মা. শামেলা।

তারা যদি সময় বলতে 'সময়ের অতিক্রম বা কালের অতিবাহন' বোঝায়, তাহলে তো সময়কে দোষারোপ করে কিছু বলা সঠিক হয় না। কারণ, সময়ের নিজের তো কিছু করার নেই। কিছু করার ক্ষমতাও তার নেই। সে নিজে নিজে কিছুই করতে পারে না– তাকে বরং একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তাহলে কি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি সময়ের দিকে কিছু আরোপ করতে পারে? পারে না।

তাহলে মানুষ তো এভাবে যুগের ওপর দোষারোপের মাধ্যমে ইসলাম থেকেই বের হয়ে যায়। কারণ, এই দোষারোপ সে প্রকৃত অর্থে এর স্রষ্টার ওপর করছে। এর মাধ্যমে সে কি আল্লাহর হিকমত-প্রজ্ঞার অসম্পূর্ণতা বোঝাতে চায়? যেমন ইবলিস তার ওপর হজরত আদম আলাইহিস সালামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানকে অযৌক্তিক ভেবেছিল।

আজকের দিনেও এমন অনেকেই করে থাকে। কিন্তু অন্তরের এই বক্রতার সাথে তাদের ইসলাম তাদের কোনো উপকার করতে সক্ষম হবে না। কোনো নামাজ-রোজাও কাজে আসবে না। আগে নিজের আকিদা বা বিশ্বাস বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। এরা তো বরং কাফিরদের চাইতেও অধম ও নিকৃষ্ট।

এই অতি সংক্ষিপ্ত জীবন

আমি আমার নিজের ক্ষেত্রে এবং বহু মানুষের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ করে ভীষণ আশ্চর্য বোধ করি। বিষয়টা হলো, আমরা আমাদের জীবনের বর্তমান সময় নিয়ে কতটা অবহেলা ও উদাসীনতার মধ্যে থাকি– অথচ আমরা জানি, আমাদের জীবন কত সংক্ষিপ্ত... কত সংক্ষিপ্ত... কত সংক্ষিপ্ত।

আমরা সময় নষ্ট করি– যদিও আমরা জানি, ঠিক এখানে যে পরিমাণ আমল করা হবে, পরকালে সে পরিমাণই প্রতিদান দেওয়া হবে। তারপরও আমরা সময় নষ্ট করি।

বিষয়টা নিয়ে আমি খুবই আশ্চার্যান্বিত হই। আমাদের কাজ আমাদের জানার মতো নয়। আমাদের আমল আমাদের বিশ্বাসের অনুযায়ী নয়।

হে সংক্ষিপ্ততম জীবনের অধিকারী, তুমি তোমার আজকের দিনগুলোকেই কাজে লাগাও। যাত্রার প্রস্তুতি নাও। আর তোমার অন্তরকে এমন জিনিসের সাথে লাগিয়ে রেখো না– যাতে কোনো কল্যাণ নেই। তোমাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি– তুমি নিজেকে সেই কাজে নিমগ্ন রেখো না।

আল্লাহর জিকির

আমি একবার মানুষের ইবাদত নিয়ে চিন্তা করলাম। দেখলাম– তাদের অধিকাংশের ইবাদত আসলে আদত বা অভ্যাস। অর্থাৎ অভ্যাসের বশে শুধু করে যাওয়া।

হ্যাঁ, যারা সচেতন এবং সজাগ, তাদের অভ্যাসগুলোও অবশ্য প্রকৃত ইবাদত। কারণ, ইবাদতকে তারা অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছেন।

কিন্তু যারা উদাসীন– তারা হয়তো অভ্যাসের বশে মুখে 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কিন্তু তাতে তার কোনো প্রভাব ও চিন্তা থাকে না। নিছক শুধু উচ্চারণ।

কিন্তু যিনি সচেতন, জগতের এই বিস্ময়কর যত সৃষ্টি, স্রষ্টার মহত্ব– এই সব চিন্তা ও ভাবনা তার মাথার মধ্যে থাকে আর এটিই তাকে আন্দোলিত করে তোলে এবং তার মুখ থেকে বের হয়– সুবহানাল্লাহ!

এভাবে একজন মানুষ যদি একটি আনার বা ডালিম নিয়ে চিন্তা করে, তার থরে থরে সাজানো দানাগুলো নিয়ে চিন্তা করে– কী চমৎকারভাবেই না তাকে তার খোসা দিয়ে আচ্ছাদন করে নিরাপদ রাখা হয়েছে, যাতে বিনষ্ট না হয়। দানার মধ্যে কেমন রস দিয়ে দিয়েছেন এবং সেখানে দিয়ে দিয়েছেন পাতলা আবরণ!

কীভাবে ডিমের উদরে পাখির কত বিচিত্র রঙ ও আকার-আকৃতি তৈরি করেন তিনি। মায়ের উদরে কী বিস্ময়করভাবেই না মানবশিশু একে একে বেড়ে ওঠে। এমন আরও কত কী! বিশ্বজুড়ে কত সৃষ্টির কত বাহার!

এসকল চিন্তা-ভাবনা তার অন্তরের মধ্যে স্রষ্টার মহত্ব ও বড়ত্ব তুলে ধরে আর সে বলে ওঠে– সুবহানাল্লাহ... আল্লাহু আকবার! এই জিকিরটাই হলো চিন্তা দ্বারা উৎসারিত জিকির। এটাই হলো সচেতন মানুষের প্রকৃত জিকির ও ইবাদত।

এভাবে তারা গোনাহের ভয়াবহতা ও তার পরিণাম সম্পর্কেও চিন্তা করে এবং চিন্তিত হয়। এদিকে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও পরাক্রমশীলতাও তাদের চিন্তায় রয়েছে। এ কারণে তারা তাদের গোনাহের ব্যাপারে বিচলিত বোধ করে। নিজের নফসকে অবনমিত করে এবং মুখে উচ্চারণ করে– আসতাগফিরুল্লাহ... আতুবু ইলাইহি... আসতাগফিরুল্লাহ...।

এটাই হলো প্রকৃত জিকির ও ইস্তিগফার। নতুবা উদাসীন ব্যক্তিরা শুধু অভ্যাসের বশে মুখে যা কিছু উচ্চারণ করে, এটা জিকিরও নয়, ইস্তিগফারও নয়– ইবাদত তো নয়-ই। এটা নিতান্তই একটি অভ্যাস।

আদত ও ইবাদতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

সার্বক্ষণিক সচেতনতা

একজন মুমিনের সার্বক্ষণিক চিন্তা থাকে আখেরাত নিয়ে। সুতরাং দুনিয়াতে যেখানেই সে যা কিছু দেখে– তার মধ্যেই সে আখেরাতের স্মরণ ও শিক্ষা অর্জন করে।

এটাই নিয়ম– যে ব্যক্তি যেটা নিয়ে আগ্রহী ও আকর্ষণ বোধ করে, যেকোনো জিনিসের মধ্যে সে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে খুঁজে বের করে। যেমন দুনিয়ার কোনো নতুন নির্মিত ঘরে যদি বিভিন্ন ধরনের কর্ম-আকর্ষণের লোক যায়, তখন সকলেই তার নিজের আকর্ষিত জিনিসের দিকেই বেশি মনোযোগ প্রদান করে। যেমন, একজন কাপড় ব্যবসায়ী ঘরের বিছানাপত্র, কাপড় ইত্যাদির দিকে লক্ষ করবে এবং মনে মনে এগুলোর একটা দামও অঙ্কন করে নেবে। এভাবে একজন কাঠমিস্ত্রী তাকাবে কাঠের তৈরি ছাদের দিকে। এবং খুঁটে খুঁটে কাজগুলো পরখ করে এর একটি মান নির্ণয়ের চেষ্টা করবে। আর একজন রাজমিস্ত্রী তাকাবে দেয়ালের দিকে– এর গাঁথুনি ও ধরনের দিকে। একইভাবে একজন বয়নশিল্পী দেখবে বোনা কাপড়গুলো এবং দেখবে সেগুলোর কারুকাজ।

এভাবে একজন মুমিন যখন কোনো অন্ধকার দেখে, তখন তার কবরের অন্ধকারের কথা স্মরণ আসে। যখন কোনো বেদনার্ত ব্যক্তিকে দেখে, তখন তার পরকালের শাস্তির কথা মনে আসে। কোনো ভীতিপ্রদ আওয়াজ বা শব্দ শুনলে, তার কিয়ামতের শিঙার আওয়াজের কথা মনে পড়ে। ঘুমন্ত মানুষকে দেখলে তার মৃত্যুর কথা স্মরণে আসে। আবার যখন কোনো সুখ ও আনন্দের বিষয় সে দেখে, তখন তার মনে চলে আসে জান্নাতের সুখ-শান্তির কথা। প্রতিটি নিয়ামত দেখে তার জান্নাতের নিয়ামতের কথা মনে হয়। বিশেষকরে তার অন্তরের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে জান্নাতের সেই চিরন্তন সুখ ও আনন্দের কথা– যা কখনো নিঃশেষ হবে না। যা কখনো ফুরিয়ে যাবে না। সেখানে কোনো কষ্ট নেই। কোনো দুঃখ নেই। না-পাওয়ার কোনো হাহাকার নেই। শুধুই শান্তি আর শান্তি। সুখ আর সুখ।

জান্নাতের এই অনন্ত শান্তির কথায় তার অন্তর আশান্বিত ও উজ্জীবিত হয়। আর এগুলোর আশাতেই দুনিয়ার কোনো কষ্ট ও দুঃখ, কোনো বঞ্চনা কিংবা

প্রিয়জনের মৃত্যু কিছুই তাকে কাবু করতে পারে না। আখেরাতের সীমাহীন সুখের তুলনায় সাময়িক এই কষ্টকে তার খুবই সামান্য মনে হয়।

কাবার দর্শনসুখে রমলের কষ্ট কি কেউ গায়ে মাখে! যেমন সুস্থতার প্রত্যাশায় ওষুধের তিক্ততা কেউ ধর্তব্যেই আনে না।

এভাবে একজন মুমিন বুঝতে পারে, এখানে বীজ বপনের পরিমাণ অনুযায়ী পরকালে ফসল উত্তোলন করা সম্ভব হবে। তাই সে আমলের সবচেয়ে ভালো বীজগুলো বপন করতে থাকে। অলসতা করে না। কারণ, জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত।

এভাবে একজন মুমিন ব্যক্তি আখেরাতের শাস্তি ও আজাবের কথাও ভাবে। তখন তার দুনিয়ার জীবনের সুখ-আহ্লাদ বিমর্ষ হয়ে পড়ে। তার চিন্তা ও পেরেশানি বাড়তে থাকে। তখন সে দুনিয়া এবং তার মাঝের সকল কিছু থেকেই নিজেকে নিরাসক্ত করে তোলে। কারণ, এখানে সে তো চিরদিন থাকতে পারবে না– থাকা সম্ভব নয়। এটি থাকার জায়গা নয়।

এভাবে একজন মুমিন ব্যক্তির দুটি অবস্থা হয়। একবার সে জান্নাতের অন্তহীন সুখের কল্পনায় আন্দোলিত হয়। আবার জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে দুটি বিষয়ই সমানভাবে কাজ করে।

আর তার বাস্তব জীবনযাপনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো হয়তো কিছুটা ঢিলামি এসে পড়ে– অন্যের মৃত্যু দেখেও নিজেকে নিরাপদ মনে করে। আবার কখনো কখনো কবরের চিন্তায় যখন নিমগ্ন হয়, তখন আখেরাতের প্রতি ধাবিত হয়ে পড়ে। এবং ভাবে– দুনিয়া নয়, আখেরাতই হলো একমাত্র শান্তি ও সুখের জায়গা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সার্বক্ষণিক সচেতনতা দান করুন; যাতে আমরা ভালো কাজের দিকে ধাবিত হতে পারি এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারি। আমিন।

শাসককে নসিহত করার পদ্ধতি

কেউ যদি কোনো শাসককে নসিহত করতে চায়, তবে সে যেন খুবই নম্রতার সাথে করে। এবং তার মুখের সামনে এমন কথা বলবে না– যা তাকে জালেম সাব্যস্ত করে।

কারণ, অধিকাংশ শাসকই হয়ে থাকে কঠোর, কঠিন ও উদ্ধত। এ কারণে তাদের যদি কোনো তিরস্কার করা হয়, সেটাকে তারা অপমান মনে করে। এটা তারা সহ্য করতে পারে না। এ কারণে নসিহতের মধ্যে শাসকের কিছু ভালো কাজ, প্রজাদের প্রতিপালনে কিছু সঠিক সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ করা উচিত। এবং পূর্ব যুগের যে সকল ন্যায়বান শাসক, সুলতান বা খলিফা ছিলেন, তাদের কিছু ঘটনাও আলোচনা করতে পারে।

এছাড়া মূল বিষয় হলো, এ ধরনের কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তিকে নসিহত করার আগে তার পূর্বঅবস্থার দিকে খেয়াল করে নেবে। নসিহতকারী যদি দেখে, শাসকের অতীত কার্যাবলি ভালো, তাহলে সাহস করে কিছু কথা নিশ্চয়ই সে বলতে পারে। যেমন মানসুর ইবনে আম্মার এবং অন্যরা খলিফা হারুনুর রশিদকে নসিহত করতেন– নসিহত শুনে খলিফা ক্রন্দন করতেন। এভাবে যদি কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্য ভালো থাকে, তাহলে তাকে অধিক নসিহত ও উপদেশ প্রদান করতে পারে।

আর যদি দেখে– লোকটি আসলে জালেম, কল্যাণের কোনো ইচ্ছাই রাখে না, ভীষণ রকম মূর্খ, তাহলে এ ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রথম চেষ্টা করবে– কোনোভাবে তার সাথে সাক্ষাৎই যেন না ঘটে। কোনো নসিহত যেন করতে না হয়। কারণ, এ অবস্থায় তাকে যদি কোনো নসিহত করতে যায়, তাহলে তার নিজের জীবনই ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। আর যদি প্রশংসা করে, তাহলে সেটা হবে তোষামোদ।

এরপরও যদি কোনো ঘটনাচক্রে তাকে কিছু বলতে বাধ্য হয়, তবে তা ইশারার মাধ্যমে বলবে। স্পষ্ট কিছুই বলবে না। হ্যাঁ, তবে শাসক-খলিফাদের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি অতিবাহিত হয়েছেন, নসিহত শ্রবণের ক্ষেত্রে যারা নম্রতার পরিচয় দিয়েছেন। নসিহতকারীদের রূঢ় বাক্যও সহ্য করেছেন।

এমনকি খলিফা মানসুরকে মুখের সামনে 'জালেম'ও বলা হয়েছে এবং তিনি ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে তা শ্রবণ করেছেন।

কিন্তু সেই সময় পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন আর সেই সময় নেই। আজকের দিনের অধিকাংশ সুলতান ও শাসক হলো খারাপ প্রকৃতির। জেদি লোভী ও নিষ্ঠুর। আর অধিকাংশ শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিরাও তাদেরকে তোষামোদ করে চলে। আর যে ব্যক্তি তোষামোদ করে না, তার বঞ্চনার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। তাকে তখন চুপ করে যেতে হয়।

আগে শাসনের দায়িত্ব তারাই নিতেন, যারা ছিলেন এ বিষয়ে জ্ঞাত, প্রাজ্ঞ ও আমানতদার। যারা ছিলেন এ বিষয়ে অভিজ্ঞ। কিন্তু আজকের অবস্থা গেছে পাল্টে। আজকের শাসকদের প্রায় সকলেই সমান মূর্খ, দুনিয়ার প্রতি লোভী। স্বজনপ্রীতির দোষে দুষ্ট। এ কারণে প্রশাসনের দায়িত্বও অর্পিত হয় অযোগ্যদের হাতে।

পারতপক্ষে এ ধরনের লোকদের থেকে সতর্ক ও দূরে থাকাই উত্তম।

হ্যাঁ, এরপরও যদি কেউ তাদেরকে কিছু বলার ক্ষেত্রে বাধ্য হয়, তবে সে যেন তার কথার ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকে। এমন কথা বলবে না, যা তাদেরকে ক্রোধান্বিত করে। আবার মিথ্যা তোষামোদও করবে না।

আর তারা যদি কখনো নিজের থেকে আগ্রহ প্রকাশ করে বলে, 'আমাকে কিছু নসিহত করুন', এ জামানায় তাদের এ ধরনের কথায়ও ধোঁকায় পড়া যাবে না। এটা তাদের নিছক একটি কথার কথা। কারণ, এটাকে সত্য মনে করে নসিহতকারী যদি এমন কথা বলে ফেলে, যা তাদের মত ও উদ্দেশ্যের বিরোধী, তাহলে তারা এর প্রতিশোধ নিতে দেরি করবে না।

আর যে ব্যক্তি শাসকের সাথে কথা বলে, সে যেন প্রশাসনের অন্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে তার নিকট কিছু না বলে। এতে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে তার প্রাণনাশের চেষ্টা করতে পারে। কারণ, এতে সকলেই তখন ভাববে, তার কথা বুঝি শাসকের নিকট লাগিয়ে দিয়েছে।

মোটকথা– এই যুগে তাদের থেকে দূরে থাকাই সবচেয়ে কল্যাণকর। তাদের কোনো ওয়াজ-নসিহত না করাই সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু এরপরও যদি কেউ কিছু বলতে বাধ্য হয়, তবে খুবই সতর্কতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে বলবে। তাদের বরং প্রধান কর্তব্য হবে সাধারণ মানুষদের নসিহত করা– যাতে তাদের ঈমান ও আমল সঠিক হয়। তাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই।

মানুষের ব্যক্তিক পরিমাপ

কোনো ব্যক্তির কোনো বক্তৃতা বা মৌখিক কথা এবং তার বাহ্যিক আমল– নামাজ, রোজা দান ও নির্জনতা অবলম্বন তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। তার ব্যাপারে এতটুকুতেই আস্থার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ো না। বরং একজন মানুষের আমলের পরিমাণ নির্ণিত হবে দুটি মাধ্যমে–

এক. ফরজ বা আবশ্যক বিধানাবলির যথাযথ সংরক্ষণ।

দুই. আমলের খুলুসিয়াত বা একনিষ্ঠতা।

নতুবা কত মানুষকে তো দেখি, বাহ্যিকভাবে ভালো আমল করে, কিন্তু আড়ালে ফরজ বিধানও তরক করে। বরং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে নাজায়েয বিষয়েও লিপ্ত হয়ে পড়ে। কত ধার্মিক মানুষের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সে তার আমল দ্বারা দুনিয়া অন্বেষণ করছে। আজকের দিনে– কমবেশি অনেক মানুষের মধ্যেই এই রোগ দেখা দিয়েছে।

সুতরাং প্রকৃত ও সম্পূর্ণ মানুষ তো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমানাগুলো লক্ষ করে চলে– তার ওপর আবশ্যকভাবে অর্পিত ফরজ বিধানগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করে। আর এর সাথে যে ব্যক্তির নিয়ত সুন্দর হয়, তার কথা ও কাজও একান্তভাবে শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই হয়ে থাকে। এর দ্বারা সে কোনো মানুষ বা পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য করে না এবং মানুষের থেকে সম্মান ও মর্যাদার প্রত্যাশাও করে না।

নতুবা এমন বহু বাহ্যিক ধার্মিক রয়েছে, তাকে যেন 'ধার্মিক বা আনুগত্যকারী' বলা হয়, এ জন্য সে লোক দেখানো ধর্ম পালন করে। কত লোক 'মুত্তাকি' উপাধি পাবার আশায় মৌনতা অবলম্বন করে। এবং 'জাহেদ বা দুনিয়াত্যাগী' উপাধি পাবার জন্য দুনিয়া ত্যাগের ভান করে।

কিন্তু একজন মুখলিস বা একনিষ্ঠ আমলকারী ব্যক্তির আলামত হলো, তার বাহ্যিকতা এবং নির্জনতা এক রকম হবে– বরং বাহ্যিকতার চেয়ে নির্জনতা হবে আরও বেশি আমলপূর্ণ। আরও বেশি ইবাদতপূর্ণ। মানুষের থেকে তার একান্ত আমলকে আড়ালে রাখতেই সে ভালোবাসে। এ কারণে বাহ্যিকতায়

বরং সে কখনো কখনো একটু হাসি, একটু আনন্দপূর্ণ মেজাজে থাকবে; যাতে করে তার সাথে 'জাহেদ' উপাধি না লেগে যায়।

যেমন হজরত ইবনে সীরিন রহ. দিবসে মানুষের মাঝে হাসি-মজাকে থাকতেন, কিন্তু রাতের নির্জনতায় তার কান্না দেখলে মনে হতো– তাকে যেন জনপদবাসী হত্যা করে ফেলছে। এ কারণে আমলের ক্ষেত্রে কোনো মানুষ বা পার্থিবতার ইচ্ছা শরিক না হওয়া চাই। এটাতেই তার সফলতা ও শুভ পরিণাম।

আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা কিংবা পার্থিব কোনো স্বার্থ অর্জনের জন্য তার আমলকে প্রকাশ্যে দেখিয়ে বেড়ায়, এতে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। কারণ, মানুষের অন্তর তো তার হাতে, যার সাথে সে এই আমলকে শরিক করে ফেলছে। এ কারণে হয়তো তিনি মানুষের অন্তর তার দিকে না ঘুরিয়ে– তার বিপক্ষে ঘুরিয়ে দেবেন।

আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে গোপনে নির্জনে মানুষকে না দেখিয়েও আমল করে, লোকজনের অন্তর তার দিকেই ঝুঁকে যায়। লোকেরা তাকে ভালোবাসে—যদিও এই একনিষ্ঠ ব্যক্তি তাদের এইসব কার্যাবলির প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। তাদের প্রশংসার প্রতি লালায়িত থাকে না। অন্যদিকে লোক দেখানো আমলকারীকে মানুষ শুধু অপছন্দই করে– আমল তার যতই বেশি দেখাক। এগুলো গ্রহণীয় নয়। এছাড়া একনিষ্ঠ ব্যক্তি ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সদা সচেষ্ট থাকে। ইলম অর্জনে কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। যুগের সকল কল্যাণ যথাসম্ভব অর্জনের চেষ্টা করে। এবং আত্মিক উন্নতি থেকে নিজেকে বিরত রাখে না। মূলত সে তার সকল কর্ম ও ব্যস্ততার কেন্দ্রে রাখে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। লক্ষ রাখে তাঁর পছন্দ এবং অপছন্দ।

পরশ্রীকাতরতা মানুষের একটি জন্মগত স্বভাব

সব জায়গায় দেখি, মানুষেরা পরশ্রীকাতরকে অনেক নিন্দা-মন্দ করে এবং খুবই খারাপ মনে করে। এবং তারা বলে, নিকৃষ্টতম মানুষই শুধু পরশ্রীকাতরতায় আক্রান্ত হয়। সে এর মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামতের বিরোধিতা করে এবং আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে না। এবং তার অপর মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ দেখতে পায় না।

আমি বিষয়টা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করলাম। দেখলাম, লোকজন যেভাবে বলে, প্রকৃত অর্থে বিষয়টা আসলে তেমন নয়। এখানে মূল বিষয় হলো মানুষের স্বভাব। মানুষের স্বভাব হলো, অন্য কেউ তার ওপরে উঠে যাক– এটা সে পছন্দ করে না কিংবা মেনে নিতে চায় না। সে যদি দেখে– তার কোনো বন্ধু তার চেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে, এটা তার ওপর প্রভাব ফেলে এবং তার চেয়ে ওপরে উঠে যাওয়াটা সে পছন্দ করে উঠতে পারে না। সে বরং কামনা করে– সে নিজে যেখানে পৌঁছেছে, তার বন্ধু যেন সেখানে না পৌছায় কিংবা তার বন্ধু যা প্রাপ্ত হয়েছে, সে নিজেও যেন তা প্রাপ্ত হয়– যাতে তার বন্ধু যেন তার চেয়ে ওপরে উঠে না থাকতে পারে।

মাটি দ্বারা তৈরি মানুষের স্বভাবের মাঝে এই বিষয়টি একেবারে কাদা-মাটির মতোই মিশে আছে। আমি বলি, এটি কোনো দোষের বিষয় নয়। বরং দোষের বিষয় হলো– নিজের কথায় কিংবা কাজের মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটানো। অন্যের অনিষ্টের চেষ্টা করা। অন্যকে দমন করে নিজে উঁচুতে উঠতে চাওয়া।

নতুবা আমার নিজের মধ্যেও এই ঈর্ষার বিষয়টি রয়েছে। আমি আগে ভাবতাম, এটি বুঝি আমার কোনো গোপন রোগ ও নিম্নশ্রেণির মানসিকতা। কিন্তু পরবর্তীতে এ ব্যাপারে হজরত হাসান বসরি রহ. থেকে আমি একটি মন্তব্য পেয়ে যাই। তিনি বলেন,

ليس من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحسد...

বনি আদমের এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার সাথে ঈর্ষা নেই।

তাই মানুষের কর্তব্য হলো, কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটাকে অতিক্রম করে যাওয়া। নিজের কল্যাণ সকলেই চাইবে, সেটাই কর্তব্য– কিন্তু অন্যের ক্ষতি করে নয়।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না

মুমিনের ঈমান প্রকাশ পায় তার বিপদ বা কষ্টের সময়। তখন সে বারবার দুআ করতে থাকে। কিন্তু দুআ কবুলের কোনো প্রভাব সে দেখতে পায় না। কিন্তু তাই বলে তার আশা এবং প্রত্যাশাও কমে যায় না। নিরাশার সকল কারণও যদি তার ক্ষেত্রে প্রবলতর হয়ে ওঠে, তবুও সে নিরাশ হয় না। কারণ, সে জানে, তার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা তার কল্যাণের বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন। কিংবা তিনি হয়তো এখন তার থেকে ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চান। তার ঈমানের দৃঢ়তা দেখতে চান। এর দ্বারা তিনি তার বান্দার অন্তরের পরিপূর্ণ সমর্পণকে দেখতে চান। তার কাছে যেন বান্দা আশ্রয়ের জন্য ঝুঁকে যায়। আরও বেশি বেশি দুআ ও প্রার্থনা করে।

কিন্তু যে ব্যক্তি দ্রুতই প্রার্থনা কবুল হওয়া দেখতে চায় এবং দ্রুত কবুল না হলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে– এটা হবে তার দুর্বল ঈমানের প্রকাশ। সে ভাবতে থাকে দুআ কবুল হওয়াটা যেন তার অধিকার। সে যেন তার কাজের প্রতিদান প্রার্থনা করছে।

তুমি কি হজরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনার কথা শোনোনি? দীর্ঘ ২৮ বছর তিনি পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু আশার মধ্যে কোনো হেরফের হয়নি। যখন হজরত মুসা আলাইহিস সালাম হারানোর পর তার ভাই বিনয়ামিনও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখনও তার আশা রহিত হয়নি। তিনি তখন বললেন,

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾

> আশা করা যায়, আল্লাহ আমার নিকট তাদের সকলকেই এনে দেবেন। [সুরা ইউসুফ : ৮৩]

ধৈর্যধারণ ও আশা জিইয়ে রাখার এই বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর মধ্যে– তিনি ইরশাদ করেন–

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

> (হে মুসলিমগণ!) তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা জান্নাতে এমনিতেই প্রবেশ করবে, অথচ এখনও পর্যন্ত তোমাদের ওপর সেই রকম অবস্থা আসেনি, যেমনটা এসেছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট এবং তাদেরকে করা হয়েছিল প্রকম্পিত, এমনকি রাসুল এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? মনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই। [সুরা বাকারা : ২১৪]

এটা তো বিদিত বিষয়– দীর্ঘ কষ্ট ও পরীক্ষার পরে এবং পরিত্রাণের ব্যাপারে নৈরাশ্যের কাছাকাছি পৌঁছানোর পরই কেবল রাসুল ও মুমিনদের থেকে এমন কথা প্রকাশ পেয়েছিল।

এ ক্ষেত্রে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، قيل له: وما يستعجل. قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي.

> বান্দা যতক্ষণ না তাড়াহুড়ো করছে, ততক্ষণ সে কল্যাণের মধ্যেই থাকবে। প্রশ্ন করা হলো, তাড়াহুড়ো বিষয়টা কী? তিনি বললেন, তাড়াহুড়োর বিষয়টি হলো, বান্দা বলতে থাকবে, প্রার্থনা করলাম, কিন্তু কই, আমার ডাকে তো সাড়া দেওয়া হলো না।'[১০৩]

এ কারণে তুমি কিছুতেই কষ্ট ও পরীক্ষার সময়কে দীর্ঘ মনে করবে না। এবং বেশি বেশি দুআ করার ক্ষেত্রে বিরক্তি বা কষ্ট অনুভব করবে না। কারণ, তোমাকে তো পরীক্ষাই করা হচ্ছে– মেনে নাও কি না? এই ধৈর্যধারণ এবং প্রার্থনাও তোমার ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

মোটকথা, বিপদ যদি দীর্ঘও হয়, তবুও আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। মুমিন কখনো নিরাশ হয় না।

---

[১০৩]. সহিহ বোখারি: ১৯/৫৮৬৫, পৃষ্ঠা: ৪১৬ এবং মুসনাদে আহমদ: ২৬/১২৫৩৮, পৃষ্ঠা: ৮৫– মা. শামেলা।

যুক্তির অনুসরণে মুক্তি

যে ব্যক্তি শুধু ইন্দ্রিয় চাহিদার অনুসরণ করবে, সে ধ্বংস হবে। আর যে ব্যক্তি আকল বা যুক্তির অনুসরণ করবে, সে নিরাপদ থাকবে।

ইন্দ্রিয়শক্তি অনুধাবন করতে সক্ষম শুধু বর্তমানকে– দুনিয়াকে। কিন্তু আকল লক্ষ করে সকল সৃষ্ট বস্তুর দিকে। এর মাধ্যমে সে এমন এক স্রষ্টার পরিচয় লাভ করে– যিনি অনেক কিছু প্রদান করেছেন। অনেক কিছু ব্যবহার ও ভোগের বৈধতা দিয়েছেন। কিছু এমনিতেই ছেড়ে দিয়েছেন। আর কিছু নিষেধ করেছেন। এবং তিনি জানিয়েছেন, একদিন আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করব এবং তোমাদের পরীক্ষা করব– যাতে তোমাদের নিকট আমার অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটে এভাবে যে, তোমাদের কিছু বিষয় খুবই মন চাইবে– কিন্তু আমার স্মরণে তা বর্জন করবে। এটাই হলো আমার জন্য তোমাদের ইবাদত। আর আমি তোমাদের জন্য এই পার্থিব আবাস ছাড়াও একটি আবাস নির্মাণ করেছি– যাতে আনুগত্যকারীদের পুরস্কার দেবো আর বিরোধিতাকারীদের শাস্তি দেবো।

যুক্তি এবং আকল এভাবেই লক্ষ করে এবং ভাবে।

কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয়শক্তি– সে শুধু নিকট অনুভবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বর্তমানের সুখ-আনন্দ দ্বারা সে তাড়িত হয়। যা চায়, সেদিকেই তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় ছুটে যায়। এবং তার কিছু শাস্তিও সে পেয়ে যায়। যেমন, জিনা করলে 'রজম' করা হয়। মদ খেলে শাস্তি দেওয়া হয়। চুরি করলে হাত কাটা হয়। অনৈতিক কিছু করলে মানুষের মাঝে অপদস্থ হতে হয়। অলসতার মাধ্যমে জ্ঞান থেকে বিরত থেকে মূর্খতার মধ্যে ডুবে থাকতে হয়।

কিন্তু যে ব্যক্তি বুদ্ধি, যুক্তি ও আকলের অনুসরণ করে চলে, তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই লাভ হয়। মানুষের মাঝে সম্মানের সাথে চলতে পারে। এবং যে ব্যক্তি নিছক ইন্দ্রিয়শক্তির চাহিদা অনুযায়ী চলে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি এই বুদ্ধিমান ব্যক্তির জীবনযাপন মর্যাদাপূর্ণ ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

যা বললাম, বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেন এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তার ভবিষ্যতের জীবন যুক্তি ও প্রমাণের ওপর পরিচালিত করে– তাহলেই সে নিরাপদ থাকতে পারবে।

পূর্বযুগের আলেমগণের সুউচ্চ হিম্মত ও সাধনা

আগের আলেমদের হিম্মত ও সাধনা ছিল অনেক উচ্চ। তাদের মনোবলও ছিল অনেক দৃঢ়। এগুলো বোঝা যায় তাদের রচিত বইপত্র পড়ে, যেগুলো তাদের জীবনের সারাংশ। তাদের এত এত রচনা– যুগের অতিবাহনে সেগুলোর অনেকই জীর্ণ হয়ে গেছে। কাগজ বিবর্ণ হয়ে গেছে। অথচ পড়ার কেউ নেই। কারণ, ইলম অন্বেষণকারীদের হিম্মত হীন হয়ে পড়েছে। তারা শুধু সংক্ষিপ্ততা খোঁজে। বড় বড় বিস্তৃত গ্রন্থের দিকে তারা যেন আগ্রহ রাখছে না। এরপর তো আরও ভয়াবহ সময় এসেছে। এখন তো অল্পকিছু পাঠ্যবিষয় সাব্যস্ত করে অন্যগুলো বর্জনের পর্যায়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাই সেই বিশাল বিস্তৃত পূর্ববর্তীদের গ্রন্থগুলো পড়া এবং অনুলিপি করার অভাবে সেগুলো আরও জীর্ণ ও বিবর্ণ হয়ে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যে শিক্ষার্থী তার ইলমের মধ্যে পরিপূর্ণতা আনতে চায়, তার জন্য অবশ্যই উচিত হবে পূর্ববর্তীদের কিতাবগুলো সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বেশি বেশি অধ্যয়ন করা। তাহলে সেখানে সে আমাদের জাতির এমন বিস্ময়কর জ্ঞান এবং উচ্চ হিম্মতের সন্ধান পাবে– যা তার অন্তরকে করে তুলবে আরও শাণিত। উচ্চ মর্যাদা ও আসন প্রাপ্তির জন্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করবে একটি অমিততেজা আন্দোলন।

এছাড়া প্রতিটি কিতাবেই রয়েছে মানুষের জন্য উপকার। উপকারশূন্য কোনো কিতাব নেই।

কিন্তু আজকের দিনে আলেম ও প্রাজ্ঞজনদের জীবনাচরণ হয়ে পড়েছে কত নিম্নতর! তাদের মাঝে এমন কোনো উচ্চ হিম্মতসম্পন্ন ব্যক্তি চোখে পড়ে না– যাকে নবীনরা অনুসরণ করতে পারে। এমন কোনো তাকওয়াবান পরহেজগার ব্যক্তিরও সন্ধান পাই না– যার থেকে জাহেদ ব্যক্তি উপকার লাভ করতে পারে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার দোহাই দিয়ে তোমাদের বলি, তোমরা গুরুত্বের সাথে আমাদের সালাফদের জীবনী পাঠ করো। তাদের রচনাসমূহ অধ্যয়ন করো। তাদের কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত হও। তাদের তো এখন আর দেখা

সম্ভব নয়– কিন্তু তাদের এই জীবনী ও কিতাবসমূহ অধ্যয়নের মাধ্যমেই যেন তাদেরকে দেখা হয়ে যাবে।

যেমন কবি বলেন,

فاتني أن أرى الديار بطرفي ... فلعلّي أرى الديار بسمعي.

আমি আমার দু-চোখ দ্বারা তাদের আবাস ও বসবাস প্রত্যক্ষ করতে পারিনি। কিন্তু সেগুলো হয়তো আজ আমার শ্রবণের মাধ্যমে দেখতে পাব।

এবার আমি আমার অবস্থা সম্পর্কে বলি– কিতাব অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কিছুতেই আমার পরিতৃপ্তি আসে না। শুধু মনে হয়– অধ্যয়ন করেই যাই। তাই যখনই আমার এমন কোনো কিতাব হস্তগত হয়, যা আগে আমি দেখিনি, তাহলে আমি সে কিতাবের ওপর একটি ধনভান্ডারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি। 'মাদরাসায়ে নিযামিয়া'তে যত কিতাব রয়েছে, আমি তার তালিকা বা সূচির ওপর নজর বুলিয়েছি। তাতে প্রায় ৬০ হাজার কিতাব রয়েছে। এভাবে আমি হজরত আবু হানিফা, হুমাইদি, আমাদের শাইখ আবদুল ওয়াহহাব ইবনে নাসের, আবু মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খাশশাব– তাদের সকলের কিতাব সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছি। এছাড়াও আরও যেখানে যখন যে কিতাবগুলো সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়েছি, সেগুলো সম্পর্কেও জেনেছি।

আমি যদি বলি, আমি আমার জীবনে ২০ হাজার কিতাব অধ্যয়ন করেছি, তাহলে হয়তো এর চেয়েও বেশি অধ্যয়ন করেছি। অধ্যয়নে কখনো আমার পরিতৃপ্তি আসে না।

এভাবেই আমি সে সকল কিতাবের মাধ্যমে আমার জাতির সুউচ্চ জীবন সম্পর্কে জেনেছি। তাদের হিম্মত, সংরক্ষণ, ইবাদত এবং বিস্ময়কর সব ইলম সম্পর্কে জেনেছি। যে ব্যক্তি এগুলো অধ্যয়ন করবে না, সে তো এগুলো সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে না।

কিন্তু আমি যেহেতু তাদের অবস্থা দেখেছি ও জেনেছি, তাই আজকের সময়ের মানুষের হিম্মত ও সাধনার অবস্থা আমার নিকট খুবই তুচ্ছ ও নিম্ন মনে হয়। চিন্তা করা যায়! কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছে আমাদের ইলম ও হিম্মত!!

নাস্তিকতা একটি বোকামিপূর্ণ দর্শন

মানবজাতির নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো তার প্রাণ। আমার খুবই আশ্চর্য বোধ হয় তাদের ব্যাপারে, যারা তাদের এই প্রিয় প্রাণ কত সহজেই ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়। কত সহজেই না তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। আর এগুলোর প্রধান কারণ হলো– জ্ঞানের স্বল্পতা এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গি।

যেমন, আমরা দুনিয়ার সাধারণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও দেখি, কেউ কেউ নিজেকে বহু ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি নিয়ে যায়– যাতে সে মানুষের প্রশংসা কুড়াতে পারে। মানুষ যাতে তাকে সাহসী বলে। কেউ হয়তো হিংস্র প্রাণী শিকারে বের হয়ে পড়ে। কেউ যায় কিসরার সেই সুবিশাল সুউচ্চ ভগ্ন প্রাসাদে আরোহণের জন্য। কেউ দৌড় প্রতিযোগিতা করে ৩০ ফারসাখ (৬০ মাইল)। এগুলো করতে গিয়ে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জীবনে আর কী থাকল? কোনো প্রশংসা বা বাহবাই তো সে আর শুনতে পাবে না! কিংবা যে জীবনের জন্য সে সম্পদ অর্জন করতে চেয়েছিল– সেটাই তো তার নিঃশেষ হয়ে গেল।

আবারও বলি, নিজের প্রাণই মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয়। তবুও আমি আশ্চর্য হই– যখন দেখি কোনো মানুষ নিজের অজান্তেই তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দেয়। যেমন, কেউ হয়তো রাগান্বিত হয়ে কাউকে হত্যা করল, তাহলে তো তার এই রাগ প্রশমিত হবে জাহান্নামের আগুনে গিয়ে।

মুশরিকরা ছাড়াও– ইহুদি এবং খ্রিষ্টানদের বিষয়টিও অতি আশ্চর্যজনক। তাদের কেউ যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তার ওপর কর্তব্য ছিল, আল্লাহ তাআলার শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া। দলিল-প্রমাণগুলো পর্যবেক্ষণ করা এবং অন্য নবীদের সাথে তাকেও নবী হিসেবে স্বীকার করা। কিন্তু সে যদি তা স্বীকার না করে, তবে তো সে নিজেকে চিরদিনের জন্য জাহান্নামের সীমাহীন কষ্টের মধ্যে আপতিত করে ফেলল।

আমি একবার তাদের একজনকে বললাম, আচ্ছা বলো তো, কেন তুমি তোমার নিজেকে অনর্থক চিরকালীন শাস্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছ? আমরা তো তোমাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখি। এমনকি এটাও বলে থাকি, কোনো

মুসলমান যদি আমাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তোমাদের নবীকে কিংবা তোমাদের কিতাবকে মিথ্যা মনে করে, সে আর মুসলিম থাকে না- সে কাফের হিসেবে চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তাহলে তোমাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে পার্থক্যটা থাকল কোথায়? কারণ, আমরাও তো তাকে সত্য নবী হিসেবে বিশ্বাস করি, তার কিতাবকে বিশ্বাস করি। এমনকি আমরা যদি তাকে কখনো পেতাম, আমাদের কষ্টে জর্জরিত করে ফেললেও তাকে কখনো আমরা অপমান করতাম না। অস্বীকার করতাম না। তাহলে আর পার্থক্য কোথায়?

ইহুদি লোকটি বলল, তোমরা কি শনিবার পালন করো?

আমি বললাম, এটা পালন করা আবশ্যক কি না- সেই বিতর্কের কথা বাদ দিলেও এটি একটি শাখাগত বিষয়। আর ধর্মের কোনো শাখাগত বিষয় বর্জনের কারণে কারও ওপর তো চিরকালীন শাস্তি আসে না।

এবার তাদের প্রধান নেতা ঔদ্ধত্যের সাথে বলে উঠল, আমরা তোমাদের থেকে শনিবার পালনের কামনাও করি না। কারণ, শনিবারের বিষয়টি শুধু বনি ইসরাইলদের জন্যই বিশিষ্ট। অন্য কেউ এটা করলেও হবে না।

আমি বললাম, আমি তোমাদের এই মতকে মেনে নিলাম। তোমরা ধ্বংসশীল। কারণ, তোমরা জেনেবুঝে সম্মিলিতভাবে নিজেদের আত্মাকে চিরকালীন শাস্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছ।

আশ্চর্য লাগে তাদের নিয়েও- যারা এমন একটি বিষয়ে নিজের দৃষ্টি প্রদানের ক্ষেত্রে অবহেলা করে, যেখানে অবহেলা করার কারণে চিরকালীন শাস্তি আবশ্যক হয়ে পড়ে। স্রষ্টাকে অস্বীকারকারী নাস্তিকের ব্যাপারেও আশ্চর্য লাগে- সে এমনই এক বোকা ও নির্বোধ, স্রষ্টার এতকিছু দেখে, পরিধান করে এবং উপভোগ করেও বলে বসে- স্রষ্টা নেই।

এসব চিন্তা ও কার্যাবলির মূল হলো, জ্ঞানের স্বল্পতা, ইন্দ্রিয়কামনার অনুসরণ এবং বিশ্বব্যাপী সকল দলিল-প্রমাণের দিকে নিজের দৃষ্টিকে না ফেরানো। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আমিন।

মর্যাদা প্রত্যাশীকে নিমগ্ন হতে হয়

ইলম ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ চূড়ায় সেই শুধু পৌঁছাতে পারে– যে হবে ইলমের আশেক। আর জানা কথা– আশেক ব্যক্তিকে অনেক রকম কষ্ট ও মুসিবতের ওপর ধৈর্যধারণ করতে হয়।

প্রথমত যে ব্যক্তি ইলম নিয়ে ব্যস্ত হবে, তাকে সকল রকম উপার্জন থেকে বিরত থাকতে হবে। এরপর ইলমের প্রত্যাশী হওয়ার পর থেকেই সকল ধনী ও পরিচিত ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করতে হবে। আর ঠিক এই দুই কারণে আবশ্যকভাবে তাকে দারিদ্র্য পেয়ে বসবে। কিন্তু সে নিজের চর্চায় অটল থাকবে। কষ্ট স্বীকার করবে—ইলম ও শ্রেষ্ঠত্ব যদি সে চায়। কারণ, শ্রেষ্ঠত্ব তাকে বারবার ডেকে বলছে—

﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾

এই সময়েই মুমিনদের ভীষণ কষ্টে ফেলা হয়েছিল এবং তাদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিল। [সুরা আহযাব : ১১]

আর যখনই কেউ এই কষ্টের কথায় ভয় পেয়ে যায়, তখন সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব এসে বলে,

لا تحسب المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا.

শ্রেষ্ঠত্ব কোনো সুস্বাদু খেজুর নয়, তুমি তা আরামে খেয়ে নেবে।
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন হবে না, যতক্ষণ না ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. যখন ইলম অর্জনকেই প্রাধান্য দিলেন, তখন তিনি দরিদ্র ছিলেন। দীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত ইলম নিয়ে এমনভাবে মশগুল ছিলেন যে বিয়ের জন্য অবসর পাননি। বিয়ে করেছেন ৪০ এর পর। এ কারণে কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি ইলম নিয়ে চর্চা করতে চায়, তবে তাকে ইবনে হাম্বলের মতোই নিজের দারিদ্র্যের ওপর ধৈর্যধারণ করতে হবে। একনিষ্ঠ সাধনা করতে হবে। তবে কথা হলো, তিনি যা করে দেখিয়েছেন, সেই সক্ষমতা এখন কি কারও আছে! সেই কঠিন দরিদ্র অবস্থাতেও তিনি সরকারি কিছু গ্রহণ করেননি। সব মিলিয়ে তিনি প্রায় ৫০ হাজার দিনার

ফিরিয়ে দিয়েছেন। অথচ এদিকে তিনি সামান্য চাটনি ও লবণ দিয়েই খাদ্য-রুটি আহার করেছেন।

সারা বিশ্বে আজ তার কত সুনাম ও সুখ্যাতি! তার কবরের নিকট যেতে গেলেও অন্তরের মধ্যে এক অন্য রকম শিহরণ অনুভব হয়। এটা তো শুধু দুনিয়ার খ্যাতি ও মর্যাদা। আখেরাতে কেমন সম্মান আশা করা যায়, তার বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। এবার এমন আলেমের কথা চিন্তা করো– যাদের কবরের কথা কেউ জানেও না। জিয়ারত করতেও যায় না। তারা দুনিয়ায় থাকতে বিভিন্ন সহজতা গ্রহণ করেছিল, ব্যাখ্যা করে নিয়েছিল এবং সুলতানদের সান্নিধ্যে এসে দুনিয়া অর্জন করেছিল। এ কারণে তাদের ইলমের বরকত নষ্ট হয়ে গেছে। মর্যাদা ধুয়ে মুছে গেছে। আর মৃত্যুর সময় আকাশ পরিমাণ আফসোস নিয়ে ইন্তেকাল করেছে।

এগুলো এমন আফসোস—যা কখনো শেষ হওয়ার নয়। এমন ক্ষতি– যার কোনো প্রতিষেধক নেই। দুনিয়ার সুখ ও আস্বাদন চোখের পলকেই নিঃশেষ হয়ে যায়, এরপর যা চিরদিন বাকি থাকে—তার নাম আফসোস ও অনুশোচনা।

সুতরাং হে শ্রেষ্ঠত্বের প্রত্যাশী, ধৈর্য ধরো। সবর করো। প্রবৃত্তি ও ভ্রান্তির অনুসরণে সাময়িক স্ফূর্তি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর আফসোস করতে করতে সময় যায়।

হজরত শাফেয়ি রহ. বলেন,

يا نفس ما هو إلاّ صبر أيام ... كأن مدتها أضغاث أحلام

يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة ... وخل عنها فإن العيش قدامي

হে আমার নফস, জেনে রেখো, ধৈর্যের দিনগুলো যেন কিছু এলোমেলো স্বপ্নের দিন।

সুতরাং হে আমার নফস, দ্রুত যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে নাও, দুনিয়ার পাঠ চুকিয়ে নাও, আরামের দিন তো সামনে।

হে দরিদ্র আলেম, তোমাকে এবার বলি,

সম্রাটদের রাজত্ব থেকে তোমার রাজত্ব অনেক সমৃদ্ধ। তুমি যে ইলম অর্জন করেছ, তাদের কি তা অর্জন হয়েছে? তাহলে আর তাদের কিসের সুখ! প্রকৃত সচেতন সকল দূরদর্শী ব্যক্তি এটাকেই প্রাধান্য দেবে। তাছাড়া যখন তোমার মনের মধ্যে কোনো সুন্দর বোধ জাগ্রত হয় এবং কোনো আশ্চর্য অর্থের আবিষ্কার ঘটে– তখন তুমি যেই স্বর্গীয় আত্মিক আনন্দে উদ্ভাসিত হও, এই আনন্দ কোনো ইন্দ্রিয়-সুখ প্রেয়সী পেতে সক্ষম নয়। এছাড়া তোমাকে শাহওয়াত বা যৌনসুখের অনুভব ও শক্তি প্রদান করা হয়েছে, অন্য অনেকেই এটা থেকে বঞ্চিত। এভাবে তুমি স্বাভাবিকভাবেই তাদের সকল জীবনযাপন ও আনন্দের সাথে অংশীদার হয়ে চলেছ, তুমি তো জীবনের অনিবার্য কোনো কিছু থেকেই বঞ্চিত নও। এভাবেই সকলের দুনিয়ার জীবন নিঃশেষ হয়ে যাবে– তোমারও এবং তাদেরও।

এরপর ভাবো আখেরাতের কথা, আখেরাতে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। আর তোমার সেখানে নিরাপদ থাকারই অধিক সম্ভাবনা। তাহলে এবার শেষ পরিণামের কথা ভেবে দেখো। তুমিই তো জিতে আছ।

অলসতাকে বর্জন করো– যা কখনো কাউকে মর্যাদাবান হতে দেয় না। এই অলসতার কারণেই অনেক আলেম মৃত্যুর সময় রাশি রাশি আফসোস নিয়ে ইন্তেকাল করেছে। কিন্তু তখন তো আর কিছুই করার থাকে না।

একবার একলোক স্বপ্নের মধ্যে আমাদের শাইখ ইবনুয যাগওয়ানিকে দেখতে পায়। শাইখ তাকে বলেন,

أكثر ما عندكم الغفلة و أكثر ما عندنا الندامة.

> তোমরা দুনিয়াতে যা বেশি বেশি করো, তা হলো 'উদাসীনতা' আর আমরা এখানে যা বেশি বেশি করি, তা হলো সময় অপচয়ের 'অনুশোচনা'।

সুতরাং এখনই সচেতন হও– জীবনের সময় নিঃশেষ হওয়ার আগেই। এবং বড় প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হলে এখনই প্রবৃত্তির শিকল গলা থেকে খুলে ফেলো। শ্রেষ্ঠত্ব কখনো আরাম-আয়েশের মাধ্যমে অর্জিত হয় না। হতে পারে না। সুন্দর মুখে সামান্য আঁচড়ও বড় দৃষ্টিকটু লাগে। সৌন্দর্যের কাতার থেকে অল্পতেই সে ছিটকে পড়ে।

সুতরাং হে বন্ধু, দ্রুত করো– খুবই দ্রুত। নফসের প্রতিটি শ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর ফেরেশতাও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওত পেতে বসে আছে। দৃঢ় প্রত্যয়ের শক্তি নিয়ে সটান সজাগ হও– স্বপ্ন তোমার সাধন করতেই হবে। প্রত্যয়ের হিসাব কষে জনৈক কবি বলেন,

إذا همّ ألقى بين عيينة عزمه . ونكب عن ذكر العواقب جانبا

وإذا يستشر في أمره غير نفسه ولم يرض إلاّ قائم السيف صاحبا

> যখন সে প্রত্যয়ে দৃঢ় হয়, তখন তার চোখের দু-তারায় প্রত্যয়ের আগুন জ্বলজ্বল করে। প্রতিবন্ধকতার সকল কথা ছুড়ে ফেলে একপাশে।
>
> কেউ যদি ভিন্ন কথায় টলাতে চায় তাকে, নিজেকে সে পাল্টে নেয় এবং তখন শুধু সে নিজের জন্য সবল বন্ধুকেই বেছে নেয়।

আর এই প্রত্যয়গুলোর মধ্যে দুনিয়া এবং তার প্রতি লালায়িত ব্যক্তিদের থেকে বিরত থাকার প্রত্যয়ও নাও। (আল্লাহ দুনিয়াদারদের তাদের দুনিয়ার বিষয়ে বরকত দান করুন।) কিন্তু কথা হলো, আমরাই ধনী আর তারাই হলো আসল গরিব। যেমন, ইবরাহিম ইবনে আদহাম রহ. বলেন,

ولو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف.

> যদি রাজা-বাদশাহ এবং রাজকুমাররা জানত– আমরা কী সুখের মধ্যে আছি, তাহলে তারা এটা অর্জনের জন্য তরবারি নিয়ে আমাদের ওপর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

দুনিয়াদার যা কিছু ভক্ষণ করে, তা হয়তো হারাম কিংবা সন্দেহপূর্ণ। যদি এমন হয়, সে নিজে এর মধ্যে জড়িত নয়; কিন্তু তার প্রতিনিধি এগুলো করে। যদি টাকা-সম্পদ অর্জন করে– এমন অনেক পথ থেকে অর্জন করে, যার প্রতিটি মাধ্যম হালাল নয়। এছাড়া তারা তাদের এসব সম্পদের কারণে বিভিন্ন ধরনের ভয়ে ভীত হয়ে থাকে– হত্যার ভয়, এগুলো নিঃশেষ হওয়ার ভয়, লোকসানের ভয়, বিনষ্টের ভয়, ব্যবস্থাপনার বিশৃঙ্খলার ভয়।

আর এদিকে আমরা যা খাই, হালাল ও বৈধ জিনিস খাই। আমাদের শত্রুর কোনো ভয় নেই। আমাদের কর্তৃত্বেরও নিঃশেষ হওয়ার কোনো ভয় নেই।

মানুষেরা আমাদের নিকটই ভালো মন নিয়ে আগমন করে। মুসাফাহা করে। সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখে।

এছাড়া আশা করা যায়, আল্লাহ যদি দয়া করেন, আখেরাতে আমাদের এবং তাদের মাঝে তারতম্য হবে। দুনিয়াদাররা যদি আমাদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পেত, তাহলে তারা আমাদের মর্যাদার বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হতো। আর এই পার্থিব জীবনে সম্পদওয়ালারা যদি আমাদের ওপর কিছু না দেয়, তাহলেই তো বরং আমাদের অন্যের সম্পদ থেকে বেঁচে থাকার মর্যাদা পূর্ণতা পায়। কারণ, অনুগ্রহের মধ্যে এমন এক হীনতা রয়েছে যা কিছুতেই দূর হতে চায় না। অনুগ্রহের এই খাবার যেন খাবার নয়। অনুগ্রহের পোশাকও যেন পোশাক নয়। অনুগ্রহ গ্রহণের দিনগুলো বড় কষ্টের দিন।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যক্তি সে, যে নিজেকে ইলমের জন্য উৎসর্গ করে দিলো। কারণ, একটি সুন্দর সম্ভ্রান্ত অভিজাত মন ছাড়া কেউ নিজেকে ইলমের জন্য উৎসর্গ করে না। অন্যদিকে যে ব্যক্তির সম্মানের একমাত্র মাধ্যম হলো টাকা-পয়সা, তার চেয়ে অপদস্থ সত্তা আর কেউ হতে পারে না। তার গর্বের একমাত্র মাধ্যম হয়তো তার বিশাল বাড়ি, অনেক সম্পদ। এতে তার নিজের মর্যাদা কোথায়? নিজের সত্তার উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধি কোথায়?

আবু ইয়ালা আল আলাওয়ি আমাকে একটি কবিতা শুনিয়েছেন। কবিতাটি এমন–

رُبَّ قوم في خلائهم ... عرر قد صيروا غررا

ستر المال القبيح لهم   سترى إن زال ما سترا

> কিছু মানুষের চরিত্রের মধ্যে ঢুকে আছে খোস-পাঁচড়া—কিন্তু সেগুলো দেখায় চমৎকার স্বাস্থ্যের মতো।
>
> সম্পদ তাদের কদর্যতাগুলো ঢেকে রাখে। কিন্তু যখন এই ঢাকনা ছুটে যাবে, দেখবে আসলে কী ছিল তাতে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অলসতা ও উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত করুন এবং আমাদের জাগ্রতদের চিন্তা ও কর্ম-চাঞ্চল্যতা দান করুন। ইলম ও আকল অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুন। নিশ্চয় তিনি অতি নিকটে এবং তিনি প্রার্থনায় সাড়াদানকারী।

পরিণতির দিকে লক্ষ রাখা

মানুষের একটি বড় ভুল হলো, বঞ্চিত ব্যক্তির প্রতি কষ্টদায়ক কোনো কথা বলা এবং তাকে হেয়জ্ঞান করা। এটি উচিত নয়। পরিণাম হিসেবেও ভালো নয়। কারণ, হেয়জ্ঞানকারী লোকটিরও একদিন এই অবস্থা হতে পারে– তখন তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

মোটকথা– মৌলিকভাবে কারও সাথেই কখনো শত্রুতা প্রকাশ করা উচিত নয়। কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। কখনো কখনো এই তাচ্ছিল্যকৃত ব্যক্তিও অনেক ওপর উঠে যেতে পারে। যাকে হয়তো গণনার মধ্যেই আনা হয় না– তার দ্বারাও সম্পাদিত হতে পারে অনেক অসম্ভব জিনিস। এ কারণে শত্রুদের সাথে কথা বলার সময়ও অন্তরের আগুন গোপন রেখে কথা বলা উচিত। আর যদি তার থেকে কোনো প্রতিশোধ নিতেই চাও তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও। এর চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর হয় না। এটা তাকে নত ও অবনত করে তুলবে।

মোটকথা, সকল মানুষের সাথেই ভালো আচরণ করা উচিত। বিশেষ করে যাদের কখনো কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বঞ্চিত বরখাস্ত কিংবা অপসারিত ব্যক্তিদের সাথেও ভালো ব্যবহার করা উচিত। হয়তো সে আবার তার পদ ফিরে পেতে পারে। তখন তার কর্তৃত্বে উপকার লাভ করা সহজ হবে।

আমরা একটি ঘটনার কথা জানি। ঘটনাটি এমন—

একবার একলোক বিখ্যাত বিচারক ইবনে আবি দাউদের নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়ে দারোয়ানদের কাছে এসে বলল, তোমরা ভেতরে গিয়ে বলো, দরজায় আবু জাফর অনুমতির আশায় দাঁড়িয়ে আছে।'

দারোয়ানরা ভেতরে গিয়ে সংবাদ প্রদান করতেই বিচারক সাহেব আনন্দিত হয়ে উঠলেন। দারোয়ানদের বললেন, তোমরা দ্রুত তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।

এরপর লোকটি ভেতরে এলো। বিচারক সাহেব দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। এরপর কাছে নিয়ে বসালেন। খুবই সম্মান প্রদর্শন করলেন। বিভিন্ন কথাবার্তা বললেন। শেষে ওঠার মুহূর্তে লোকটির হাতে পাঁচ

হাজার দিনার তুলে দিলেন এবং বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাকে বিদায় জানালেন।

আশপাশের লোকজন তো অবাক! এ কেমন বিষয়! অবশেষে কৌতূহল দমন করতে না পেরে তারা বিচারক সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, একজন অবিখ্যাত অতি সাধারণ ব্যক্তির সাথে আপনি এমন আচরণ করলেন! কারণ কিছুই বুঝলাম না!

বিচারক ইবনে আবি দাউদ বললেন, এর পেছনে লুকিয়ে আছে অন্য রকম এক ঘটনা। এক সময় আমি খুবই দরিদ্র ছিলাম। আর এই লোকটি ছিল আমার বন্ধু। একদিন আমি তার বাড়িতে গিয়ে বললাম, আমি খুবই ক্ষুধার্ত। কিছু খাওয়াও।

বন্ধুটি আমাকে বলল, 'একটু বসো। আমি এখনই বাইরে থেকে আসছি।' সে আমাকে বসিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কাবাব, হালুয়া এবং রুটি নিয়ে উপস্থিত হলো। সেগুলো আমার সামনে রেখে বলল, খাও।

আমি বললাম, তুমিও আমার সাথে খাও।

সে বলল, না, তুমিই খাও।

আমি বললাম, আল্লাহর কসম, তুমি যদি আমার সাথে না খাও, আমি খাব না।

আমার এ কথায় সে বাধ্য হয়ে আমার সাথে খেতে বসল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখি তার মুখ দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে...। আমি বিচলিত হয়ে বললাম, এটা কী হলো তোমার?

সে বলল, তেমন কিছু না। এমনি একটু অসুস্থতা।

আমি বুঝতে পারছিলাম সে আমার থেকে কিছু লুকাতে চাচ্ছে। আমি তাকে বললাম, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তুমি আমাকে আসল কথা বলো—কী হয়েছে। এভাবে রক্ত পড়ছে কেন?

এভাবে অনেক সাধাসাধির পর সে আমাকে যা বলল, তা শোনার জন্য আমি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার অন্তর যেন উড়ে গেল। সে আমাকে বলল, 'তুমি যখন আমার নিকট এসে তোমার ক্ষুধার কথা জানালে, তখন

আমার নিকট খাদ্য কেনার মতো কিছুই ছিল না। তবে আমার দাঁত ছিল ভঙ্গুর। সেটা স্বর্ণের তার দিয়ে বাঁধাই করে নিয়েছিলাম। আমি তখন বাইরে গিয়ে সেই তার খুলে বিক্রয় করে এই খাবারগুলো কিনে এনেছি। ভাঙা দাঁত থেকে এখন তাই রক্ত বেরোচ্ছে।'

কথা শেষ করে বিচারক সাহেব বললেন, এবার তোমরাই বলো এর কি কোনো প্রতিদান হয়! কোনো সম্মান ও সম্পদ এর সমকক্ষ হতে পারে কি! পারে না। কিছুতেই পারে না।

ঠিক এর উল্টোটাও অনেক সময় হয়। হয়তো কেউ কাউকে এক সময় কষ্ট দিয়েছে। জুলুম করেছে। হয়তো একদিন সেই ব্যক্তিই কর্তৃত্ব পেয়ে আগের ব্যক্তির উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। যেমন ইবনে যিয়াদকে কষ্ট পেতে হয়েছে মুতাওয়াক্কিল থেকে। ইবনুল জাঝারির ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে মুসতারশিদ।

একারণে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সব সময় পরিণামের কথা চিন্তা করে এবং সেটাকে ধর্তব্যের মধ্যে রাখে। ভবিষ্যতে কী কী হতে পারে, তার একটি চিত্র সে মনের মধ্যে এঁকে নেয় এবং সতর্কতার সাথে কাজ করে।

এব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভেবে রাখার বিষয় হলো, হঠাৎ মৃত্যুর কথা। কোনো রোগ-বালাই ছাড়াই হঠাৎ আকস্মিকভাবেও মৃত্যু এসে যেতে পারে। সুতরাং সচেতন ব্যক্তি সেই– যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং এমন কাজ করে– মৃত্যু এসে গেলে যেন আফসোস করতে না হয়। তাই সে গোনাহের কাজ থেকে সতর্ক থাকে। কারণ, এটি একটি ওত পেতে থাকা নির্মম শত্রুর মতো। তার ক্ষেত্রে বেখেয়াল হলেই সর্বনাশ। সে ব্যক্তি নিজের জন্য ভালো আমল সঞ্চয় করতে থাকে। কারণ, এটিই একমাত্র বন্ধু, যে বিপদের সময় উপকার করে।

এছাড়া একজন মুমিন ব্যক্তির এটাও খেয়াল রাখা দরকার, তার আমল যত বেশি হবে, জান্নাতে তার মর্যাদাও তত উচ্চ হবে। আর যদি আমল কম হয়, মর্যাদাও কম হবে। তখন সে বেশি আমলকারী ব্যক্তির তুলনায় কম মর্যাদা নিয়ে জান্নাতে বসবাস করবে। তবে এটা ঠিক সে তার নিজের পুরস্কার নিয়েও সন্তুষ্ট থাকবে—তার এই কমতির কথা সে কখনো বুঝতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কাজের পরিণামের প্রতি লক্ষ রেখে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

দুনিয়ার টুকরো টুকরো প্রতারণা

আমার একটি কিতাবের নাম 'المنتظم'। এটি লিখিত হয়েছে বিভিন্ন খলিফা, সুলতান, সম্রাট ও জাতির ইতিহাস নিয়ে। আমি যখন এটি সংকলন করতে থাকি, তখন অনেক কিছুই জানতে পারি—বহু খলিফা সম্রাট রাজা-বাদশাহ, উজির-মন্ত্রী, লেখক-সাহিত্যিক, ফকিহ, মুহাদ্দিস, জাহেদ এবং আরও অনেকের জীবনী সম্পর্কে জানতে সক্ষম হই।

সবার অবস্থা জানতে গিয়ে যেটা আমার মনে হলো, তা হলো, দুনিয়া অনেক মানুষকে নিয়ে এমন প্রতারণার খেলা খেলেছে যে, তাদের দ্বীন-ধর্ম নষ্ট করে ছেড়েছে। বিভিন্ন অপরাধ ও অবাধ্যতায় জড়িয়েছে। এমনকি অনেককে তাদের আখেরাতের বিষয়ে অবিশ্বাসী করে তুলেছে।

অনেক শাসকই অন্যায়ভাবে মানুষদের হত্যা করেছে, সম্পদ কেড়ে নিয়েছে, আহত করেছে, বন্দি করেছে—অনেক রকম অত্যাচার করেছে। এছাড়াও ব্যক্তিগত বিভিন্ন অবাধ্যতা ও গোনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে। যেন এগুলো সম্পর্কে তাদের কিছু ভাবার নেই। যেন তারা পরকালের পাকড়াও থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করছে। কিংবা কখনো কখনো তারা ভেবে বসেছে—প্রজাদের এই দেখাশোনা ও পরিচালনা তাকে শাস্তি থেকে বিরত রাখবে। কিন্তু তারা কি ভুলে যায় যে, খোদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত বলা হয়েছে—

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

হে নবী, আপনি বলুন, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি। [সুরা যুমার: ১৩]

অথচ যারা নিজেদের আলেম হিসেবে গণ্য করে, সেই তাদের অনেকেই দুনিয়ার নগদ কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে প্রবেশ করেছে। ইলম তাদের কোনো উপকারই করেনি। এটা কেমন ইলম! এভাবে অনেক জাহেদও নিজেদের দুনিয়াবি কামনা চরিতার্থ করার জন্য পথবিচ্যুত হয়েছে। তাদের এগুলো করার কারণ—দুনিয়া হলো একটি ফাঁদের মতো। আর মানুষরা পাখির মতো। পাখি তার খাদ্য খেতে এখানে-সেখানে উড়ে

বেড়ায়—কিন্তু ফাঁদের কথা ভুলে থাকে। তাই তারা ফাঁদে আটকা পড়ে। ধরা খেয়ে যায়।

এভাবে অধিকাংশ মানুষ তাদের তাৎক্ষণিক বাসনা ও কামনার মাঝে কঠিন শাস্তির কথা ভুলে থাকছে। তারা রাতভর বিভিন্ন অনর্থক আলাপ-আলোচনায় মত্ত থাকে। কিন্তু আকল বা বিবেকের পরামর্শের দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করে না। সামান্য তুচ্ছ সুখের বিনিময়ে তারা সমূহ কল্যাণ বিক্রয় করে দিচ্ছে। সাময়িক উত্তেজনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে চলতে তাদের কারও নিকট যখন মৃত্যু এসে পড়ছে, তখন সে আফসোস করে বলছে, হায়, আমার যদি সৃষ্টি না হতো! হায়, আমি যদি মাটি হতাম! এভাবে সে নিজের সত্য অনুধাবনের কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু তখন তাকে বলা হবে– آلْآنَ ؟ – অবশেষে এখন? এতদিনে কী করেছ!

এখন শুধু আফসোফ আর আফসোস! হারিয়ে যাওয়া এমন জিনিসের জন্য– যাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। আপতিত এমন অপদস্থতার জন্য– যার থেকে আর মুক্তি নেই। এখন শুধু অন্তহীন অনুশোচনা। আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখেও শাস্তির জন্য আফসোস! কারণ, বিবেকের দারস্থ না হলে সে তো কোনো উপকার করতে পারে না। অবৈধ আকর্ষিত জিনিস থেকে বিরত থাকার দুর্দম ইচ্ছাশক্তি ছাড়া বিবেকের পরামর্শ কেউ তো শুনতে সক্ষম হয় না!

খলিফাদের মধ্যে তুমি উমর ইবনে খাত্তাব রা. এবং উমর ইবনে আবদুল আজিযের কথা চিন্তা কর। আর আলেমদের মধ্যে ভেবে দেখ আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কথা। দৃষ্টি প্রদান কর জাহেদদের মধ্যে ওয়ায়িস করনি রহ. এর কথা। তারা যথেষ্টভাবে চেষ্টা-মুজাহাদা করেছিলেন। এবং নিজেদের অস্তিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তারা প্রবৃত্তির কাছে নতি স্বীকার করেননি।

ধ্বংসশীলদের ধ্বংস হওয়ার প্রধানতম কারণ হলো অবৈধ আকর্ষিত জিনিসের ক্ষেত্রে ধৈর্যের স্বল্পতা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা। কত মানুষ তো পরকাল এবং তার শাস্তির প্রতি ঈমান রাখে না—এটা কোনো আশ্চর্য বিষয় নয়। বরং আশ্চর্যের বিষয় হলো, একজন মুমিন 'ঈমান ও ইয়াকিন' রাখে, কিন্তু তার এই ঈমান ও ইয়াকিন তাকে কোনো উপকার করছে না! আল্লাহর শাস্তিকে সে বোঝে ও মান্য করে—কিন্তু তার এই বুঝ তাকে কোনো উপকার করছে না! একজন মুমিনের জন্য এ বড় ভয়াবহ ব্যাপার!

মনোবলের উচ্চতা ও নিচুতা

উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার মনোবলের উচ্চতা অনুযায়ী কষ্টও স্বীকার করতে হয়। কবি বলেন,

وإذا كانت النفوس كباراً ... تعبت في مرادها الأجسام

> যখন অন্তর বড় হয়, তখন তার বিশাল আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করতে শরীরকেও কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

অন্য কবি বলেন,

ولكل جسم في النّحول بليةٌ ... وبلاء جسمي من تفاوت همتي

> প্রত্যেক মানুষের শরীরেই কিছু অসুস্থতার বিপদ থাকে। আর আমার শরীরের বিপদ হলো আমার মনোবলের উচ্চ ভারবহন।

এর ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তির মনোবল অনেক উচ্চ, সে সকল ধরনের ইলম অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। সে শুধু এক প্রকার ইলমের ওপর সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না। বরং সে প্রতিটা ইলমে সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক পরিশ্রম—আর শরীর এটা বহন করতে সক্ষম হয় না। তখন মনোবলকে সঙ্গ দেওয়া শরীরের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে ওঠে।

এরপর যখন সে বুঝতে পারে ইলমের উদ্দেশ্যই হলো আমল, তখন সে দীর্ঘ রোজা, নামাজ ও জিকিরে মশগুল হতে শুরু করে। তখন এই সমূহ ইবাদত এবং ইলমচর্চার মাঝে সমন্বয় করা অর্থাৎ দুটোকেই সমানভাবে সামলানো তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর যখন সে বুঝতে পারে– দুনিয়াবিমুখ হওয়া দরকার কিন্তু এদিকে আবার জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোও অর্জন করা দরকার। এছাড়া সে চায় অন্যকে প্রাধান্য দিতে, অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে। কৃপণতাকে পছন্দ করে না। এগুলো তাকে খরচের ওপর উদ্বুদ্ধ করে। আবার সে যেমনতেমনভাবে উপার্জনও করতে চায় না– হালাল পথ ছাড়া। এভাবে সে যদি সম্মান ও আভিজাত্যের সাথে চলতে চায়– অথচ তার উপার্জন কম থাকে, তখন সেটাও তার শরীর ও পরিবারের ওপর কষ্টকর হয়ে পড়ে। আর সে যদি কাউকে কিছু না দিয়ে চলতে চায়– তবে এটা তার স্বভাবের ওপর কষ্টকর হয়ে ওঠে।

মোটকথা তাকে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বিপরীত বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় করার প্রবল চেষ্টা নিয়ে তার জীবনপাত করতে হয়। অর্থাৎ তাকে সার্বক্ষণিক শ্রমের মধ্যে থাকতে হয়। ক্লান্তি ও শ্রান্তি নিয়েও কাজ করে যেতে হয়। তার কোনো অবসর থাকে না। এরপর যদি তার এই কাজগুলোর মধ্যে একনিষ্ঠতা থাকে—তবে তো তার কষ্ট আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। সতর্ক থাকতে হয় সকল ক্ষেত্রে।

আর এদিকে যার মনোবল উচ্চ নয়, তার অবস্থা কী হয়? সে যদি ফিকাহবিদ হয় আর যদি তাকে কোনো হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে বলে—আমি জানি না। আর যদি মুহাদ্দিস হয়, তখন যদি তাকে কোনো ফিকহি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে বলে, আমি জানি না। অর্থাৎ তার জ্ঞান হয় অসম্পূর্ণ—একপেশে। এবং এটা নিয়ে যেন তার কোনো মাথাব্যথাও নেই।

আর উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি নিছক একটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করাকে নিজের জন্য অপমান মনে করে। এটা তার নিকট ত্রুটিযুক্ত মনে হয়। মানুষ তার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করল—আর সে তার উত্তর দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে—এটাকে সে নিজের জন্য অপমানকর মনে করে।

এছাড়া একজন হীন মনোবলসম্পন্ন লোক মানুষের অনুগ্রহকে কিছু মনে করে না। তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করতেও লজ্জাবোধ করে না। যে যা প্রদান করে—সকলের জিনিসই গ্রহণ করে। অসমীচীন কারও জিনিস ফিরিয়ে দেওয়ার আত্মসম্মানবোধটুকু তার থাকে না।

কিন্তু একজন উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি এগুলো কখনো করে না। হয়তো কষ্ট ও দারিদ্র্য প্রতিনিয়ত তার জীবনকে আঘাত করে, শ্রমের ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চায় শরীর, তবুও কী এক তৃপ্তির সুধায় সকল কিছু সে ভুলে থাকে। ভবিষ্যতের পুরস্কার ও প্রতিদানের আশায় তখন কোনো কষ্টই আর তাকে কষ্ট দেয় না।

এদিকে মনোবলহীন ব্যক্তি নিজেকে যতই কাজ ও ক্লান্তি থেকে সরিয়ে রাখুক—পরিণামে তাকেই বরং কষ্টে পতিত হতে হয়; শারীরিক কিংবা মানসিক। কিছুতেই তার তৃপ্তি আসে না।

অবশেষে বলি, দুনিয়া হলো একটি সম্মানজনক উচ্চ কাজের প্রতিযোগিতার স্থান। সুতরাং একজন উচ্চ মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি স্বল্প উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। সে বরং সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণের চেষ্টা করে। সে যদি সফলকাম হয়—তাহলে তো সোনায় সোহাগা। আর যদি প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও তার সফলতার ঘোড়া হোঁচট খেয়ে যায়—তবুও ব্যথা পাওয়ার কিছু নেই। অনেকে তো এই হোঁচট খাওয়া পর্যন্তই আসতে পারে না—কিংবা আসতে সাহস করে না। আর মুমিনের নিয়তই তো উত্তম।

আত্মমুগ্ধতার বিপদ

মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ হলো তার নিজের প্রতি তুষ্ট থাকা এবং নিজের ইলমের উপর নির্ভর করা। এটি বর্তমানের এমন এক বিপদ—অধিকাংশ মানুষ যার দ্বারা আক্রান্ত।

তুমি দেখবে, ইহুদি ও খ্রিষ্টানরাও নিজেদের সঠিক মনে করে। কিন্তু এটা নিয়ে তারা কোনো পর্যালোচনা করে না। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের প্রমাণ ও দলিলের দিকে দৃষ্টি প্রদান করে না। যা শুনলে তাদের অন্তর নরম হতে পারে—যেমন বিমুগ্ধকর কোরআন, সেটা থেকেও তারা পালিয়ে থাকে—যাতে শুনতে না হয়।

ঠিক এভাবেই প্রতিটি মনগড়া মতবাদ কিংবা ধর্মের প্রতিটি দল নিজের মতকেই সঠিক মনে করে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। হয়তো এটা তাদের পূর্বপুরুষ—বাপ-দাদার ধর্ম, সে কারণেই এটি পালন করে। কিংবা প্রথমেই সে একটি মতবাদ নিজের জন্য গ্রহণ করে নিয়েছে—এটাকেই সে সঠিক মনে করে। এর বিপরীত কোনো মত, মতবাদ কিংবা ধর্মের দিকে সে কোনো দৃষ্টিপাত করে না। এবং এটা নিয়ে জ্ঞাতজনদের সাথে আলোচনাও করে না—তাহলে তারা তার ভুলটা ধরে দিতে পারতেন। কিন্তু সে সেটাও করে না। নিজের মতে নিজেই সন্তুষ্ট—এই ভ্রান্তির কোনো প্রতিকার নেই।

হজরত আলি রা.-এর ক্ষেত্রে খারেজিদের অবস্থাও হয়েছিল এমন। তারা নিজেরা যা করছিল, সেটাকেই ভালো মনে করছিল। কিন্তু তারা এ জন্য

কোনো বিজ্ঞ আলেমের দ্বারস্থ হয়নি—যিনি তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে পারতেন। কিন্তু হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. নিজেই যখন তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের ভুলটা স্পষ্ট করে ধরে দিলেন—তখন তাদের মধ্যে দুই হাজারেরও বেশি ব্যক্তি সেই মতবাদ থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। আর এই প্রবৃত্তিতাড়িত মতবাদ থেকে যারা ফিরে আসতে চায়নি, তাদের মধ্যে একজন হলো ইবনে মুলজিম। সে তার নিজের মতবাদকেই সঠিক মনে করছিল। সুতরাং সে আমিরুল মুমিমিনকে হত্যা করা বৈধ মনে করছিল। এবং এটাকে সে তার দ্বীন মনে করছিল। এ কারণে বন্দি করার পর তাকে যখন শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হচ্ছিল- তখনও সে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। নীরবে সয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যখন তার জিহ্বা কর্তন করার উপক্রম করা হলো, তখন সে বলে উঠল- হায়, দুনিয়ায় এমন একটি মুহূর্ত আমি কীভাবে বেঁচে থাকব- অথচ আল্লাহ তাআলার জিকির করতে পারব না!

ইবনে মুলজিমের ব্যাপারটি লক্ষ করো—জিদ ধরে থাকা অজ্ঞতার সাথে এই যে একনিষ্ঠ ভ্রান্তি—এর কোনো ওষুধ নেই। কিছুই তাকে সঠিক পথে আনতে সক্ষম হবে না। মানুষের জন্য এটি এক দুরারোগ্য রোগ—মৃত্যু ছাড়া এর কোনো প্রতিষেধক নেই।

এভাবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফও বলত, দুনিয়া কিছুই নয়, আমি সকল সুখ-শান্তির আশা রাখি আখেরাতে!

যে ব্যক্তির কথা ও বিশ্বাসটি এমন—অথচ সেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এমন বহু মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে—যাদের হত্যা করা ছিল নাজায়েয। যেমন সাঈদ ইবনে যুবায়ের—তাকে কী নির্মমভাবেই না হাজ্জাজ হত্যা করেছে। কাছির ইবনে কাহদাম বলেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জেলখানায় এমন বন্দির সংখ্যাই ছিল ৩৩ হাজার—যাদের ওপর কোনো ধরনের দণ্ড অপরিহার্য হয়নি।

আমার মনে হয়—অধিকাংশ শাসক-সুলতান মানুষদের হত্যা করে, হাত-পা কর্তিত করে এই ধারণায় যে, তাদের ক্ষেত্রে এগুলো করা বৈধ। কিন্তু তারা যদি অভিজ্ঞ জ্ঞাত ব্যক্তিদের এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নিত, তাহলে তারা

তাদের নিকট সঠিক বিষয়টি তুলে ধরতে পারতেন। কিন্তু তারা সেটা করে না। নিজেদের সিদ্ধান্তের ওপরই তারা অজ্ঞভাবে জিদ ধরে বসে থাকে– মানুষজাতির জন্য এটা এক বড় মুসিবত।

এছাড়া সাধারণ মানুষও বিভিন্ন গোনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়—ক্ষমা পেয়ে যাওয়ার ধারণায়। কিংবা ধারণা করে—তার সওয়াবগুলো তাকে মুক্তি দিয়ে দেবে। কিন্তু তারা শাস্তির বিষয়টা যেন ভুলেই থাকে। তাদের কেউ কেউ অজ্ঞভাবেই ধারণা করে বসে আছে, সে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত' এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ এর বিশ্বাসের বিষয়গুলো খেয়াল করে না। এগুলো হয়ে থাকে অজ্ঞতার প্রাধান্যের কারণে।

এ কারণে মানুষের জন্য উচিত, মূল উৎসের দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা। সন্দেহ ও সংশয় থেকে দূরে থাকা। শুধু নিজের জানা ইলমের ওপর কিছুতেই নির্ভর না করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সব ধরনের বিপদ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

নিজের কর্মের হিসাব-নিকাশ

আমি একদিন আমার নফসের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তায় নিমগ্ন হলাম। কিয়ামতের দিন তার হিসাব নেবার আগেই একটি হিসাব নিতে চাইলাম। কিয়ামতের দিন তাকে পরিমাপ করার আগেই তাকে একটু পরিমাপ করার চেষ্টা করলাম।

হিসাব করে দেখলাম, জন্ম-শৈশব থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমার ওপর প্রতিপালকের কত যে দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষেছে—তার কোনো হিসাব নেই। অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ। আমার খারাপ কাজগুলো গোপন রাখা হয়েছে। এমন বহু বিষয় ক্ষমা করা হয়েছে—যার অনিবার্য পরিণাম ছিল শাস্তি। আর আমি সকল নিয়ামতের জন্য শুধু সামান্য কিছু মৌখিক শুকরিয়া জানিয়ে আসছি।

আমি আমার ভুলগুলো নিয়ে চিন্তা করলাম—এত এত ভুল আর অপরাধ, এগুলোর সামান্য কিছুর জন্যও যদি আমাকে শাস্তি প্রদান করা হতো, তবে আরও বহু আগেই আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। মানুষদের মাঝে এর সামান্য কিছুও যদি প্রকাশ করে দেওয়া হতো, তবে আমার মাথা লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যেত। কোনো বিশ্বাসকারীই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না যে,

এগুলো 'গোনাহে কবিরা' ছিল, সে কারণে আমার ক্ষেত্রে ফাসেক হওয়ার ধারণা হয়তো করত না। কিন্তু আমি তো জানি, আমার জন্য এই অপরাধগুলো ছিল খুবই নিকৃষ্টমানের। কত ভুল ব্যাখ্যার মধ্যে আপতিত হয়েছি। কত সহজতা গ্রহণ করেছি!

সুতরাং আমি দুআ করার সময় বলতে থাকি, হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা তোমারই। যেভাবে তুমি আমার দোষ-ত্রুটিগুলো ঢেকে রেখেছ, সেভাবেই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

এরপর আমি নিজেকে এই সকল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের দিকে মনোনিবেশ করিয়েছি। কিন্তু যেভাবে শুকরিয়া আদায় করা উচিত, সেভাবে পারিনি। এরপর আমি আমার যে কামনা-বাসনাগুলো পূরণ হয়েছে, সেগুলোর হিসাব নিলাম। এরপর দেখলাম, আমার থেকে কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ সেই পরিমাণ নেই এবং নিয়ামতগুলোর শুকরিয়া আদায়ও যথার্থ পরিমাণ নয়।

এবার আমি অনুশোচনা করতে লাগলাম নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের স্বল্পতার ওপর। ইলমের অন্বেষণ ও চর্চার মাঝে আমি তো আনন্দ ও স্বাদ অনুভব করি, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল তো প্রতিষ্ঠা করা হয় না। আমি বড়দের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার প্রত্যাশী হয়েছি। কিন্তু জীবন তো শেষ হয়ে যেতে বসেছে, কিন্তু পার্থিব সেই উদ্দেশ্যও সফল হয়নি—যা চেয়েছি তাহলে আমার হলোটা কী!

পড়তে পড়তে একদিন হজরত আবুল ওয়াফা ইবনে আকিলের লেখা সামনে এলো। দেখলাম সেখানে তিনি আমার মতোই নিজের শোক ও অনুশোচনার কথা বলেছেন। তার অনুশোচনার ধরনটি আমাকে খুব প্রভাবিত করে। আমি তার সেই কথাটি এখানে তুলে ধরছি।

তিনি লিখেছেন—

একবার আমি আমার নফসকে ডেকে বললাম, হে আমার অস্থিরমতি চিত্ত, তুমি যে এখানে-ওখানে শান্তি উচ্চকিত কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে বেড়াও—যাতে লোকজন তোমাকে 'বিতার্কিক' বলে। এর প্রতিফল তো এটাই হবে যে, তুমি এটাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করবে আর তোমাকে মানুষেরা বলবে—হে বিতার্কিক। যেমন একজন কুস্তিগীর মানুষকে বলা হয় বীর পালোয়ান। কিন্তু এতটুকু নামের অর্জনে তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ সময়গুলো—শ্রেষ্ঠ জীবনটা বিসর্জন

দিয়ে বসলে! অর্থাৎ তুমি তোমার পুরো জীবন দিয়ে মানুষের মুখে শুধু এই উপাধিটুকু অর্জন করতে চাও। যে মানুষ আগামীকালই নিঃশেষ হবে তার মাঝে নাম ছড়াতে চাও– তুমি একজন বিখ্যাত বিতার্কিক। কিন্তু তুমি কি খেয়াল করে দেখেছ, কিছুদিনের মধ্যেই অন্তরসমূহ থেকে 'স্মরণকারী এবং স্মরণকৃত' সকল নামই মুছে যাবে।'

এটা তো তা-ও সেই মানুষের জন্য, মৃত্যু অবধি যার সুনাম ও সুখ্যাতি থাকে। কিন্তু কখনো এমন যুবকের দেখাও পাওয়া যাবে, লোকজন যার ওপর হয়তো একটি বিকৃত নাম আরোপ করে দিয়েছে, আর সেটাই তার নাম হয়ে গেছে। দুনিয়ার খ্যাতিটাও অনেকে শেষমেশ পায় না। কিন্তু যারা জ্ঞানী—কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর—তারা তো সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা করে, যা তাদেরকে বিখ্যাত করেছে। যেমন, ইলম অনুযায়ী আমল করা। নিজেদের জন্য বিশুদ্ধ আকিদা ও বিশ্বাস রাখা।

হায়, নিজের জন্য আফসোস! সে তো বিভিন্ন ইলমি বিষয়ে অনেক খণ্ডের কিতাব রচনা করেছে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে সব জায়গায়। যখনই তাকে বিতর্কের জন্য আহ্বান করা হয়, সেই বিজয়ী হয়। নসিহত করতে বলা হয়—চমৎকার নসিহত করে বেড়ায়। আবার কোথাও যখন দুনিয়ার কোনো উজ্জ্বলতা সফলতা ও সমৃদ্ধি প্রকাশ পায়, তখন সে সেইদিকে শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত পচা জিনিসের ওপর কাকেরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঠিক সেভাবেই সে দুনিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আহ, তার জন্য আফসোস! সে যদি এভাবে হামলে পড়ে আকণ্ঠ ভক্ষণে নিমজ্জিত না হতো; বরং সে যদি অনন্যোপায় মানুষের মতো মৃত বস্তুর গোশত খাওয়ার মতো শুধু জীবনধারণের পরিমাণটুকু দুনিয়া থেকে গ্রহণ করত—কতই না ভালো হতো!

হায় আমার নফস! মানুষের সাথে মেলামেশায় তুমি এমন সকল দোষ-ত্রুটি বৃদ্ধি করেছ, যা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়েছে। লজ্জায় তুমি চাইবে না যে, প্রভু সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিক। অথচ সে সকল অপরাধ ও গোনাহের কারণে যখন তোমার কোনো বাসনা চরিতার্থ হয় না—তখন তুমি বিরক্ত হও, বিরূপ হয়ে ওঠো। আর যখন বিভিন্ন নিয়ামতের মাধ্যমে তোমাকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়, তখন তুমি নিয়ামতদাতার শুকরিয়া আদায় করা থেকে উদাসীন হয়ে থেকেছ।

আহা, আমার আফসোস—আজ তো পৃথিবীর ওপর রয়েছি, আর আগামীকাল থাকতে হবে তার মাটির নিচে। আল্লাহর কসম, মাটির নিচে যাওয়ার পর তিন দিনের মধ্যে আমার শরীর পচা যে দুর্গন্ধ হবে, তার চেয়েও অধিক দুর্গন্ধময় হলো আমার আখলাক ও চরিত্রগুলো—যখন আমি দুনিয়াতে মানুষদের মাঝে বিচরণ করছি। আল্লাহর কসম, প্রভুর এই সহনশীলতা ও অনুগ্রহের বহর দেখে আমি হতবুদ্ধ হয়ে পড়ছি—আমার লাঞ্ছনাগুলো তিনি কী অসীম মমতার সাথেই না ঢেকে রেখেছেন! বিক্ষিপ্ত অস্থিরতাগুলোকে তিনি কী দৃঢ়তার সাথেই না একত্র করে দিয়েছেন!

আমার মৃত্যুর পর হয়তো বলা হবে—একজন অভিজ্ঞ সৎ আলেম ইন্তেকাল করেছে। কিন্তু আমি তো জানি, তারা যদি আমার আসল পরিচয় ও অবস্থা সম্পর্কে জানত, তাহলে তারা আমাকে দাফন করতেও সম্মত হতো না। আল্লাহ আমার এত দোষ ঢেকে দিয়েছেন!!

একজন শত্রুর সকল দোষ-ত্রুটি যেভাবে খুঁটে খুঁটে প্রকাশ করা হয়, সেভাবেই সকল দোষ প্রকাশ করে আজ আমি আমার অন্তরকে আহ্বান করছি। সন্তানহারা মানুষের শোক-সন্তাপের মতো হৃদয় ছিঁড়ে আমি আমার অনুশোচনার কথা প্রকাশ করছি। কারণ, আমার জন্য এমন কোনো শোককারী নেই, যে ব্যক্তি আমার এই গোপন বিপদের বিষয়ে শোক প্রকাশ করবে। আমার গোপন খারাপ আচরণগুলোর বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কারণ, এগুলো অন্য কারও জানা নেই। সকলের থেকে এগুলো রয়েছে আড়াল ও অজ্ঞাত।

আল্লাহর কসম, আমার নিজের এমন ভালো কোনো কর্ম নেই, যার ওসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট বলতে পারি—হে আল্লাহ, তুমি আমার অমুক কাজের কারণে অমুকটা মাফ করে দাও। আমি যখনই আমার আমলের দিকে তাকাই, এমন আমল কখনো পাইনি, যা আমার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এমন সহায়ক কিছু পাইনি—যা আমার সহায় হতে পারে।

এরপরও আমি যখনই আমার প্রয়োজনে হাত বাড়িয়েছি– প্রভুর পক্ষ থেকে তা পূরণ করা হয়েছে। আমার সাথে তার আচরণটা এমনই ছিল—অথচ তিনি এমন প্রভু—আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করলেও তার কোনো ক্ষতি নেই। আর অন্যদিকে তার সাথে আমার আচরণের এই অবস্থা —অথচ আমি

সর্বক্ষণ তার দয়া ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। কী আশ্চর্য কাণ্ড! অথচ আমার কোনো ওজর-আপত্তিরও সুযোগ নেই যে, আমি বলতে পারি—এটা আমি জানতাম না কিংবা এটা আমার ভুল হয়ে গেছে। কারণ, তিনি আমাকে কত সুস্থ ও সুগঠিত করে সৃষ্টি করেছেন। আমার মধ্যে মেধা বুদ্ধি বিবেক ও চেতনা দিয়েছেন—কত অদেখা আড়াল বিষয়ও আমার নিকট প্রকাশিত হয় এবং কত কিছু বুঝতে পারি।

হায়, আমার জীবনের ওপর আফসোস! তা এমন কাজসমূহে অতিবাহিত হয়ে গেল, যা তার সন্তুষ্টির অনুকূলে নয়। এবং তা একজন বুদ্ধিমান মানুষের মান-মর্যাদা অর্জন থেকেও বঞ্চিত রয়ে গেল। আর দ্বীনের ক্ষেত্রে যত অবহেলা উদাসীনতা—সকল কিছুর জন্যই আফসোস।

আহা, আফসোস আর আফসোস—যেদিন আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে থাকবে, সেদিন তো আমার প্রতি মানুষের সকল সুধারণা কীভাবেই না নষ্ট হয়ে যাবে! দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে আমার অপদস্থতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। আমার এসকল বিষয় জানা থাকা সত্ত্বেও শয়তান আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছে!

হে আল্লাহ, আমি এই সকল কদর্যতা, গোনাহ ও অপরাধ থেকে একনিষ্ঠ তাওবা করছি। এই সকল কলঙ্ক মুছে দেবার জন্য সত্যসত্য অনুনয় করছি। আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে এটাকে গ্রহণ করছি। দীর্ঘ ৫০ বছর আমি কত নিয়ামতে সিক্ত হয়েছি—আজ আমি তোমার দরবারে হাজির। আমার তো কিছু নেই। আমার তো কোনো সম্বল নেই, তোমার রহম ছাড়া—

وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدي إلى معدن الكرم

وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم.

ইলম আমাকে হাত ধরে এনেছে দয়ার খাজানার নিকট। আর সম্বল বলতে আমার রয়েছে শুধুই অনুশোচনা আর আফসোস।

হে আল্লাহ, আমি অবাধ্য হয়েছি—তবে তোমার সীমাহীন নিয়ামতের কথা জানি। অপরাধ করেছি—তবে তোমার অনন্ত দয়ার কথাও মানি। সুতরাং তুমি আমার অতীত ভুলগুলো ক্ষমা করো– প্রভু হে আমার, তোমার দয়ায় ক্ষমা করো ।

লোক দেখানো দুনিয়াবিমুখতা

আমি অধিকাংশ মানুষকেই শরিয়ত থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের অভ্যাস ও সুবিধা অনুযায়ী চলতে দেখি।

এদের সকলকে সর্বিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক. আলিম ও শিক্ষিত শ্রেণি। দুই. অশিক্ষিত আবেদ শ্রেণি।

১. আলেম বা শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অবস্থা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু দুনিয়ার বিষয়-আশয় সম্পর্কেই জ্ঞান লাভ করার উপর সীমিত থাকে– যাতে দুনিয়াতে উপার্জন সহজ হয়। এবং আখেরাতের বিষয়-আশয় থেকে বিরত ও দূরে সরে থাকে। হয়তো সে আখেরাতের বিষয় সম্পর্কে জানেই না কিংবা আখেরাতের বিষয়গুলো পালনে কঠিন হয় বলে দূরে সরে থাকে। আর অনেকেই জানা বিষয়েও পালন কঠিন হওয়ার কারণে সেগুলো পালন করে না আর অবশিষ্ট বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে নিজের স্বভাবমতো কাজ চালিয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রেই সে বুঝতে পারে সে ভুল করছে, তবুও ফিরে থাকে না। সে কি বোঝে না, তার এই জ্ঞানই তার বিপক্ষে প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান হবে?

আর কেউ কেউ বাহ্যিক ইলম অনুযায়ী আমল করে। কিন্তু ইলমের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে থাকে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাদের কেউ কেউ রাজা-বাদশাহর দরবারে যাতায়াত করে। এর দ্বারা নিজেও সমস্যায় পতিত হয়– সেখানে সে অনেক অন্যায় জুলুম ও অপরাধের বিষয় দেখতে পায়, কিন্তু সেগুলো থেকে সে বাধা প্রদান করতে সক্ষম হয় না। তাকেই বরং কখনো কখনো প্রশংসা ও তোষামোদ করতে হয়।

বাদশাহ নিজেও তার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সুবিধা ভোগ করে। বাদশাহ বলতে সুযোগ পান—আমি যদি সঠিক পথে না থাকতাম, তাহলে অমুক আলেম আমার সাথে সম্পর্ক রাখতেন না। আমার এখানে আসা-যাওয়া করতেন না!

এদিকে সাধারণ মানুষজনও এতে করে বিভ্রান্তিতে আপতিত হয়। তারা ভাবে এবং বলে বেড়ায়—বাদশাহর কাজ যদি সঠিক না হতো, তবে তো এই আলেম তার পাশে থাকতেন না। তার নিকট যাওয়া-আসা করতেন না।

আর কিছু কিছু আলেম পরিবারের সন্তান তাদের অভিজাত পূর্বপুরুষের নাম ভাঙিয়ে চলে। ভাবে, তাদের মাধ্যমেই বুঝি নিজেরাও পার পেয়ে যাবে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, বনি ইসরাইল থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল 'ইহুদি' গোষ্ঠী। বংশের আভিজাত্য ও দোহাই ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। অনেক অনৈতিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে এটি একটি নিকৃষ্টতম অজুহাত।

২. আর দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অশিক্ষিত আবেদ ব্যক্তিগণ। এদেরও বিভিন্ন অবস্থা। এদের কেউ কেউ নিয়তের দিক দিয়ে সঠিক, কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে অধিকাংশই সঠিক ও বিশুদ্ধ পথে নেই। আগের যুগে কিছু কিতাব রচিত হয়েছিল– যেগুলো অসংখ্য ভুলে ভরা, অশুদ্ধ হাদিস, বিদআত এবং এমন অনেক বিষয়ে নির্দেশনা-সংবলিত, যেগুলো সরাসরি শরিয়তের বিরোধী। এগুলোর লেখক যেমন, হারেস আর মুহাসিবি, আবু আবদুল্লাহ আত-তিরমিযি, *কূতুল কুলুব* রচয়িতা আবু তালেব আল-মাক্কি, *কিতাবুল ইহইয়া*র লেখক আবু হামেদ আত-তুসি প্রমুখ। যখন সাধারণ মানুষজন এই কিতাবগুলো পড়ে এবং কিতাবের বিষয়গুলো অনুসরণের চেষ্টা করে, তখন তারা বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়। কেননা, এগুলো রচিত হয়েছে অশুদ্ধ বানোয়াট হাদিসের উপর ভিত্তি করে। এগুলোতে কঠিনভাবে দুনিয়ার নিন্দা-মন্দ করা হয়েছে। কিন্তু তারা তো বোঝেই না, এই নিন্দামন্দ দ্বারা আসলে কী উদ্দেশ্য।

এ কারণে অনেক নবীন ও সাধারণ ব্যক্তি তাদের এই কিতাবগুলো পড়ে মূল দুনিয়াকেই খারাপ ও মন্দ ভেবে বসে। তখন সে পরিবার-পরিজন বসতি ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এভাবে তারা মানুষের সমাজ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেউ কেউ তো জুমা ও জামাতও ছেড়ে দেয়। অল্পসল্প খাদ্য-খাবার গ্রহণ করে। সামান্য সবজি ফল-মূল। কেউ কেউ শুধু দুধের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকে। এতে মেজাজ শিথিল হয়ে যায়। কেউ-বা শুধু শিম বা ডাল খেতে থাকে। এতে শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তখন অনেক মৌলিক ইবাদতও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই কি ইবাদত ও তার পদ্ধতি?

বরং নিয়ম হলো, যে ব্যক্তি হজের ইচ্ছা করছে, তার প্রথম কর্তব্য হবে তার বাহনের ব্যবস্থা করা। দেখো না, তুর্কিরা নিজের খাদ্য-খাবারের আগে তার বাহনের খাদ্য-খাবারে কথা চিন্তা করে?

কখনো কখনো বক্তারা পূর্ববর্তী সালাফ ও জাহেদদের এমন কিছু বিষয় বর্ণনা করে, যেগুলো অনুসরণ করতে গিয়ে ভক্ত-মুরিদরা ভীষণ সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু আমি যখন এগুলো উল্লেখ করে এর ভুলগুলো ধরিয়ে দিই, তখন জাহেল ও মূর্খ ব্যক্তিরা চিৎকার করতে থাকে—তুমি দুনিয়াবিমুখ জাহেদ ব্যক্তিদের নিন্দা-মন্দ করছ কেন? তুমি কে?

এসব ক্ষেত্রে আসলে মূল উৎস কোরআন ও হাদিসের কথা অনুসরণ করা উচিত। অন্তরের মধ্যে যাদের সম্মান ও মর্যাদার স্থান দিয়ে রাখা হয়েছে, শুধু তাদের কথার দিকে লক্ষ না করা উচিত।

সাধারণত আমরা বলে থাকি, ইমাম আবু হানিফা এটা বলেছেন... এরপর ইমাম শাফেয়ি এর বিরোধিতা করেছেন...ইত্যাদি। কিন্তু আসলে আমাদের মূল দলিলের অনুসরণ করা উচিত। ইমাম মারওয়াযি একবারের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, একদিন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বিয়ের প্রশংসা করলেন। তখন আমি তার সামনে বলে উঠলাম, ইবরাহিম ইবনে আদহাম বলেছেন...। এতটুকু শোনার সাথে সাথে তিনি গলা চড়িয়ে তেজের সাথে বলে উঠলেন, আমরা তো নিজেদের নির্মিত খানাখন্দরবিশিষ্ট পথের মধ্যে পতিত হয়ে পড়েছি। আমাদের উচিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবিদের অনুসরণ করা।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. হারেস মুহাসিবির সমালোচনা করেছেন এবং সারি সাকাতির বিরোধিতা করেছেন যখন তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন, আল্লাহ যখন আরবি হরফগুলোকে সৃষ্টি করলেন, সে সময় আলিফ (ا) দাঁড়িয়ে থাকল এবং ইয়া (ي) তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল।' এ কথা শুনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. তার বিরোধিতা করে বললেন, মানুষজনকে তার নিকট থেকে সরিয়ে দিন। এগুলোর কী ভিত্তি আছে? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পক্ষপাত করা থেকে মুক্ত। বরং একেকটি হরফ একেক রকম হওয়া তার ভাগ্য। একটি স্বাভাবিক কাজ।

এভাবে আমি অনেক মানুষকে শরিয়ত থেকে বিচ্যুত হতে দেখেছি। কোনো পির বা জাহেদের কথাই যেন তাদের নিকট শরিয়ত হয়ে বসেছে। কী ভয়ংকর অবস্থা!

বলা হয়, আবু তালেব আল-মাক্কি—যিনি সালাফদের অন্তর্ভুক্ত, তিনি তার প্রতিদিনের খাদ্য একটি ছোট পাত্রে মেপে নিতেন এবং প্রতিদিন একটু একটু করে তার থেকেও কমাতেন!

এগুলো এমন বিষয় যা কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ শিখিয়ে যাননি। হ্যাঁ, এটা ঠিক, তারা অতিরিক্ত পেট পূরণ করে খেতেন না। পরিমাণমতো খেতেন। আর না থাকলে ধৈর্যধারণ করতেন।

কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে ক্ষুধার্ত রাখা—এটা অবৈধ কাজ। নাজায়েয কাজ।

দাউদ আত-তায়ি হজরত সুফিয়ান সাওরি রহ.-কে বলতেন, আপনি যেহেতু ঠান্ডা পানি পান করেন, তবে আর কীভাবে বলতে পারেন যে, আপনি মৃত্যুকে ভালোবাসেন?

আর দাউদ আত-তায়ি নিজের পানি মাটির মধ্যে রেখে গরম করে খেতেন। এর দ্বারা বোঝাতে চাইতেন—তিনি দুনিয়ার আস্বাদন থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন।

আমার কথা হলো, তিনি কি জানতেন না নিজের নফসের একটা হক রয়েছে? এভাবে অব্যাহত গরম পানি পান করা (বিশেষ করে উষ্ণ অঞ্চলে) পাকস্থলীকে থলথলে করে দেয় এবং এটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পানি ঠান্ডা করা হতো। তিনি ঠান্ডা পানি পান করেছেন।

আরেক মূর্খ জাহেদের কথা ছিল এমন—দীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ আমার ভুনা গোশত খেতে ইচ্ছা জেগেছে, কিন্তু আমি প্রবল দৃঢ়তার সাথে সেই ইচ্ছাকে দমন করে রেখেছি।

আরেক জন বলেন, দীর্ঘদিন আমার নফস মধু দিয়ে মাখিয়ে রুটি খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিল, আমি তা থেকে বিরত থেকেছি।

আচ্ছা, বলো, এটা কি শরিয়ত নাকি শরিয়তের চাহিদা? কোনোটাই নয়। তা ছাড়া, তুমি কি মনে করো, এর দ্বারা তারা উদ্দেশ্য নিয়েছে যে, তাদের পাকস্থলী থেকে ততদিনে যা বের হয়েছে, সে খাদ্যের মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। সবই ছিল সন্দেহমুক্ত খাদ্য? কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ এটার দিকেই লক্ষ রাখতেন। তাকওয়া সকল সময়ই প্রশংসিত ও ভালো কাজ—কিন্তু অনর্থকভাবে নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলা তো ভালো কাজ নয়; বৈধও নয়।

এই যেমন বিশর হাফি রহ.। তিনি বলতেন, আমি কথা বলি না। কারণ, আমার নফস কথা বলতে চায়।

এ ধরনের পথ বিশুদ্ধ পথ নয়। কারণ, মানুষকে তো বিয়েরও আদেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ বিয়ে নফসের খুবই কাঙ্ক্ষিত একটি বিষয়।

হয়তো এ কারণেই বিশর হাফির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, আল হাফি– খালি পা, তিনি যদি তার বিষয়টি দু স্যান্ডেল দ্বারা ঢেকে রাখতেন, তবে সেটাই অধিক ভালো হতো। একজনের খালি পাও দৃষ্টিকে কষ্ট দেয়। এটাতে সওয়াবের কিছু নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজেরও দুটি জুতা ছিল। কিন্তু তাঁর এবং তাঁর সাহাবিদের জীবনপদ্ধতির ওপর তো আজকের জাহেদরা নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসতেন, মজাও করতেন, সুন্দর জিনিস পছন্দ করতেন, হজরত আয়েশা রা.-এর সাথে নির্জন প্রান্তরে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। তিনি গোশত খেতেন। মিষ্টান্ন ভালোবাসতেন। তার জন্য শরবত করা হতো।

এ ধরনের জীবনপদ্ধতির ওপর ছিলেন সাহাবায়ে কেরামও। কিন্তু এরপর 'জাহেদগণ' তাদের জীবনযাপনের এমন অস্বাভাবিক সব পদ্ধতি প্রকাশ করতে শুরু করলেন, তা যেন নতুন শরিয়ত। এর কোনোটিই সঠিক ও বিশুদ্ধ নয়। তারা এ ব্যাপারে প্রমাণ প্রদান করে হারেস মুহাসিবি ও আবু তালেব মাক্কির কথা দিয়ে। কিন্তু তাদের কেউ তো কোনো সাহাবি, তাবেয়ি এবং ইসলামের কোনো ইমামের কথা দিয়ে দলিল দেয় না।

এসকল জাহেদরা যদি কোনো আলেমকে সুন্দর জামা পরিধান করতে দেখে কিংবা কোনো রূপসী নারীকে বিয়ের কথা শোনে অথবা যে আলেম দিবসে খাওয়া-দাওয়া করে এবং কখনো হাসে, তখনই তারা এদের নিন্দামন্দ করতে থাকে।

তাই তাদের অনেকের ইচ্ছা ভালো থাকা সত্ত্বেও ইলমের স্বল্পতার কারণে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে। তাদের কেউ কেউ এমন কথাও শুনিয়েছে যে, দীর্ঘ ৮০ বছর আমি পিঠ লাগিয়ে ঘুমাইনি! কেউ বলে, আমি শপথ করেছি, একবছর আমি পানি পান করব না!

কী আজগুবি সব কথা! অথচ এগুলোকেই তারা সওয়াব ও শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যম মনে করছে! এর চেয়ে বড় মূর্খতা আর কী আছে!

আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি, তারা সঠিক পথে নেই। নিশ্চয় মানুষের নফস ও শরীরের হক রয়েছে।

আরও কিছু ব্যক্তি রয়েছে, যাদের উদ্দেশ্যই সঠিক নয়। লোক দেখানো মুনাফেকিতে লিপ্ত। দুনিয়া অন্বেষণের জন্য এবং সাধারণ ব্যক্তির থেকে সম্মান ও সমীহ প্রাপ্তির জন্য দুনিয়াবিমুখতার ভান ধরে। এদের নিয়ে আমার কোনো কথা নেই। এরা তো জেনেশুনেই ভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত। এবং আজকের দিনে অধিকাংশ সুফির অবস্থাই এমন। বিচিত্র পোশাক পরিধান করে– যাতে মানুষ তাদের দুনিয়ার সাজসজ্জা বর্জনকারী হিসেবে ভাবে। ভালো কোনো জামা রাখে না। পূর্ববর্তী দরবেশ ফকিরদের আকার ধারণ করে। অথচ বাস্তবে তারা লিপ্ত রয়েছে দুনিয়ার সম্পদ আস্বাদন, সন্দেহযুক্ত সম্পদ গ্রহণ, অলসতা, খেলতামাশা এবং সুলতান-বাদশাহদের দরবারে যাতায়াতের মধ্যে।

এসকল মানুষ অল্পে তুষ্টির সীমা অতিক্রম করেছে, প্রথম যুগের ব্যক্তিদের দুনিয়াবিমুখতা থেকে বহুদূরে সরে গেছে। এরপর আমি তাদের ব্যাপারে বেশি আশ্চর্যবোধ করি, যারা এদের পেছনে এখনো সওয়াবের কথা ভেবে দান-সদকা করে।

পুনর্জীবনের প্রমাণ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষজাতির বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে এমন কিছু দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন, যার মাধ্যমে মানুষের উপদেশ গ্রহণ করা সহজ হয়ে গেছে। যেমন, চাঁদের বিভিন্ন অবস্থার উদাহরণ। এটি খুবই সূক্ষ্ম ও চিকন হয়ে শুরু হয়। ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে। চৌদ্দ তারিখে এসে একেবারে সম্পূর্ণতা অর্জন করে। এরপর আবার ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে এবং এক সময় আরও সূক্ষ্ম ও চিকন হয়ে সম্পূর্ণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিংবা কখনো হঠাৎই তার ওপর ধ্বংসশীলতা এসে পড়ে। যেমন, চন্দ্রগ্রহণের সময়।

মানুষের অবস্থাও ঠিক এমন। তার সূচনা হলো সামান্য এক ফোঁটা বীর্য দিয়ে। এরপর ধীরে ধীরে বড় ও উন্নত হতে থাকে। শক্তি ও সামর্থ্য বাড়তে থাকে। এরপর যখন একসময় পূর্ণিমার চাঁদের মতো তারও সম্পূর্ণতা এসে যায়, তখন তারও ক্ষয় শুরু হতে থাকে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা এসে গ্রাস করে। একসময় পুরোটাই ক্ষয়ে যায়। কিংবা কখনো চন্দ্রগ্রহণের মতো কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় হঠাৎ করেই জীবন প্রদীপ নিভে যায়।

জনৈক কবি বলেন,

والمرء مثل هلال عند طلعته ... يبدو ضئيلاً لطيفاً ثم يتسق

يزداد حتى إذا ما تم أعقبه ... كر الجديدين نقصاً ثم ينمحق

> মানুষ হলো চাঁদের মতো। সূচনাতে খুবই সূক্ষ্ম ও চিকন হয়ে বেড়ে ওঠে। এরপর হয় বড় ও পরিব্যাপ্ত।
>
> ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে তার পরিধি। এরপর অনিবার্য পুনরাবৃত্তিতে আবার হয়ে আসে ক্ষীণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত।

মানুষের অবস্থার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো রেশম পোকা। পোকাটি দীর্ঘদিন স্বাভাবিকভাবে জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকে। এরপর যখন তার খাদ্যের লতা-গুল্ম অর্থাৎ তুঁত গাছের পাতা ধরে। পাতা যখন নাদুসনুদুস সবুজ হয়ে ওঠে, এর মাঝে তার নতুন জীবন শুরু করে। শিশুর মতো সেখানে সে একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থায় রুপান্তরিত হতে থাকে। কিন্তু

পরিণামের কথা চিন্তা না করে অলস শুয়ে থাকে। এরপর যখন জাগ্রত হয়, সবুজ পাতার লোভে সেখানেই বসে খেতে থাকে। যেমন কোনো লোভী মানুষ দুনিয়া অর্জনের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। এরপর সে নিজেকে সেই আবদ্ধ পঙ্কিলতার মধ্যে আবদ্ধ করে নেয়, যেমন মানুষ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে নিজের চারপাশ পঙ্কিলতায় ভরিয়ে তোলে। এরপর সেই পোকা নিজের ছোট কুঠুরির মধ্যে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকে, যেমন মানুষ তার কবরের মধ্যে। এরপর কোনো রেশম আহরণকারী হয়তো এই মৃত কুঠুরি থেকে এক নতুন সৃষ্টির আবির্ভাব ঘটায়—যেমন কবর থেকে মানুষের পুনরুত্থান ও নতুন জীবনের উদ্ভব ঘটে।

এরপর আরেকটি প্রমাণ এভাবে হয় যে, বীর্য থাকে একটি মৃত জিনিসের মতো। এরপর তা থেকে একটি পূর্ণ সম্পূর্ণ মানুষের উদ্ভাব ঘটে। তেমনি এক বীজদানা বহুদিন মাটির অন্ধকারে মৃতের মতো পড়ে থাকে। নিজের অস্তিত্ব পচে গলে বিনষ্ট হয়ে পড়ে। এরপর এখান থেকেই অঙ্কুরিত হয় নরম সবুজ ছোট পাতা, যা পরবর্তীতে হয়ে ওঠে আরও সবুজ আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক—কখনো মহীরূহ।

মানুষের দুনিয়া ও পরকালের জীবনের উদাহরণও এমনই!

আহা, এমন কত উদাহরণই তো আমাদের চারপাশে বিদ্যমান। দরকার শুধু একটু শিক্ষা নেওয়ার। যেমন বলা হয়—

إذا المرء كانت له فكرة ... ففي كل شيء له عبرة

যে মানুষের বোধ ও চিন্তা আছে, সব বিষয়েই তার শিক্ষা নেবার উপকরণ আছে।

সাময়িক সুখের পথে

আকল বা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই হলো পরিণামের প্রতি চিন্তা করতে পারা। কিন্তু যার আকল বা বুদ্ধি কম, সে তো সাময়িক ও তাৎক্ষণিক সুখ ও আনন্দ নিয়েই মেতে থাকে। স্থায়ী পরিণামের দিকে লক্ষ করে না। এ কারণে একজন চোর শুধু সম্পদের দিকে তার নজর রাখে; কিন্তু এর পরিণাম অসম্মান ও হাত কাটার দিকে তার নজর থাকে না। একজন অলস অকর্মণ্য ব্যক্তি তার উপস্থিত বিলাস ও বিশ্রামের মধ্যেই মজে থাকে; কিন্তু এর পরিণামে যে সে ইলম ও সম্পদ অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়—সে দিকে লক্ষ করে না।

এ কারণে যখন তার বয়স বেড়ে যায়, কোনো ইলম ও জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে পারে না। নিজের যখন কোনো টাকা-সম্পদের দরকার হয়, অন্যের নিকট চাইতে হয় এবং নিজেকে অপমানিত করতে হয়।

জীবনের একটি সময়ে যতটুকু সে বিশ্রাম আরাম ও আয়েশে কাটিয়েছে, পরিশেষে তাকে তার চেয়ে বহুগুণ আফসোস, অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটাতে হয়।

তাছাড়া দুনিয়াতে আমল না করার কারণে আখেরাতের পুরস্কার প্রতিদান থেকেও তাকে বঞ্চিত হতে হবে।

মদ পানকারীর অবস্থাও তা-ই; তার যেন কোনো দূরদর্শিতা নেই। সাময়িক আনন্দ ও স্ফূর্তি সে অর্জন করে, উপভোগ করে। কিন্তু পরিণামে দুনিয়া ও আখেরাতের যেই ভয়াবহ ক্ষতি ও শাস্তি তার ওপর নেমে আসে, তার কথা যেন সে ভুলেই যায়।

জিনা-ব্যভিচারের বিষয়টাও এমন। ব্যক্তি তাৎক্ষণিক উত্তেজনা ও কামনা চরিতার্থ করে। কিন্তু পরিণামে যেই লাঞ্ছনা ও শাস্তি রয়েছে তার কথা স্মরণ করে না। আর যদি নারীটির স্বামী থাকে আর জিনার কারণে গর্ভধারণ হয়। তবে তো এই জিনার ফসল অব্যাহত চলতেই থাকবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর মাধ্যমে অন্য বিষয়গুলোও বুঝে নাও। পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হও। এমন তাৎক্ষণিক কোনো আনন্দ-স্ফূর্তিকে প্রাধান্য দিয়ো না, যার কারণে অনেক কল্যাণ ও ভালোত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করো—নিশ্চয় পরিণামে প্রভূত কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে।

আত্মার সুখ

দুনিয়াতে আলেম ও জাহেদ ছাড়া মনের প্রকৃত সুখ কেউ উপভোগ করতে পারে না। হ্যাঁ, কখনো কখনো তাদের পূতপবিত্র স্বচ্ছ অবস্থাও মধ্যে পঙ্কিলতা এসে ভর করতে চায়।

কারণ হলো, আলেম তার ইলম অর্জন করা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। উপার্জনের তেমন একটা সময় সুযোগ পায় না। এ অবস্থায় তার যদি পরিবার-পরিজন থাকে, তবে তো তার সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। তখন তাকে বাধ্য হয়েই শাসক বা সুলতানের দরবারে ধরনা দিতে হয়। এতে করেই তার অবস্থা ও অবস্থানের ভীষণ ক্ষতি হয়।

জাহেদ ব্যক্তির অবস্থাও ঠিক এমনই।

এ কারণে আলেম এবং আবেদ ব্যক্তিদেরও জীবিকা অর্জনের জন্য কিছু কিছু কাজে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যেমন, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো অনুলিপি তৈরি করা, লেখালেখি করা কিংবা পাটি বানানো।[১০৪] তার যদি এতে সামান্য উপার্জনও হয়, তবে সে এটার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। এভাবে যদি সে চলতে পারে, তাহলে আর কোনো মানুষ তাকে 'গোলাম' বানিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

যেমন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. খুবই সামান্য উপার্জনের ওপর জীবন অতিবাহিত করতেন। কখনো মাত্র একটি দিনারে তার মাস চলে যেত।

কিন্তু কোনো আলেম যদি এমন অল্পেতুষ্টি অর্জন না করে, তবে শাসকবর্গ ও সাধারণ ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা তার দ্বীন-ধর্মকে বিনষ্ট করে দেবে।

স্বভাবগতভাবেই কিছু মানুষ একটু আরাম-আয়েশে থাকতে ভালোবাসে। ভালো থাকা, ভালো খাওয়া। কঠিন ও কঠোর জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত নয়। এগুলো তাদের শরীর সইতে পারে না। এমতাবস্থায় তাদের আগে থেকেই

---

[১০৪]. এখানে লেখক সে যুগের অবস্থা নিয়ে বলেছেন। আল্লাহর শোকর, আমাদের এযুগে কর্মের পরিধি আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছে। আলেমগণ যদি পরিশ্রমের মানসিকতা নিয়ে এগুলোর সাথে যুক্ত হন, তাহলে তাদের নিজের, দ্বীনের এবং দেশ ও মানুষের অনেক উপকার হয়। হ্যাঁ, তবে নিজের অবস্থা ও অবস্থানের সাথে মানানসই কোনো কর্মের সাথে যুক্ত হওয়াটাই অধিকতর কল্যাণকর– অনুবাদক।

যদি আর্থিক সংগতি না থাকে, তবে তো তাদের জন্য দ্বীন-ধর্ম রক্ষা করা খুবই মুশকিল। স্বল্প উপার্জনে দুনিয়ার আস্বাদনের সাথে সাথে কীভাবে সে তার দ্বীনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে?

কিন্তু কোনো আলেম বা জাহেদ যদি অল্পেতুষ্ট হয়, তবে তারা কিছুতেই নিজেদেরকে শাসকবর্গের জন্য বিলিয়ে দেবে না। তারাও তাদেরকে যখন-তখন নিজেদের দরবারে ডেকে নিতে পারবে না। এবং জাহেদকেও তখন আর লৌকিকতার আশ্রয় নিতে হবে না।

সুখের জীবন তো সেই স্বাধীন ব্যক্তির, যার মাথা নত হয় না কোনো মানুষের কাছে এবং তার কাছেও নত হয় না কোনো মাথা। এটাই হলো একজন আদর্শ মুসলিমের দৃষ্টান্ত।

দুনিয়ার অধিকাংশ স্ফূর্তিই কদর্যতা দ্বারা মণ্ডিত

যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিষয়ে চিন্তা করে, সে জানে—দুনিয়াতে প্রকৃত সুখ ও আস্বাদন অর্জন করা সম্ভব নয়। আর যদি কোথাও কোনো কিছুতে আস্বাদন অর্জিত হয়, তবে তার পেছনে এত বেশি কদর্যতা নিহিত থাকে যে—পরিণামে আস্বাদনের চেয়ে বহুগুণ কষ্ট ও বেদনাই তাকে পেতে হয়।

যেমন, কেউ যদি দুনিয়ার আস্বাদন কোনো সুন্দরী নারীর মাধ্যমে পেতে চায়, সেখানেও অনেক সমস্যা। অনেক সময় সুন্দরী নারীগণ কঠোর ও অহংকারী স্বভাবের হয়। তাদের সাথে জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। হয়তো স্বামীকে ভালোবাসে না। আর এই ব্যাপারটি যখন স্বামী বুঝবে, তখন তার জীবন বিস্বাদ হয়ে উঠবেই।

নারী কখনো প্রতারণা ও খেয়ানতও করে। তখন তো জীবনই ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হবে। আর যদি সকল উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি ঘটে, তখন তো হারানো বিষয়ের স্মরণ কষ্টকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

কখনো পুত্র-কন্যার মাধ্যমেও মানুষ সুখ খুঁজতে চায়। এখানেও বিভিন্ন সমস্যা। সন্তান যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, জান-প্রাণ উড়ে যেতে চায়। অস্থির হয়ে ওঠে মন। আর যদি সেটা দুরারোগ্য ধরনের কোনো ব্যাধি হয় কিংবা আর না-ই সারে, তখন তো শোক, আফসোস ও অনুতাপে জীবন আনন্দহীন

হয়ে ওঠে। আর যদি অবাধ্য অনাচারী হয়, তখন আরেক বিপদ। এছাড়াও বিয়ের পর কী হয়—সেটা আরেক চিন্তা। কন্যার স্বামী যদি তাকে কষ্ট দেয়—জীবন আবার কষ্টকর হয়ে ওঠে। কিংবা সন্তান যদি বিবাহের পর বেয়াড়া হয়ে পড়ে, তখনও চিন্তার বিষয়। কন্যার দূরে চলে যাওয়া, পুত্রের দূরে সরে পড়া—সবই কষ্টকর। আর যদি কোনো উদ্দেশ্যই পূরণ না হয়—তখন তো বাকি জীবনটাই আফসোসের মধ্যে কাটাতে হয়।

আর কোনো পাপাচারী ব্যক্তি যদি শ্মশ্রুহীন কোনো বালকের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, তবে তো দুনিয়ায় তার মান-সম্মান নষ্ট হয়ে যায় আর দ্বীনদারি তো পুরোটাই ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে।

কত মানুষ সামান্য সময়ের উত্তেজনা ও কামনার বশে এমন কর্ম করে বসে, পরিণামে জীবনভর সেই কলঙ্ক ও ক্ষতি বয়ে বেড়াতে হয়। কখনো-বা কারও ওপর উত্তেজনা প্রবল হওয়ার কারণে কৃষ্ণাঙ্গ দাসীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করে বসে, ফলে তার গর্ভ থেকে কৃষ্ণ বর্ণের সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরিণামে এটা তার জন্য আজীবনের লজ্জার কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কেউ যদি সম্পদের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, তখন দেখা যায়, তার এই অর্জনের মধ্যে গোনাহের মিশ্রণ এসে গেছে। আবার সম্পদ যদি বিনষ্ট হয়ে পড়ে, তখনও আফসোস ও কষ্টের সীমা থাকে না। এভাবে জীবনটাই অতিবাহিত হয়ে যায় একটি প্রতারণা এবং সুখে থাকার অলীক কল্পনার মধ্যে।

মানুষের জীবনে আরও ভয়াবহ যত ক্ষতি ঘটে, আমি এখানে তার অল্পকিছু নমুনা উপস্থাপন করলাম। নতুবা পাপমিশ্রিত দুনিয়ার জীবনে বাস্তব ভয়াবহতা আরও অনেক করুণ ও অসংখ্য।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যাকে সক্ষমতা দিয়েছেন, সে যেন নিজের জীবনের আবশ্যক বিষয়াবলির ওপরই সন্তুষ্ট থাকে। এতে করে সে তার নিজের শরীর সম্মান ও দ্বীন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে। ভালো ও সুন্দর থাকবে। আর সেই প্রবৃত্তি ও কামনাগুলো বর্জন করবে, যেগুলোতে লিপ্ত হওয়ার পরিণামে আরও বহুগুণ কষ্ট ও শাস্তি আবশ্যক হয়ে পড়ে।

বরং যে ব্যক্তি পরিণামের কথা ভেবে সাময়িক কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করে এবং তাৎক্ষণিক স্ফূর্তি থেকে বিরত থাকে, প্রতিফলে সে ব্যক্তি আরও বহুগুণ বেশি এবং স্থায়ী আনন্দ অর্জন করতে সক্ষম হয়। যেমন ছাত্রদের কথা—তারা যদি অল্প কিছুদিনের জন্য জান-প্রাণ পরিশ্রম করে, তবে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে পারে। উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আর এই অল্প সময়গুলো যদি অবহেলা ও অলসতায় কাটিয়ে দেয়, তবে ইলম ও আমলহীন হয়ে পড়ে। বাকি জীবনে আফসোস অনুশোচনা ও লাঞ্ছনা তাদের নিত্য সঙ্গী হয়। ছাত্রজীবনের সেই স্বল্প বিলাসের বহুগুণ বেশি কষ্ট ও বেদনার মধ্যে তাকে আপতিত হতে হয়।

আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, তাৎক্ষণিক কামনা উত্তেজনা যেন তোমার উপর বিজয়ী হতে না পারে। আর প্রবৃত্তি যদি বলে, ঠিক আছে এখন করো, পরে তাওবা করে নিলেই হবে, তবে খুব জোরের সাথে তুমি তাকে প্রতিরোধ করে দাঁড়াও। তাকে অতি আসন্ন শাস্তি ও পরিণামের ভয় দেখিয়ে এই সাময়িক আস্বাদন থেকে বিরত রাখো।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। অন্যরা হেলায়-খেলায় হারিয়ে ফেলে। এর পরিণাম হয় অতি ভয়াবহ!

কোরআন ও সুন্নাহ হেদায়েতের মূল

আমি ভেবে দেখেছি, মানুষের ওপর ইবলিস বিভিন্ন কৌশলে তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। সে অধিকাংশ মানুষকে ইলম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে–অথচ ইলমই হলো মানবজীবনের আলো। এছাড়া তার জীবন অন্ধকার। তাই ইবলিস অনেক সুফি ও সাধককে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সে কারণে তারা নিজেদের ইন্দ্রিয়শক্তির নিয়ন্ত্রণে বন্দি হয়ে পড়ে। আকল ও যুক্তির কোনো ধার ধারে না। এরপর তাদের কারও যখন জীবনে দারিদ্র্য চেপে বসে, সবকিছু বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন সে হতাশ হয়ে পড়ে; এমনকি কেউ কেউ কুফরের দিকে ধাবিত হয়।

তখন কেউ কেউ যুগকেই দোষারোপ করতে থাকে, কেউ গালি দেয় দুনিয়াকেই। এটা একটা নিকৃষ্টতম পদ্ধতি। কারণ, যুগ বা দুনিয়া এগুলো

সংঘটিত করে না। এর মাধ্যমে মূলত স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার দোষ ধরা হয়। নাউজুবিল্লাহ!

তাদের কেউ কেউ বিরূপ চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর হিকমতকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন সে বলতে থাকে, এত সুন্দর জগৎ গঠনের পর তা ধ্বংস করার মধ্যে কী কল্যাণ? শুধুই অনর্থক এক কাজ! আবার কেউ কেউ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকেই অসম্ভব মনে করে। পুনর্জীবনকে অস্বীকার করে। এবং যুক্তি দেখিয়ে বলে, এ পর্যন্ত সেখান থেকে কেউ তো ফিরে এসে এটা প্রমাণ করছে না!

কিন্তু তারা কেন ভুলে যায়, দুনিয়া থেকে সকল মানুষের এখনো তো অন্তর্ধান হয়নি। এর আগেই যদি জীবিত মানুষ পুনর্জীবন দেখে ফেলে, তবে আর অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা সম্ভব হবে না—তখন আর এটা 'অদৃশ্য' বলে গণ্য হবে না। চাক্ষুষ পুনর্জীবন দিয়ে পুনর্জীবনের ওপর প্রমাণ চাওয়া তাই একটি বড় ধরনের বোকামি এবং অযৌক্তিক প্রস্তাব।

এরপর ইবলিস যখন মুসলমানদের অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখে, তাদের মধ্যে অনেকেই আছে অনেক মেধাবী। তখন সে তাদের মনের মধ্যে উদয় করে, দেখো, শরিয়তের বাহ্যিক বিষয়াবলি এতটাই সহজ ও সরল বিষয় যে অনেক সাধারণ মানুষও সেগুলো জানে ও বোঝে। সুতরাং তাদের থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য, পণ্ডিত ও অনন্য হওয়ার জন্য দর্শন ও কালামশাস্ত্র অধ্যয়ন করা দরকার। তখন তারা অ্যারিস্টটল, জালিয়ানুস, পীথাগোরাস এবং বিভিন্ন পণ্ডিতদের কথাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু এরা তো আমাদের শরিয়তের অনুসারী ছিল না। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান্যকারী ছিল না। বরং তারা তাদের মত ও মতবাদগুলো ছড়িয়েছে নিজেদের আকল মেধা যুক্তি ও মন দ্বারা যতটুকু বুঝেছে ও জেনেছে—সে অনুযায়ী। অনিবার্যভাবে এগুলোতে তারা অসংখ্য ভুলের শিকার হয়েছে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের অভ্যাস ছিল, তাদের কারও যখন কোনো সন্তান হতো, তাকে প্রথমে কোরআনের শিক্ষায় নিমগ্ন করে দিতেন। বিশেষকরে যদি পুত্র সন্তান হতো, তবে তাকে কোরআন ও হাদিস মুখস্থের কাজে লাগিয়ে দিতেন। এর মাধ্যমে তাদের অন্তরের মধ্যে ঈমান দৃঢ়ভাবে বসে যেত। কিন্তু

বর্তমানের মানুষ এগুলোর ক্ষেত্রে উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে। এ কারণে তার মেধাবী সন্তানটি প্রাচীন মানুষের দর্শন নিয়ে মেতে উঠছে। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস এই বলে পরিত্যাগ করছে যে, এগুলো তো মাত্র একজনের কথা; কোনো সম্মিলিত গবেষণালব্ধ বিষয় নয়। হাদিসবিশারদ ব্যক্তিকেও তাই তারা আর জ্ঞানী ও পণ্ডিতব্যক্তি বলে মান্য করে না। তারা এখন বিশ্বাস রাখে অতি সূক্ষ্ম দর্শন, প্রকৃতি বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, পদার্থ ও পরমাণু বিদ্যায়।

এরপর তারা স্রষ্টার গুণাবলির ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে থাকে। এগুলোর কোনোটিকে বাদ দেয়। কোনোটির সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে। আবার কখনো স্রষ্টার সাথে অনুচিত গুণাবলিও যুক্ত করে। এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে যে কথাগুলো আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলোকে পার্থিব ঘটনা ও যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে চায়।

যেমন মুতাযিলারা বলে,

إن الله لا يرى لأن المرئي يكون في جهة.

আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্ভব নয়। কারণ, দৃশ্য বিষয় তো কোনো একটি দিকে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা কোনো দিক থেকে মুক্ত।

অথচ এই কথাটি হাদিসের এই কথাটির সম্পূর্ণ বিপরীত। হাদিসে এসেছে—

إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته.

নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে [কিয়ামতের দিন], যেভাবে তোমরা আকাশের চাঁদ দেখো। চাঁদ দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হয় না। (সেদিনও তেমনই হবে।)[১০৫]

এভাবে তারা কোরআনের ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করেছে। তারা কোরআনের ক্ষেত্রে বলেছে, এটা মাখলুক বা সৃষ্ট এবং ধ্বংসশীল। এভাবে তারা মানুষের অন্তর থেকে তার সম্মান ও মর্যাদাই বিনষ্ট করে দিয়েছে।

---

[১০৫]. সুনানে তিরমিজি: ৯/২৪৭৭,পৃষ্ঠা: ১১১– মা. শামেলা। পুরো হাদিসটি এমন–
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَتُضَامُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর ক্ষেত্রে তারা বলেছে, এটা তো মাত্র একজন ব্যক্তির জীবনযাপন। একজন ব্যক্তির কথা ও মন্তব্য– এটা কোনো পরীক্ষিত সত্য নয়।

এমনই ভয়াবহ তাদের বিভ্রান্তিকর মতবাদ। তারা অ্যারিস্টটল, জালিয়ানুস ও অন্য দার্শনিকদের কথা নকল করে বেড়ায়। এগুলোকেই অকাট্য সত্য বলে মেনে চলে। দর্শনের ঘুপচি গলিতে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের নামাজ-রোজা ও ইসলামি শরিয়তের বিধান থেকে মুক্ত রাখে। এভাবে ধীরে ধীরে তাদের পা অগ্রসর হতে থাকে কুফরির দিকে।

এ কারণে আমাদের কিছু পূর্বসূরি দর্শন বা যুক্তিশাস্ত্রের চর্চা করা অপছন্দ করতেন। এমনকি ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেছেন,

> حكمي فيهم أن يركبوا على البغال ويشهروا ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بالكلام.
>
> যে সকল ব্যক্তি দর্শন বা কালামশাস্ত্র চর্চা করবে তাদের ক্ষেত্রে আমার মন্তব্য হলো, তাদেরকে গাধার পিঠে চড়িয়ে মানুষের মাঝে ঘুরানো হবে। এবং বলা হবে, যে ব্যক্তি কোরআন ও সুন্নাহ ছেড়ে 'কালামশাস্ত্র' নিয়ে মগ্ন থাকে, তার প্রতিফল এমনই হয়ে থাকে।

এমনকি এসকল দর্শনগামী ব্যক্তিদের অবস্থা এতটাই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে যে, তারা বিশ্বাস করে—যে ব্যক্তি যুক্তিশাস্ত্রের বিচারে 'তাওহিদ'-এর বিস্তারিত প্রমাণাদি জানে না, সে ব্যক্তি মুসলমানই নয়।

আল্লাহ আমাদের বিদআতের মিশ্রণ থেকে রক্ষা করুন। তোমরা বরং কোরআন ও সুন্নাহকেই ভালোভাবে আঁকড়ে ধরো—তবেই তোমরা সোজা ও সঠিক পথটি প্রাপ্ত হবে।

সময় যেন এক তরবারি

আমি দেখেছি—মানুষের অনেক নষ্ট অভ্যাস তার সময়গুলো বিনষ্ট করে দেয়। তারা এ ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপই করে না। অথচ আমাদের পূর্ববর্তীগণ এ ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন।

আমাদের এক পূর্বসূরির নিকট একবার কিছু লোক আগমন করে বলল, আমরা হয়তো আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে ফেললাম!

তিনি ভণিতা না করে বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমি একটি কিতাব পড়ছিলাম। আপনাদের আগমনের কারণে পড়া বন্ধ রাখতে হয়েছে।

একবার কিছুলোক হজরত মারুফ কারখির নিকট উপবিষ্ট ছিল। তারা দীর্ঘক্ষণ এভাবে বসেই থাকল। অবশেষে তিনি বললেন, সূর্যের মালিক তো আর সূর্যকে চালানোর ব্যাপারে কমতি করবেন না। তবুও আপনারা উঠছেন না কেন? আর কতক্ষণ অনর্থক বসে থাকবেন?

সময়ের মূল্যায়নের ব্যাপারে আমের ইবনে কায়েস রহ.-এর প্রসিদ্ধি ছিল প্রবাদতুল্য। একবার একলোক তাকে বলল, একটু দাঁড়ান। আপনার সাথে কিছু গল্প করতে চাই।

তিনি তাকে বললেন, তবে তুমি সূর্যকে দাঁড় করিয়ে রাখো। (যদি এটা পারো, তাহলে তোমার প্রস্তাবে রাজি আছি। নতুবা নই।)

হজরত উসমান আল বাকিল্লানি রহ. সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মগ্ন থাকতেন। তিনি বলেন, খাওয়ার সময়টা আমার নিকট সবচেয়ে কষ্টকর মনে হয়। যেন আমার প্রাণ বের হয়ে যেতে চায়। কারণ, খাওয়ার কারণে সেই সময়টুকু আল্লাহর জিকির থেকে বিরত থাকতে হয়।

আমাদের এক পূর্বসূরি তার সাথি-মুরিদদের বলতেন, তোমরা যখন আমার মজলিস থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে ফিরবে, তখন সকলে আলাদা আলাদা হয়ে যাবে। এতে হয়তো কেউ কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে যেতে পারবে। আর একসঙ্গে গেলে অনর্থক গল্পগুজব হবে।

জেনে রেখো, সময়ের একটি মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয়। সহিহভাবে বর্ণিত হয়েছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة.

যে ব্যক্তি একবার 'সুবহানাল্লাহিল আযিম ওয়া বিহামদিহি' বলে, বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপিত হয়ে যায়।[১০৬]

মানুষ জাতি এমন কত সময় অনর্থক অযথা বিনষ্ট করে; অথচ সে সময়ে কত সওয়াব ও পুরস্কার প্রাপ্তির কাজ করা যেত! মানুষের এই সময়গুলো শস্যক্ষেতের মতো। মানুষকে যেন ডেকে ডেকে বলা হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে তুমি যদি একটি বীজ বপন করো, তবে আমি তোমার জন্য হাজার শস্য নিয়ে হাজির হব।

এমন ঘোষণার পরও কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য বীজ বপন না করা কিংবা এক্ষেত্রে অলসতা করা কোনোভাবেই উচিত নয়। আর সময়কে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে একটি সহায়ক পদ্ধতি হলো, যতদূর সম্ভব নির্জন নিরালায় নির্ঝঞ্ঝাট থাকার চেষ্টা করা। আর মানুষের সাথে শুধু সালাম ও খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংক্ষেপে আলাপ সেরে নেওয়া। এরপর একান্ত মনে নিজের কাজে নিমগ্ন থাকা। স্বল্প আহার করা। কারণ, বেশি আহার দীর্ঘ ঘুমের কারণ হয়। রাত্র বিনষ্ট করে।

এভাবে কেউ যদি আমাদের সালাফের জীবনাচারের দিকে লক্ষ রাখে এবং প্রতিফলের বিষয়ে বিশ্বাস রাখে, তাহলে আমি এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা করলাম এগুলো তার নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে।

---

[১০৬]. সুনানে তিরমিজি: ১১/৩৩৮৬, পৃষ্ঠা: ৩৬৭– মা. শামেলা।

বৈবাহিক জীবনের ভিত্তি হলো ভালোবাসা

বুদ্ধিমান মানুষের জন্য উচিত হবে, স্ত্রী হিসেবে কোনো ভদ্র পরিবার থেকে একজন সৎ নারীকে নির্বাচন করা। দরিদ্র হলেই ভালো, তাহলে স্বামীর ঘরে এসে যে বাড়তিটুকু প্রাপ্ত হবে, তাতেই সে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হবে। এবং কিছুটা সমবয়সী দেখে বিয়ে করাই উত্তম। কারণ, একজন বৃদ্ধ যদি কোনো কিশোরীকে বিয়ে করে, তাহলে হতে পারে, মেয়েটি পাপাচারে জড়িয়ে যাবে কিংবা তাকে হত্যা করে ফেলবে। অথবা এমনও হতে পারে যে, মেয়েটি তালাক চায়; কিন্তু লোকটি তাকে ভালোবাসে—ফলে এটা কষ্টকর একটা অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পুরুষকে অতিশয় ভালো আচরণ এবং অধিক খরচপাতি দিয়ে তার ত্রুটি ও কমতিগুলো পুষিয়ে দিতে হয়।

স্ত্রী খুব বেশি বেশি স্বামীর কোল ঘেঁষে থাকবে না। নতুবা উভয়ের মধ্যে বিরক্তিভাব চলে আসতে পারে। আবার খুব দূরে দূরেও থাকবে না। নতুবা স্বামী তাকে ভুলেই যাবে এবং তার দূরবর্তিতায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। স্ত্রী যখন স্বামীর নিকটবর্তী হবে, তখন সে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে আসবে। নিজের ঘ্রাণের ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখবে। আর সতর্ক থাকবে, স্বামী যেন তার লজ্জাস্থান না দেখে এবং সমস্ত শরীরও যেন না দেখে। কারণ, মানুষ যত সুন্দরই হোক, তার সমস্ত শরীর সমান সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়। কিছু অংশ ও স্থান না দেখাই ভালো। এতে মনের মধ্যে একটি বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হতে পারে।

আর ঠিক একইভাবে স্বামীর জন্যও এ বিষয়গুলো প্রযোজ্য। সে তার পুরো শরীর স্ত্রীকে দেখাবে না। নিজের ঘ্রাণ ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারেও যত্নবান হবে। বিশেষকরে নৈকট্যে আসার সময়। আর সহবাস করবে বিছানায়।

সম্রাট কিসরা একদিন জবাই করা পশু ছেলানো, গোশত বানানো এবং রান্নার প্রক্রিয়াগুলো দেখলেন। এগুলো তার মনের মধ্যে একটি বিরূপভাবের সৃষ্টি করল। এরপর থেকে গোশত খাওয়ার প্রতি তার রুচি উঠে গেল। একদিন তিনি তার উজিরকে বললেন, উজির মশাই, এ আমার কী হলো? গোশত খেতে রুচি হচ্ছে না!

উজির বললেন, খাবার শুধু খাবার টেবিলে দেখাই উচিত, আর নারীকে বিছানায়।

অর্থাৎ সকল জিনিসের কিছু অসৌন্দর্য থাকে। এগুলোকে এড়িয়ে তার মৌলিক উদ্দেশ্যটুকু অর্জন করাই শ্রেয়।

হজরত আয়েশা রা. বলেন, আমি কখনো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন অঙ্গ দেখিনি। তিনিও আমার থেকে দেখেননি। শুধু একরাতে ঘুমের মধ্যে তার বস্ত্র সরে যায়। এর আগে আর কখনো আমি তাঁর সম্পূর্ণ শরীর দেখিনি।[১০৭]

এগুলো চারিত্রিক ভব্যতার মৌলিক কিছু বিষয়। সুরুচিবান মানুষের কিছু চারিত্রিক সুষমা ও সৌন্দর্য। এভাবে চললে পুরুষ আর নারীর ত্রুটি ধরতে পারবে না। কারণ, সে তো তার ত্রুটিগুলো দেখতেই পায়নি। এছাড়াও স্বামী এবং স্ত্রীর জন্য আলাদা বিছানা হওয়া ভালো। তারা শুধু পূর্ণ পরিচ্ছন্নতা আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়েই একত্র হবে।

অনেক মানুষ এসকল বিষয়ে অবহেলা করে এবং এগুলোকে 'সামান্য বিষয়' বলে ধারণা করে। কিন্তু এর পরিণাম হয় অতি ভয়াবহ। অবস্থা হয়ে ওঠে নিরাময়ের অযোগ্য। তখন প্রায় দেখা যায়, স্ত্রী নিজ স্বামীকে দেখিয়ে বলছে, ইনি আমার সন্তানদের বাবা। অর্থাৎ তাকে নিজের করে ভাবতে পারছে না। আবার পুরুষের ক্ষেত্রেও এমন হয়। তখন আর কেউ কারও প্রতি কোনো আগ্রহ, আকর্ষণ ও আসক্তি রাখে না। অন্তর হয়ে পড়ে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। কাছাকাছি দুটি জীবন অতিবাহিত হতে থাকে—একেবারে আগ্রহ ও আকর্ষণহীন। প্রেম ও ভালোবাসাহীন।

বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের বিবাহিতদের ভাবা উচিত এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করা উচিত। এটি অনেক বড় একটি লক্ষণীয় বিষয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে জীবনের অনেক কিছু—কর্ম স্বস্তি শান্তি ও ভবিষ্যৎ।

---

[১০৭]. হুবহু এই শব্দে হাদিসটি কোনো সূত্রে পাওয়া যায়নি। তবে হজরত আয়েশা রা. থেকে 'মুসনাদে আহমদ'-এর বর্ণনাটি এমন- مارأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. । মুসনাদে আহমদ : ৫/২২৮৭, পৃষ্ঠা : ২৪২

নিজেকে লাঞ্ছিত করো না

অল্পেতুষ্ট না হলে দুনিয়াতে কারও পক্ষে সুখে বসবাস করা সম্ভব নয়। কারণ, যখনই অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসের প্রতি লোভ বৃদ্ধি পাবে, চিন্তা ও অস্থিরতাও বাড়তে থাকবে সমানতালে। অন্তর বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আরও অর্জন ও উপার্জনের প্রয়োজন হবে এবং এ কারণে অন্যরা তাকে দাসে পরিণত করে ছাড়বে।

আর যদি অল্পেতুষ্ট থাকা যায়, তখন আর নিজের চেয়ে ওপরের ব্যক্তির সাথে মেলামেশার প্রয়োজন পড়বে না। তাদের অধীনও হতে হবে না। আর যে ব্যক্তি তার সমপর্যায়ের, তার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করার কিছু নেই। কারণ, তার নিকট যা আছে, তার নিজের কাছেও তা-ই আছে।

কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অল্পেতুষ্ট থাকে না, অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসের জীবন অন্বেষণ করে, তারা তাদের দ্বীনকে তুচ্ছ করে ফেলে। নিজেদেরকেও অন্যের সামনে নত অবনত ও অপদস্থ করে তোলে।

বিশেষ করে আলেমদের ক্ষেত্রে—তারা যদি ঘন ঘন আমির ও ধনবানদের নিকট যাতায়াত করতে থাকে, তবে তারা তাদেরকে গোলাম বানিয়ে ছাড়বে। তারা সেখানে অনেক অপছন্দনীয় বিষয় দেখতে পাবে, কিন্তু নিষেধ করতে পারবে না। কখনো কোনো জালেমের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তার প্রশংসা করতেও বাধ্য হতে হবে...ইত্যাদি।

অর্থাৎ এসব করে তাদের থেকে যতটা পার্থিব বিষয় অর্জন করবে, তারচেয়ে বহুগুণ বেশি তাকে লাঞ্ছনায় পড়তে হবে—নিজের দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে পড়তে হয় বিচারক ও সাক্ষীদের। যদিও এককালে এ দুটি বিষয়ই ছিল সম্মান, মর্যাদা ও মহত্বের নিদর্শন। যেমন, কাজি আবদুল হামিদ ছিলেন এমন এক বিচারক—যিনি কখনো কোনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না। অন্যায় করতেন না। এখানে তার একটি উদাহরণ পেশ করছি—একবার তিনি খলিফা মুতাদিদের নিকট খবর পাঠালেন—আপনি কিছু সরকারি জমি ভাড়া নিয়েছিলেন, তার ভাড়া পরিশোধ করুন।'

খবর পেয়ে খলিফা ভাড়া পরিশোধ করলেন। এরপর খলিফা বিচারক আবদুল হামিদকে বললেন, 'অমুক ব্যক্তি মারা গিয়েছে, তার নিকট আমার কিছু অর্থ প্রাপ্য ছিল। আপনি এটি প্রদানের ব্যবস্থা করুন।'

বিচারক খলিফাকে বললেন, 'আপনি যখন আমাকে এই বিচারকের দায়িত্ব অর্পণ করেন, সেদিন বলেছিলেন, এই দায়িত্বটি আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে আপনার কাঁধে অর্পণ করলাম। অর্থাৎ আমাকে বিচারক হিসেবেই বিচার করতে হবে। আর সে হিসাবে আপনি একজন সাধারণ মানুষ। তাই আপনি যে সম্পদের দাবি করছেন, এক্ষেত্রে আপনার পক্ষে দু-জন সাক্ষী ব্যতীত আমি আপনার পক্ষে কিছু করতে সক্ষম নই।'

এই ছিল তখনকার বিচার ও বিচারকের সম্মান! সাক্ষীর বিষয়টিও ছিল এমন মর্যাদাকর। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—একবার এক খলিফার নিকট কিছু লোক এল। খাদেম বলল, তোমরা কি আমার মুনিবের পক্ষে এ বিষয়ে সাক্ষী হবে?

লোকগুলো খাদেমের কথা অনুযায়ী বিষয়টির ওপর খলিফার সাক্ষী হতে রাজি হলো। এ সময় হজরত মাজঝুয়ি আমিরের নিকট একান্তে এগিয়ে গিয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন, এই কাগজে যা লেখা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমি কি আপনার সাক্ষী হতে পারি?

খলিফা বললেন, অসুবিধা নেই। তুমি সাক্ষী থাকো।

মাজঝুয়ি বললেন, সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আপনার এভাবে বলাই যথেষ্ট নয়। বরং আপনি যতক্ষণ না নিজ মুখে 'হ্যাঁ' বলবেন, ততক্ষণ আমি সাক্ষী হব না।

খলিফা বললেন, হ্যাঁ। সাক্ষী হতে পারো।

এরপর হজরত মাজঝুয়ি খলিফার বিষয়ে সাক্ষী হলেন। এমনটাই ছিল তখন বিচার, বিচারক এবং সাক্ষ্য ও সাক্ষীর মর্যাদা ও মহত্ব।

কিন্তু আমাদের যুগে এসে সবই উল্টে গেছে। এমনকি মানুষ আজ ঘুষ দিয়েও সাক্ষী হতে চায়। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে দুনিয়া অর্জন করে। তুমি দেখবে, নিজেদের অদেখা ও অজানা বিষয়েও তারা সাক্ষ্য দেবার জন্য কেমন প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দেয়!

আবুল মায়ালি ইবনে শাফি আমাকে বলেছেন, আমাকে একবার একটি সাধারণ বন্দির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হয়। আল্লাহর নিকট এ জন্য আমি খুব ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহ মাফ করুন!

আমরা জানি, সাক্ষ্য প্রদানের কারণে সাক্ষীদের কোনো পারিশ্রমিক নেই। বরং সময়-অসময়ে তার দরজায় করাঘাত পড়ে এবং নিজের কাপড় টেনে নিজের সময় খরচ করে নিজেকেই সাক্ষ্য দিতে যেতে হয়। এটা কোনো সুখ ও লাভের বিষয় নয়। এ কারণে প্রবাদকথা আছে—আল্লাহ তোমাকে সাক্ষী হওয়ার নিয়ামত থেকে রক্ষা করুন!

একারণে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাক্ষী হওয়া এবং বিচারক হওয়ার বিড়ম্বনা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন।

যেমন, হজরত ইবরাহিম নাখঈ রহ. এর ক্ষেত্রে লোকেরা যখন বলতে লাগল, আপনিই হবেন আমাদের বিচারক, তখন তিনি লাল জামা গায়ে বাজারে যাওয়া-আসা করতে শুরু করলেন। দেখতে বেখাপ্পা লাগে। অবশেষে লোকেরাই আবার বলতে লাগল—'তিনি এ পদের যোগ্য নন।'

আরেকটি ঘটনা পাওয়া যায়—একবার খলিফা হারুনুর রশিদ একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। খলিফা তাকে বিচারকের দায়িত্ব দিতে চান। লোকটি খলিফার নিকট এসে সালাম দিয়ে বললেন, আপনি কেমন আছেন এবং আপনার সন্তান-সন্ততি কেমন আছে?...

লোকটির এমন বোকামিপূর্ণ কথা শুনে আশপাশের লোকেরা বলল—এ তো পাগল। ফলে তাকে বিচারকের পদ প্রদান করা থেকে বিরত রাখা হলো।

আল্লাহর কসম! তার এই পাগলামিই ছিল প্রাজ্ঞতা। বিচারকের পদ থেকে বিরত থাকার জন্য তার এই বোকামিই ছিল বুদ্ধিমত্তা।

কিন্তু আমাদের অবস্থা কী! আমার ধারণা, আখেরাতের প্রতি আমাদের ঈমান রয়েছে খুবই টলটলায়মান অবস্থায়। সামান্য ঝাঁকিতেই গড়িয়ে পড়ে পড়ে ভাব। তাই আমাদের খুবই সতর্ক থাকা দরকার। আল্লাহ আমাদের দ্বীনকে হিফাজত রাখেন। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

অনর্থক কাজ থেকে আল্লাহ চিরমুক্ত

এখন যে বিষয়টি এখানে উল্লেখ করতে চাই, এ ধরনের বিষয় এই কিতাবে এর আগেও গিয়েছে। তারপরও সেটা আবার উল্লেখ করছি। কারণ, এটা বারবার নফসের নিকট পুনরাবৃত্তি করা অতি জরুরি। নফস যেন এসকল বিষয়ে উদাসীন ও বেখেয়াল না হয়।

একজন মুমিন ব্যক্তির ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলেন আমাদের প্রতিপালক। তিনি সকল কিছু জানেন। তিনি প্রজ্ঞাময়; সুতরাং তিনি কোনো অনর্থক কাজ করেন না।

আমাদের এই জ্ঞানটুকু আমাদের তাকদির এবং ঘটিত কোনো বিষয়ে আপত্তি ও অভিযোগ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে। আর এই জ্ঞানটুকু না থাকার কারণে অনেক মানুষকে দেখা যায়, তারা আল্লাহ তাআলার হিকমত ও পরিচালনার ব্যাপারে সীমাহীন অভিযোগ ও আপত্তি করতে থাকে। দোষ-ত্রুটি খুঁজতে থাকে। সেগুলোর নিন্দামন্দ করে।

ঠিক এই ধরনের কাজ জগতের প্রথম যে করেছিল, তার নাম ইবলিস। ইবলিস শয়তান। সে আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা না করে বলেছিল,

﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

> আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে উজ্জ্বল আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর তাকে সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ মাটি দ্বারা।
>
> [সুরা আরাফ : ১২]

অর্থাৎ ইবলিস বলতে চেয়েছে—আপনার এভাবে আগুনের ওপর এই তুচ্ছ মাটিকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা যুক্তির কাজ নয়।

আমরা ফকিহদের দেখি, মাসআলা নিয়ে পারস্পরিক আলোচনায় সকল সময় এটা-ওটা নিয়ে অভিযোগ ও আপত্তি করতে থাকে। আর তারা এটা করে থাকে বাহ্যিক কাজ দেখে। হ্যাঁ, এভাবে অভিযোগ যখন আমাদের মতো মানুষের কোনো কাজের ক্ষেত্রে হয়, তখন তো ঠিক আছে; হতেই পারে। মানুষের ভুল হয়। তার অজ্ঞতার সীমা নেই। তার সীমাবদ্ধতারও শেষ নেই।

কিন্তু এই মূর্খতা, অজ্ঞতা এবং সীমাবদ্ধ বোধ, বুঝ ও সক্ষমতা নিয়ে যদি কেউ জগতের স্রষ্টার হিকমতের বিচার করতে বের হয়, তখন বিষয়টা কেমন হয়ে দাঁড়ায়! তাদের অভিযোগ ও আপত্তিটা হয়ে পড়ে পাগলের মতো, নাদানের মতো।

আর যারা ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা তাড়িত, তারাও বিভিন্ন অভিযোগ-আপত্তি করতে থাকে। কারণ, তারা চায়, জগতের সকল জিনিস তাদের চাহিদা ও কামনা অনুযায়ী পরিচালিত হোক। কিন্তু যখনই এর বিপরীত হয়, তখনই তারা অভিযোগ ও আপত্তি করতে থাকে। অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে থাকে।

আবার কেউ কেউ আছে, যারা মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে। তারা অভিযোগ করে বলে, তিনি সৃষ্টি করলেন আবার বিনষ্ট করছেন—এটা কী হলো? জীবন দান করেই আবার যেন এই আচমকা অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু! কত ক্ষুদ্র জীবন! এই এত স্বল্প সময়ের মধ্যে কতটুকুই-বা অর্জন করা যায়! কতটুকুই-বা ভোগ ও আস্বাদন করা যায়!!

আমাদের এক বন্ধু ছিল। কোরআন পড়েছে। বিভিন্ন কিরাআতে চমৎকার পারদর্শিতা অর্জন করেছে এবং বহু হাদিস সে শ্রবণ করেছে এবং সংরক্ষণ করেছে। কিন্তু এরপরও সে পরবর্তী জীবনে গোনাহের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। ৭০ বছর বেঁচে ছিল। এরপর একদিন যখন মৃত্যুর সময় উপনীত হলো, আমাকে একজন শুনিয়েছে, তখন সে বলতে লাগল, দুনিয়া তো আমার ওপর সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এর কতটুকুই-বা উপভোগ করা গেল!

এভাবে আরেক ব্যক্তির কথা শুনেছি, মৃত্যুর সময় সে বলছিল—আমার প্রতিপালক আমার প্রতি জুলুম করে ফেলছে! (নাউজুবিল্লাহ)।

এমন আরও অনেক ঘটনা ও কথা রয়েছে। এ ধরনের ইন্দ্রিয়তাড়িত ব্যক্তিদের এসকল নিকৃষ্টতম অভিযোগ ও ঘটনাগুলো বর্ণনা করতেও অপছন্দ লাগে। তারা যদি বুঝত যে, এই দুনিয়া হলো প্রতিযোগিতার স্থান, এটি ধৈর্যধারণের ময়দান। এটি পরীক্ষার জায়গা; যাতে এখানে স্রষ্টার প্রতি মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও আত্মসমর্পণের বিষয়টি প্রকাশিত হয়। এগুলো যদি তারা বুঝত, তাহলে স্রষ্টার কোনো কাজের ক্ষেত্রে তারা আর অভিযোগ আপত্তি করত না।

হায়! মানুষ যদি বুঝত, রাতদিনের কঠিন পরিশ্রমে তারা এত ব্যাকুল হয়ে যেই শান্তি স্বস্তি এবং নিজের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদাগুলো পূরণের কামনা করছে, তা তো রয়েছে তাদের সমুখে, ভবিষ্যতে, আখেরাতে।

দুনিয়া হলো শস্যক্ষেতের মতো। এখানে যখন সে কর্মরত থাকবে, তখন তার কষ্ট এবং শরীরে ধূলি-কাঁদা লাগবে। কিন্তু যখন সে এখানকার কাজ সম্পন্ন করবে, তখন সে বিশ্রাম পাবে। সুন্দর জামা-কাপড় পরিধান করবে। শান্তি-সুখের অবকাশ পাবে।

হায়! কে বুঝবে, দুনিয়ার এই তুচ্ছ শরীর পবিত্র আত্মাকে চিরকাল ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না। মৃত্যুর মাধ্যমে তাই আত্মাকে তার থেকে বের করে আনা হয়। এরপর তার জন্য এমন এক স্থায়ী শরীর প্রদান করা হবে, যার মধ্যে এই আত্মা চিরকাল অবস্থান করবে। তাহলে কেন এই মৃত্যু নিয়ে এত অভিযোগ?

এরপরও যে ব্যক্তি অভিযোগ করতে চায়, তাকে তুমি বলো,

﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾

> সে আকাশ পর্যন্ত একটি রশি টানিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করুক। তারপর দেখুক, তার প্রচেষ্টা তার আক্রোশ দূর করে কি না! [সুরা হজ : ১৫]

তুমি তাকে আরও বলো, এভাবে অভিযোগ-আপত্তিতে তাকদিরের কোনো হেরফের হবে না। আর যদি মেনে নেয়, তবুও তো তাকদির তার গতিতেই চলবে। সুতরাং বিক্ষুব্ধ অবস্থায় তাকদির অতিবাহিত হওয়ার চেয়ে আল্লাহর ফয়সালায় অনুগত দাস হওয়া অবস্থায় তাকদির অতিবাহিত হওয়া অনেক কল্যাণকর।

যেমন 'অদাহুল ইয়ামান' যখন বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, তার চুপ থাকাটাই সুন্দর হয়েছিল। খলিফা যখন বললেন, হে বাক্স, আমরা যা ধারণা করছি, তা যদি তোমার মধ্যে থাকে, তবে তোমার অস্তিত্বই আমরা মুছে দিলাম, আর যদি তা না থাকে, তবে তো আমরা প্রাসাদের কাঠের একটি বাক্সকেই শুধু দাফন করলাম।'[১০৮]

---

১০৮. এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে। ঘটনাটি যেমন প্রেমের রসে আপ্লুত, নির্মম হত্যার দ্বারা তেমনি বেদনাবহ। সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণটি এমন—

এসময় 'অদাহুল ইয়ামান' যদি বাঁচার জন্য বাক্সের মধ্য থেকে চিৎকার করে উঠত, এটা তার কোনো উপকারই করত না। বরং তাকে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করা হতো। বরং এমন অবস্থায় নীরবতাই কখনো কখনো বাঁচার সম্ভাবনা জাগিয়ে রাখে।

'অদাহুল ইয়ামান' (وضاح اليمن) ছিল একজন বিশিষ্ট কবি। এটি তার উপাধী। তার আসল নাম আবদুর রহমান ইবনে ইসমাইল আলখাওলানি। তখন উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালেকের রাজত্ব চলছে। অদাহুল ইয়ামানের কবিতার ধার ছিল প্রখর। কিন্তু সে নিজে ছিল চারিত্রিকভাবে অধঃপতিত। বিয়ে করেনি। কিন্তু বহু নারীর সঙ্গ সে লাভ করেছে। এদিকে খলিফা ওয়ালিদের স্ত্রী 'উম্মুল বানিন' হজ করার ইচ্ছা করলেন। খলিফা তাকে এক বিশ্বস্ত দাসীর তত্ত্বাবধানে হজের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। 'উম্মুল বানিন' মক্কায় পৌঁছে হজ আদায় করলেন। আগে থেকেই তার কবিতার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। তিনি চাইতেন অন্যদের মতো তাকে নিয়েও যেন কবিরা কিছু 'প্রশংসা-কাব্য' রচনা করে। তিনি খবর নিয়ে জানলেন এ এলাকায় 'অদাহুল ইয়ামান' এর প্রচণ্ড কবি-খ্যাতি রয়েছে। তিনি কবিকে দিয়ে তার 'স্তুতি' রচনা ও শোনার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। কিন্তু খলিফা ওয়ালিদ রাজি হচ্ছিলেন না। তবে তিনি যেহেতু আগে থেকেই এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন, তাই অবশেষে সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তাই ঘটল। কবিতায় স্তুতি শুনে এবং প্রেমের কবিতা রচনা করতে গিয়ে একে অন্যের প্রেমে পড়ে গেল। কিছুদিন পর খলিফার স্ত্রী সিরিয়ায় ফিরে এলেন। কবিকেও সিরিয়ায় চলে আসতে বলে এলেন। কিছুদিন পর যথারীতি প্রেমিক কবিও সিরিয়ায় পৌঁছে গেল। সিরিয়ায় এসে খলিফার দরবারে কাব্য রচনা করে আর গোপনে তার স্বতন্ত্র প্রাসাদে অভিসারে গমন করে। অন্য কেউ এসে পড়ার আভাস পেলেই কক্ষে রাখা বাক্সগুলোর মধ্যে বড়টির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। বাক্সগুলোর মধ্যে সাধারণত জামা-কাপড় রাখা হতো। কিছুদিনের মধ্যেই গোপন মাধ্যমে প্রেমের বিষয়টি খলিফার কানে গেল। খলিফা ওয়ালিদ একদিন হঠাৎ স্ত্রী উম্মুল বানিনের কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। বিভিন্ন কথার শেষে খলিফা স্ত্রীকে বললেন, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?

স্ত্রী বললেন, আমার প্রাণের চেয়েও আপনাকে বেশি ভালোবাসি।

তাহলে তোমার কক্ষের এই বড় বাক্সটি আমাকে দিয়ে দাও।

স্ত্রী বললেন, এটি ছাড়া অন্যগুলি নিন।

খলিফা বললেন, আমার এটাই পছন্দ। এর কারু-সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ।

নিরুপায় হয়ে স্ত্রী বাক্সটি প্রদানে রাজি হলেন। খলিফা তার কিছু দাস-অনুচরকে ডেকে বললেন এটি বাইরে নিয়ে যাও। বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। এরপর তিনি তাদেরকে বাগানের মধ্যে একটি গভীর গর্ত খনন করার নির্দেশ দিলেন। দ্রুত নির্দেশ পালন করা হলো। এবার বাক্সটিকে সেই গর্তের নিকট নিয়ে বাক্সকে সম্বোধন করে বললেন, হে বাক্স! আমরা যা ধারণা করছি, তোমার মধ্যে যদি তা থাকে, তবে তো তোমার চিহ্ন পর্যন্ত আমরা মুছে ফেলব। আর যদি তা না থাকে, তবে তো নিছক প্রাসাদের একটি কাঠের বাক্সকে আমরা দাফন করছি। তার সাথে দাফন করছি অপবাদের সূত্রটিও।

কিন্তু বাক্সের মধ্য থেকে কোনো আওয়াজ আসে না। এভাবেই বাক্সটিকে গভীর গর্তে দাফন করে দেওয়া হয়। এরপর আর কখনো 'অদাহুল ইয়ামান'কে ধরাপৃষ্ঠে দেখা যায়নি। ধারণা করা হয়– সে বাক্সের মধ্যেই চুপ করে ছিল এবং বাক্সটির সাথে সে নিজেও দাফন হয়ে যায়– অনুবাদক।

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করা

যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিষয়াবলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে, নিশ্চয়ই সে বুঝেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা হলো, মানুষ দুনিয়ার কামনা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে যেন বিরত রাখে। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো বৈধ বিষয়েও আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করার দিকে ঝুঁকেছে, সেখানেই সে তার প্রতিটি সুখের সাথে এক বা একাধিক দুঃখের মুখোমুখি হয়েছে। প্রতিটি স্বস্তির সাথে যুক্ত হয়েছে ক্লান্তি। প্রতিটি অপূর্ণ আস্বাদন তার চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে; কিছুতেই তৃপ্তি আসেনি।

এভাবে যখনই সে দুনিয়া থেকে কিছু অংশ উঠিয়ে নিয়েছে, দুনিয়াও তার থেকে সমপরিমাণ অংশ নিয়ে নিজের কমতি পুষিয়ে নিয়েছে। দুনিয়ার এ এক মহা নির্মম রীতি। বিনিময় ছাড়া সে কাউকে কিছুই প্রদান করে না। যেমন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আয়েশা রা.-কে বেশি ভালোবেসেছিলেন, ঠিক প্রতিফলে কষ্টের অংশ হিসেবে তার ওপর 'ইফক' (অপবাদ)-এর ঘটনা আপতিত হয়েছে। তিনি যখন যায়নাব রা.-এর দিকে ঝুঁকেছেন, তখন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে সেই ঘটনা—

> 'এরপর যায়দ যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম; যাতে করে পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে, যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে।'
>
> [সুরা আহযাব : ৩৭]

অতএব, দুনিয়ার প্রতিটি সুখের সাথে লেগে আছে দুঃখ। এটা আমরা এভাবেও বুঝতে পারি, যখন কারও প্রেমাস্পদ বা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির মিলন ও সান্নিধ্য অর্জন হয়, বুদ্ধিমত্তার চোখ তখনো দেখতে পায় পরমুহূর্তের ওত পেতে বসে থাকা কষ্টকর বিরহ ও বিচ্ছিন্নতা। তাই সেই প্রাপ্তির সময়ও মানুষের হৃদয় বিরহের চিন্তায় ব্যথিত হয়।

জনৈক কবি বলেন,

أتم الحزن عندي في سرور ... تيقن عنه صاحبه انتقالاً

সুখের মাঝেও আমার নিকট সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয়

জানে সেই প্রিয়, অচিরেই হারিয়ে যাবে এই সুখের সময়।

সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে, দুনিয়াতে এসকল অপূর্ণতা ও পঙ্কিলতা প্রদানের দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত থাকে। এ কারণে দুনিয়াতে নিজের প্রয়োজন পরিমাণ অর্জনের প্রতিই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দুনিয়ার জন্য অধিক ব্যস্ততা বর্জন করতে হবে। তাহলেই শুধু আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা ও ইবাদতে পূর্ণ মনোযোগ স্থাপন সম্ভব হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এসকল দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না, তাকে একদিন বহু বঞ্চনার ওপর আফসোস করতে হবে। তখন সে আফসোস কোনো উপকারে আসবে না।

কিছু উপদেশ

বুদ্ধিমান ব্যক্তি দুনিয়াতে তার জীবনযাপনকে বুদ্ধিমত্তার সাথেই পরিচালনা করে। সে যদি দরিদ্র হয়, উপার্জনের চেষ্টা করে। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করে; যাতে অর্থের জন্য মানুষের নিকট হাত পাততে না হয়। অনাবশ্যক খরচের মাধ্যমগুলোকে কমিয়ে আনে এবং অল্পেতুষ্ট থাকে। এভাবেই সে মানুষের অপ্রীতিকর অনুগ্রহ ও দয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। তখন সে মানুষের মাঝে নিজের সম্মান মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়।

আর সে যদি ধনবান হয়, তাহলেও সে তার খরচের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকে। অবিবেচকের মতো নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে নিজেই আবার অন্যের দারস্থ হয়ে পড়ে না।

কিন্তু নির্বোধ ব্যক্তি এ বিষয়ে ভীষণ বোকামি করে। সে খরচের ক্ষেত্রে অপচয়ের সীমায় চলে যায় এবং সম্পদ নিয়ে এমন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়; যাতে তার বিপক্ষের লোকেরা তার খরচ দেখে চুপসে যায় এবং তার কাছে ছোট হয়ে যায়। এভাবে সে নিজেই তার সম্পদে চোখ লাগার ব্যবস্থা করে ফেলে।

কিন্তু আমাদের জন্য সর্বক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। যা এবং যতটুকু গোপন রাখা উচিত, তা গোপন রাখাই ভালো। নতুবা পরিণামে বিপদে পতিত হতে হয়।

একবার এক ডুবুরী সাগরে অনেক সম্পদ খুঁজে পেল। অনেক মণি-মুক্তা-জহরত। এরপর সে কোনো দিকে খেয়াল না করে সমানে দু-হাতে এগুলো খরচ করতে শুরু করল। অচিরেই তার সম্পদের কথা মানুষদের মাঝে জানাজানি হয়ে গেল। প্রতিফলে একদিন তার সকল সম্পদ ডাকাতি হয়ে গেল। ডুবুরী আবার সেই আগেই মতোই নিঃস্ব, দরিদ্র ও সম্বলহীন হয়ে পড়ল।

সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারাও একটি বড় যোগ্যতার
স্মরণ রাখা উচিত—
যা প্রকাশ করা উচিত নয়, তা গোপন
ব্যাপার। পরিমিত খরচ করবে।

রাখবে। এমনকি স্ত্রীর নিকটও সকল সম্পদের পরিমাণ প্রকাশ করা একটি বোকামিপূর্ণ কাজ। কারণ, সম্পদ যদি তুলনামূলক কম হয়, তবে স্ত্রীর নিকট নিজের মর্যাদা কমে যাবে। আর যদি সম্পদ বেশি হয়, তাহলে স্ত্রী বেশি বেশি ভরণপোষণ চাইবে, অলংকারাদি বানিয়ে দেওয়ার বায়না ধরবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾

তোমরা অবুঝদের হাতে তোমাদের সেই সম্পদ তুলে দিয়ো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জীবনযাপনের অবলম্বন বানিয়েছেন।

[সুরা নিসা: ৫]

এভাবে সন্তানকেও পুরোপুরি সম্পদের কথা জানানো উচিত নয়। নিজের একান্ত গোপন বিষয়াবলিও সংরক্ষণ করা জরুরি এবং সে সম্পর্কে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এমনকি বন্ধু সম্পর্কেও সতর্ক থাকবে। কারণ, বন্ধুও কখনো শত্রুতে পরিণত হয়ে যেতে পারে!

কবি বলেন,

إحذر عدوك مرة ... واحذر صديقك ألف مرة

فلربما انقلب الصدي ... ق فكان أعلم بالمضرة

শত্রুর ক্ষেত্রে সতর্ক হও একবার। বন্ধুর ক্ষেত্রে সতর্কতা হাজার বার।

বন্ধু যদি কখনো শত্রু হয়ে যায়– সে যে তোমার ক্ষতিতে বেশি খবরদার।

পরিশিষ্ট

সকল প্রশংসা আল্লাহর। তারই দয়া ও অনুগ্রহে আমার দুর্বল চিন্তা যা কিছু ভেবেছিল, 'সইদুল খাতির' কিতাব আকারে সংক্ষিপ্তভাবে তা কলমবন্ধ করা সমাপ্ত হলো। আশা করা যায়, এর দ্বারা অন্তরের অনেক রোগের নিরাময় হবে। শরিয়তের সঠিক বিধান ও তার অনুপম সৌন্দর্য দ্বারা জীবনকে সজ্জিত করা সম্ভব হবে এবং প্রিয়তর আখলাক ও গুণাবলির মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে সজ্জিত করা যাবে।

আল্লাহ তাআলা এটাকে ওয়াজ ও নসিহতের ক্ষেত্রে মিম্বর ও মঞ্চের সঠিক দিকনির্দেশিকা করে দিন। এবং মানুষের হেদায়েতের জন্য করুন সবচেয়ে উপকারী কিতাব; যা তার নিজের সৌকর্য নিয়ে দ্বিপ্রহরের আলোর মতোই হবে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়।

ইমাম ইবনুল জাওযি রহ.—দীপ্ত জ্ঞানের সব্যসাচী। সত্যালোকের পথপ্রদর্শক। উম্মাহর অমিততেজা শার্দূল। শাসনের রোমশ বাহু ও নৃশংস নখরের আওতার মধ্যে থেকেও আমৃত্যু অটল ছিলেন মহান আদর্শের ওপর। তার চলার পথে বনভূমি ছিল, বালুকাভূমি ছিল, উপলখণ্ড ছিল; সবকিছু ডিঙিয়ে-ভেঙে তিনি সামনের দিকে এগিয়েছেন। তার সমুখে কখনো এই বিশ্ব-স্রোতস্বিনীর স্রোত প্রবল হয়েছে, কখনো গতি মন্থর হয়েছে, কখনো পথ ঘুরে গিয়েছে, কখনো পানি ঘোলাটে হয়েছে, কখনো আবর্ত রচনা করেছে, কখনো স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ হয়েছে। এ সবকিছুর ভেতর দিয়ে তিনি নিজের অবস্থা ও অবস্থান ঠিক রেখেছেন। কণ্টকাকীর্ণ পথ, এবড়োখেবড়ো প্রান্তর ও শ্বাপদসংকুল অরণ্য মাড়িয়ে সাফল্যের মুকুট ছিনিয়ে এনেছেন। গ্রন্থ রচনা ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনার সমন্বয়ে তার সময়ে তিনি ছিলেন এক অনন্য উচ্চতায় আরোহী; যার দৃষ্টান্ত ছিলেন শুধুই তিনি। ইলমচর্চার এক প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রান্তিকতা বর্জন করা এবং ভারসাম্য ও মধ্যপন্থার ওপর সবক্ষেত্রে অটল থাকা যার সবিশেষ বৈশিষ্ট্য। রাজদরবারে ছিল না তার অবাধ যাতায়াত। শাসকদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন আজীবন। কোনো স্বার্থই তাকে আদর্শের ব্যাপারে আপস করার দিকে প্ররোচিত করতে পারেনি। যার কারণে জীবনের সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ-পাঁচটি বছর কাটাতে হয়েছে ক্ষমতাধর জালিমদের জিন্দানখানায়। হিংসুকদের রোষানলে পড়ে তার রৌদ্রের দিন রূপান্তরিত হয়েছে নিষিদ্ধ নিশীথে। তবুও তিনি সত্যের বাণীকে উচ্চকিত রেখেছেন। সত্যের মশাল থেকে আলো বিলিয়েছেন।

হৃদয়ের দিনলিপি গ্রন্থটি তার হৃদয়ের বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনার সংকলন। যার কারণে এর একক কোনো বিষয়বস্তু নেই। তিনি নিজেই এর পরিচয় তুলে ধরেছেন এভাবে : 'আমি যখন চিন্তার দৃষ্টিতে কোনো বিষয় নিয়ে ভাবি, মাথার ভেতর আশ্চর্য সব ভাবনা ও বিশ্লেষণ এসে ভিড় করে। বোধ, বিশ্বাস ও চেতনার এক বিশাল ভান্ডার যেন আমার সমুখে খুলে যায়। অবশেষে ভেবে দেখলাম, এ বিষয়ে আর অলসতা বা উদাসীনতা দেখানো ঠিক হবে না। হৃদয়ের কথাগুলো লিখতে শুরু করলাম। পরিশেষে এর নাম রেখে দিলাম—সইদুল খাতির। ভেতরের রক্ষিত কথামালা। হৃদয়ের দিনলিপি। অন্তরের কথকতা।'

যারা ন্যায় ও ইনসাফের ওপর চলতে চান, যারা মধ্যপন্থা ও ভারসাম্য অবলম্বন করতে চান, যারা বিশুদ্ধ পন্থায় ইলমচর্চা ও আত্মশুদ্ধির স্বপ্ন লালন করেন, যারা নফস ও শয়তানের ধোঁকা থেকে প্রতিমুহূর্তে সুরক্ষিত থাকার এবং প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকার প্রত্যাশা করেন, যারা তত্ত্বকে জীবনে প্রয়োগ করতে চান এবং জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় করার আগ্রহ রাখেন, সর্বোপরি যারা সত্যালোকের দীপ্ত অভিযাত্রী এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আদর্শের ধারক হতে চান—তাদের সকলের জন্য এই গ্রন্থটি হতে পারে উত্তম পাথেয়। আল্লাহ তাআলা সইদুল খাতিরকে যেমনিভাবে কবুল করেছেন, তার বঙ্গানুবাদ হৃদয়ের দিনলিপিকেও সেভাবে কবুল করুন। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

আলী হাসান উসামা

লেখক । অনুবাদক । সম্পাদক । আলোচক ।

ISBN